আকালের সন্ধানে

অমলেন্দু চক্রবর্তী

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

AKALER SANDHANE Rs. 30
A BENGALI NOVEL
BY
AMALENDU CHAKRAVORTY
Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street,
Calcutta 700073

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৬২

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখব দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর :
অশোককুমাব ঘোষ
নিউ শশী প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৬

গ্রন্থস্বত্ব :
গীতা চক্রবর্তী

দাম : ৩০ টাকা

মে-জুন মাসে 'আকালের সন্ধানে'র একটি খসড়া তৈরি হয়েছিল মাত্র। তারই ভিত্তিতে শ্রীমৃণাল সেন-কৃত চলচ্চিত্রের নির্মাণ। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের আয়তন এবং বিষয়গত ব্যাপ্তি দীর্ঘতর। প্রয়োজনীয় উপকরণসংগ্রহ বা তথ্যানুসন্ধানে সময়ের যে দীর্ঘপ্রতীক্ষা আবশ্যিক ছিল, তারই পরিণামে সমগ্র উপন্যাস রচনার কালগত পরিধি বৎসরাধিক। লেখা শেষ হয় ডিসেম্বর।

উৎসর্গপত্র শ্রীমৃণাল সেন প্রস্তাবিত। সুতরাং নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্য আমাদের যৌথ। ১১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পংক্তিগুলি শ্রদ্ধেয় কবি বিষ্ণু দে-র বিখ্যাত 'যম-ও নেয় না' কবিতার অংশ।

পাণ্ডুলিপির প্রথম পাঠক শ্রীঅশোক সেন। তাঁর সুপরামর্শ রচনাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বিষয়ে শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত-এর গবেষণা উপন্যাস নির্মিতিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে। এছাড়াও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ কাগজপত্র দিয়ে এবং অন্যান্য ভাবে গ্রন্থরচনায় সহায়তা করেছেন কলকাতা কর্পোরেশনের (কেন্দ্রীয় ভবন) গ্রন্থাগারিক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীপ্রবীর বসু, শ্রীসুবীর ভট্টাচার্য, শ্রীমিহির মুখোপাধ্যায়, শ্রীসমর দে।

প্রুফ দেখায় নিরন্তর সাহায্য করেছেন শ্রীঅনুপ চক্রবর্তী এবং শ্রীমান প্রিয়দর্শী চক্রবর্তী। মুদ্রণসংক্রান্ত বিষয়ে নিউ শশী প্রেস-এর কর্মীরা অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও মুদ্রণভ্রান্তি হয়তো পরিহার করা যায় নি। দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন অন্যত্র উল্লিখিত হলো।

এই উপন্যাস, শিল্পের নিজস্ব অর্থে, সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বস্তুবিশ্বে কোথাও সাযুজ্য লক্ষিত হলে, বলা বাহুল্য, সেটা নিতান্তই আপতিক।

অমলেন্দু চক্রবর্তী

৩৩ পৃষ্ঠায় 'এখনও স্থিরীকৃত নয়' দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মুদ্রণবিপর্যয়। শুদ্ধপাঠ—
সম্পাদনা : নীলমণি ঘটক।

১৬৯, ১৭৪, ২০৪ পৃষ্ঠায় ক্ল্যাপস্টিক নির্দেশে মাসসূচক সংখ্যাশব্দ 10 (অক্টোবর)
হবে।

'আকাল' ছবির গল্প

'চিত্রচিত্রণ'-এর নতুন উদ্যোগ

প্রযোজনা : প্রভুপদ সাহা
কাহিনী : শ্রীকান্ত সিংহ
চিত্রগ্রহণ : নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গীত : এখনও স্থিরীকৃত নয়
সম্পাদনা : এখনও স্থিরীকৃত নয়
শিল্পনির্দেশন : গোপেন কর
স্থিরচিত্র : সুকান্ত সান্যাল
অভিনয় : কিরণময় ভট্টাচার্য, ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, নন্দিতা রায়, প্রতিমা দাশ, আরতি সোম, বিতোষ সরকার, হরদয়াল ঘোষ, নিশীথ বাগচী আরো অন্যান্য।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : পরমেশ মিত্র

১৩৫০

অখণ্ড বাংলার

পঁয়ত্রিশ লক্ষ

মানুষকে

বেলা প্রায় চারটে নাগাদ গাড়িটা একেবারে স্কুলবাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল। ড্রাইভারের পেছনে, ডানদিকের দরজা খুলে পরমেশই নামলেন প্রথম। দীর্ঘ-দেহে নেভি-ব্লু প্যান্ট আর গাঢ় হলুদ শার্ট, এলোমেলো চুলে বেশ কিছুটা পাক ধরেছে যদিও, মাথা ভরে একরাশ ঘন চুলে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার অবশেষ। প্রায় পঞ্চাশ-বাহান্ন বছরের চেহারার আদলে মনীষীসুলভ এমন কিছু নেই অথবা গ্রামবাসীর কাছে হয়তো এটাই তাজ্জব, খবরের-কাগজের ছাপা-ছবি থেকে কালেভদ্রে এঁরা কেউ কাছাকাছি এসে গেলে, অবাক কাণ্ড, এঁদের সচলতায় অবিকল মানুষের আচরণ।

সকাল থেকেই স্কুলের বড়ো ফটকটায় ভিড় করে ছিল নানা বয়সের গাঁয়ের মানুষ। দুপুরের পর ভিড়টা আরো বেড়েছে। বড়ো ভ্যান আর জিপ গাড়িটাকে তারা দুদিন আগে থেকেই দেখছে। দুটো অ্যাম্বেসেডরের পর তৃতীয়টি এসে পৌঁছোতেই জনতা চঞ্চল হলো। ঘিরে ফেলল আসল মানুষকে।

পরমেশ নেমেই গাড়িগুলো দেখলেন পর পর। পড়ন্ত বেলায় স্কুলবাড়ির সম্মুখবর্তী কয়েক ফুট চওড়া এবড়ো খেবড়ো রাস্তার প্রায় সবটা জুড়ে লক-করা গাড়িগুলো স্থির। ফিরে এসে কী বললেন নিজের ড্রাইভার রাজুকে। রাজু ব্যাক-গিয়ারে গাড়িটা একটা গাছের ছায়ায় নিয়ে যাচ্ছিল।

দীর্ঘ পথযাত্রার শেষে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যেন নিশ্চিত প্রসন্নতা। একটা পরিত্যক্ত ফাটল-ধরা ভাঙা মেটেঘরের গা ঘেঁষে, ছায়ায় দাঁড়িয়ে তাকালেন এপাশে ওপাশে গাছপালার সবুজে, দূরবর্তী রেললাইন বা রেলের সিগনাল পেরিয়ে উদার মাঠ, বিস্তৃত আকাশ আর নিকটবর্তী স্কুলবাড়ি, ভিড়ের মানুষ। নিজের ভাবনায় তলিয়ে থেকে আনমনে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিলেন। গাড়ির দ্বিতীয় আরোহী কিরণময় ভট্টাচার্য এরই মধ্যে নিঃশব্দে তাঁর বিড়িটা ধরিয়ে নিয়েছেন। বয়সে প্রায় বছর দশেকের জ্যেষ্ঠ অনতিবৃদ্ধ শিল্পীকে বিশেষ মর্যাদায় পরমেশ নিজের গাড়িতে সঙ্গী করে এনেছেন। তিলে তিলে দগ্ধে-মরা কিরণময় ভট্টাচার্য চারদশক পূর্ববর্তী গণনাট্য সঙ্ঘের যুগ থেকে বাংলা-

দেশের এক বিশিষ্ট নাট্যকার। বর্তমানে ভাঙাচোরা নড়বড়ে এক গ্রুপ-থিয়েটার দলের নির্দেশক অভিনেতা।

এগোতে এগোতে পরমেশ যুবকদের দিকে তাকালেন একবার। চকচকে চেহারায় বেশ শহুরে-শহুরে। অন্যদিকে ফ্রক-পরা বাচ্চা মেয়ের কাঁখে ন্যাংটো শিশুকে গাল টিপে আদর করলেন হাত বাড়িয়ে।

কিরণময় হাসলেন—'বিয়েবাড়িতে বরের গাড়ি এলে এরকম ভিড় হয় পড়শিদের...'

'আপনি কি নীতবর কিরণদা ?'

'হ্যাঁ, সে তো বটেই। তোমার পিছু পিছু আছি যখন...'

'সিল্কের পাঞ্জাবি আর টোপর-পরা ওই লোকটাকে এমন ন্যাকা-ন্যাকা লাগে আমার। বেশ বর্বর...'

পরিহাসে তৃতীয় মানুষ নেই। হাসিটা উচ্চকিত হলো না তেমন।

ফটক পেরোতেই স্কুলের এলোমেলো বাগান। গাঁদা দোপাটি ধুলোয় মাখামাখি, টগররঙ্গনপাতাবাহারের দিশি গাছ। ডানে বাঁয়ে সায়েন্স বিল্ডিং, হিউম্যানিটিজ-কমার্স বিল্ডিং-এর বড়ো বড়ো দুটো দোতলা বাড়ির প্রান্তে সারিবাঁধা একতলা ঘরের সংযোগ। ওপাশে একতলা ঘরের বর্গক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। বিশাল প্রাসাদ, অসংখ্য ঘর, অঢেল জায়গা। পুজোর-ছুটির বাঁধা সময়টাই একমাত্র ভাবনা। নইলে ক্যাম্প হিশেবে সবদিক থেকেই আশ্চর্য সুন্দর।

ইউনিটের অন্যান্যরা নিজেদের শোয়াবসাথাকার বন্দোবস্তগুলো গোছগাছ করে নিয়ে ঘুরছিল ইতস্তত। ছুটে এলো—'আপনাদের এত দেরি হলো পরমদা ?'

পরমেশ আমল দিলেন না—'সুকুমারবাবু কোথায় ?'

'সুকুমারদা তো তারকবাবুকে নিয়ে ইলেকট্রিক আপিশে গেছেন। এক্ষুনি ফিরবেন।'

'ইলেকট্রিসিটির অফিস! সেটা কোথায় ?'

'বেশি দূরে নয়। এই তো স্টেশনের কাছে।'

'কেন ? আলোটালো নেই নাকি আপনাদের ?'

ওরা এ ওর দিকে তাকাল। সেকেণ্ড-অ্যাসিস্ট্যান্ট চটপটে যুবক প্রদীপ চৌধুরী হাসল—'সে তো আমরা কাল থেকেই পাচ্ছি।'

'তাহলে আবার ওখানে কেন ?'

'পরশুদিন ইঞ্জিনিয়ার নিজে এসে ও. কে. দিয়ে গেছেন। কাল বিকেল

থেকেই কানেকশান পাবার কথা। সে আর আসে না। আমরা প্রথম ভেবেছিলাম, লোড-শেডিং। শেষে, বাইরে স্কুলের লাইট জ্বলছে দেখে সুকুমারদা ছুটে গেলেন। ইঞ্জিনিয়ার নেই, আপিশ বন্ধ। খবর পেলেন টেস্ট সার্টিফিকেট না নিয়ে দুজন কেরানিবাবু গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছেন। সুকুমারদা তো রেগে কাঁই। শেষে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ঝগড়াঝাঁটি করে সন্ধেবেলা কানেকশান নিয়ে এসেছেন। আজ সকালেও গিয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে। শুনে এসেছেন, আপিশের কি কাজে নাকি ব্যাণ্ডেল গেছেন সাহেব। ফিরবেন তিনটে নাগাদ…'

বাকি কথা নিষ্প্রয়োজন। পরমেশ অর্ধেক সিগারেটটা অদূরে করবী গাছের দিকে ছুঁড়লেন—'দীপক কোথায়?'

'নন্দিতাদি প্রতিমাদি যেখানে থাকবেন, মাস্টারমশাইদের কোয়ার্টারে…'

'আর সবাই ঠিকমতো পৌঁছে গেছেন? ধ্রুব নির্মল?'

'ধ্রুবদা ঘরে। নির্মলদা তো এই একটু আগে কোথায় বেরোলেন সুকান্তদার সঙ্গে…'

'কিরণদা তো আমার সঙ্গে থাকবেন। আমার ঘরটা দেখিয়ে দাও তো ওঁকে। বুড়োমানুষ। ওর জিনিসপত্তরগুলো তুলে একটু গুছিয়েটুছিয়ে দিতে বলো কাউকে।'

ওদিকে বাঁধানো সিঁড়ির পাশে, রকে বসে পড়েছেন কিরণময়। কয়েকজন অভিনেতা বিতোষ সরকার উদয় চৌধুরী বিমল দাশগুপ্ত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। পরমেশ এগিয়ে এলেন—'আপনি বরং একটু বিশ্রাম করুন কিরণদা। ঘরটা আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছে ওরা…'

'তুমি আবার ওরকম কুটুম্বিতা আরম্ভ করলে কেন হঠাৎ…' প্রায় সবটাই শাদা ঝাঁকড়া-চুলে নাচন দিয়ে থুতনি উঁচিয়ে তাকালেন কিরণময়—'আমি আছি, খাসা আছি। ঠিক-ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছ, ব্যস, নাউ আই উইল সি টু মাই ওন্ থিংগস্। তুমি তোমার নিজেরটা দেখো…'

ফিরে যাচ্ছিলেন পরমেশ। কিরণময় ডাকলেন—'ফিল্ম্ তো করতে এসেছ। ওটা দেখেছ?'

সবাই তাকাল। ওদিকে সায়েন্স বিল্ডিং-এর দোতলার গায়ে দীর্ঘ হলুদ দেয়ালে প্রায়-বিলীন দেয়াল-লিখন—'এ বুর্জোয়া ব্যবস্থায় যে যতো পড়ে সে ততো মূর্খ হয়।'

পরমেশ হাসল—'সে তো আজ বছর দশক আগের কথা। এখনও রয়েছে?'
'তার মানে বুর্জোয়াদের মিস্তিরি বুর্জোয়া হোয়াইট-ওয়াশে কথার সত্যিটাকে মুছে দিতে পারেনি দশ বছরে।'
'কিন্তু মূর্খ বানানটা যে ভুল কিরণদা।' বিতোষ হাসল।
কিরণময় আবার বিড়ির-পোঁটো বের করেছেন—'ভুল তো তোমাদের পঞ্চাশ বছরের গোটা রাজনীতিটাই। ঢাক পিটিয়ে সে তো তোমাদের নেতারা নিজেরাই বলে বেড়াচ্ছেন। ভুল-মাস্টাররা সব কিছু ওভাবে হ্রস্ব করে দেখলে দীর্ঘ-উ শিখবে কোথায় ছেলেরা? মূর্খতা তো সব দেশে সব যুগেই ভুল।'
পুরনো হাসিটা ঠোটের কোণে আলতো করে ঝুলিয়ে রেখে পরমেশ কব্জিতে ঘড়ির দিকে তাকালেন—'আপনি তাহলে এদের সঙ্গে বসে গল্প করুন কিরণদা। আমি একটু দেখি…'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি যাও। লিডার অব দ্য ব্যাটেলিয়ন, তোমার কি এখানে বসে গপ্পো করলে চলে!' পা ঝুলিয়ে বসে ছিলেন কিরণময়। চটপট উঠে দাঁড়ালেন—'সে না-হয় কাজকম্মের ফাঁকে আমিই খুঁজে বের করব ছোঁড়া-গুলোকে…'
'খুঁজে বের করবেন! কাদের?'
'ওই যারা ওসব লিখেছিল। দেখতে হবে, পরীক্ষা পাশটাশের পর চাকরিবাকরি নিয়ে ঘরগেরস্তালি করছে, না কি পড়াশুনো লাটে তুলে এখনও পোস্টার লিখে যাচ্ছে আর কারও হয়ে…'
পরমেশ লাফ মেরে উঠে এলেন একতলার বারান্দায়। দ্রুত সিঁড়ি টপকে দোতলার দিকে। সঙ্গে ইউনিটের ঘনিষ্ঠরা।
এদিকে চায়ের-ট্রে-হাতে বেরিয়ে পড়ছে বাসু। পেছনে দুহাতের প্লেটে অঢেল বিস্কুট নিয়ে রবি। চা চার প্রকার—চিনি দুধ মেশানো সাবেকি, চিনি ছাড়া দুধ মেশানো, দুধ ছাড়া চিনিসহ, দুধচিনি সব বাদ—শুধু লিকার। প্রডাকশন কন্ট্রো-লার সুকুমার বসাক ধরে ধরে হিসেব দিয়ে রেখেছেন—কার ডায়বেটিস, কার কী পছন্দ। বেচারি বাসুদেব। গুনে গুনে হিসেব রাখতে হয়, মুখ চিনে চিনে কাপ বা গ্লাস এগিয়ে ধরতে হয়। বিশেষত আর্টিস্টদের চায়ের মেজাজে গড়বড় ঘটলে খিস্তিতে ভূত ভাগাবেন সুকুমারদা। সুতরাং নির্দিষ্ট ফরমায়েসের চা-গুলোই তার বাঁ-হাতের তেলোয় ট্রে-তে সাজানো থাকে। ডান হাতে সাবেকি চায়ের কেটলি।

অক্টোবর মাস। পুজোর ছুটি। প্রসন্ন শরৎবেলায় গোটা গ্রাম যখন চাষ-আবাদের পরবর্তী বিশ্রামে আগমনীর ঢাকে চামড়া সেঁকছে আগুনে অথবা খড়ের কাঠামোয় মাটির কাজ শেষ হবার পর রঙে রঙে মা হয়ে উঠছেন দশভূজা মূর্তি, ছুটির স্কুলবাড়িটা পরিত্যক্ত ভূতুড়ে-প্রাসাদের মতোই নিঝুম পড়ে থাকার কথা, কিন্তু বিদেশী লোকজনের হল্লায় সকাল থেকেই সরগরম। শুধু স্কুলপাড়া বা মোহনপুর গ্রাম নয়, হুগলী জেলার বলাগড় থানা এলাকার মোহনপুর মৌজার আরো দশটা গাঁয়ের মানুষের মধ্যে বিপুল চঞ্চলতা। একই সঙ্গে দুর্গাপূজা এবং ফিল্‌ম্‌ কোম্পানি। যদিও অমিতাভ বচ্চন হেমা মালিনী বা উত্তমকুমারের মতো কেউ নেই, তবু তাদের কাছে পরমেশ মিত্র একটি শ্রদ্ধেয় নাম। বিভিন্ন কাগজ-পত্তরে সচিত্র নামটা প্রায়ই দেখা যায়। শ্রেষ্ঠাংশে অমুক-অনুক নায়কনায়িকার নামে নয়, পরিচালকের নামে যে-সব ছবি নিয়ে কাগজওয়ালারা খুব মাতামাতি করে, তাঁদের একজন।

লোকেশান খুঁজতে বেরিয়ে ব্যাপারটা হাড়েমজ্জায় টের পেয়েছিলেন পরমেশ। গত সাত আট বছরে পুরোপুরি গ্রামের পটভূমিতে কোনো ছবি করেননি বলেই হয়তো অথবা অন্যান্য ছবিতে দুচারটে গ্রামের সিকোয়েন্স থাকলেও যেহেতু ঝামেলা ছিল না তেমন, বোঝা যায়নি স্পষ্ট করে, কী দ্রুততায় গ্রামগুলো বদলে গেছে, বদলে যাচ্ছে। উনিশ শ আশিতে তেতাল্লিশের আকাল খুঁজতে এসে আরেক বোধোদয়—গ্রামের অভ্যন্তরে অসংখ্য কাঁচা রাস্তার সঙ্গে পাকা সড়ক, শালকাঠের থাম পুঁতে বিজলি আলো, অগুন্তি কুঁড়েঘর মেটেঘরের ভিড়ে সুন্দর সুন্দর সব একতলা দোতলা পাকাবাড়ি, বিস্তর দোকানপাট, প্রতিদিনের বাজার, স্নো পাউডার টেরিলিন স্ট্রেচলন রেডিও গ্রামোফোন মাইক। মানুষজনের, বিশেষত নতুন ছেলেদের চলনেবলনে কথায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন।

‘আমরা এখানে একটা ফিল্‌ম্‌ সোসাইটি গড়তে চাই। আপনি আমাদের সাহায্য করবেন?’

ঘাবড়ে গিয়েছিলেন পরমেশ। নদীয়া জেলার চাকদহ থেকে মাইল কয়েক দূরে এক গ্রামে তাকে বলেছিল কোনো যুবক।

‘আপনি কী করেন?’

‘চাকরি।’

‘কোথায়?’

'বি. বা. দী বাগে। একটা প্রাইভেট ফার্মে…'

'কলকাতায় থাকেন?'

'না, ডেইলি প্যাসেঞ্জারি…'

পরমেশ আঁৎকে উঠেছিলেন—'এখান থেকে রোজ রোজ কলকাতা যান! আবার ফেরেন?'

সেই যুবক এবং তার বন্ধুরা ঘনিষ্ঠ হলো আরো—'তাই তো বলছিলাম, আপনাদের বই আমরা দেখব কী করে? কলকাতার লোকদের জন্যে করেন, ওখানেই রিলিজ হয়, ওখানকার লোকেরাই দেখে। এদিকে তো আসেই না আপনাদের বই?'

'আমরাও তো চাই আমাদের ছবি আপনারা দেখুন। আরো, আরো বেশি বেশি করে দেশের মানুষ আমাদের ভালোবাসুক, গালমন্দ দিক। কিন্তু তাই বলে…' বিহ্বল পরমেশ কিঞ্চিৎ হেসে হাত রেখেছিলেন যুবকটির পিঠে—'কিন্তু তাই বলে এখানে, এই গাঁয়ের সিনেমা হলের ভরসায় ফিল্ম্-সোসাইটি কেন?'

'কেন! আমরা ভালো বই দেখতে পারি না?'

'না, সে কথা নয়। নিশ্চয়ই পারেন…'

'তবে?'

নিরুত্তর পরমেশ। . গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে—'বিষয়টা তো এত সহজ নয়। এত বড়ো ইন্‌ডাস্ট্রি, ট্রেড-এর হাজারো ঝঞ্ঝাট। সব তো এখানে এভাবে বুঝিয়ে বলা যাবে না। রাজনীতি করেন?'

'তেমন কিছু না।'

'কবিতা লেখেন?'

সেই যুবক এবার কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত—'এই একটু আধটু…'

অন্য একজন—'চাকদা থেকে একটা লিট্‌ল-ম্যাগাজিন বের করি আমরা—দুরন্ত মশাল…'

'বিক্রি হয়?'

'ন্‌নাহ্‌, এখানে কে পড়বে ওসব? লোক কই? সবাই তো সিনেমা-পত্রিকা আর খেলার-কাগজ…'

হেসেছিলেন পরমেশ। গাড়িতে ওঠার আগে—'নাউ অ্যাক্সেপ্ট দ্য রিয়েলিটি…'

নবম শ্রেণী, ক-শাখা দোতলার ডানদিকে প্রথম ঘর। হাই-বেঞ্চ লো-বেঞ্চ কিছু নেই। মস্ত ঘর জুড়ে চারটে তক্তপোশে কোনোটায় হোল্ডল খোলা হয়নি এখনো, কোথাও পরিপাটি বিছানা। যার-যার বিছানার পাশে স্যুটকেশ ব্রিফকেশ। পাশাপাশি গোটা তিনেক টেবিল ওদিকের জানালা ঘেঁষে। দেয়ালে-আঁটা বিশাল ব্ল্যাকবোর্ডে জটিল অঙ্কের আঁকিবুকি।

পরমেশ ঢুকে পড়লেন। আশ্চর্য! কেউ নেই। একেবারে ওদিকের শেষ বিছানায় এই বিকেলে পড়ে-পড়ে নাক ডাকাচ্ছে কে একজন। যেহেতু গেঞ্জি-গায়ের পিঠটাই দেখতে পাচ্ছেন শুধু, এগিয়ে গেলেন। ইউনিটের ছেলেরা হাসছে। উঁকি দিয়ে নিজেও না হেসে পারলেন না—'এই, এই মশাই। কী করছেন? এখন ঘুমোচ্ছেন?'

খোঁচা খেয়ে মেদ-থলথল মাঝবয়েসী হরদয়াল ঘোষ ধড়ফড় কেঁপে উঠলেন এবং পরমেশের মুখোমুখি কিছুটা বিব্রত। মস্ত একটা হাই সামলালেন মুঠোয় চেপে। পরমেশ বেশ হালকা মেজাজ—'বাঃ, খুব তো বিপ্লবী নাটক করে স্টেজ কাঁপাচ্ছেন কলকাতায়। এখানে দিবানিদ্রা। দিবা কেন, সান্ধ্যনিদ্রা?'

লজ্জিত হরদয়াল—'না, অবেলায় খেয়ে এমন ম্যাজম্যাজ করছিল শরীরটা…'

'যান যান, নিচে যান। সবাই আছেন, আড্ডা মারুন। নতুন জায়গায় এসেছেন, ঘুরেটুরে দেখুন। আর কী, কাল থেকে তো জিরোবার সময় নেই কারও। একটানা একমাস…'

ঘর ছেড়ে বেরোবার মুহূর্তে আরো একবার থমকে দাঁড়ালেন পরমেশ। তাকালেন পেছনে—'কিন্তু এভাবে ঘরটা ফাঁকা রেখে বেরিয়ে গেল সবাই…'

বাচ্চা ছেলে, থার্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট সুভদ্র ঘোষ—'সে কোনো ভয় নেই। নিচে তো আমরা সবাই আছি। এখান থেকে বেরোবার ওই একটাই সিঁড়ি…'

'আমরা তো শুধু এই…এদিকের বিল্ডিংটাই নিয়েছি?'

'হ্যাঁ, ওপরে ছটা ঘর, নিচে তিনখানা। হাই-বেঞ্চি লো-বেঞ্চিগুলো সব ওদিকের সায়েন্স বিল্ডিং-এ…'

'ভাঙচুর করিসনি তো কিছু?'

'না।'

'হেডমাস্টারমশাই, ওদের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতের প্রধান, কী যেন নাম ভদ্রলোকের, সবাই এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ, কারা কারা যেন এসেছিলেন সকালে। সুকুমারদার সঙ্গে কথা হয়েছে। সন্ধেবেলা ফের আসবেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

'সত্যবাবু?'

'উনি তো আজ সারাদিনই এখানে ছিলেন। সুকুমারদার সঙ্গে গেছেন। ফিরবেন এক্ষুনি···'

সত্যবাবু। সত্যভূষণ মল্লিক। এ গাঁয়েরই মানুষ, কলকাতায় থাকেন। ব্যবসাসূত্রে কিরকম যেন একটা যোগাযোগ আছে এ ছবির প্রযোজক প্রভুপদ সাহার সঙ্গে। এখানে ওখানে অনেক ছুটোছুটির পর তারই সূত্রে অবশেষে কালনা-কাটোয়া লাইনে হুগলীর মোহনপুর। লোকেশান সিলেকশানের পর সুকুমারের সম্মতিটা জরুরি ছিল। নিরেট পাড়াগাঁয়ে মস্ত একটা স্কুলবাড়ি। ঘরের হয়তো অভাব নেই। সবচেয়ে বড়ো সমস্যা—মাসখানেকের দীর্ঘ প্রোগ্রাম। ঘুরেফিরে প্রায় প্রতিদিন ষাটসত্তর জন মানুষ থাকবে ক্যাম্পে। টয়লেটের সঙ্কট। স্নানের জল, পানীয় জল, বিশেষত মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। অল্প কয়েকজন লোক নিয়ে আজ প্রায় চারপাঁচ দিন এখানে বনবাসে পড়ে আছে সুকুমার। কাজ শুরুর আগে যাবতীয় বন্দোবস্ত প্রস্তুত।

এঘর থেকে ওঘরে যাবার পথে মনে পড়ল। গাড়িতে আসার পথে ঠিকই বলেছিলেন কিরণদা—'একটা আচ্ছা-লোক পাকড়াও করেছ তো হে। এই বিশাল কর্মকাণ্ডে তুমি যদি রথী হও তো, প্রডাকশান কন্ট্রোলার না কী বলো, সে অবশ্যই সারথি। কুরুক্ষেত্রে তুমি অর্জুন তো সুকুমার শ্রীকৃষ্ণ। লোকটা মিরাকল্···'

দশম শ্রেণী 'খ' শাখা ঘরেও যথানিয়মে চার কোণে চারটে বিছানা। চারজন অভিনেতা। ঢুকতেই অদ্ভুত দৃশ্য। তক্তপোশের ওপর দাঁড়িয়ে কোমরে টাওয়েল-জড়ানো ধ্রুবজ্যোতি। নায়ক চরিত্রে নির্বাচিত অভিনেতা ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, পরমেশ মিত্রের ধারণায়, যথার্থই বড়ো অভিনেতা। রাজ্য-সরকারের কর্মচারী ধ্রুবজ্যোতি কলকাতায় কোনো এক নামী গ্রুপ থিয়েটারের দ্বিতীয় পুরুষ। হালে দল-ভাঙাভাঙির পর চাকরি ছেড়ে যাত্রায় নাম লেখাবেন কি চাকরী রেখে নতুন দল গড়বেন, ভাবছেন যখন, অকস্মাৎ ফিল্মের কণ্ট্রাকট। পরমেশের আকস্মিক প্রবেশে সচকিত অন্যান্যরা—'পরমদা কখন এলেন! এই একটু আগেও কে যেন বলল, এখনও পৌঁছোননি।'

'কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো আপনাদের ?' পরমেশ আবার একটা সিগারেট হাতে নিলেন।

'অসুবিধে মানে…' সাউণ্ড রেকর্ডার সিতাংশু আচার্য—'এত বড়ো ঘরটায় মাত্র একটা ফ্যান। অন্তত একটা সিলিং-ফ্যানও যদি থাকত এর সঙ্গে…'

'দাঁড়ান দাঁড়ান, ধ্রুববাবু দাঁড়ান তো একটু…' হঠাৎ, ভ্রূকুঁচকে ছুটে এলেন পরমেশ। ধ্রুবজ্যোতির উদোম পেটের ডান দিকে হাত—'আপনার পেটে এ দাগটা কি মশাই ?'

ধ্রুবজ্যোতি তখন নেহাৎ-ই বেকায়দায়। ভাঁজ-ভাঙ্গা পায়জামার একদিকের চোঙায় একটা পা গলিয়ে দুটো হাতই আটকে ফেলেছে। টাওয়েলটা খুলে পড়লেই বিপদ। রোগা রোগা রোমশ পা আর লিকলিকে শরীরে তখন শুধু আণ্ডারওয়ার। হেসে বলল—'বছর তিনেক আগে গ্যাসট্রিক আলসার অপারেশন হয়েছিল। মরেই তো যাচ্ছিলাম।'

'এখন যে আমাকে মেরে ফেলবেন মশাই। আকালের চাসি। পেটে গ্যাসট্রিক অপারেশনের দাগ! পঞ্চাশের মন্বন্তরটা কি সমাজতান্ত্রিক দেশে হয়েছিল নাকি ?'

সকলেই হেসে উঠল।

পরমেশ বললেন—'মেকআপম্যান শিববাবুকে বলে দেব, আপনিও মনে রাখবেন, আপনার পেটে রঙ লাগাতে হবে।'

হাসাহাসির মধ্যে বয়স্ক অভিনেতা নিশীথ বাগচী—'ওটা তো ছুরি-মারার দাগও হতে পারে পরমেশবাবু। অর্জুনকে মেরে দিতে চেয়েছিল কেউ!'

'না মশাই, সেটা আরো তিন বছর পরে, ছেচল্লিশের অবদান। আর হরবকৎ ছুরি-চালাচালির ব্যাপারটা গ্রামে তখন কোথায় ? লাউ-এর মাচা আর জমি-জায়গার হিস্সে নিয়ে মামলামোকদ্দমা লাঠালাঠি যতই হোক মশাই, ছুরিবোমা নেই। ওসব আপনাদের আর্বান কালচার। পরে গ্রামে চালান করেছেন।'

চায়ের ট্রে আর বড়ো কেটলি নিয়ে ঘরে ঢুকেছে বাসু। বিস্কুট নিয়ে রবি। দুজন একজন লেবুলিকাবের প্রত্যাশী, অন্যান্যরা প্রায় সকলেই সাবেকি চায়ের। দুধচিনির চা হাতে নিয়ে পরমেশ—'রেস্ট নিন আপনারা। আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি। দেখা যাক, যদি সুযোগ হয় স্ক্রিপ্টটা নিয়ে বসা যাবে সন্ধেবেলা…'

বিকেলের রোদ দ্রুত সরে যাচ্ছে দোতলার বারান্দা থেকে। রোদের রঙ

গোলাপী থেকে আরো গোলাপী। গাছপালার সবুজ আর আকাশের নীলে প্রকৃতি উদার। ওপাশে স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলছে ছেলেরা। দোতলার বারান্দা থেকে মাঠের অনেকটাই চোখে পড়ে। এক ঝাঁক বালিহাঁস আকাশে। উচ্চকিত হাস্যরোল নিচে একতলায়। দূরে কয়লার ইঞ্জিনে রেলগাড়ি গড়িয়ে যাবার ধাতবধ্বনি।

সিঁড়ির ওপাশে আরো তিনটি ঘর দেখলেন পরমেশ। যতদূর জানা আছে, একটা তার নিজের। সঙ্গে কিরণময় থাকবেন। একেবারে কোণের ঘরে ক্যামেরাম্যান নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাউণ্ড রেকর্ডার সিতাংশু আচার্য, স্টিল-ফটোগ্রাফার সুকান্ত সান্যাল। মধ্যবর্তী ঘরে প্রডাকশন কন্ট্রোলার সুকুমার আর প্রডিউসারের প্রতিনিধি নকড়ি দত্ত। সেখানেই অফিস এবং এদের ঘরেই থাকবে মূল্যবান ক্যামেরাটা, টেপ রেকর্ডার ছাড়াও আরো কিছু দামি জিনিস। ট্রলিপ্লাঙ্ক লাইটের বিবিধ সামগ্রী সবই একতলার একটা ঘরে। অন্যান্য লোক-জনদের মাঝখানে, যেখানে পুলিশ প্রহরা।

অন্য দুটো ঘরে যখন তালা-আঁটা, দশম শ্রেণী 'ক'-শাখায় নিজের ঘরে প্রবেশ করলেন পরমেশ। গাড়ি থেকে তাঁর বিছানা, বড়ো বড়ো দুটো স্যুটকেশ, টুকিটাকি মালপত্র তুলে এনে তক্তপোশে খুলে ফেলেছে রাজু। বিছানাটা পরিপাটি সাজিয়ে ঘরটা গুছিয়ে দেবে।

প্রদীপ সুভদ্র লোকনাথকে সরিয়ে দেবার পর এবার নিভৃতি চাইলেন। লোকজনে আড্ডায় হাসিঠাট্টায় যখন মহোৎসব ছুটির স্কুলবাড়িতে, আখড়ার মূল মোহান্ত তার নির্জনতায় অকস্মাৎ বিষাদে কাতর।

ঠিক এমনটাই হয় প্রতিবার। গত দশবারো বছরে সাতটা ছবি তৈরির অভিজ্ঞতায় আর্থিক সাফল্য না থাক, একবার রজতকমল, বারকয়েক মস্কো কার্লোভেভারি ঘুরে আসার পর বিবিধ সম্মান মর্যাদা পুরস্কারে কিছুটা আত্মপ্রতিষ্ঠা। বছর দুয়েক আগে নিজের মতো করে পরিপূর্ণ একটি ইউনিট গড়ে তোলার পর এখন আরো কিছু বাড়তি আত্মবিশ্বাস। আরো বড়ো মাপের বড়ো কিছু করার দুরন্ত বাসনা অথচ প্রতিটি সূত্রপাতে মর্মান্তিক দাহ। ভয় নিজেকে নিয়েই। বিজ্ঞানের অসম্ভাব্যতায় যদি এমন ঘটনাও সত্যি হয় কোনোদিন, কোনো সার্জেন, প্রতিদিনের দাড়ি কামানোর মতোই তার অনায়াস স্বভাবে নিজেই অস্ত্রোপচার করছেন নিজের শরীরে, নিজেরই আলসার খুঁচিয়ে তুলছেন অথবা ভাঙা-হাড় জুড়ে দেবেন বলে ছুরিকাঁচি, এবং অনর্গল রক্তপাতে আত্মহনন নয়—

জীবন। গল্প বাছাই-এর পর চিত্রনাট্য পর্যন্ত একটা অবাধ উদ্যম, প্রবল উত্তেজনা। তারপরই উত্তেজনাকে জিইয়ে রাখার দায়। প্রডিউসারের লাখ লাখ টাকাকেই তখন মনে হয় প্রশ্রয়ের বিভীষিকা। ভুল হচ্ছে না তো কোথাও ! অথচ কার্লোভেভারি মস্কো তাসখন্দ ডিঙিয়ে বার্লিন ভেনিস সর্বোপরি কান-এর দিকে যাত্রাপথে···

পূর্ণাঙ্গ আর্শির মুখোমুখি নিজেকে দাঁড় করিয়ে খুঁজতে ইচ্ছে করে নিজেরই মুখ।

আর্শি নয়, মস্ত একটা জানালার ওধারে আপাতত মোহনপুর। যার প্রান্তসীমায় নিরেট ক্ষেতমজুরের গ্রাম—হাতুই।

কিন্তু মগজের মধ্যে অন্য এক গ্রামের ছবি তার অস্পষ্টতায় ভেসে থাকে—উনিশ শ তেতাল্লিশের বাংলাদেশ, মন্বন্তরের গ্রাম। মস্ত মস্ত যুদ্ধের ইতিহাস নেই এখানে। বড়ো বড়ো আকাল লড়েছে এদেশের মানুষ। পলাশী-যুদ্ধের তের বছর পরে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ; ইংরেজ বিদায়ের চার বছর আগে ইতিহাসের পঞ্চাশ। মধ্যবর্তী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমিশায়িত বাংলার গ্রামে বিপন্ন কৃষক ! স্বাধীনতার পরবর্তী তেত্রিশ বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ক্রমান্বয় সিরিজ···

অপলক তাকিয়ে থেকে শক্ত লোহার-শিক-বসানো জানালার ফ্রেমে ঘন গাছপালায় ঘেরা একটা বড়ো পুকুর দেখলেন পরমেশ। উল্টোদিকে সবুজে সবুজে আকীর্ণ হলুদ দোতলা বাড়ির উঁকিঝুঁকি। এধারে জানালা থেকে আকাশ-চোখে মেটে পাঁচিল ঘেরা গৃহস্থসংসার। বড়ো উঠোন, উঠোনের এপাশে ওপাশে টালির ছাদে মাটির-ঘর, তুলসীমঞ্চ, ধানের মরাই, খড়ের পালুই, শেতলপাটির মতো উঠোনে ছড়ানো ধান। রোদ পড়ে যাওয়ার পরও ধানগুলো তোলা হয়নি এখনও। ইঁদারার ওপাশে কি স্নান করছেন দুজন মহিলা। হঠাৎ উঠোনের আলোটা ঝলমলিয়ে উঠল। সম্পন্ন গৃহস্থ সন্দেহ নেই। মাটির ঘরে বিজলি বাতি।

চারদিক ছেয়ে অদৃশ্যলোকে ঘরে-ফেরা পাখিদের অস্থির কিচিরমিচির। বাইরের বারান্দায় দল বেঁধে আসছে কারা। সচকিত হলেন পরমেশ—'এক গ্লাস জল দে তো রাজু। মাথা-ধরার ট্যাবলেটগুলো কোথায় রেখেছিস ?'

'ওদিকের টেবিলে।'

একটা নয়, ঘরে দুটো টেবিল। চেয়ারসংলগ্ন টেবিলে টেবিল-লাইট। ডিরেকটরের নিজস্ব ঘরে ওটা বিশেষভাবে জরুরি। এমনি ছোটখাটো হাজারো খুঁটিনাটিতে নিখুঁত সুকুমার।

রাজু এক গ্লাস জল নিয়ে কাছে দাঁড়ায়। রাংতা মোড়া পাতা থেকে একটা ট্যাবলেট ছিঁড়লেন পরমেশ—'তুই কিছু খেয়েছিস ?'

'যাচ্ছি। আমি ঠিক খেয়ে নেব।'

'চা তো দিচ্ছিল সবাইকে। যা, খেয়ে আয়। ফুরিয়ে যাবে। আর শোন্, এক কাপ চা পাঠিয়ে দিতে বলবি তো ওপরে...'

'আলোটা জ্বেলে দিয়ে যাব ?'

'না থাক।'

প্রথম ঢোঁক জলের সঙ্গে ট্যাবলেট গলায় নেমেছে মাত্র, হুড়মুড় করে ঘরের ভেতর নন্দিতা প্রতিমা আরতি, সঙ্গে ফার্স্ট-অ্যাসিস্টাণ্ট দীপক বসু।

'বাঃ পরমদা, আপনি তো অদ্ভুত মানুষ...' নায়িকার অভিনেত্রী নন্দিতা রায় ঘরে ঢুকেই স্বভাবে উচ্ছল—'আমাদের সেই বনবাসে রেখে আপনি এখানে অন্ধকারে একা বসে আছেন। সুকুমারবাবু কী বলুন তো! তেপান্তরের ওপারে আমাদের একেবারে আলাদা করে রেখেছেন!'

বিকেলের রঙে তখন সত্যি অন্ধকার। দিন কখন রাত হয়, কোন্ মুহূর্তে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, মুভিওলার খটখটি যন্ত্রে ঠিক জায়গায় আটকে দেওয়া কঠিন। সত্যি কঠিন। দেওয়াল হাতড়ে আলো জ্বালল দীপক। ঘর ভরে আলো। ভ্রূ কুঁচকোলেন পরমেশ।

ছুঁচোল চাউনির দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে ত্রস্ত সবাই। অসহায় আরতি সোম। বাইশ-তেইশ বছরের যুবতী অস্বস্তিতে নিজের ম্যাক্সি সামলায়।

'এভাবে মাঠ পেরিয়ে এলে ?' পরমেশের কুঞ্চিত চোখজোড়া এবার আরতি থেকে সহযোগী দীপকের দিকে—'গ্রামের মানুষ ছিল না রাস্তায় ?'

'থাকবে না কেন ? প্রচুর। গিজগিজ করছে এখনও।' কুণ্ঠিত দীপক।

প্রচ্ছন্ন ক্রোধে পরমেশ আরতির দিকে তীক্ষ্ণতায় তাকিয়ে রইলেন।

অস্বাচ্ছন্দ্যে আরতি বোঝে না, কী তার অপরাধ! মাথা নুয়ে ঘন ঘন তাকায় নিজেরই দিকে। চক্রাবক্রা জমকালো নয়, হালকা হলুদ-নীল রুচিসম্মত সর্বাঙ্গ আবৃত ম্যাক্সি। যথারীতি হাইহিল।

'এটা পরেছ কেন ? শাড়িটাড়ি নেই তোমার ?'

নিরুত্তর আরতি। নন্দিতা আস্তে আস্তে সরে গিয়ে কিরণময়ের জন্য নির্দিষ্ট বিছানায় বসেছে। প্রবীণা অভিনেত্রী প্রতিমা দাশ চুপচাপ।

'এটা তোমার থিয়েটার নয়। প্রথম ফিল্ম্ করতে এসেছ, তোমার জানা উচিত ফিল্মের আর্টিস্টকে মাঠেঘাটে রাস্তায় মানুষের মধ্যে নেমে কাজ করতে হয়। পিপ্‌ল-এর সঙ্গে একটা ইন্‌ভল্‌ভমেন্ট চাই। ডায়রেক্ট ইন্‌ভল্‌ভমেন্ট ইন লাইফ অ্যাণ্ড সোসায়েটি অ্যাণ্ড পিপ্‌ল···বুঝলে?'

নিষ্ঠুর পরমেশ। একবার ভাবলেন না মেয়েটার দুরবস্থা। উত্তেজনায় একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। উঠে দাঁড়ালেন আবার—'এই সঙের সাজ দিয়ে ভাবছ খুব একটা ভেলকি দেখাবে গ্রামের লোকদের। বোকাহাবা লোকগুলো খুব একটা বড়ো আর্টিস্ট ভাববে তোমাকে? ওটা স্টুপিডিটি। কিছু হয় না ওতে। কিচ্ছু হয় না। ইউনিটের ক্ষতি হয়। ইউ, ইউ মাস্ট হ্যাভ রেস্‌পেকট ফর দ্য পিপল। যাদের কথা বলতে এসেছ, তাদের জন্যে একটা শ্রদ্ধা ভালোবাসা থাকবে না তোমার?'

বিহ্বল আরতি। আরো বিপদ, ম্যাক্সির আঁচল নেই। এবং যেহেতু, আঁচল ধার চাওয়া যায় না নন্দিতাদি বা প্রতিমাদির কাছে, দুটো হাতের পাতায় মুখ ঢেকে, নিচু হয়ে বেঁকে সে থরথর কাঁপছে। ক্ষোভে বিক্ষোভে ফেটে পড়ার কান্না।

পরমেশ তাকালেন নন্দিতার দিকে—'আমার ঘর আমি ছেড়ে দিচ্ছি। ও বসে থাকুক এখানে। দীপককে নিয়ে তুমি যাও। শাড়িব্লাউজ কী সব লাগে, পাঠিয়ে দাও। শাড়ি পরে ও বেরোবে এখান থেকে ··'

আবার আরতিকে—'শাড়িটাড়ি এনেছ কিছু! নাকি সবই এসব?'

আরতি ভেঙে পড়ে কাঁদছে। বুকে টেনে নিয়েছেন প্রতিমা দাশ।

'না এনে থাকো, সুকুমারবাবুকে বলবে। কলকাতায় যখন গাড়ি যাবে, নিজে সঙ্গে যাবে নয়তো চিঠি লিখে দেবে। ওরাই নিয়ে আসবে···' চৌকাঠ ডিঙোবার আগে, পরমেশ ওদের বিহ্বলতা অথবা নিজেরই নিষ্ঠুরতার দিকে তাকিয়ে, কী মনে হলো, থমকে দাঁড়ালেন— 'একটা অজ গ্রাম। স্টেশন আছে। ইলেকট্রিক-ট্রেন চলে না এখনও। সেখানে কী নিয়ে এসেছ তোমরা? শহরের ঝিলিক? ওতে স্টার হবে? ফিল্মের রাজকন্যা রাজকুমারী। সিনেমা-পত্রিকার ব্যানার হেডলাইন? অফসেটে সাবানের বিজ্ঞাপন? যতদিন-না ওসব কিছু হতে পারছ, অন্তত সে কটা দিন একটু নিজের ডিগ্‌নিটির কথা

ভাবো। অ্যাট লিস্ট ট্রাই টু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড দ্য পিপ্‌ল অ্যারাউণ্ড ইউ···আকাল, আকাল··· দুর্ভিক্ষের ছবি তুলতে এসেছি আমরা···'

ঘর ছেড়ে বাইরে এসে মনে হলো, নিঃসন্দেহে বাড়াবাড়ি। দীর্ঘ বিস্তৃত বারান্দার ঠিক মাঝখানে, সিঁড়ির মুখে তেজী আলোটা ঝুলছে অস্থায়ী ব্যবস্থায়। পেছনে দীর্ঘ ছায়া ফেলে পরমেশ থমকে দাঁড়ালেন। হু-হু কান্নায়—'কেন এভাবে বলবেন আমাকে ? আমি কি একস্ট্রা নাকি ! রীতিমতো কন্ট্রাক্ট ফর্ম সই করে আসিনি তোমাদের মতো ?'

'ওসব কী বলছ ? একস্ট্রা-রেগুলারের আবার কী হলো ? আরতি শোনো, শোনো আরতি, কথাটা তুমি বুঝতে পারোনি···' প্রবীণা প্রতিমা দাশ।

'খুব বুঝি। সব জানা আছে আমার। এভাবে নন্দিতাদি কি তুমি সাজলে কিছু হতো না। কেউ কিছু বলত না। নন্দিতাদির মতো ঘরের মেয়ে, তোমার মতো ঘরের বৌ হলে এমন করে কেউ দেখত না আমাকে। থিয়েটার করে আমাকে সংসার চালাতে হয় প্রতিমাদি, পেটের টানে ঘুরে ঘুরে আমি অফিস-ক্লাবে নাটক করি···'

সীমাহীন মূর্খতা। ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে থেকে অশান্ত পরমেশ, দীপককে বেরিয়ে আসতে দেখেই নড়েচড়ে পকেটে সিগারেট খুঁজলেন। অগত্যা আরো কিছু কথা বলতে হয়—ভাবনায়, দীপক এসে ছুঁয়ে ফেলার আগেই দ্রুত নিচের দিকে পা ফেললেন। সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে, একতলায়। সহযোগী আরো অনেক মানুষের চলাফেরায়, কথাবার্তায়, অন্ধকার-তাড়ানো উজ্জ্বল আলোয় নিজেকে কিছুটা ব্যস্ত-রাখা।

তাঁরই স্বপ্নকে ঘিরে, তাঁরই স্বপ্নসম্ভবে এত বিপুল আয়োজন ! এত মানুষ ! লক্ষ লক্ষ টাকার অর্থলগ্নী।

কিন্তু নিজেকে গোছাতে পারছেন না কিছুতেই। কাজ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত এই এক দুর্বোধ্য যন্ত্রণা। তখন বড়ো একা, বড়ো নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে।

গোটা আকাশ জুড়ে থমথম অমাবস্যা সেদিন। মহালয়ার রাত।

'নির্মল স্বচ্ছ শান্ত সরোবরে ধীরে ধীরে নেমে এলো তৃষার্ত হরিণ। ডালাপালা ছড়ানো শৃঙ্গের ভারে বেচারি তার নিজের সুন্দরকে নিয়ে বড়ো অসহায়।

পেছনের ঝোপঝাড়ে একটা হিংস্র বাঘ তার পায়ের শব্দ পেল। ওটা জঙ্গল। জঙ্গলের নিয়মে সেটাই বাস্তব। হরিণকে মরতে হবে।'

গাড়ির দীর্ঘপথে বলছিলেন কিরণময়। শব্দগুলো বাক্যগুলো মন্ত্রের মতো শোনাচ্ছিল যদিও, পরমেশ তার অনীহার শ্রুতি থেকে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিলেন একসময়। এসব মিথ্‌ফিথ্‌কে স্পিরিচুয়ালি ধরতে হয় মগজের মধ্যে। হয়তো কোথাও কোনোভাবে কাজে লেগে যেতেও পারে, হয়তো লাগে না। দুর্ভিক্ষ মহামারি বিশ্বযুদ্ধ, কোটি কোটি মানুষের ক্ষুধা আর মৃত্যু—এত কঠিন আর ক্ষমাহীন বাস্তব সত্য, ভাতের থালা সূর্য হয়ে উঠলে গিমিকের ভয়। অতিমাত্রায় চালাকি।

'আপনি পরমদা! কোথায় যাচ্ছেন?'

'কোথাও না। দাও তো তোমার টর্চটা…'

লাইটের কন্ট্রাকট নিয়ে এসেছে যে ছেলেটা, শশী, সামনে এসে দাঁড়াল। আশে-পাশে কাউকেই দেখছেন না পরমেশ, অভিনেতা বা টেক্‌নিসিয়ানদের কেউ। চারদিকে শুধু তারাই, ক্রেডিট-টাইটেল-এ নাম থাকে না যাদের।

'আর সবাই কোথায় জানো? কিরণদা?'

'কে?' চতুর যুবক পলকে গুছিয়ে তুলল নিজেকে—'ওই যো বুড়োমতো! আপনার সঙ্গে এসেছেন? ধ্রুবদা বিতোষদার সঙ্গে এখানেই তো ছিলেন। কোথাও গেছেন হয়তো। অনেকেই তো বাজারে মাখা খেতে গেলেন…'

'মাখা?'

'কাঁচাগোল্লা আর কি। এখানে মাখা বলে। ফাস্টক্লাস টেস্ট…'

'তুমি খেয়েছ?'

বত্রিশ-দাঁতে যুবকের পূর্ণ হাসি—'এই তো একা আড়াই শ খেয়ে এলাম। কাল আবার খাব।'

'ভালো?'

'টপ।'

পিঠ চাপড়ে হাসলেন পরমেশ। ফটকের দিকে ফিরলেন। একা একা কি করবেন ভাবলেন এবার।

খোলা গেটটা এখন নির্জন। কৌতূহলী জনতা কেউ আর নেই। স্কুলবাড়ির একেবারে ভেতরের দিকে, একতলা পাকা দালান ঘিরে আরো একটা চতুষ্কোণ ফাঁকা উঠোন। রান্নাবান্না চলছে সেখানে। লোকজন আর যত হট্টগোল।

অন্ধকারে ঘাপটি মেরে গাড়িগুলো স্থবির। তিন ব্যাটারির পেল্লাই টর্চ [illegible] মতো। কাঁচা রাস্তায় পা ফেলে ডানদিকেই এগোলেন। কেন ডানদিক, কেন বাঁদিক নয়, নির্দিষ্ট হিশেব নেই। অনির্দিষ্ট পদযাত্রা বা নিজের জন্য নিজেকে খুঁজে পাবার একটু অবকাশ।

'বোঝো কাণ্ডটা! অরণ্যচারী হরিণকে ওই জঙ্গলেই থাকতে হবে। বাঘের তল্লাটেই বসবাস। ওদের সকলের জন্যেই তো একটা করে শকুন্তলা নেই বে বাপু। রথে চেপে রাজারা আসবেন মৃগয়ার নামে ফুর্তি করতে, টার্গেট ওই হতভাগা। ওব অপরাধ কী? না, প্রকৃতি ওকে সুন্দব করে গড়েছেন। বোঝো ঠ্যালা! আরে শালা, সুন্দর হয়ে জন্মানোর পাপে যদি মরতেই হয়, সুন্দর হতে চায় কোন্ বাঞ্চোৎ! খচ্চর করে বানালেই হতো সবাইকে...'

জাতীয় সড়কের মসৃণ পিচে দুরন্ত গাড়ির বেগ। কাচের জানালায় ধাবমান বাংলাদেশ। পরমেশ তার মৌনে গা এলিয়ে ছিলেন।

'অবশেষে খচ্চর বাপের ঔরসে হরিণীর গর্ভে এক আজব শিশু জন্মাল। হরিণেব মুণ্ডু নিয়ে নিষ্পাপ এক মানবসন্তান। বাপ বিভাণ্ডক মুনি সরোবরে স্নানেব সময় স্বর্গের উর্বশীকে দেখে কামাবিষ্ট হলেন। নিঃশব্দে রেতঃপাত ঘটল তাঁর। বোঝো কাণ্ড! শালা তিলেখচ্চর ঋষিঠাকুর। এক তৃষার্ত হরিণী সেই জল পান করতে এসে গর্ভবতী হলো। পিতৃপুরুষের লাম্পট্যের দেনা মেটাতে মায়ের দুঃখ মাথায় বয়ে জন্ম নিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি। কালক্রমে সেই ঋষি জ্ঞানেকর্মে-তপশ্চর্যায় এক অজেয় পুরুষমহিমা। ভণ্ড বিভাণ্ডকের পুত্র বলে তাঁর চরিত্র-হননে যাঁরা নতুন করে উর্বশীরম্ভাকে পাঠালেন, তাঁরাই হেরে গেলেন। অমিত ব্রহ্মতেজ। দেহে মানুষ হলেও মেধায় কুরঙ্গবিভূতি। মানুষের জঙ্গলেও তাই বাঘসিংহের কেউ নন, খাতকদের একজন। পীড়িতের স্বার্থে প্রকৃতিকে বশ করলেন, বজ্রকে টুটি চেপে ধরলেন হাতের মুঠোয় রাজবদুন্নতধ্বনিরসদৃশ নীবদমালা তার সুহৃদ হলো। কেননা কৃষিকর্মী কোটি কোটি মানুষের স্বার্থে জীমূতবাহী আকাশেব প্রভুত্ব চাই। অনাবৃষ্টি আনে খরা আর আকাল, প্রবলবর্ষণে বন্যা আর মড়ক...'

বরং কিঞ্চিৎ বিরক্তই ছিলেন পরমেশ। দুরন্ত গাড়ি হাইওয়ের আরো একটা স্পিডব্রেকার ভাঙতেই নড়েচড়ে লাফিয়ে উঠেছিলেন—'কী বললেন কিরণদা? শেষ কথাটা...'

'আকাল, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর···ইয়োর সাবজেক্ট। আকাল খুঁজতে চলেছ? সেই আকালের কথা। সেকালে আকাল তৈরি হতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, একালে প্রকৃতিকে জয় করে আকাল বানায় মানুষ।'

'বলুন তো, বলুন। ওই ঋষ্যশৃঙ্গের গল্পটা আমি জানি। বাট ইয়োর নাইস ওয়ে অব পুটিং দ্য স্টোরি···'

গাড়িটা ছুটছিল। রাজুর হাতে নিরাপদ স্টিয়ারিং। হেলে পড়েছিলেন পরমেশ। শ্রবণে এবার নিজেরই উদ্যোগ। বিড়ি ফুঁকছেন নিস্পৃহ কিরণময়, পৌরাণিক কথক—'অঙ্গরাজ্যে ভয়াবহ খরা। তীব্র সূর্যদাহ, দীর্ঘ অনাবৃষ্টি। বোঝো কাণ্ড, এ-ও সেই তিলেখচ্চর বামুনগুলোর বদমাইশি। কী এক যজ্ঞানুষ্ঠানে অঙ্গরাজ লোমপাদ ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের প্রতি অসৎ আচরণ করলেন। ব্রাহ্মণরা ক্ষুব্ধ। অধর্মের শাস্তিবিধানে জলবর্ষণ বন্ধ করলেন দেবরাজ ইন্দ্রদেব। মৃত্তিকা বা শস্যোৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্করহিত ব্রাহ্মণ বা রাজার তো ক্ষতি নেই। রাজার দুষ্কর্মে আর ব্রাহ্মণদের অভিশাপে শাস্তি পেল রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ। কর্ষণভূমিতে দীর্ঘ অজন্মা, স্বেদসিক্ত মানুষের শ্রম নিষ্ফল। চারদিকে হাহাকার, ক্ষুধিতের কান্না, তৃষিতের আর্তনাদ। স্বর্গের ক্রোধ যখন মানুষকে মারে, মহাতেজা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিই শুধু পারেন ভয়াল ক্ষুধা আর মৃত্যু থেকে মানুষকে বাঁচাতে। ধ্যাননিমগ্ন তপস্বীর তপস্যা ভাঙতে রূপসী নারীদের পাঠানো হলো। ঋষি নির্বিকার। কিন্তু সর্বমানবের কল্যাণে বারাঙ্গনাদের নিয়ে অঙ্গরাজ্যে প্রবেশ করলেন। আকাশ জুড়ে মেঘের সমারোহ। স্নিগ্ধ বর্ষণধারায় সিক্ত হলো অভিশাপের মাটি, বারাঙ্গনারা পবিত্র হলো, মানুষ রক্ষা পেল ক্ষুধা মড়ক মৃত্যু থেকে।'

মনোযোগী শ্রোতার ভূমিকায় নিরুত্তেজ শান্ত পরমেশ।

'লোকলস্কর যন্তরপাতি লাখ লাখ টাকা নিয়ে তুমিও তো চলেছ আকালের দেশে আকাল খুঁজতে। মেট্রোপলিটান বৈকুণ্ঠের এলিট দেবতা। পারবে তো ওদের বাঁচাতে। মাঠে মাঠে ডিপ-টিউবওয়েল বসিয়েছ। কিন্তু ডিজেলের অভাব। পাওয়ার ক্রাইসিস। বন্যা প্রতিরোধে ডি ভি সি গড়েছ, ডি ভি সি-র জল ছেড়ে বন্যা বানাও। তুমি আমি আমরা দেশপ্রেমিকরা এ অরণ্যে হরিণ না বাঘ?'

টানটান শিরদাঁড়ায় সোজা হয়ে বসেছিলেন পরমেশ— 'অঙ্গরাজ্যটা ঠিক-ঠিক কোথায় বলুন তো।'

'তোমাদের আধুনিক ভূগোলে যদ্দুর মনে হয়, ভাগলপুরের কাছাকাছি কোথাও। সে বাপু, তুমি দেখে নিয়ো ভালো করে···'

'হবে, তাই হবে…' সংযত গাম্ভীর্যে আরো উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলেন পরমেশ—'এতে আমার ধারণাটাই সত্য হয়ে ওঠে।'

এবার কিরণময় বাক্যহীন। জানালার বাইরে দৃষ্টি।

দীর্ঘ পথের বিশ্রামে, পাঞ্জাবী চটির খাটিয়ায় চা খেতে খেতে বুঝিয়েছিলেন পরমেশ—দারিদ্র্যটা গোটা ভারতবর্ষের। খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষের অভাব নেই কোথাও। না খেতে পেয়ে মানুষ গুজরাটেও মরেছে, বিহারেও মরেছে। মহারাষ্ট্রেও দুর্ভিক্ষ উত্তরপ্রদেশেও দুর্ভিক্ষ। কিন্তু গ্রেট গ্রেট ফেমিন বা মহামন্বন্তর বলতে যা বোঝায়, ইতিহাসের মস্ত মস্ত দুর্ভিক্ষগুলো সব মাদ্রাজে উড়িষ্যায় বাংলাদেশে, পূর্ববিহারে ভাতের দেশে…

'জানি নে বাপু, আমি ভূগোলের মাস্টার নই…'

'না…' হেসেছিলেন পরমেশ— 'এর জন্যে খুব একটা এক্সপার্ট হওয়ার দরকার নেই। ধান চাষটা পুরো নির্ভর করে মৌসুমী বায়ুর ওপর। প্রকৃতির খেয়ালিপনারও তো শেষ নেই। কোনো বছর মেঘটা দেরিতে এলো, কোনো বছর খুবই তাড়াতাড়ি। কখনও অনাবৃষ্টি কখনও অতিবৃষ্টি। বঙ্গোপসাগরের উপকূল ছুঁয়ে দেশগুলোতে তাই…'

'আর তোমার নিজের সাবজেকট। দ্যাট গ্রেট নাইনটিন ফর্টি ?'

'হ্যাঁ। দ্যাট্ ইজ দ্য পয়েন্ট। ওতে মনসুন ছিল না, ড্রট ছিল না, মেদিনীপুরে চব্বিশ পরগনায় ফ্লাড হলেও সেটা তেমন কিছু না। ইম্‌পেরিয়ালিজ্‌ম ছিল। বাউণ্ডলেস ইনহ্যানিটি অব দ্য ইম্‌পেরিয়ালিস্টস হু ফট দ্য পিপল-ওয়ার বাই কিলিং ফাইভ মিলিয়ানস পিপল অর মোর…'

থমকে দাঁড়ালেন পরমেশ। নিঃশব্দ কাঁচা রাস্তায় আনমনে হাঁটতে হাঁটতে কোথায় এসে পড়েছেন, কতদূর, কিছুই জানেন না। ঘনঘোর অমাবস্যার কালোয় একটানা ঝিঁঝিঁর ধ্বনি, ঝোপেঝাড়ে জ্বলছে নিভছে জোনাকির আলো। নতুন তেজী ব্যাটারির টর্চটা দুর্ভেদ্য অন্ধকারে বল্লম যদিও, আলোটা জ্বালতে ইচ্ছে হলো না। অনভ্যাসের গেঁয়ো অন্ধকারে ঘাপটি মেরে জোনাকির খেলা আর আবিশ্ব নক্ষত্র দেখার বাসনা।

হাতুইটা কোন্‌দিকে? পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ—কালোয় কালোয় দশদিগন্ত লোপাট হয়ে যাবার পর কোনোদিকে হদিশ না পেয়ে, একটা সিগারেট ধরালেন। জ্বলন্ত কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর ওর শেষপর্যন্ত নিভে-যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হাতের সিগারেটটাও এখন আরো একটা জোনাকি, যার আগুনে দূর

থেকেও যে-কেউ তাকে চিনে নিতে পারেন—একজন মানুষ। চেনা জানার পরও তিনি আস্ত একটা গ্রাম হাতুই-এর হদিশ পাচ্ছেন না। মোহনপুরে তার ক্যাম্প, হাতুই শুটিং-স্পট। পাকারাস্তা এগোয়নি অতদূর। ইলেকট্রিসিটি নেই। দু-এক ঘর বামুন আর সদ্‌গোপ কি করে গিয়ে জুটেছিল কে জানে! ওরাই নাকি মোটামুটি কিছুটা সম্পন্ন গেরস্ত। ওদেরও মাটির ঘর। কোথাও দালানকোঠা নেই। অবশিষ্ট সকলেই ক্ষেতমজুর। অধিকাংশই দুলে। শেষপ্রান্তে কিছু বাউরি।

লোকেশান নির্বাচনের পর দ্বিতীয়বার আর্ট-ডিরেকটর গোপেন কর আর ষ্টিল-ফটোগ্রাফার সুকান্ত সান্যালকে নিয়ে তন্ন তন্ন করে ঘুরেছিলেন জায়গাটা। ভাঙা পুতুলের মতো অদ্ভুত ধরনের মাটির ঘর কতগুলো। সেখানে মানুষ বাঁচে! বাঁচে। ঝোপজঙ্গল বনবাদাড় প্যাচপ্যাচে জলকাদা ঘুঁটেগোবরে অদ্ভুত এক রাসায়নিক গন্ধ। গন্ধটা আসে না সেলুলয়েডে। মনে মনে সিদ্ধান্ত তখনই—এখানে আউটডোর শেষে এদের অনুকৃতিতে আর কোনো সেট তৈরি হবে না কলকাতার স্টুডিও-এ। হলেও খুবই সামান্য কাজ সেখানে। ইন্‌ডোরও এখানেই। এদেরই ঘরে। খুঁটিনাটি ডিটেলে নিষ্পাপ দারিদ্র্য তার অবিকৃত বিশ্বস্ত চেহারায় উঠে এলে, এমন কি দুর্গন্ধটাও উঠে আসবে। খামচে খিঁচড়ে খুঁজতে হবে জীবনটাকে।

এবার ফিরলেন পরমেশ। বেশ শীত-শীত করছে। কাজ শুরুর আগে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগলে বিপদ। একটানা একমাস কাজ। বিরতিহীন।

খুঁজে বের করতে হবে সেই বুড়িকে। হাতুই-এর মেঠো পথে হঠাৎ দেখে চমকে উঠেছিলেন সেদিন। শতচ্ছিন্ন পুরনো নোংরা একটা গামছা কোমরে জড়িয়ে লোলচর্ম হাড়শুকনো এক কুঁজো বুড়ি। কুঁজো হতে হতে, কোমর থেকে শরীরটা বেঁকে যেতে যেতে সমকোণে এসে, যেন অনেক অনেক কাল বেঁচে-থাকার সুবাদে, এবার মাটিতে মিশে যাবার সাধ। এক হাতে আছোলা বাঁশের লাঠি, নুলো গোছের অন্য হাতটা টলতে টলতে গোবর কুড়োচ্ছে রাস্তায়। বুড়ি বলেই যেন পুরুষ নয়, রমণী নয়, যৌনলজ্জার উর্ধ্বে ফিরে পাওয়া উলঙ্গ শৈশবে শনের চুলে রূপকথার সেই ডাইনি অথবা কুঁচি-কুঁচি কালো চামড়ার ভাঁজে ভাঙা টেরাকোটা। সুকান্ত একটা স্ন্যাপ নিয়েছিল ক্লোজ-আপে। মাটিতে শুয়ে। অবাক বুড়ি কাঁপতে কাঁপতে হাত বাড়িয়েছিল—পয়সা! পাঁচ টাকার একটা নোট এগিয়ে দিয়েছিলেন পরমেশ। অভিভূত বুড়ি কাঁপতে কাঁপতে টলতে টলতে

গড় হয়ে পেন্নাম ঠুকতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল মাটিতে। ধরাধরি করে তুলেছিলেন গোপেন সুকান্ত সুকুমারের সঙ্গে তিনি নিজেও।

কী ভীষণ অবাস্তব, কী নির্মম মানুষের দীর্ঘজীবন! গ্রামবাসীরা অনেকেই বলেছিল—একশ পেরিয়ে গেছে শেতলাবুড়ির বয়স। ছেলেমেয়েরা সবাই চলে গেছে একে একে। নাতির ঘরে পুতি দেখেও মরণ নেই আবাগীর। এখন আর কেউ দেখে না। দেখবে কী! কে এক নাতি আছে বাগদা। বৌবাচ্চা নিয়ে নিজেরই পেট চালাতে পারে না লোকটা। বুড়িকে খাওয়াবে কী! বুড়ি এখনও গোবর কুড়োয়, ঘুঁটে দেয়, বেচে। চেয়েচিন্তে ভিক্ষেয় বাঁচে।

অনেকেরই সংশয়—হয়তো অতোটা নয়। একশ না-হোক, নব্বুই তো বটেই। মোহনপুরের নব্য যুবকেরা, যারা সঙ্গে ছিল, তাদের নতুন ভাষায়—একটা ছক্কা আর একটা চার মারলেই বুড়ির সেঞ্চুরি···

একশ বছর। আঠার শ আশি!

চমকে উঠলেন পরমেশ। ডানদিকের ঝোপজঙ্গলে কী একটা শব্দ আচমকা। শিকারীর টর্চ ফেললেন। গায়ে-গা-লেপটে দুই-দেড় মানুষ উঁচু ফনিমনসার জঙ্গল। বাতাসে নড়ে না, কাঁপে না, অন্ধকারে ঘাপটি-মারা ঠ্যাঙারের মতো। ঝোপেঝাড়ে ঝিঁঝিঁর আবহে খেলছে জোনাকিরা। সাপখোপের আতঙ্কে রক্তে রক্তে শিরশির একটা কাঁপুনি যদিও, ভুলপথে চলতে চলতে হঠাৎ গ্রামের শ্মশানে পৌঁছে যাবার পর যেমন, হঠাৎ নির্ভয়, পরমেশ তাঁর টর্চের চড়া আলো আটকে রাখলেন। প্রকাণ্ড একটা গাছ। হাতের আলোটা উর্ধ্বে উঠতে থাকে। শক্ত সবল দেহকাণ্ড নিয়ে কী পরাক্রান্ত শক্তি ডালপালায় নিজেকে ছড়িয়ে মস্ত গম্বুজ হয়ে উঠেছে আকাশে! বিশাল চত্বর জুড়ে তার একার প্রভুত্ব! বট অশ্বথ বা আর কী হতে পারে গাছটা!

নক্ষত্রেরও হয়তো আলো আছে এক রকম। অন্ধকারের আলোয় চারদিকে সিলুয়েট-করা অসংখ্য গাছপালার ছবি। পরমেশ তাঁর নির্জনতায়, নিভৃতিতে গম্বুজের দিকে তাকিয়ে রইলেন। লতা আগাছা অর্কিডের মতো বেঁচে থাকা নয়। পায়ের তলায় শক্ত শিকড় খুঁজি আমরা! শিকড় পেয়ে গেলে, শিকড় গেঁথে গেঁথে, চারপাশে নিজেকে চাড়িয়ে নিজেরই মৌরসিপাট্টা [illegible] তুলি এক-সময়। তখন আগাছা ছাড়া আর কারও আশ্রয় [illegible] আমার ছায়ার [illegible]।

চট করে বড়ো ভালো লেগে গেল। আ[illegible] ধাক্কায় নতুন কোনো [illegible] মগজে গজিয়ে উঠলে নিজের প্রতি মুগ্ধতায় নি[illegible]কেই ভালো লাগতে শুরু [illegible]।

81659

গা-ছমছম ভয়ের মধ্যেও হাতের টর্চটা শক্ত মুঠোয় পিষে ফেলার সাধ জাগে। কন্‌ফিডেন্স। পায়ে পায়ে এগোন। স্কুলবাড়িটা, তাঁর ক্যাম্প নিশ্চয়ই খুব বেশি দূরে নয়।

আঠার শ আশি! অনেক অনেক আকাল পেরিয়ে শেতলাবুড়ি বেঁচে আছে আজও। এই গ্রামেই কোথাও সে আছে। এই অন্ধকারে।

কালই খুঁজে বের করতে হবে বুড়িকে। বুড়িকে দিয়েই শুরু হতে পারে প্রথম শট। অনেক অনেক কালের প্রাচীন এক অশ্বত্থতলায় কাঁথা-সেলাই-এর শুঁচের মতো মাটিকে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে মৌরসিপাট্টার শেকড়, সেখানে তেলসিঁদুর-মাখা আদ্যিকালের প্রাচীন পাথর, বংশপরম্পরায় অসংখ্য এয়োতির পুজোর মানতে লাল। আরো পুজো চাই, এখনও মানত দিতে হবে বাবাঠাকুরের থানে। কেউ নেই। শুধু একজন। শেতলাবুড়ি তার বেঁচে-থাকার ভয়াল মূর্তিতে। বুড়ো অশ্বত্থের ছালবাকলের সঙ্গে একাকার প্রপিতা-মহীর শিথিল চর্মের কুঞ্চন। শতবর্ষের মৌসুমী বাতাসে অসংখ্য নবান্ন বা বানভাসি হাহাকার। বিলম্বিত মৌসুমীর অজন্মা খরা। চিরন্তন ফুল্লরা শেতলা-বুড়ি। অনেক আকালের সাক্ষী।

সারি বাঁধা গোটা কয়েক বাবলা গাছের ধার ঘেঁষে বাঁক ফিরতেই, অদূরে, নিশুতির নীরব অন্ধকারে স্কুলবাড়ির চড়া আলো, দূরাগত কোলাহল। যেন একটা অকারণ মোট বইছেন মনে হলো। কিছুটা ক্লান্ত। স্ক্রিপ্‌ট্‌টা বদলে যেতে চাইছে মগজের মধ্যে। এই বদলে-যাওয়ার একটা প্রক্রিয়া থাকে। অনেক কাটাকুটি, অনেক হিশেব। মাস খানেক আগে, শেতলাবুড়িকে দেখার পর থেকেই স্নায়ুর শিরায় শিরায়, নিভৃত চিত্রকল্পে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে ছবিটা—বুড়ির ক্লোজ আপে ছবির শেষ। শ্মশানের পোড়া কাঠে ফাটা-ফাটা অঙ্গার যেমন, শ্লথ চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে মাছের আঁশ সহস্র ফাটল। জুম-ফরোয়ার্ড এগিয়ে গিয়ে ক্যামেরা বৃহৎ ফ্রেম জুড়ে বৃদ্ধার ললাট ধরতেই আদিগন্ত খরার মাঠে চকিত মন্টাজ। সবুজ-বিপ্লব আর বারোমাসী ধানের দেশে অহল্যা আজও মুক্তি খোঁজে। শেত্‌লাবুড়ি। ক্ষুধা

স্কুলের দরজায় কয়েকজন মানুষ! দূর থেকেই দেখলেন পরমেশ।

বয়সে কিছু ছোট, আটচল্লিশ-পঞ্চাশের উদভ্রান্ত সুকুমার ছুটে এলেন—'এই তো,

কোথায় ছিলেন আপনি? আমি চারদিকে লোক পাঠিয়ে অস্থির। কী যে করেন হঠাৎ-হঠাৎ…'

সুকুমারের সঙ্গে জনাচারেক কনস্টেবল, একজন অফিসার—'নমস্কার, নমস্কার স্যর…'

প্রতি-নমস্কারে উদাসীন পরমেশ। সুকুমারের দিকে—'আপনার কাজ মিটল সব। কী সব ইলেক্‌ট্রিসিটির গোলমাল!'

'গোলমাল বলে গোলমাল! কাজ শুরুই হলো না এখনও। এরই মধ্যে কেউ লেগে গেছে পেছনে। ছোঁড়া জ্বালাবে বিস্তর…'

'কোন্ ছোঁড়া? কে?'

'সে ভাবতে হবে না আপনাকে। আমি দেখছি। আপনি ভেতরে যান। শুনলাম, একটু রেস্টও নাকি নেননি এসে অবদি। স্নান করবেন? আপনার জল আলাদা তুলে রাখতে বলেছি…'

এলোমেলো চুলে বাঁহাতের আঙুলে শিথিল চিরুনি। পরমেশ ফিরে তাকালেন।

'কিছু ভাববেন না স্যর। চব্বিশ ঘণ্টা আমরা আছি এখানে। আমি না থাকি, আমাদের লোক থাকবে…' উচ্ছল অফিসার। লাফাচ্ছে গমকে গমকে—'আপনার মতো একজন গ্রেট ম্যান এয়েচেন আমাদের এলাকায়। আপনার নাম শুনেচি স্যর। খুব হাই থট-এর বই করেন আপনি…'

'আপনি বুঝি অফিস্যার-ইন-চার্জ?'

'আজ্ঞে না স্যর, আপনাদের আশীর্বাদে প্রমোশনে এয়েচি। সেকেণ্ড অফিসার…', সর্বত্রই যেমন, সুকুমার মুস্কিল-আসান। তাকালেন অফিসারের দিকে—'আপনি একটু ভেতরে ঘরে গিয়ে বসুন। আমি আসছি এক্ষুনি। কথা আছে আপনার সঙ্গে…'

এবং ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে—'সুবলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার? সুবল দেওয়ান!'

'কে সুবল?'

'এই গ্রামেরই ছেলে। ছোঁড়া আবার পার্টি করে। মস্ত পলিটিকাল মাতব্বর। আগে কি বুঝেছি ছাই, এত ক্ষমতা ছোঁড়ার?'

'কেন। কী করেছে সে?'

'এখানকার ইলেক্‌ট্রিসিটির অফিসে ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক বেশ ভালো। নিজে

এসে সব দেখেশুনে ও. কে. দিয়ে গেলেন, ওদিকে অফিসের কিছু সাবঅর্ডিনেট ঝামেলা পাকিয়ে বসে আছে। কানেকশান দেবে না। টেস্ট-সার্টিফিকেট সাবমিট করেন নি, ফ্রেস অ্যাপ্লাই করুন, হাবিজাবি বায়নাক্কা…'

'কী। ঘুস চায়? দিলেন ঘুস?'

'না। কিসের ঘুস। সব তো ওই সুবল দেওয়ান। আমি তো অফিসে গিয়ে ওকে দেখেই বুঝেছি—সর্বনাশ। পড়-তো-পড় ছোঁড়া একেবারে আমার সামনে…'

'ও কি কাজ করে নাকি ওখানে?'

'না, কাজ করবে কেন? কাজ করায়। কদিন ধরেই সকালে বিকেলে রোজ আমার কাছে এসেছে। অবিশ্যি টুকটাক উপকারও করেছে কিছু। এই গ্রামেরই ছেলে তো। পরে বুঝলাম, আসল মতলবটা কী। ছোঁড়া আমার কাছে লাইটের কণ্ট্রাক্ট চেয়েছিল। কোনো ধারণা নেই। আমি বললাম—আরে মশাই, জেনারেটার থেকে টুনিবাল্‌ব পর্যন্ত হাজারো রকমের লাখ লাখ টাকার ইলেকট্রিক্যাল ইক্যুপমেণ্ট আমাদের দরকার। সব কলকাতা থেকে আসবে। ওর জন্যে আলাদা লোক আছে। ছোঁড়া শোনে নাকি ও সব। বলে পার্টলি দিন। ইশ্‌কুলের ওয়্যারিং-এর ওপরই কাজ করে দেব। আপনাদের খরচ কম পড়বে। কেউ টেরটি পাবে না…'

হাতের তেলোয় থুত্‌নি চেপে ধরে বিচলিত পরমেশ—'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু একেবারে গোড়াতেই সাপটাপ ক্ষেপিয়ে রাখছেন…'

'সে আমি বুঝব। ভাববেন না কিছু। ওরকম দুচারটে ফড়ে তো সব জায়গাতেই থাকে। ওসব ছোঁড়াকে কখন কিভাবে কতটুকু রগড়ে দিতে হয়, আমার ভালো জানা আছে।'

'এখানকার এম. এল. এ কে?'

'হুঁ, এম. এল এ-র সঙ্গে দেখা করা হয়নি এখনও…' সুকুমার বসাক নিজেও সিগারেট ধরালেন এবার— 'তবে পঞ্চায়েত, জেলাপরিষদের সভাপতি সকলের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় কথাবার্তা বলে রেখেছি। সত্যভূষণবাবু তো অফিস কামাই করে আজ সারাদিন ছিলেন এখানে।'

'শুনেছি।'

'ও ভালো কথা, স্কুলের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি হেডমাস্টারমশাই পঞ্চায়েতের হরিনাথ সাঁতরামশাই একটু আগে সবাই এসেছিলেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে…'

'সে কি ? কোথায় তাঁরা ?'
'এই তো মিনিট পনের আগে চলে গেলেন। কেউ-কেউ বুড়োমানুষ, ঠাণ্ডাও পড়েছে। সত্যবাবুকে আবার কাল সেকেণ্ড ট্রেন ধরতে হবে। অফিস আছে তো…'
ওপাশে, স্কুলবাড়ির ভেতরের উঠোনে চেঁচামেচি হল্লা। পরমেশ সকলের সঙ্গে মিশে যেতে সেদিকেই এগোলেন। নকড়ি দত্ত, প্রভিডেন্সারের প্রতিনিধি একেবারে মুখোমুখি। হঠাৎ, জটিল সব ভাবনাচিন্তা থেকে রেহাই খুঁজতে—
'কী মশাই, লাগছে কেমন ? বৌকে চিঠি লিখেছেন তো! আমরা খুব খারাপ লোক নই।'
বশংবদ কেরানিভঙ্গি। নকড়ি ঘাড় এলিয়ে হেসে— 'আমার আর কী! সুকুমারদা আছেন।'
'অনেক টাকাকড়ি আপনার সঙ্গে। না মশাই, সাবধানে থাকবেন…' ঘাড় ফেরালেন পরমেশ। সুকুমারের দিকে— 'কোথায় ঘর দিয়েছেন একে ? আপনার সঙ্গেই তো!'
'হ্যাঁ, দোতলায়। একতলায় সিঁড়ির মুখেই পুলিশ।'
ডানে বাঁয়ে হিউম্যানিটিজ আর সায়েন্স বিল্ডিং। বাগান পেরিয়ে স্কুলের ভেতর-বাড়ির দিকে এগোলেন আরো। কোলাহল হট্টমেলার দিকে। কুঞ্চিত ভ্রূরেখায় উদ্বেগ জেগে থাকে—'মেয়েদের থাকার জায়গাটা শেষপর্যন্ত ওখানেই হলো ?'
'হ্যাঁ, এছাড়া আর উপায় ছিল না। চাইলে অবিশ্যি এধারের সায়েন্স বিল্ডিং-এর দুটো ঘর ইজিলি পাওয়া যেত। কিন্তু এত খোলামেলা, মেয়েদের টয়লেটের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। ওতে ওদের আরও অসুবিধা হতো। তার চেয়ে বরং…'
'ওখানে কোনো অসুবিধে নেই ?'
'না, না, দোতলা কোয়ার্টার। চমৎকার দুটো ঘর। মাস্টারমশাইরা ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন সেখানে। এদিকে দুজন মাস্টারমশাই ফ্যামিলি নিয়ে আছেন এখনও। পুজোর ছুটিতে যান না কোথাও …'
'কিন্তু আমাদের থেকে বেশ একটু দূরে হয়ে গেল না। শহরের মেয়ে। গ্রামে থাকবে। হঠাৎ যদি রাত্তে আমাদের কাউকে দরকার-টরকার হয়!'
'তা কেন! ওরা দোতলায় থাকবেন। রবি আর বিলুকে নিয়ে বুড়ো তারকবাবু থাকবেন একতলায়।'

আপাতত ভাবনা থেকে মুক্তি চাইলেন পরমেশ। স্কুলের ভেতরবাড়িতে প্রবেশ, যেখানে তখন বিয়েবাড়ির উৎসবের মজা।

চারদিক ঘিরে একতলা ঘরের চতুষ্কোণে বিশাল প্রাঙ্গণ। ঘন সবুজ ঘাস। ডানদিকের বারান্দায় খেতে বসে গেছে সবাই। ঠিক-ঠিক উৎসব বাড়িরই খানাপিনা। চওড়া কেরোসিন কাঠের পাটাতন ফেলে লম্বা খাবার-টেবিল। কলকাতা থেকে ভাড়া। উপবেশনের জন্য স্কুলের অঢেল লো-বেঞ্চি। গায়ে গা লেপটে খাচ্ছে সবাই। অনেকটা পিকনিকের মজা। কে যেন বলল ভিড়ের মধ্যে— 'আকালের খাওয়া বাবা! জব্বর মেনু। একেবারে প্রথম দিনই ফুল্‌কো লুচি, মুর্গির ঠ্যাং…'

ধ্রুবজ্যোতি বিতোষের মধ্যবর্তী কিরণময়কে দেখে এগিয়ে গেলেন পরমেশ— 'আপনি একটু বুঝেসুঝে কিরণদা। প্রেশার ডায়বেটিস কোলাইটিস আরো কী সব ঘড়িআংটি কবচমাদুলি বয়ে বেড়ান আপনি, সামলে…'

'কোয়ালিটি লিভিং নয়, বুঝলে হে, কোয়ালিটি লিভিং চাই। ওটাই বাঁচা। রিয়েল লিভিং…' স্বল্পাহারী কিরণময় লুচি নয়, হাতে-গড়া রুটি চিবোচ্ছিলেন। খেতে খেতেই বললেন— 'ডাক্তারের ওষুধপত্তর আর হবিষ্যির অন্ন গিলে আশি-পচাশির জাবর কাটার চেয়ে প্রাণের সুখে খেয়েদেয়ে ফুর্তি লুটে ষাটেই ফুলস্টপের ফোঁটা দিয়ে দাও। ব্যস, ব্রিফ ক্যাণ্ডেল আউট…'

মাংসের বালতি নিয়ে ঘুরছিল ক্যাটারিং বিশেষজ্ঞ বাসুদেব নিজে। প্রতিটি মাটির-বাটিতেই সে রেখে যাচ্ছে কিছু। কিরণময় প্রলেপের মুদ্রায় বাটি ঢেকে এঁটো হাতের আঙুল নাচালেন। গাল ভরে রুটি তখন— 'পাগল নাকি! দাঁড়াও, দাঁড়াও হে বাপু, এই সামলাই আগে…'

ওদিক থেকে বিমল— 'আপনি কিরণদা, পুরোপুরি চাবাক?'

ভুরু কুঁচকে চোখ উঁচোলেন কিরণময়— 'তুই শালা মধ্যবিত্ত কেরানি না মাস্টার, চার্বাকও বুঝিস না বেদান্তও জানিস না। শুধু চাটাং চাটাং চটপটি বাতাস মুখে। ঘুস খাবি আর ফাঁকি মারবি, বজ্জাতির লজিক খুঁজবি চার্বাকে মার্ক্সে গান্ধীবাদে…'

একটা হাসির হুল্লোড়। পরমেশ তার সিগারেটের শেষের প্রান্তে ছোট্ট একটা টান দিয়ে উঠোনের দিকে ছুঁড়ে ফেললেন। সবুজ ঘাসে। এগোতে এগোতে পংক্তি ভোজের একেবারে শেষে ক্যামেরাম্যান নির্মলের পাশে একটু ঠাঁই খুঁজে পেলেন। বসবেন বলেই সিদ্ধান্ত যখন, কী মনে হলো, জিজ্ঞেস করলেন—

'মেয়েরা কোথায় বলো তো।'

নির্মল— 'নন্দিতাকে তো এখানেই দেখছিলাম একটু আগে। পান চাইছিলেন কার কাছে।'

'ওদের খাওয়া হয়ে গেছে ?'

'বোধ হয়।'

জলের জগ নিয়ে ঘুরছিল রবি। পরমেশ ডাকলেন—'দিদিমণিদের খাইয়ে দিয়েছিস ?'

'ওনারা তো ফাস্ট ব্যাচেই খেয়ে গেচেন। সুভদ্রদা পৌঁছে দিয়ে এসচেন ঘরে ?'

বেঞ্চির পাশ থেকে সবে এলেন পবমেশ। নির্মল মাংসেব হাড় চুষতে চুষতে চেঁচাল—'কী হলো। বসবেন না!'

'আসছি। এক্ষুনি আসছি। তোমবা খাও...' পেছনেব দিকে খিড়কি আছে গোটাতিনেক। কথা আছে, একটাই খোলা থাকবে ফিল্ম-কোম্পানির জন্য। পরমেশ দ্রুত বেবিয়ে এলেন।

অমাবস্যার ঘুটঘুট্টি অন্ধকার বাইরে। টর্চটা হাতে ছিল। কাব টর্চ মনে নেই। এগোতে লাগলেন। স্কুলের পেছনে মস্ত খেলার-মাঠের অপর প্রান্তে অনন্ত কালোয় কয়েকটি বৈদ্যুতিক ঝিলমিল। মাস্টারমশাইদের কোয়ার্টার, তিনটে ব্লক। মাঝখানে একটি দোতলা। নির্দিষ্ট দিনের তিনদিন আগে ছুটি পেয়ে মাস্টারমশাইবা ফাঁকা কবে দিয়ে গেছেন। অভিনেত্রীরা থাকবেন সেখানে। আপাতত বা স্থায়ীভাবে তিনজন। ছোটখাটো কাজেব জন্য নির্বাচিত আরো দুজন অভিনেত্রী নির্দিষ্ট দিনে আসবেন একবাত-কি-দুরাতের জন্য। মহালয়ার দিনকয়েক আগে এসে, একটানা পড়ে থেকে সব ব্যবস্থা করেছে সুকুমার।

থমকে দাঁড়ালেন। অন্ধকারে কোথায় যেন চাপাগলায় মানুষের কণ্ঠস্বর! কথা বলছে কারা! মাঠের প্রান্তে আরো একটা টর্চের আলো জ্বলেই নিভে গেল। হয়তো গ্রামের ছেলেরাই, যারা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, বাজারে বা স্কুলের মাঠে বসে আড্ডা মারে অনেক রাত অবদি। এখন আবার বিশেষ আকর্ষণ—স্কুলবাড়িতে সিনেমা কোম্পানি! তবু ভালো—শুধুমাত্র টর্চের আলোয় তাকে চিনতে পারেনি ঠিকমতো। আড্ডা ছেড়ে উঠে আসেনি কেউ। ঘিরে ধরেনি রাস্তাঘাটে। অনুরাগী স্তাবকদের কোলাহলে বিপদ এই, কখনও প্রেরণা, কখনও সত্যি উৎপাত।

টর্চের আলো স্থির রেখে এগোতে শুরু করলেন আবার। খানাখন্দে গর্তে

কাদায় কোথায় পা পড়বে বেমক্কা! শহর-অভ্যস্ত জীবনে গ্রাম অনেক বেশি বিদেশ।

কিন্তু…প্রশ্নটা ভাবিয়ে তুলল। এই মাঠ পেরিয়েই, এদেরই নাকের ডগায় মেয়েদের আনাগোনা চলবে দিনে রাতে সারাক্ষণ! বিশেষত দুদিন বাদে, পুজোর ভিড়ে।

গ্রামের ছেলে! খুব একটা খারাপ ভাবারই-বা কারণ কী! নিজের মধ্যেই প্রশ্নটা ধাক্কা খেল। বৃত্তাকার তীক্ষ্ণ টর্চের আলো পথ দেখায়। অথচ এসব ছেলেদের উন্মাদনাই তাঁকে সাহায্য করেছে বিস্তর। এদেরই উৎসাহে মোহনপুরের স্কুলবাড়ি তার ক্যাম্প। প্রাথমিক কাজের জন্য সুকুমারকে মহালয়ার দুদিন আগে স্কুলবাড়িটা ছেড়ে না-দিলে বা শুটিং-এর প্রোগ্রাম পিছোলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা যেহেতু খুবই কঠিন, বেশ গোলমালই পাকিয়ে গিয়েছিল শেষদিকে। স্কুল-কমিটির দু-চারজন, বিশেষত হেডমাস্টারমশাইও নাকি রাজি ছিলেন না নির্ধারিত দিনের আগে ছুটি ঘোষণায়। ঘোঁট পাকানো ঘোলাজলের ব্যাপারটা অবিশ্যি খুব বেশি টের পাননি তিনি। সুকুমার সামলেছেন। সঙ্গে সত্যবাবু, স্থানীয় মাতব্বর সত্যভূষণ মল্লিক।

পরমেশ মাঠ পেরিয়ে মাস্টারমশাইদের কোয়ার্টারের এলাকায় নির্বিঘ্নে উঠে এলেন। যেহেতু হেডমাস্টারমশাইসহ কমিটির কিছু সদস্যের আপত্তি, অন্য সদস্যরা তাদের পুরনো সংঘর্ষ থেকেই অন্য কথা বলতে শুরু করলেন। তাদের সমর্থনে মাস্টারমশাইদের একটা বড়ো অংশ, তৎসহ গ্রামের নব্যশিক্ষিত তরুণরা, চাপ সৃষ্ট করলেন—তাদের গ্রাম সিনেমায় উঠবে। পরমেশ মিত্র-এর ছবি। হিল্লি-দিল্লী বিদেশে যাবে। এত বড়ো সুযোগ! এর মধ্যে পড়ে অনেক প্যাঁচগোচ খেলতে হয়েছে সুকুমারকে। খাটাখাটনিও হয়েছে বিস্তর। রাজনীতি বা গ্রাম্য দলাদলির লাভ—স্কুল খোলা অবস্থাতেই জনাতিনেক সঙ্গী নিয়ে এখানে ছিলেন দিনকয়েক। লোকজন নিয়ে কাজকম্মোও করেছেন মোটামুটি বিনা বাধায় এবং জনসমর্থনে। স্কুলপাড়ার সর্বজনীন পুজোয় দেড়শ টাকা চাঁদা। আরো কারা কারা যেন চাঁদার নামে টাকা চেয়েছে মোটা অঙ্কের। সুকুমারের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত তিনি জানেন না।

অন্ধকারে উজ্জ্বল জোনাকিরা। হীরেমুক্তো জ্বলছে দূরের গাছপালার গোড়ায়। আকাশ ভরে নক্ষত্র তখন। পরমেশ বন্ধ দরজায় কড়া নাড়লেন।

'কে?'

'আমি।'

দরজা খুলে সন্ত্রস্ত প্রভাকশান ম্যানেজার তারক পণ্ডিত। আটষট্টিতেও প্রাণপণ সচল থাকার চেষ্টা। প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর নাকি আছেন এ লাইনে। প্রমথেশ বড়ুয়াকে বড়ুয়াদা বলেন, দেবকী বসুকে দেবকীবাবু। সুকুমারের অভিযোগ—বড্ডো স্লো। আর চলে না এখন ··

'মেয়েরা ওপরে?'

'হ্যাঁ, সুভদ্র পৌঁছে দিয়ে গেল।'

দমকা ঝড়ে ঢুকে পড়লেন পরমেশ। ঘর ডিঙিয়ে ভেতরে। টর্চ জেলে সিঁড়ির গতিবিধি বুঝে নিয়ে দু চার ধাপ উঠতেই ওপরের ঘরে আলো, ঘূর্ণায়মান পাখার ছায়া সিঁড়ির মুখে, মেয়েলি হাসাহাসি, নন্দিতার গলা। কি মনে হলো, ধীরলয়ে নেমে এলেন নিচে।

আলোপাখা জেলে তক্তপোশে হিশেবের খাতা ছড়িয়ে বসে ছিলেন তারকবাবু। পরমেশ বললেন—'বলুন তো ওদের···'

সবুজ লুঙির গিঁট সামলাতে সামলাতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তারক পণ্ডিত। গুটি গুটি এগোলেন নির্দেশ পালনে।

এবং শূন্য ঘরে আর কিছু করণীয় নেই জেনে পরমেশ সিগারেট ধরালেন। হাতে তুলে দেখলেন হিশেবের কাগজপত্র। পিন-আপ-করা লাল ভাউচার অথবা নিতান্তই সাদা কাগজে বাজারের সওদা—ডিম কুড়ি ডজন, পোস্টম্যান তৈল দশ কেজির দুই টিন, ঘৃত দুই কেজির তিন টিন, ডাল—মুসুর পাঁচ কেজি ছোলা পাঁচ কেজি···কাঁচা রশিদ থেকে লম্বা খাতায় পাকাপাকি তুলে রাখার সুকুমার-নির্দেশিত ফরমায়েসি কর্ম।

এবং সিঁড়ি ভেঙে নন্দিতার তড়তড়িয়ে নেমে আসার ধ্বনিতে ঋজু হয়ে দাঁড়াতেই—'এম্মা, পরমদা আপনি! এখানে দাঁড়িয়ে কী করছেন? ওপরে উঠে আসবেন তো! আসুন, ওপরে আসুন···'

'কেমন আছো তোমরা? কোনো ট্রাবল নেই তো!'

'না না, সেসব কিছু না। কী কাণ্ড হয়েছে। দেখবেন চলুন···' উচ্ছল নন্দিতা হাত ধরে টানে।

এবং সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে— 'দেখি, দেখি পরমদা আপনার টর্চটা···'

টর্চ জেলে নন্দিতা সিঁড়িতেই পায়ের ওপর বসে পড়ল যখন, হতচকিত পরমেশ,

কিছুই না বুঝে লাফ মেরে উঠতে চাইলেন সিঁড়ির দুধাপ— 'কী হচ্ছে! কী হলো তোমাদের?'

কিন্তু অসম্ভব। প্যান্টে টান! কলকল কলকল হাসিতে ভেঙে ভেঙে পড়ছে যুবতী— 'দেখো দেখো প্রতিমাদি, পরমদার প্যান্টটা। এখন কী হবে?'

সংযত প্রতিমা দাশ বেরিয়ে এসেছেন বাইরে। মুখে হালকা হাসি— 'কী ছেলেমানুষী করছ তোমরা? গ্রামে আসোনি কোনোদিন? এ তো হয়ই...'

'বাঃরে! আমাদের দামি দামি শাড়িগুলো!'

পরমেশ দেখলেন, তার প্যান্টের নিচের দিকে সূঁচ-বেঁধানো অজস্র চোরকাঁটা। ওদের চকচকে শাড়িগুলো বিছানায় এলোমেলো। বললেন—'তোমরা কি চোরকাঁটা তুলছিলে নাকি বসে বসে? আর কোনো কাজ নেই?'

'কী করব! যা কাজ দিয়েছেন...' নন্দিতা— 'কিন্তু আপনার কী হবে পরমদা। বৌদিকে যে আনেননি। আপনার প্যান্ট থেকে এই বিচ্ছিরি কাঁটা তুলবে কে?'

'কলকাতা গিয়ে তো কলেজে ছাত্রীদের কাছে ওমেন-লিব নিয়ে মস্ত মস্ত বক্তৃতা করবে। এখানে প্যান্টের কাঁটা তোলার জন্যে বৌদির খোঁজ করছ...' পরমেশ নিস্পৃহতায় আরতির দিকে তাকালেন—'কুলোয় চাল ঝাড়ে না গ্রামের মেয়েরা। দেখেছ? চালের ধান বাছে, রেশনের চালে কাঁকর বাছে কত যত্নে, কত মনোযোগে। সেটা নিজেদের জন্যে নয়, অন্যেরা তৃপ্তিতে খাবে বলে। কী প্রাণের আকুতি আমাদের মেয়েদের! চাষি-বৌ চাষির-মেয়ে হয়ে ফিল্মে তো সেটা করতেই হবে তোমাদের, না-হয় ক্যামেরার বাইরে জীবনেও শিখে নিলে...'

অভিমানক্ষুব্ধ আরতি চপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। শাড়িব্লাউজে বাঙ্গীণ। পরমেশ এগিয়ে এলেন! সস্নেহে হাত রাখলেন কাঁধে— 'এই তো, এই তো বেশ সুন্দর লাগছে তোমাকে। এক্সেলেন্ট...'

ভেঙে পড়ার মুখে আরো বিনম্র আরতি। আনত মুখ।

পরমেশ আরো নিবিড় হতে চাইলেন। পিঠে চাপড় মেরে আদরে— 'ডোণ্ট থিংক আই অ্যাম্ এগেনস্ট ইয়োর মডার্নিটি আমার মেয়েও তো কী সব বেলবটম কাফ্তান ম্যাক্সিস্কার্ট জিন্স-টিশার্ট পরে ঘুরে বেড়ায়। আমাকে যাই বলো, পিউরিটান ভেবো না বাপু। দ্যাট উইল বি টু মাচ ফর মি...'

ওদের কারো বিছানায় বসে পড়লেন আচমকা। বেশ খোস আড্ডার মেজাজে— 'একটা জিনিস বোঝো না কেন, বোঝার চেষ্টা করো। তুমি আমি কলকাতায়

যেভাবে চলি-ফিরি কথা বলি দেশের শতকরা নব্বুই জনের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। সেখানে শহুরে-ভেলকি দেখাতে চাও? গ্রামের ছেলেমেয়েরা তাজ্জব বনবে হয় তো, কিন্তু বুড়োরা নাক কুঁচকাবে, নানান কথা বলবে। আমাদের কাজের অসুবিধে। এমনিতেই তো কিছু লোক পেছনে লেগে গেছে…'

অস্থিরতায় ঝাঁ করে উঠে দাঁড়ালেন আবার। এবার প্রতিমার দিকে—'আপনি বুঝবেন প্রতিমা, এ ছবি ভালো হোক মন্দ হোক, বড়োসড়ো রিলিজ চেন পাক বা চৌরঙ্গির কোনো হলে শুধু নুন শো হোক, এ গ্রামের সবাই কিন্তু যাবে দেখতে। শুধু মোহনপুর-হাতুই কেন, আশেপাশের আরো দশটা গ্রামের প্রতিটি শহর-চেনা মানুষ যাবে, অন্তত যাবার চেষ্টা করবে। এ গল্পের মালতী কিন্তু ওদের খুব দুর্বল জায়গা, মধ্যচাষির কন্যা ওদেরই ঘরের মেয়ে, ভিক্‌টিম অব ওয়র অ্যাণ্ড ফিউডাল সিস্টেম। বাস্তবে-দেখা মেমসাহেব আরতি সোমকে ভুলে ওরা কিন্তু চিনতেই পারবে না মালতীকে। মনে হবে না, মালতীটা ফাঁকি? শিল্পটা জীবন নয়, জীবনটা শিল্প নয়। সবটাই বানানো…'

'একটা কথা বলব পরমদা?'

পরমেশ নন্দিতার দিকে তাকালেন— 'বলো…'

শাড়ির আঁচল ডানদিকে টেনেটুনে নন্দিতা তার স্লিভলেশ ঢেকে— 'ব্যাপারটা ফিল্‌ম-জার্নালে তো এসব আখছাড় হচ্ছে। চকচকে রঙিন অফসেটে স্টার-আর্টিস্টদের জমকালো ছবি ছেপে কভার-স্টোরি,হট্‌-ব্লো-আপ…'

'একসজাক্‌ট্‌লি, ঠিক এই…এই কথাটাই আমি বোঝাতে চাইছি তোমাদের…' মাথার এলোমেলো চুলে আঙুলের চিরুনি আঁচড়ে পরমেশ আরো বেশি উৎসাহী। প্রতিমা বা নন্দিতা নিঃশব্দ শ্রোতা, মনোযোগী ছাত্রীর মতো—'তোমাদের ওই সিনেমা পত্রিকাগুলো দেশ জুড়ে ঠিক এই সবনাশটাই করছে। বাজারি স্টারদের নিয়ে এত গালগপ্পো, তাদের প্রেমবিবাহ বিবাহবিচ্ছেদ দাঁতের রোগ পেটের-ব্যথা নিয়ে এত বানানো কেচ্ছা, মানুষগুলোই তখন অ্যাট্রাকশন। এমন একটা মিথ্‌ বানিয়ে তোলে, আগেকার দিনে হায়দরাবাদের নিজাম কি পাতিয়ালার মহারাণীকে নিয়েও বোধহয় এত কৌতূহল ছিল না মানুষের। ওতে আর্টিস্ট আর্টিস্ট থাকে না। পণ্য হয়ে যায়। সিনেমায় তখন সবাই ওই ইন্‌ডিভিজুয়াল ব্যক্তিকে দেখে, অভিনেয় চরিত্রকে নয়। তোমরাও কি সেই পণ্য হতে চাও? তবে কেন গ্রুপ থিয়েটার করো…'

উঠে গিয়ে অগোছাল শাড়িগুলো ভাঁজ করছিলেন প্রতিমা, গৃহিনীর ভঙ্গিতে। নন্দিতা আরতি দুদিকের দুটো বিছানায় চুপচাপ। পরমেশ সিগারেট ধরালেন। আরতিকে লক্ষ্য করে—'যদি তোমাদের সেই ডিগ্‌নিটি বা মর্যাদাবোধটাই না থাকে, তবে কেন ডেকেছি তোমাদের! আমার প্রডিউসারের টাকার অভাব? মানি-ম্যাগ্‌নেটদের ডাকলে রাজি হতো না ভেবেছ? ভীষণ খুশি হতো। আরো আরো টাকা ঢালত। কিন্তু আমার কাজ হতো না…'

একনাগাড়ে বলতে বলতে গলায় খুশখুশ। ঘরের আবাহাওয়াটাও কেমন ভারি। নিজের প্রয়োজনেই যেন একটু সহজ হতে চাইলেন এবার। আরতির পিঠে সহাস্য চাপড়—'চিয়ার আপ। নেভার মাইণ্ড। এ অনেকটা কিরকম জানো! এ অনেকটা তোমাদের, আজকালকার ছেলেমেয়েদের প্রেম করার মতো। একটা ছেলের সঙ্গে লেকে কি রাস্তায় দুদিন ঘুরলে হয়তো, ব্যস, বন্ধুদের কাছে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে এমন গপ্‌পো শুরু করে দিলে, প্রেম লোপাট। তারপর বিয়ে করে ..নের ঠোকাঠুকি…'

হাসিতে দোল খায় নন্দিতা। এমন কি, আরতিও স্মিতমুখ। প্রতিমার গালে নিঃশব্দ ভাঁজ-ভাঙার দিকে তাকিয়ে উচ্ছল নন্দিতা—'আপনি এমন সব কথা বলেন পরমদা! প্রেমের নামে অপবাদ! প্রায় ব্লাসফেমি ..'

বাঃরে, প্রেমটা করলে কোথায় তোমরা! ওর তো চার আনা প্রেম আর বারো আনাই নিজেদের বানানো গপ্‌পো। মিথ্‌। নিজেদের তৈরি মিথ্‌ বা মিথ্যের পিছু ছুটে…'

দরজায় হঠাৎ সুভদ্র—'পরমদা।'

'কী ব্যাপার?'

'আপনাকে ডাকছেন।'

'কে?'

'সুকুমারদা।'

পরমেশ কব্জিতে ঘড়ির দিকে তাকালেন— 'এই ছাখো, দশটা বেজে গেছে। নাও, নাও, শুয়ে পড়ো। আর নয়, গুড নাইট…'

চৌকাঠ ডিঙোবার আগেই পথ আগলে দাঁড়াল চঞ্চলা নন্দিতা— 'রাত্তিরে শেয়াল ডাকবে না তো পরমদা?

ডাকতে পারে। ওতে তো আমারও ভীষণ ভয়।'

'উঃ, কী মশা!

'হ্যাঁ, ওদের এক একটার সাইজ দেখেছ? চড়ুই থেকে একটু ছোট...'
মধ্যবয়সের প্রতিমা দাশ রাশ টেনে নিজের শোভনতায়— 'কাল সকালে কখন কাজ শুরু করছেন?'
পরমেশ সিরিয়াস। ডানহাতের বুড়ো আঙুল কপালের ভাঁজে ঘসে— 'এক্ষুনি ঠিক বলতে পারছি না। যা হোক আপনারা তৈরি থাকবেন।'
সুভদ্রর সঙ্গে অন্ধকারের মাঠ পেরিয়ে ক্যাম্পে ফিরে সুকুমারকে ডাকলেন কাছে। ফার্স্ট-অ্যাসিস্ট্যান্ট দীপক বসুকেও— 'বলে দেবে তো সবাইকে। কাল সকালে হয়তো কাজ শুরু না-ও করতে পারি। দেখি যদি লাঞ্চের পর বিকেলের দিকে...'
দীপক নিরুত্তর।
'ঠিক-ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারছি না কিছুতেই...অলরাইট, লিভ ইট...' ভেতরের অস্থিরতায় সুকুমার বসাকের দিকে— 'সেই বুড়িটাকে মনে আছে আপনার?'
'কোন্ বুড়ি?'
'সেই যে রাস্তায় দেখেছিলাম সেদিন। শেতলাবুড়ি না কী নাম! সুকান্ত ছবি তুলেছিল।'
'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে তো কাল না পরশুও দেখলাম কোথায়!'
'একটু খোঁজ করবেন তো। দরকার আছে।'
'সে আর এমন কী। এত এত লোকের রান্নাবান্না হচ্ছে। এরই মধ্যে কাঙালের ভিড় জমতে শুরু করেছে দরজায়। ও বুড়ি নিজেই আসবে।'

বাংলাদেশ। তেরশ উনপঞ্চাশ।

অনন্ত বিস্তারে সোনার ধান। ধানের মাঠ। প্রান্তর প্রান্তর জুড়ে কিষান-কিষানা। ধানকাটার উৎসবে শীতের দুপুর।

ভবদুপুরের গনগনে আকাশকে ভেঙেচুরে, তছনছ করে, অকস্মাৎ বিকট শব্দ। হুঁকো-টানার গুড়গুড়ানি একটা আওয়াজ প্রথম। কিন্তু কোথায়, কোন্‌দিকে প্রথম ধাক্কায় ঠাহর করতে পারেনি কেউ। দুচোখ মেলে তাকানো যায় না আকাশের উঁচুতে। চোখ দগ্ধায় রোদ্দুর। মাথার টোকা কপালের দিকে একটু টেনে অথবা ভুরু ছুঁয়ে দুহাতের আঙুলে ঝাঁপি বানিয়ে, পিটপিটে চোখের আওতায় যখন খুঁজে পাওয়া গেল, আর রক্ষে নেই, এপাশে ওপাশে আরো দশটা মাঠগ্রাম থরথর কাঁপিয়ে দত্যিদানোর মতো ভয়ঙ্কর শব্দটা চন্দ্রসূয্যিআকাশ নিয়ে ভেঙে পড়েছে মাথার ওপর। যারা মাঠে ছিল, হাতের কাস্তে ফেলে বা হাতে নিয়েই ছুটতে শুরু করল। তাড়া-খাওয়া গাইবাছুরের মতো এলোমেলো থেকে, গায়ে-গা-লেপটে জড়ো হতে লাগল মাঠের কেন্দ্রে। কানে-তালা-ধরানো আওয়াজটা তখন মাথার ওপর

জোয়ান মরদ যারা, তারাও মাটিতে বসে পড়ল দুহাতে কান চেপে। ভয় যারা ঘরের মানুষ, মাগীমদ্দা বাচ্চাবুড়ো সবাই বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। উঠোন ছাড়িয়ে একেবারে খোলামেলা মাঠে

পুকুরঘাটে এসেছিল রমণীরা বাসন মাজবে, কাপড় কাচবে, স্নান .সেরে ঘরে যাবে। ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে

ঘেঁটেঘরের দাওয়ায় কাঁদছে ন্যাংটো খোকা। ধরার কেউ নেই

যতক্ষণ দেখা গেল, চোখেকানে যদ্দুর ধরে রাখা সম্ভব, তাকিয়ে রইল। শাদা মেঘের সঙ্গে মাখামাখি পাখির মতো কিছু। কিন্তু পাখি নয়। মুখগুলো ছুঁচোল। গুনল কেউ কেউ—কারও মতে তিনটে, কারও গুনতিতে চারটে। এবং উড়ে যেতে যেতে, গাঁয়ের আকাশ পেরিয়ে দূরে মিলিয়ে যাবার মুহূর্তে যখন বুকের খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে, খোলামেলা নিশ্বাসটা একটু স্বস্তি দিচ্ছে সবাইকে, পলক ফেলল না কেউ। রোদে আগুনে তাকিয়ে রইল এবং চোখ উঁচিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যখন ঘাড়গর্দানায় যন্তরনা, মেঘের আড়ালে হারিয়ে

যাবার পরওয় খন শব্দটা থেকে যায়, আঙুল তুলে 'উই···উই উদিকে···উদিক-ভালে, ছুট্টু সর্বেত্তানার মতন গ, উই···উই চল্যে গেল···'
চাষাভুসো থেকে মালিকমহাজন মুখ্যুপণ্ডিত, জাতবিজেতের ফারাক নেই, সব মানুষের মুখে তখন আজব কলের গপ্পো।

সোয়ামিশ্বশুরের দুপুরের ভাত নিয়ে আল বেয়ে ছুটতে ছুটতে মুখ থুবড়ে পড়েছে সাবিত্রী। ভেঙে পড়ল মেটে-হাঁড়ি, ছিটকে পড়ল কাঁসার থালাবাটি-গেলাস।
অর্জুন দৌড়ে এসে ধরল বৌকে। ধারালো কাস্তে-হাতে বুড়ো চন্দ্রধর— 'তুই আর ভাত আনবি নাই কাল থিক্যে। আমরা একজনা ঘর যাব। নিজেরটো খে' আরজনারটো নিয়ে আসব। ঘরের-বৌ ঘর-থাকবি তুই···'
গাভীর মতোই টলটল টলটল একজোড়া ঠাণ্ডা চোখ সাবিত্রীর। আকাশের দিকে উন্মুখ— 'উটো গেল কী বটে! উটো···'
ভয় যখন ভয় ধরায়, কুঁচকে গিয়ে এদিক ওদিক তাকায় অবশ অর্জুন।
'নাতির মুখ দেখবে নিকি গ খুড়···' আশেপাশের জমি থেকে একে একে উঠে এসেছে পড়শি চাষিরা— 'ঘরদোর মাঠ কাঁপায়েঁ কী একটো ডাইনি গেলেক গ ছুট্যে। জলের তলাকার মাছ আর গভ্ভের বাচ্ছা কেউ বাঁচবেক নাই···'

গাঁয়ের মুখুজ্জেবাবুদের বাড়ি কুটুম এসেছেন শহর থেকে। কুটুম নয়, জ্ঞাতিভাই কলকাতাতেই নিজেদের ঘরবাড়ি, বড়ো কারবার। দেশগাঁয়ের জোতজমিতে ছিলেন না এতকাল। এখন নাকি আর তিষ্ঠোনো যাচ্ছে না সেখানে। সোনাদানা বাক্শোপ্যাটরা কাচ্চাবাচ্চাদের নিয়ে এসেছেন। এখানেই থাকতে হবে। যুদ্ধু।
হাঁটতে হাঁটতে বামুনপাড়ায় চলে এসেছিল চন্দ্রধর। শুনল, শহরের বাবু চিৎকার করে বলছেন সবাইকে—একেই বলে গোরাসাহেবের মাথা। রেলগাড়ি মোটরগাড়ি ইষ্টিমারের পর এখন উড়ুজাহাজ ছোটাচ্ছে আকাশে। এই উড়ুজাহাজে উড়ে উড়ে সাহেবসৈন্যরা শত্রুর দেশে যায়। শুন্যি থেকে আগুন বমি করে। তাকে বলে বোমা। সে আরেক মারণকল। সে-ও গোরাদের তৈরি। মাটিতে পড়লে রক্ষে নেই। কানের পর্দা ফাটিয়ে দাউদাউ আগুন ধরিয়ে দেবে চারপাঁচ ক্রোশ জুড়ে গোটা তল্লাটে। সে আগুন নেভে

না। হাজারে হাজারে মানুষ ছুঁচোইঁদুরের মতো মরবে। আগুনে জ্বলসে জ্বলসে পোকার মতো মরবে। ঘরদোরগাইবলদফলফলাদিফসল কিছুই থাকবে না...

শুনতে শুনতে বোবা বনে যায় চন্দ্রধর এবং সকলেই। সাতজন্মের মুখ্যু সব গাঁয়ের মানুষ।

জীবনে এই প্রথম চন্দ্রধর মরণে ভয় পেল। বুকের ছাতি শুকিয়ে আসে। সাঁঝের আঁধারে ঘরে ফেরার পথে পড়শিদের সঙ্গে কথা—সেই আতঙ্ক, সেই আজব কলের বিভীষিকা।

দুঃখে দুঃখে মনের কথা শুধোয়—

এবছর চাষের ফলন বড়ো ভালো। বাপঠাকুদ্দা রেখে গেছেন তিন বিঘে জমি। খরায় বানে অজন্মায় মড়কে জীবনভর আঁকড়ে আছে পরম সম্পদ। এ ছাড়াও বাবুদের জমিতে দুই বাপব্যাটার ভাগের চাষ। নতুন ধানে বুকটা যখন ভরে ওঠার কথা, তখন, কেন এমন তরাস! তিন মেয়ে দুই ছেলে রেখে ম্যালেরিয়ায় মরে গেল অর্জুনের-মা। বে-থার পর মেয়েরা ঘর করছে শ্বশুরের ভিটেয়। তাজা জোয়ান যুধিষ্ঠিরকে কালে কাটল অকালে। সেই থেকে তো একটাই ছেলে—অর্জুন। পরমা সুন্দরী কন্যে সাবিত্রী তার ঘরের লক্ষ্মী। আবার তার ঘর ভরে উঠছে নতুন করে। অনেক, অনেক কাল বাদে আঁতুড় পড়বে উঠোনে। ঘরে তার পোয়াতী বৌ-এর গতরজ্বালানী সুখ।

ভয়ে তরাসে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফেরে চন্দ্রধর। কৃষ্ণপক্ষের ঘুটঘুট্টি আঁধার যদিও, সুখের ঘরে লম্ফ জ্বলছিল।

লম্ফটা কাঁপছিল। লম্ফর মুখে লাল ফুল।

দোরগোড়ায় ঝিম মেরে বসে ছিল অর্জুন। হাঁটু মুড়ে, মেটে-দেয়ালে ঠেস দিয়ে। কেমন বদলে যাচ্ছে দিনকাল। ডর-ডর ছ্যাকা লাগে কলজেয়।

ঘরগেরস্তালির ফাঁকে সাবিত্রী উচ্ছল যুবতী। চুপে চুপে, পা টিপে টিপে এসে টুকুস করে একটা চিমটি কাটল সোয়ামিকে।

অর্জুন ক্ষেপে যায়— 'তুই এমনটো কচ্চিস কেনে গ বৌ! মনে লয়, লাচতে নেগেচিস। আরো দশজনা আচে না গাঁয়ে?'

সাবিত্রীর হুঁস নেই। অঙ্গে অঙ্গে সুখের নাচন। আরো বেহায়া, খলখল খলখল হাসি— 'শরীলটো বলতে নেগেচে গ, তুমি, তুমি একটো মরদ...'

অর্জুন অর্থ বোঝে না। ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে বুক-পোড়া-পলতের চোখে।

শ্বশুরের চোখ এড়িয়ে, পড়শিদের নজর লুকিয়ে, উনুনের পোড়ামাটি চিবোনোর মতোই সাবিত্রীর গতর-নাচানো উচ্ছ্বাস— 'অমন তিজি টিপ্‌নি যি মানুষটার নাগুলে, সি মানুষটো জানে নাই আবাদ কল্লে মরাই ভরো ধান দিবেন গ মা-লক্ষ্মী। হ্যাঁদা নিকি গ আমার মরদটো! নিজের জমিন চিনে নাই?'

ভোরবেলায়, কাক মুর্গির ডাক শুরু হয়েছে সবে, চমকে উঠল গাঁয়ের মানুষ। মেটেঘরের দাওয়ায় কাঁথা-মুড়ি ঘুম থেকে উঠে বসেছে চন্দ্রধর। ঘর থেকে বেরি.য় এসেছে অর্জুন সাবিত্রী। এদিক ওদিক থেকে ছুটে আসছে পড়শিরা। উৎকর্ণ সবাই।
দূরে কোথায় গগন চৌকিদারের হাঁক।

গাছপালা ঘরদোরের ফাঁকফোকর থেকে জোয়ানবুড়ো বেবাক পুরুষমানুষের' বেরিয়ে আসছে। ছুটছে। তাদের পিছে ন্যাংটো বাচ্চারা।

চাষিপাড়ার প্রান্তে পুকুরধারে বাঁশতলায় কৌতূহলী জনতার কেন্দ্রে গগন চৌকিদার। ঢোলে কাঠি বাজিয়ে চড়া গলায় হাঁক— 'মহামান্য রাজা-বাহাদুরের হুকুমত। এতদ্দাবা সব্বোসাধারণকে জ্ঞাত করা হয়তেচে যে, যুদ্ধ... মহাযুদ্ধ জগতময়। মহাযুদ্ধের সেবায় পিত্যেক চাষিকে ধান দিতে হইবেক। মহামান্য সরকার বাহাদুর নেয্যমূল্যের অতিবিক্ত দর দিবেক। পিতি বস্তা দশ ট্যাকা...'
চোয়াল-ভাঙা হাই আব পিচুটির চোখে বম্‌ মেরে গেছে গাঁয়ের মানুষ। বলে কি গ চৌকিদাব ব্যাটা! মাথাটাথা খারাপ হল নিকি! নাকি গান্ধী মহারাজের স্বরাজ এল দেশে! পয়সার জন্যে বছর-বছর কিছু ধান ত ছাডতেই হয় গরিব চাষিকে। কিন্তু তাই বলে এমন দর! দশ টাকা বস্তায়!
সুতরাং আর এগোতে পারে না চৌকিদার। পুণ্যির লোভে কত্তাবাবুরা দানা ছড়ালে যেমন কাকভোরে উঠোন জুড়ে শতশত হরেক বঙের পাখি, চৌকিদারকে ঘিরে তাবৎ মানুষ— 'বলচ কি গ গগন, ই ত তাজ্জব কতা বটেক...'
কাঁধের ছোট্ট মতো ঢোলটা টেনেটুনে একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল গগন চৌকিদার— 'অঁ, সি কতাই ত নিখ্যে দিয়ে এলম থানায় দারোগা-বাবুর খ্যাতায়। বললম, নিখুন না কেনে, ই বছর ফলন জব্বর। উচিত্ত-দর

দিবেন ত সরকার বাহাদুরকে ধান কেনে দিবেক নাই আমার গাঁয়ের লোক! নিচ্চয় দিবেক...'

'বটেই ত, বটেই ত...' বাতাসে-নোয়ানো কলাপাতার মতো মাথা নড়ে জটলার— 'কিন্তু ই ধান কে লিবেক বটে! ট্যাকা দিবেক কে?'

'সি তুমাদের ভাবতে হবেক নাই। দারোগাবাবু লোক নিয়ে আসবেন...' গগন চৌকিদার কনুই উঁচিয়ে, ঢোলের কাঠি দিয়ে পিঠের চুলকুনি ঘসতে ঘসতে— 'চৌকিদারি কি যেমন-তেমন কম্মো গ! তুমাদের দশজনাকে সরকার বাহাদুরের কতা শুধোতে হয়, ফের থানায় যেয়ে তুমাদের দশজনার সুখ দুঃখু ভালমন্দ বলে আসতে হয়...'

'বটে, বটেই ত। তুমি হলে গে ই গাঁয়ে সরকার বাহাদুরের আপন লোক...'

গগন চৌকিদার এগোয়, ঢোলের কাঠি বাজে, হাঁক— 'মহামান্য রাজাবাহাদুরের হুকুমত। এতদ্বারা সব্বোসাধারণকে জ্ঞাত করা হয়তেচে...'

গাছপালার আড়ালে দূরবর্তী বাতাসে কণ্ঠস্বর হারিয়ে যাবার আগেই গা-ঘেশামেশি মানুষেরা খুশিতে মশগুল—জম্মো জম্মো ধরে চাষার ব্যাটা চাষার লাতি চাষা! সাত জম্মোয় কেউ শুনেচ গ ধানের এমন দর! দেড় টাকা দুটাকা মনের ধান, ছ-সাত চলছেল। এখন বলে কিনা দশ! যুদ্ধু, সব যুদ্ধু। যুদ্ধু বড় পয়া। যুদ্ধু বেঁচে থাক...

বেড়জাল ফেলে দহদীঘি উথালপাথাল করলে যেমন হরেক জাতের মাছের খলবল, গোটা গ্রামকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল গগন চৌকিদার। বামুনপাড়ায় কায়েতপাড়ায় চাষিপাড়ায় ঘরে ঘরে আবার এক নতুন গপ্পো—কপাল খুলে গেল চাষির, এবার চাষের ইজ্জৎ।

হুঁকো-হাতে খড়মের চাটাং চাটাং শব্দ তুলে চুকচুক ঘুরে বেড়ায় মালিক মহাজনেরা। সাঝের আঁধারে মাঝিপাড়ায় কেলো সামন্ত এলেন তো মণ্ডল-পাড়ায় বামুনঠাকুর তারিণী ভট্‌চায। কেদার কোঙার কার্তিক মুখুজ্জেও ফাঁকফোকর খুঁজছেন এদিক ওদিক— 'ধান বেচবি ত পরের দোরে কেনে দিবি র‍্যা! আমার জমি চষবি আর আমার ধান পরকে দিবি! ধম্মে সইবেক নাই। আমরা গাঁয়ের মানুষ। সুখেদুঃখে আমরাই ত দেখি র‍্যা তুদের। দেখতে হয়। উ ধান আমায় দে। সরকারের বাঁধা দরেই লুবো...'

গরিব মানুষ ভয় পেল। ঘরে ঘরে কানাকানি ফিসফাস—চৌকিদার বলেছে সরকারের লোক আসবে ধান নিতে। সেপাই বন্দুক নিয়ে দারোগাবাবু নিজেই নাকি আসবেন। এদিকে আবার ডাঙায় থেকে বাঘের সঙ্গে খোচাখুচিও চলে না। গাঁয়ের মালিকমহাজনেরাই ত দেখে গ অকালে। দাদন দেয়, কর্জ দেয়, তাদেরই জমি ভাগে চষতে হয় বছর-বছর…

বিকেল-বিকেল বুড়িমাতলায় বটের ছায়ায় সভা বসল চাষিপাড়ার দশজনের। অর্জুনকে নিয়ে চন্দ্রধরও এসে বসল এককোণে। মিলেমিশে একটা পরামর্শ চাই—শলা করে একটা বিধেন দাও গ সবাই। মিছে ত বলেনি চৌকিদার—এ বছর ফলন জব্বর। ধান আর সোনা যখন এক দর, তুটো পয়সার মুখ দেখুক গরিবমানুষ।

কিন্তু প্রশ্ন—এ ধান তারা বেচবে কাকে? কে মালিক?

দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে শরীরটা। কাজেকম্মে হাঁপ ধরে বড়ো। বুঝতে পারে সাবিত্রী—ফুলে ফুলে উঠছে গাগতর, বমি-বমি দিনভর, জিভে সোয়াদ নেই। কিন্তু যখন শাশুড়ি ননদ কেউ নেই ঘরে, তাকেই তো গোছাল দিতে হবে নিজের সংসার। এত এত খুড়িজেঠি মাসিপিসি পড়শিদের ঘরে ঘরে। একটা পরামর্শ চাই।

লাঠি ঠুকে ঠুকে ঘরে উঠে আসে জ্ঞাতি ঘরের বুড়ি মঙ্গলাপিসি। সেই কোন্ আদ্যিকালে ন-বছর বয়সে বিয়ে, বারো বছরে বিধবা। শুকনো জীবনে অনেক, অনেক আঁতুড়ের ধন্বন্তরী ধাইমা। বুড়ি চোয়াল চুষতে চুষতে শুধোয়— 'আমের ভিত্‌রে যেমন আঁটি, মে'ছেল্যার পেটের গভ্‌ভোয তেমনি এক লাল টুকটুক মেটে হাঁড়ি। সিখেনে জটাবুড়ি মা-ষষ্ঠীর বাস। সোনার বরণ কাত্তিক ঠাকুর তেনার সোয়ামি লা বৌ। তেনাদের নাম কর। পুজো দিয়ে আয় বাবাঠাকুরের থানে। তিনিই জোগান পেটের অন্ন, তিনিই দিবেন সাধের গোপাল।'

সেই সাধের-গোপাল কামনায় মানতের পেন্নামি দিতে সাবিত্রী নিত্যি যায় বাবা-ঠাকুরের থানে— 'মুনিশ-খাটার জন নাই ত চাষার ঘরে তিন বিঘে সরেস জমি গ ঠাকুর। বাজা বৌ-এর মরণ ভালো। বুড়া শ্বশুর আজ আচে কাল নাই। একটো ছেল্যা দাও গ বাবাঠাকুর। বুড়া লাতির মুখ দেখবেক।'

পেটের ভারে উদাস বুকের দুঃখু ঘুচতে যাচ্ছে আজ। বিয়ের পর তিন-আবাদের কালে।

কিন্তু এই আবাদের ধান!
ঠেঙাপেটায় ধান-ঝাড়া! কুলোর কাঁপুনিতে ধান-সারা!
উঠোন ভরে শীতের রোদ্দুরে সোজা পায়ে দাঁড়িয়ে সাবিত্রী। টান-টান দুহাতে নাড়ায় কুলো কাঁপে। সাবিত্রীর অঙ্গ নাচে। যত্নআত্তির সোহাগী ধান। ঘরের চাল গড়িয়ে বাদলাদিনে জলের ঝালর যেমন, সোনা গড়ায়। পেটের দানা। ধুলো ওড়ে, খড়ের কুচি উড়ে উড়ে যায় বাতাসে, ঝাড়া-ধানের ঢিপি গড়ে ওঠে। নতুন মরাই, নতুন পালুই-এ গেরস্ত ঘরের শোভা।
আঁটি-আঁটি-বাঁধা ধানগাছের পাহাড় সামনে আর পেছনে, কোমর ভেঙে ধুঁকতে ধুঁকতে আরো নতুন ধানের বাঁক বয়ে উঠোনে ঢুকছে অর্জুন।
সাবিত্রীর হাতে কুলো থেমে যায়। ছুটে যায় সোহাগে।
পেল্লাই পাহাড় মাটিতে নামিয়ে ক্লান্ত অর্জুন বড়োই বিষাদ মলিন। কাঁধের গামছায় বুকগলাঘাড়মুখ মুছতে মুছতে দাওয়ায় এসে বসে।
এনামেলের গ্লাসে জল নিয়ে আসে সাবিত্রী। আদর ছুঁতে চায়—'কি গ! এমনটো করছ কেনে?'
জলটা নিঃশেষে শুষে নিয়ে বৌ-এর সর্ব অঙ্গে চোখ বুলোয় অর্জুন। মুখটা আরো শুকোয়।

ঝাঁকড়া মাথার মাতন দিয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে ঘরে ফিরল চন্দ্রধর—'ই কেমনধারা কতা গ! ই কেমন বেচার?'
নির্বোধ সাবিত্রী কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই টাঙি নিয়ে ছুটল বুড়ো। মোচড়-খাওয়া বটঅশ্বত্থের শেকড় যেমন, ঝোলা-ঝোলা চামড়ায় ফুঁসছে রাগের আক্রোশ। এখনও বুড়ো হাড়ের তেজ।

অসহায় সাবিত্রী পড়শিদের ঘরে ঘরে যায়। দাপায় ভেতরে ভেতরে। কার দুঃখু কে শোনে! সব ঘরেই কান্না আর হুলুস্থুল। বর্গি পড়েছে মাঠে। লাঠি কুড়ুলটাঙি নিয়ে চারদিকে থেকে ছুটছে মদ্দা জোয়ানেরা। ঘরের মেয়ে-ছেলেরাও বেরিয়ে পড়ল। কান্না আর শাপান্তির চিৎকারে তোলপাড়

চতুর্দিক। সোমত্তা বৌ-ঝি, কিছু কিছু বুড়ি। দিশেহারা। দল বেঁধে মাঠের দিকে ছুট।

গ্রামের প্রান্তে গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে, আড়াল থেকে মেয়েদের উদ্‌গ্রীব চোখগুলো। মাটিতে পড়ে আছাড়িবিছাড়ি চিৎকার বুড়িদের—'ই কোন্ অলক্ষুনে দিন প'ল গ বাবাঠাকুর! ই কোন্ বিধেন! মাঠের ধান মাঠেই লুটে লিবেক মড়াখেকো আটকুড়্যা ব্যাটারা? ভাগের বুঝ দিবেক নাই চাষিদের! হকের বুঝ! উই...উই ঘাটের মড়া জমিদারের গুমস্তা, তার গুখাকী দারোগাটো...'

বিশাল মাঠের মাঝখানে দশ গাঁয়ের হাজার মানুষ। জোর সোরগোল। দিনদুপুরে ডাকাতি। সারি বেঁধে মাঠে-মাঠে শুয়ে আছে ধানের আঁটি। বাছাই-বাছাই জমিতে একেবারে মাঠ থেকেই খাজনা আদায়ের শুরু। জমিদারের লোক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ধান তুলছে গাড়িতে। সঙ্গে বন্দুকসেপাই নিয়ে দারোগাবাবু নিজে।
'কেনে তুলচ ধান?'
'সরকার বাহাদুরের লুটিশ।'
চাষিরা অবাক মানল— 'ই কাগজ দেখাচ্চ কেনে গ। নেকা কাগজে কি পেট ভরবে আমাদের?'
গাঁয়ের গন্যিমান্যি কত্তাবাবুরা ছিলেন অনেকেই। বাবুরা সালিশী মানলেন—সত্যি সত্যি নোটিশ। কাগজে লেখা আছে, কোথায় কি হচ্ছে যুদ্ধুফুদ্ধু। যুদ্ধু করছে যারা, সৈন্যসামন্ত, তাদের খাওয়াতে হবে। দেশরক্ষায় রাজ্যরক্ষায় বিস্তর ধানচাল চাই সরকারের। ভালোয় ভালোয় ধান দে। না দিবি তো, এরপর পুলিশ নয়, লালমুখো গোরাসৈন্য আসবে শহর থেকে। বন্দুকের কুঁদোয় মাথা ভাঙবে, মাজা ভাঙবে। পেট ফাঁসিয়ে দেবে বেয়নেটের খোঁচায়। তোদের জন্যে গুলি খরচা করবে না। এগুলো যুদ্ধু-এ লাগবে।
'কিন্তু গগন, গগন খুড় যে বললেক সিদিন...'
'কে গগন?'
'গগন গ, গগন মাঝি। গাঁয়ের চৌকিদার। ঢোল পিটিয়েঁ শুধোল দশজনারে...'
'চৌকিদারের ঢোল!' মাঠ কাঁপিয়ে হাসলেন বাবুরা— 'যা না তবে, যা। যা ওই মুখ্যুটার কাছে। বাঁচাবে তোদের।'

গগন মাঝি ছিল সেখানে। সে এবং ভিন গাঁয়ের আরো জনকয়েক চৌকিদার।' যেহেতু বিভিন্ন গাঁয়ের রাজকর্মচারী, রাজার আদেশে আসতেই হয়েছে ঘটনা-স্থলে। কিন্তু আলে আলে পিছু হটল তারা। ডানেও মারে বাঁয়েও মারে।' ভেরা পেটানোর দায়।

এত কথা, এত বেত্তান্ত বোঝে না গাঁয়ের মানুষ। মাঠের মধ্যেই কেঁদে পড়ল কয়েকজন। লেঠেলরা এসে লাঠি খোঁচাল কোঁৎকায়। টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে দিলো দূরে। মরা গাইবলদ যেমন ভাগাড়ে।

যারা জমির মালিক, সরকারের গা লেপটে রইলেন। যারা ধানের মালিক, জমিদারের লেঠেল আর সরকারের পুলিশ তাদের ঠেকিয়ে রাখল। এবং দলা-পাকানো বিহ্বল মানুষগুলোর চোখের ডগায় ধানের-আঁটি উঠতে লাগল সরকারের গাড়িতে।

পেশীতে পেশীতে ক্রোধ আব অসহায় চিৎকার খোলা মাঠের আকাশে। যারা জোয়ানমরদ, যারা লাঙল দিয়েছে মই দিয়েছে বীজ রুয়েছে মাটিতে, টগবগানির জ্বালায় লেঠেলদের বাধা মানল না। ঝাঁপিয়ে পড়ল ডাকাতদের ওপর। সঙ্গে সঙ্গেই ঢলে পড়ল মাঠে। প্রথমই পড়ল মল্লিকপুরের বাসেদ মিঞার ব্যাটা জিয়াদ আলি, তাবপরই কানু বাগদী, হারু মাঝি, নগেন কোঙার, অর্জুন।

টলতে টলতে ঘরে ফিরছে অর্জুন। ধরে-ধবে পড়শিরাই নিয়ে এল। উঠোনে পড়েই মোষের আক্রোশে গোটা শরীর কাঁপিয়ে আছড়ানি। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে মাথায়। গলগল রক্ত।

ভগবানের দেশ, আকাশেব দিকে তাকিয়ে সাবিত্রীর আকুল চিৎকার—সুয্যি সাক্ষী চন্দ্র সাক্ষী সাক্ষী গাছপালা…

বিপুল আকাশে ডানা মেলে উড়ে গেল এক ঝাঁক বালি হাঁস।

সাঁঝের বেলা সভা বসল বুড়িমাতলায়। এ ওর দিকে তাকায়। ভয়ের চোখে ভয় বাড়ে—গোটা বছরটোই ত পড়ে রইল গ। মাগবাচ্ছা নিয়ে খাবেক কী লোকে? খড় হবেক নাই ত গাইবলদের খোরাকি!

আড়াল-আবডাল থেকে বৌঝিরাও উঁকি দিলো কেউ কেউ। ব্যাটাছেলেদের মাথা ফাটলে মরণ তো তাদেরও।

কথাটা উঠল। ধানলুটের সময় জমিদারের বুড়ো গোমস্তা মিঠে-মিঠে করে বলেছিল কথাগুলো—সব ধান তো নিচ্ছে না কেউ। যাদের খাজনা বাকি, যারা দাদন নিয়ে ফেরতা দেয়নি, কাছারিতে গিয়ে হত্যে দেয় ফি-বছর, শুধু তাদের ধানই তোলা হবে খাতার পাওনা গণ্ডার হিশেব মিলিয়ে ·
'মিছে কতা, ভাঁহা মিছে...' সভার মধ্যে ফেটে পড়ল চন্দ্রধর— 'আমি খ্যাজনা দিয়ে দেন্‌চি গ। আমাব কজ্জর ধান ছেল তারুঠাকুরের থানে। সি আমি ফি-বছর লতুন ধানে ফেরতা দি। ঠাকুরকত্তার ধান সরকার কেনে লিবেক ?'
'ঠাকুরকত্তা ত ছেল গ সিখেনে। তা তুমায় বললেন কিছু ? ওনার বুঝ উনি বুঝে লিবেন সরকাবের সনে...'
ছুটো হাতের পাঞ্জায় আঙুলগুলো বাঘের মতো আঁচড়াতে চায় কিছু। মুঠো মেরে কপাল চাপড়ায় চন্দ্রধর। যদি পাথর পেত, পাথর ভাঙত মাথায়।
মোড়ল সখানাথ বাগ চার-কুড়ি বয়স পেরিয়ে খরাবন্যামড়ক অনেক দেখেছেন জীবনে, জমিদারের লেঠেল অনেক সয়েছেন। কিন্তু এমন অলক্ষুণে কাণ্ডকীর্তি দেখেননি কোনোকালে। দাঁত-পড়া চোয়াল চুষতে চুষতে সর্ব অঙ্গে কাঁপে বুড়ো— 'উই লুটিশের কতাগুলান কে পড়ে দিবেক গ আমাদের ? বড্ড মিছে কত্তা কয় পাশ-দেওয়া বাবুরা। উগুলান হারামি ·'
'উই কাগজই ত মারে গ আমাদেবকে। কিষেন মারার কল, বাবুদের অস্তর বটেক...'
বোবা-বোবা চোখগুলো নিঝুম পাখির মতো কিংবা গোয়ালের গাইবলদের মতোই পবস্পরের দিকে তাকিয়ে চড়চাপড়ে মশা তাড়ায় বুকে পিঠে হাঁটুতে।
শলা পরামশ্যে বিধেন দেবাব জন নেই।
কে যেন বলল— 'চল না কেনে, দশজনে যাই ..'
'কুথাকে ?'
'চৌকিদাবের ঘর ..,
'কেনে ?'
'ডেরা পিটিয়ে উ মড়াখেকো বললেক কেনে এমন মিছে কতাগুলান ?'
'দারোগাসায়েব জোতমালিকের পা-চাটা কুত্তা শালা...'
'তুমরা উকে ডুষচ কেনে গ ?'
সবাই চমকে তাকাল মোড়লের দিকে। ছেঁড়া গামছায় চোখের পিচুটি মোছে সখানাথ, অথবা কান্না— 'তবু ত স্বজেতের ঘরে দু-কেলাশের বিদ্যে আছে-র‍্যা

একজনার। রাজার লোক আমাদের গগন। রাজা বাহাদুরের ট্যাকা আসে' কিমাসে। যা-হোক, বাবুদের মতন পয়সা কামায় ছুটো ..'

জোতজমি যেটুকু আছে, চাষের-চালের-ভাত জোটে না সম্বৎসর। গাইগরু নেই,-নাতিনাতনী আছে। বাস্তুভিটেয় হেলে পড়েছে মাটির ঘরটা। খড় পাল্টানো হয়নি ক বছর। তবু, ভারত সাম্রাজ্যের একমাত্র রাজপ্রতিনিধি গগন মাঝিকে ঠাঁট রেখে চলতেই হয় তার গাঁয়ে। দশজন থেকে সে আলাদা।
সে চৌকিদার।
এ হেন মস্ত মানুষ গগন চৌকিদার বেইজ্জৎ আজ। ভাঙা ঘরের দাওয়ায় বসে তামাকও বিস্বাদ।
লাগোয়া ঘর থেকে উঠোনে নেমে খিঁচোচ্ছে সহোদর শরিকি ভাই পবন—দু-আড়ি চাল সে ধার দিয়েছে আজ প্রায় চার দিন। এখনও ফেরতের নাম নেই। তারও ঘরে ছেলেপুলে আছে। তাকেও সংসার করতে হয়···
গগন মাঝি বড়োই শীতল। ধরা গলায় বোঝাতে চায়—মাস গেলে সাতটা টাকা পাঠায় মহামান্য সরকার বাহাদুর। সে-ও আসছে না তিন মাস···
ঝগড়াটা জমে যায়। ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের মেয়েছেলেরাও—কী আমার নবাব' র‍্যা! কতায় কতায় সরকার বাহাদুর। অতই যদি পিরিত, পাল্কি চেপে যায় না কেনে শ'রে, লাটসায়েবের থানে···
হুঁকোর গুড়গুড়িতে ধোঁয়া ফুরিয়ে যায়। দাওয়ায় বসে নতুন করে কল্কে পাল্টাবার সাহস পায় না গগন। ঘাড়ের ওপর এবার স্বার ঘরের মানুষেরা। মেটে ঘরের ফাটল বোজাতে ঘর নিকোচ্ছিল শশিবালা। কাঁদাজলের নুড়ি নিয়েই ছুটে এল— 'মরণ, মরণ হয় না গা আমার! ঘরে চাল বাড়ন্ত, তেল নুন মশলাপাতি সব বাড়ন্ত। ভাবনা আচে কারুর? নাথি, নাথি মারি, ঝ্যাটা মারি অমন চৌকিদারি-না-ছাই চাকরির কপালে···'
বৌ-এর মুখে অনর্গল বিষের উদ্‌গার। অসহায় গগন নিশ্চল স্থবির। সাঁওতাল পাড়ায় জ্যান্ত শুয়োরের গায়ে তাতানো লোহা খোঁচানোর উৎসব। গগন চৌকিদার সত্যি-সত্যি চোর বনে যায়। যন্ত্রনায় পোড়ে।
ভগবান না দেখুন, কোথায় লাটসাহেব!

রাতের আঁধারে চুপি চুপি গাঁয়ের মান্যিজনেরা আসেন। সত্যি সত্যি চোরের'

এতো। থপথপ মেদের শরীর বয়ে কেলো সামন্ত এসে ডাকলেন কাটা-মেটে হাড়ির গলায়— 'ই চিঠিটো কাল দিবি হ্যা দারোগাবাবুর হাতে। কাল তুকে যেতে হবেক থানায়…'

সামন্তমশাইর পায়ে ভেঙে পড়ল গগন—দিন কাল বড্ড খারাপ। সেদিন মাঠের ঘটনার পর চাষিপাড়ার স্বজনস্বজাতিরা বিশ্বাস করছে না কেউ। জোতজমির মালিকমহাজন তারু ঠাকুর কেদার কোঙার কাত্তিক মুখুজ্জে সবাই এসে শাসাচ্ছে সকাল সন্ধে। বেতন পাঠাচ্ছে না সরকার। সংসারে এতগুলো পেট। জিনিসপত্তরের দাম বেড়ে যাচ্ছে দিনকে-দিন।

সুতরাং সে আকুল হলো— 'বড়ই বেপদে পড়ে গেইচি গ কত্তাবাবু। খোরাকির ধান নাই, ধারদেনা চাইব, মানুষ নাই গাঁয়ে ··'

অন্ধকারে দেখা যায় না মুখ। খ্যাকখ্যাক হাসিটা কাঁপে— 'বটেই, বটেই ত, তোরা গাঁয়ের জন। দেখতেই হবেক বেপদে আপদে। তা তুই যাস না কেনে কাল সকালে। দিব খন আধ বস্তাটাক ধান। কিন্তু কত্তা আচে একটো ·'

রক্তে রক্তে শিহরণ। গগন চৌকিদার আরো ভেঙে ভেঙে পড়ে।

'দিনকাল বড্ড খারাপ হয়্যা যাচ্ছে হ্যা। ই ধানের কতাটো বলতে লারবি কারুকে। কাজ চাই। যেমনটো বলব তেমনটো কাজ…'

হাঁটু ভেঙে বসে, অন্ধকারে মাটি হাতড়ায় গগন। কত্তাপ্রভুর পা খোঁজে। চরণযুগল—'মুখের বাক্যি গ কত্তা। নেমক খেয়ে হারামিপানা করে নাই গগন চোকিদার।'

অন্ধকারে গা লেপটে কালো মোটা পাহাড়ের মতো ভারি শরীরটা ফিরে যায় ঘরে। আঁধার রাতের কাকতাড়ুয়া গগন চৌকিদার দাঁড়িয়ে থাকে নিঝঝুম। হাতে দারোগাবাবুর চিঠি। আঠায়-আটা খাম।

স্বজাতি পড়শিদের দুঃখে কান্না জমে তার। এমন রাজার নকরি না-থাকলে নাত্তিপুত্তি নিয়ে ভাতে মরত সে-ও।

সোয়ামির অবস্থা দেখে ঘরে আর তিষ্ঠোতে পারে না শশিবালা। চৌকিদারের বৌ বলে গাঁয়ে তার একটু বেশিই খাতির। বিশেষত চাষিপাড়া তাঁতিপাড়া মাঝিপাড়ার বৌঝিরা তাকে ঘরে নিয়ে পিঁড়ি পেতে বসায়, পানসুপুরি দেয়, গপ্‌পোগাছা করে।

এখন যেন স্বজনস্বজাতির সমাজে ধোপানাপিত বন্ধ হবার হাল।

চাষিপাড়ার বড়োপুকুরের ধারে এসে সে একটু চড়া গলায়ই বলল কথাগুলো—
'সব্বায় তুষচে কেনে গ তুমাদের চোকিদারকে। বল না গ, বল না কেনে তুমরা দশজনে! অ্যাদ্দিন ধরে ত তুমরা দেখচ মানুষটোকে...'
পুকুরঘাটে আরো মেয়েরা ছিল। রাগে মুখ ঘোরায় না কেউ।
শশিবালা আরো মরিয়া। আরো জোরে গলা চড়ে—'হোক, সত্যি কথাটো দশকান হোক। মা'জনের সনে জমিদারের ঘাট কর‍্যাচে জানিস যদি, তুই মিনসে বললি কেনে ঢোল পিটাতে...'
আঁৎকে উঠল বৌঝিরা। এ আবার কী হল গ মাগীর! এত বড়ো গলায় দশকান করে একেবারে খোদ মালিকমহাজনদারোগাসাহেব নিয়ে কথা!
স্নান সেরে ভেজা-কাপড়ে উঠছিল গোপাল মাঝির বৌ। বাঁ-কাঁখে মেটে কলসি, ডানহাতের তেলোয় মাজা-বাসনের ডাঁই। থমকে দাঁড়াল—'তুমি ফের কোন্ ফিকির নিয়ে এলে গা রাখালের-মা?'
'কেনে?' শশিবালা চমকে ওঠে—'লয় লয়, রাখালের নামে দিব্যি গ আমার...'
'আর তুমার দিব্যি! তুমাদের বিশ্বেস আচে...' কোমরে আঁচল বেঁধে পুকুর থেকে উঠে এসেছে আরো দুচারজন—'একবার ত ডেরা দিল তুমার ভাতার, মাথা ফাইট্রে ম'ল আমাদের মরদ। এখনে ফের কোন্ লতুন ফন্দি গ তুমার?'
চোখ মেলে তাকাতে পারে না শশিবালা। হেরে যাবার দুঃখে কান্না পায়। এ কেমন-কেমন চাউনি গ পড়শি স্বজাতির চোখে! অবিশ্বেসের বিষ। আরো উতলা, আরো চঞ্চল হয়ে ওঠে—'বিশ্বেস কর গ। তুমরা বিশ্বেস কর দশজনে। কোনো ক্ষেতি কত্তে আসি নাই তুমাদের। আমার রাখালের নামে দিব্যি গ জবার-মা। দিব্যি কর‍্যে বলচি গ, মায়ের মুখে মিছে বললে কুষ্ঠ হবেক গ আমার ছেল্যার...'
বিশ্বাস করে না কেউ। নাকের ডগায় ঝামটা মেরে জবার-মা পাশ কেটে যায়।

এ কী হাল হলো দেশের! শশিবালা পালিয়ে আসে।
মান গেল চৌকিদারের। এখন যে স্বজাতির ঘেন্না। গুখাকী দারোগাবুড়ো কত্তাবাবুরা আসলে কুড়ুল মারল কার সংসারে গ! কপাল কাটল কার!

চাষিপাড়ায় রাস্তায় ছুটতে ছুটতে হঠাৎ তার হুঁস—তখন কী বলল যেন মনি

মঁড়লের ঘরের ছুঁড়ি বৌটা। মাথা ফেটেছে ওর মরদের। মিছে কথা। মাথা ফেটেছে একজনারই এ গাঁয়ে। চন্দ্রধর মঁড়লের ব্যাটা অর্জুন। মরদের ব্যাটা মরদ। ডাগরডোগর একটা লক্ষ্মী বৌ আছে ছেলেটার। প্রথম পোয়াতী।
চলতে চলতে শিথিল পায়ে সে এগোয়। হাবান মাঝির ঘরের পেছনেই একটা ডোবা! ডোবার ধার ঘেঁষে বনজঙ্গল ডিঙিয়ে কটা ঘর এগোলেই চন্দ্রধরের ঘর।

উঠোনের ধারে, হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসেই তামাক টানছিল চন্দ্রধর। তাকাল আগুনে-চোখে

শেকড়বাকড় থেৎলে অষুধ দিয়েছেন বামুনপাড়ার জনার্দন কবরেজ। ছেঁড়া কাপড়ের ফেট্টি মাথায় বেঁধে ঘরের বাতায় শুয়ে ছিল অর্জুন। সাবিত্রী পাখার বাতাস বুলোচ্ছে শিয়রে।

শশিবালা ঢুকে পড়ল ঘরে—'এলম লা বৌ। ঘরে শাউড়ি নাই, দেখবাব জন নাই। লতুন পোয়াতী ··'
ঘোমটা টেনে সরে দাঁড়িয়েছে সাবিত্রী। অর্জুনও ঝামটা মেরে উঠে বসল রাগে—'চোকিদার ত বাহারের দেখচে গ স্বজেতের দশজনাকে। তুমিও দেইখতে বেইরেচ?'
'এমনটো বলবি নাই র‍্যা অজ্জুন। দশজনাকে নিয়ে সমাজ···'
'খুব যে সমাজ দেখাচ্চ গ।' জ্ঞাতিকুটুমেব ধান লুট হল মাঠে। ক-পালি পেলে বল দিকিন শুনি।'
ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল চন্দ্রধর। রাগের কাঁপুনি শিরায় শিয়ায়—'ঘর যাও না কেনে রাখালেব মা। ইখেনে কেনে? ঠ্যাঙারের লোক ঢুকবেক নাই আমার ঘরে। অকল্যেণ হবেক ·'
দরজার ভেতরে-বাইরে দৃশ্যমান দুজনই। দ্রুত ঘোমটা টেনে সরে দাঁড়াল শশিবালা—'একটা কতা তুদের শুধোতি এয়েছেলম র‍্যা অজ্জুন···'
তিনজনই চুপ।
শশিবালার ঘোমটা খুলে যায়—'চোকিদারকে দুষচিস কেনে র‍্যা বটে তুরা? দারোগাবুড়ো গুমস্তাবাবুর সনে গাঁয়ের কত্তাবাবুদের ষাট। ই ধান উঠচে সব তেনাদের উঠনে। রেতের আঁধারে সি ধান চালান যাবেক শ'রে। বারো ট্যাকা মণ র‍্যা অজ্জুন···'

অর্জুন অবাক মানে। তাকিয়ে থাকে শশিবালার দিকে।
দরজা থেকে সরে আসে চন্দ্রধর। সে পরপুরুষ।
ছেঁড়া বস্তা মাটিতে বিছোয় সাবিত্রী—'বস, বস না কেনে গ খুড়ি, বস এয়েচ গেরস্ত ঘরে…'

'কি গ খুড়, শুনেচ বটেক কী কাণ্ডটো…'
বাইরে কার কণ্ঠস্বর। সচকিত হলো ঘরের মানুষগুলো। বাতা ছেড়ে কাতরাতে কাতরাতে অর্জুনও উঠে এল।

বাইরের রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছিল পাঁচু মঁড়ল। চন্দ্রধরকে দেখে ভেতরে ঢুকেছে। এবং তার হাঁকাহাঁকিতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে আরো সব জ্ঞাতিরা। উঠোন ভরে মানুষ।
কাজেকম্মে কুটুমবাড়ি জামতলি গিয়েছিল পাঁচু। সেখানেই শুনে এসেছে খবরটা। বুকপাঁজরার হাড়কাঁপানি সে এক বেত্তান্ত—ক্রোশ চার দূরে হিজলপুরের মাঠে নতুন বগি তাডাতে তীর ছুড়েছিল সাঁওতালরা। মানুষ খেকো দারোগাসাহেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বন্দুকের গুলিতে দশ-দশটা লাস ফেলে দিয়েছে চোখের পলকে। গোটা দিন ধরে হুলুস্থুল। ঘর থেকে টেনে-টেনে এনে বেদম পিটিয়েছে গাঁয়ের নিরীহ লোকগুলোকে। বুড়োবুড়িবাচ্চা, এমন কি, মেয়েছেলেবাও নাকি বাদ যায়নি হুজ্জুতি থেকে। গাইবলদশুয়োরছাগল হাঁস মুর্গি ছেড়ে দিয়েছে সব। ঘরদোর আস্ত নেই কারও…
ভয়ের রাজ্যে ভয় বাড়ে। মড়কের মতো। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে, এক গাঁ থেকে আরেক গাঁয়ে। বোকাহাবা মানুষগুলো এ ওব চোখে চোখ রেখে গাছপালার দিকে তাকায়। আকাশের শূন্যে। কী যে সব হচ্ছে কোথায়! কী যে হবে শেষকালে!

গ্রামের পথে ধানের বস্তা মাথায় বয়ে এগোচ্ছে চন্দ্রধর। ঠিক তার পেছনে মাথায়-ফেট্টি-বাঁধা অর্জুনের পিঠে একই পেল্লাই বোঝা। সামনে পেছনে আরো অনেকেই। একই ভাবে কুঁজো-হয়ে-আসা মন্থরগতি ক্লান্ত মানুষেরা।
চলতে চলতে ভাঙতে ভাঙতে মানুষগুলো আরো খর্ব হয়ে আসে। ঘাম।

দীর্ঘ পথ-চলার ক্লান্তি অবসাদে, প্রতিটি পদক্ষেপে নিজেদের পায়ের ওপর প্রভুত্ব নেই আর। যেন নিজেদের অঙ্গ নয়, অন্য কারও।

ভেড়েণ্ডা-বেড়ায়-ঘেরা ঘরের সামনে ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তার ওপরই ধানের কারবার খুলে বসেছে তারিণী ভট্চায। জমজমাট হাটের সোরগোল।
লম্বা লম্বা বাঁশের আংটা বেঁধে পেল্লাই দাঁড়িপাল্লা ওদিকে নিমগাছের তলায়। সেখানে ধান মাপা চলছে। ব্যস্ত নাগাড়ে-কিষেনরা। আরেক দিকে সদর ঘরের দাওয়ায় মাদুরের ওপর খেড়ো খাতা আর হাতবাকশো নিয়ে বসেছে ভট্চাযমশাইর বড়ো ছেলে। সেখানেও ভিড়। টাকার হিশেব।
কোলাহলগুঞ্জনের ঊর্ধ্বে হুঁকো-হাতে তারুঠাকুরের ছুটোছুটি। ধমকধামক লাথি-খিস্তিহাঁকাহাঁকি।

অন্য প্রান্তে, পাহাড় মাথায় বয়ে ওদের বাপব্যাটার প্রবেশ।
কাঁধের বা পিঠের বোঝা সশব্দে মাটিতে ফেলে অথবা ফেলতে পেরে, যেন ধানের বস্তা নয়—নিজেদেরই সমর্পণ। দুমড়োন মোচড়ানো মানুষগুলো নিজেদেরই বস্তার ওপর হামলে পড়ে হাঁপাতে থাকে। গলগল ঘামের শরীরে হাঁ-করা মুখ আর ড্যালাড্যালা চোখগুলো অকস্মাৎ পাথরের স্থবির মূর্তি

কাঁধের বা মাথার কিড়ে-পাকানো গামছায় লোকগুলো চোখমুখগালগলাবুকের ঘাম মোছে। উঠে দাঁড়ায়। ভেড়েণ্ডা-বেড়ার পাশ দিয়ে এগোয়। সারিবদ্ধ ভাবে, একজনের অনুসরণে অন্য জন

কচুরিপানায় বিষাক্ত পুকুর। একপারে ঘোলাটে জলের একটা টাক।
ঘাট নেই। ওরা গড়িয়ে কাদায় নামল। মুখেচোখে জলের ঝাপটা সমবেতভাবে। গামছা ভেজায়।
দৃশ্যটা আরো ভয়ঙ্কর। দুহাতের আঁজলায় তুলে ওরা জল পান করল নির্দ্বিধ আকণ্ঠ তৃপ্তিতে।,

রাজার মুণ্ডুওলা রুপোর চাকতি এখন আর নেই বাজারে। সব কাগজ হয়ে গেছে। রাজার মুণ্ডুমার্কা কাগজগুলো গুনতে যাচ্ছিল বুড়ো নিশা কোঙার—

'ধানের এমন সুখ্যাত্ কুনকালে কুনো মানুষ শোনে নাই গ। জেবনে দেখে নাই। গোরাসাহেবের যুদ্ধু বড় পয়া…'

কোণ্ডারের মুখে সুখের হাসিটা ভালোভাবে উপভোগের আগেই চন্দ্রধর নাড়া খেল। ওদিক থেকে তারুঠাকুরের হাঁক—'কই র‍্যা চন্দর, দেরি করিস না, দেরি করিস না। বেলা চড়ে যেতে নেগেচে। নিয়ে আয় তুর ধান…'

যেন মরা-গাইবলদের শিং ধরে ভাগাড়ের দিকে টান। বস্তার দুদিকের দুটো কান দুহাতে পাকড়ে, মাটি হেঁচড়ে টানে চন্দ্রধর। টান-টান পিঠে দাঁতে ঠোঁট চেপে একই নিয়মে অর্জুন তার বাপের পিছু পিছু।

ধান উঠে যায় বামুনঠাকুরের গোলায়।

মাথায় ফেট্টি-বাঁধা ছেলের দিকে অবশ ভঙ্গিতে তাকাল চন্দ্রধর—'ধান আমি বেচতম নাই র‍্যা অর্জুন। কি কইরব? ঘরে আমার গভভোবতী মা…'

কাটা-মুণ্ডু রাজার ছবিটা গরিব মানুষের মুণ্ডু কাটতে শুরু করল দুদিন পরেই। আধাপয়সা বাজার থেকে উধাও। এক পয়সা ফুটো পয়সা হলো। কালেভদ্রেও চোখে-পড়ে-না সিকি আধুলি। এক-আনি দু-আনি কোথায় গেল সব!

গাজলির হাট হপ্তায় দুদিন। দুহপ্তায়ও বসে না একদিন। দোকানপাট খোলে না কেউ। পসারিরা আসে না। বিষাদের হাটে চন্দ্রধর তরাস দেখে মানুষের চোখে।

'দিনকাল কি প'ল গ! খাবেক কি লোকে! বাঁচবে কেমন কর‍্যে!'

বুড়িমাতলার জটলায় কথাগুলো উঠল।

'মরাই-এর ধানকাটা আটকে রাখ গ যদ্দিন পার। চাল কিনে খাওয়া চলবেক নাই ই বছর…'

'ফ্যানাভাত খাও গ। এক বেলা আধপেটা…'

'ফ্যানাভাত গিলব নুন কুথা গ। সি নুনও নিকি যুদ্ধুডাকু গিলতে লেগেচে…'

'তেলনুনের ফুট্নি রাখ দিনি সব। যত্তো বাবুয়ানির কতা। সোয়াদসোয়াস্তির-বালাই রাখ্তি নাই গরিবমানুষের জিভে…'

সুয্যি-গড়ানো বিকেলে সোনা-রং রোদ্দুর আর গাছের ছায়ায় গায়ে-গা-ঘেঁষে

মানুষগুলো পরস্পরকে জড়িয়ে যেন দলা পাকিয়ে থাকে হাটের গামলায় কই-মাগুরের মতো। কানে কানে ফিসফিস ফিসফিস। চোখে-চোখে ভয়ের কাঁপুনি—এমন দুদ্দিনে ভালমন্দ কতা কে শুধোবেক গ! আঁধারে পথ দেখাবার জন?

গাছে গাছে ঘরে-ফেরা পাখিদের চিৎকার বনময়!

একসঙ্গে নাড়া খেয়ে লোকগুলো কেঁপে উঠল সকলেই। দাঁড়িয়ে পড়ল।

দূরে চৌকিদারের ঢোল। আবার কোন্ মানুষ-মারা নতুন খবর গ! কোথায় কোন্ দূরের দেশের রাজা। তাঁর নয়া হুকুম!

সাঝের আঁধারে চৌকিদারকে গোল হয়ে ঘিরে কাচ্চাবাচ্চাবয়স্ক সবাই শোনে রাজার হুকুম—'সাইকল আচে গ কার? শুন…নৌকোশালতি ত নাই ইদিক-ভালে, গরুর-গাড়ি আচে কজনার? রাজাবাহাদুরের হুকুম—থানার যেয়ে নাম লেখাও, লম্বর লাগাও। অন্যথায় শাস্তি পাইবেক…'

ঘুটঘুট্টি নিশুতির রাতে যখন আকাশের তারা আর মাটির জোনাকি ছাড়া আলো নেই পৃথিবীতে, কেউ কোথাও জেগে নেই, শুধু দূরে দূরে শেয়ালের ডাক, মানকরের পাকা সড়কে কাদের গাড়িগুলো পর পর এসে দাঁড়ায় কালো কালো ছায়ার মতো। বন্দুক-কাঁধে সেপাই।

থমকে দাঁড়ায় গগন চৌকিদার। তার এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে লণ্ঠন। লণ্ঠনটা দ্রুত নিভু-নিভু করে মস্ত গাছের গুঁড়িতে আড়ালে লুকোয়। নিজেকেও আড়াল দিতে হয়। ছায়া-ছায়া কালো-কালো গাছপালার জঙ্গলে সে আরো একটা ঢ্যাঙা ফণিমনসা।

ওদিকে ঘন আঁধারে কারা বেরিয়ে আসে বনজঙ্গল থেকে? ভারি ভারি বস্তা পিঠে, সামনের দিকে ঝুঁকে কোমর-ভাঙা মানুষগুলো! কালো কালো ভূতের ছায়া!

চৌকিদারের বুক কাপে। লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে পালাতে চায়। বন্দুকের ভয়।

'কে যায় র‍্যা উদিক ভালে? কে? দাঁড়া…'

থমকে দাঁড়াল গগন। হাতের লণ্ঠন কাঁপে।

'কে? গগন নিকি? আয়, শোন ইদিকে, হারামজাদা…'

উপায় নেই। এগোতে হয়। রাজার নফরকে রাজার সেপাই ডাকে।

সেপাই নয়। ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা বন্দুক-কাঁধে সেপাইর পাহারায় কেদার কোঙার—'তুদের বড় বাড় বেড়েচে র‍্যা গগন।'

নিরিবিলি নিশুতির রাতে কেনে গ সুখের মানুষ? লাঠিলণ্ঠন ফেলে সাষ্টাঙ্গ পেন্নাম গগনের—'কেনে গ! ই কতা কেনে গ কত্তা?'

'বড্ড তেজ বেড়েচে বটে র‍্যা তুর বৌটোর। স্বদিশির কতা বলতে লেগেচে দশজনার কানে…'

করজোড় প্রাণভিক্ষা গগনের—'উ হাড়জ্বালানে মাগী আমাকে জেবনভর জ্বালায়েঁ মারল গ কত্তা। সি জানেন আপুনেরা…'

'জানিস, দারোগাবাবু জানলে, ঢুকলম লিখে দিলে তুর রাজার চাকরি…'

'ইবারের মতন মাপ করো্য দিন গ কত্তা। লাথি মেরে খেঁৎলে দিব উ মাগীর মুখ…'

ফিকফিক হাসেন কোঙারমশাই—'অঁ, মনে রাখবি কতাগুলান।'

রাতের আঁধার ভূতের রাজ্যি। প্রেতপেত্নীর খপ্পর থেকে প্রাণ নিয়ে বাঁচল চৌকিদার।

রাত ফুরোবার আগেই ঘরে ফিরল সে। চুপি চুপি নিঃশব্দে ডাকল বৌকে। বলল ভয়ে ভয়ে—আজ ভূতে পেয়েছিল তাকে। মস্ত ভূত।

পিচুটির চোখে পিটপিট তাকায় শশীবালা। চোয়াল ভেঙে লম্বা হাই—'এমনটো ভূত ত এখন পিতি রেতে দেখতে হবেক গ…'

চৌকিদার ভয়ে কাঁপে—'কিন্তু রাজার চাকরি গ রাখালের-মা…'

'ইদকে স্বজেতের ঘরে জ্ঞাতিকুটুমের সনে ভাব না রাইখলে যে ধোপানাপিত বন্ধ হবেক গ। সি আরেক জ্বালা। মরণ আমাদের…'

মরণ, মরণ! হাজার মরণ গরিব মানুষের।

পুকুরপারে ঘাট নেই। পেচ্ছল মাটি। পড়শিদের বৌ-ঝিরা ছিল ভাগ্যিস। হৈচৈ করে ছুটে এসে ধরল সাবিত্রীকে।

দিনে দিনে বাড়ে সাবিত্রী। ভরপেটের ভারে কাঁখে কলস তুলতে হেলে পড়ে শরীর।

সাতসকালে ঘরে ছিল না অর্জুন। গাইগরুর জাব সাজাচ্ছিল চন্দ্রধর। ছুটে এল।

ধরাধরি করে সাবিত্রীকে নিয়ে উঠে এসেছে মেয়েরা। মেটেঘরের ভোঁতা সিঁড়ি ভেঙে ঘরের বাতায় শুইয়ে দিতে দিতে দোষে বেআক্কেল বেটাছেলেদের। মগজটা আর স্থির রাখতে পারে না চন্দ্রধর। বেসামাল রাগে উঠোনের চারপাশে ছটফট ছটফট। দুনিয়ার তাবৎ মানুষকে গিস্তি।
হঠাৎ লেপটে বসে নিজের গালেই নিজের হাতে কয়েকটা থাপ্পড—মর চন্দর, মর। গলায় দড়ি দিয়ে মর। বুড়ি ম'ল ম্যালেরায়, অকালে কালে কাটল অমন তাজা জোয়ান ছেলেটোকে। বড় সাধ করে্য ছুট্টু ছেল্যার বে' দেচলি বটে র‍্যা! এখনে বৌটোকে খা···

তিনটে মেয়ের একটাকে শ্বশুরের ঘর থেকে আনতে চাইল চন্দ্রধর।
অর্জুন খেঁকিয়ে উঠল—'ই আকালে কুটুম আনবে সেধ্যে! রাবণের গুষ্টি বসে বসে গিলবেক দলা দলা ?'
'কিন্তুক বৌমা ?'

উঠোনের উনুনে শুকনো ডালপালা গুঁজে গুঁজে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে। মোচড খায় সাবিত্রী। বড্ড কষ্ট।

ঘরের কোণে বুনোমোষের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ গর্জায় অর্জুন। তেড়ে আসে গুঁতোনোর ভঙ্গিতে—'ই কোন্ আকালের শয়তান তুর পেটে র‍্যা ডাইনি। ই কোন্ লতুন শত্তুর ?'

নিজের কাঁপুনিতে লম্ফটা জ্বলে। পলতের ডগায় আগুনের লাল ফুল

হলুদ অগ্নিশিখা থেকে শেয়ালকাটার হলুদ ফুল। বেগুনে আকন্দ। ঝোপ ঝাড়। সবুজ ফড়িং-এর লাফ। রঙিন প্রজাপতি

ঝোপজঙ্গলে-ঘেরা জল-নিঃশেষপ্রায় শুকনো পুকুরে পোলো ফেলে বাচ্চাবুড়ো বয়স্ক নারীপুরুষের প্রাণান্ত শ্রম। খেলা নয়, দুটো-একটা মাছের খোঁজে উন্মত্ত প্রয়াস। নিদেন শামুক গুগলি

পুকুর থেকে গনগনে বোশেখজষ্টির দুপুরে খরার শূন্য মাঠ। চড়চড়ে আগুনে পুড়ছে মাটি। মাটিতে মাটিতে অসংখ্য ফাটল

খরার শূন্যতা থেকে অতর্কিতে শিশুর কান্না
হেলে-পড়া ভাঙা-ঘরের দাওয়ায় ক্রন্দনরত পিলেসর্বস্ব কঙ্কালসার দুই উলঙ্গ শিশু। মধ্যবর্তী প্রায়-বিবস্ত্রা মা শান্ত নির্জীব। পাশেই তকতকে নিকোনো উনুন, উপুর-করা মেটে হাঁড়ি। আঁচ পড়েনি কতকাল
পাথরের মা সহসা চামুণ্ডা চণ্ডী। মুমূর্ষু বাচ্চা দুটোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথারি কিলচড়ঘুসি, শাপান্তির আর্তনাদ

আকাশবাতাস মথিত করে প্রতিধ্বনির বিপুল বিস্তার
চকচকে কাটারি-হাতে ক্ষিপ্রতায় ছুটে এল পুরুষ
সন্তানদের বুকে আগলে হাঁড়িকাঠে আত্মসমর্পিত মা। কান্না চিৎকার সব ছাপিয়ে উচ্চকিত তীক্ষ্ণ বলির বাজনা

শ্রুতিপীড়ক ঢাকের বাজনার আবহে নিজের ভদ্রাসনে কালীমন্দিরের বারান্দায় কার্তিক মুখুজ্জে। সহাস্য বৃদ্ধের পশ্চাতবর্তী বিগ্রহ দৃশ্যমান।
নিচে সোনারুপো কাঁসাপেতল হাতে নিয়ে কাতারে কাতারে গ্রামবাসী। মধ্য-চাষি গৃহস্থরাও অনেকে।
মুখুজ্জের ডানে-বাঁয়ে দরদস্তুরের হাঁক পাড়ছে সেয়ানা দুভাই· মধ্যবর্তী হাত-বাকশো আর জাবদা খাতা নিয়ে টাকা গুনছেন, হিশেবের অঙ্ক কষছেন অগ্রজ। মত্ত উৎসবে বড়োই ব্যস্ত

উচ্চনাদ ঢাকের বাজনায় একই দৃশ্য কেদার কোঙারের দরজায়।
সবৎস গাভী নিয়ে এসেছে খাতক। মহাজন মৃদু হেসে অবোলা জীবদের ভেতরে চালান করে দিলেন। বিনিময়ে দু-পালি চাল

বলির বাজনায়, একই দৃশ্যে ভিন্ন ভিন্ন মুখের ব[illegible]স।
তারিনী ভট্চাযের সদরে কাঁসাপেতল সোনাদানা বিকিকিনিবন্ধকীর হাটে মলিন বিবর্ণ মানুষের ভিড়ে সদগোপ পাড়ার রমেশ হালদারের মুখোমুখি চন্দ্রধর।

বিস্ময়ে ঠিকরে পড়ছে চোখ— 'সিদিন যে আমায় বীজতলা গইড়তে ধান দিলেন গ কত্তা ?'
সঙ্কোচে গ্লানিতে নত রমেশ হালদার হঠাৎ, ধুতির খুঁটে চোখ মুছতে চেয়ে থরথর কাঁপুনিতে লেপটে ব'সে পড়ল মাটিতে। মুঠো থেকে খসে যেতে-যেতেও আঙুলের ডগায় একটা সোনার হার ঝুলতে থাকে—'বীজের ধান মাঠকে ফিরিয়ে দিয়ে যে এখনে আমার মরণ র‍্যা চন্দর ..'

জষ্ঠি ফুরিয়ে আষাঢ়। কালচেপানা খড়ের চালা গড়িয়ে রুপোলি চিকের পর্দায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত। খানাখন্দ, আড়াল-আবডাল থেকে ব্যাঙের চিল্লানি।
চিকের ওপারে, শুকনো দাওয়ার আলোআঁধারিতে মাটিতে লেপটে বসে সাবিত্রী। খুঁটি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অর্জুন।
দাওয়ার কোণে চন্দ্রধর তামাক টানছিল। উঠে এসে দাঁড়াল খুঁটিব পাশে। বৃষ্টি আর আকাশের দিকে চোখ—'আকাশেব শুন্তিতে কুথাকে থাকে গ এত জল! মাটির শুন্তি থেকে বছর-বছর সোনার ববণ মা-লক্ষ্মীর দানা, শীতের শুকনোয় কলাই-মুসুর আলুপেঁয়াজের হরেক ..'
শুধু বৃষ্টিরই ধ্বনি। ছেলে ছেলে-বৌ নির্বাক।
চন্দ্রধর ঘুরে দাঁড়াল। যেন আপন মনেই আবার— 'মাটির শুন্তি আর আকাশের শুন্তিতে যদি এত রয়স্ত গ ভগমান, পেটের শুন্তিতে কেনে গ এত জ্বালা ..'

মাঠে মাঠে এবারও নেমেছে চাষিরা। আষাঢ়-শ্রাবণের মাঠ, এক প্রসবের পর নতুন ঋতুমতী যুবতী বৌ-এর মতো আকুলিবিকুলি ডাকে।
চিমসে পেটের জ্বালায় ভাঙা-গতরে নেমেছে অর্জুন, নেমেছে চন্দ্রধর। নোয়াপাড়ার মাঠে নিজের এক বিঘে চার ছটাকি জমিতে ছেলে, আরেক প্রান্তে তপ্‌সের মাঠে ভাগের জমিতে বাপ।
দু-লাঙলের পর জমির কাদায় মই ছোটাতে গিয়ে প্রাণান্ত অর্জুন। তেড়ে ছুটছে দুটো তাগড়াই বলদ। ওদের সামাল দিতে যেন সে সত্যি-সত্যি অর্জুন। কুরুক্ষেত্রে মহারণ। জোড়া বলদের সঙ্গে পাল্লায় টগবগিয়ে ছোটে রক্ত। আকাশমাঠের দিগন্ত কাঁপিয়ে চিৎকার পাগলের মতো। শোনায় পাশের জমির চাষিকে— 'ই আকালে মাথাটো ফাটল ত আর-বছরে পিতিশোধ। ধান লুইটতি আসবেক ত মাথাটো ফাটাই দিবেক হারামি গুমস্তা বুড়র...'

আরেক দিগন্তে লাঙল ঘোরাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল চন্দ্রধর। যেন, জীবনে প্রথম অনুভব—বুড়ো হাড়। গতর আর চলে না। বারবার হেরে যাচ্ছে হাড়গিলগিলে দুই জানোয়ারের কাছে।
হাঁটুর কাছাকাছি অবদি পা ডুবে যাচ্ছে কাদায়। ঠাণ্ডার কামড় থেকে পা তুলে তুলে নতুন করে পা ফেলতে প্যাকপ্যাক শব্দ। টলে টলে পড়ছে শরীর। হাতের মুঠোয় লাঙলের টিপ্‌নি ঠিক থাকে।
'হুই, হুই হ্যাখ গ উদিক ভালে। হ্যাখ হ্যাখ...' কে যেন চিৎকার করে উঠল দূরে। প্রতিধ্বনি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।
চন্দ্রধর চমকে উঠল। তাকাল আশেপাশের জমির আর-সব চাষিরা।

দূরে মানকরের পাকা সড়কে সারি সারি মানুষের যাত্রা। দলে দলে বাচ্চাবুড়ো মাগীমদ্দা। ভাগে ভাগে ছিটোন অনেক মানুষ।

হাল ছেড়ে, হাঁটু-কাদায় থপথপ পা ফেলে চন্দ্রধর এগিয়ে এল কিছুটা। দুদাগ পরের জমিতেই ছিল এরফান। হাঁক দিলো সেদিকে— 'কী গ! বলি হল কী? ই আবাদের কালে জোতজমি ছেড়্যে এত্ত লোকে যেছ্যে কুথাকে?'
'কোন্ মুলুকের লবাব বটেক গ তুমি? দিনকাল কি পড়্যাচে বুঝ নাই? পেটের লাড়িতে খামচি খেচে গ। কলকাতা যেছ্যে সব্বায়। উখেনে লঙরখানা খুলেচে সরকার...'
লঙরখানা! আকাশমাঠের বিপুল দিগন্তে তাকায় চন্দ্রধর।

এক ঝাঁক বালিহাঁস মেঘের শূন্যে।

উদোল গায়ে টিপটিপ বৃষ্টি। জলেকাদায় ভ্রূক্ষেপহীন টোকা-মাথায় মানুষগুলো। যারা মই ঘোরাচ্ছিল অথবা চারা রুইছিল কিষেণীদের পাশে পাশে, জমি ছেড়ে উঠে এল। জড়ো হতে চাইল গায়ে গায়ে ঘনিষ্ঠতায়। কিষেণীরা একটু দূরে, ভিন্ন জটলায়। সকলেরই চোখ মানকর সড়কের দিকে।
জোয়ানমরদ দুচারজন এগোতে থাকে সড়্‌টার দিকে। দুঃখুঅশান্তির দুচারটে কথা শুধোবে মানুষগুলোর সঙ্গে। যাচ্ছে কারা? কোথায় ঘর, কোন গাঁ? কলকাতা কদ্দুর? লঙরখানা কেমন?

'ঘরটো আগুনে কি আর আমরাই থাইকতে পারব গ! দুটো দিন বাদেই ত চাষের কাজকাম ফুরোবেক?' ভিড়ে জটলায় বুড়ো এরফানই কথাটা তুলল প্রথম—'চাষটো ছেল, তাই গোলাদের আদরটোও ছেল।'
'বেইমান, হারামি শালারা! কাজের বেলা কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি...' বলল কেউ একজন— 'অ্যাদ্দিন চাষ ছেল, জলখাবার ছেল, খোরাকি ছেল একবেলা। এখনে হারামি মালিকগুলান কি বলতে লেগেচে শুনেচ গ?'
আরো ঘন হয়ে মেঘ জমছে মাথার ওপর। জলের তোড় আরো বাড়ছে। উদাস-উদাস চোখগুলো জলভরা আকাশমাঠে বোবা।
'আর-বছরে ধান উঠল ত লুটে লিলেক বাঞ্চোৎগুলান। ভাগের ধানটো ফাঁকি মারলেক। এখনে বলচে দাদনটোও দিবেক নাই...'
'বেপদে আপদে ধারকজ্জ দিবেক নাই ত লোকে খাবেকটো কী? ই কেমন কত্ত বল দিকিন...'
'শাকপাতা খেছ্যে গ মানুষ। নুন নাই, তেল নাই, চুলা ধরাবেক ত আগুনটোও নাই। কি যে মরণটো হল। গাইবলদছাগল জানোয়ার বন্যে গেল সব্বায়...'
'চাল নাই গ বাজারে। কাপড় নাই। বিটিছিলাদের সরম ঢাকবেক কি করো?
'গাজালির হাট বন্ধ আজ দেড় মাস। দুকান খোলে না গাঁয়ের কত্তারা...'
'মরণ গ, মরণ গরিবমানুষের...'
'এমনটো দুদ্দিনে দুটো কথা শুধোবেক, মানুষ নাই গ দেশে...'

আপ্লুত বর্ষা।
জটলা ভেঙে যে-যার মতো ছড়িয়ে যায় নিজেদের কাজে। কাজ তুলতে হবে।

আকাশ ছেপে জল। মাঠঘাট ভাসিয়ে শ্রাবণের বৃষ্টি। জগৎ আঁধার।
জলে জলে ঝাপসা মাঠ আর আকাশের দিগন্তে দুচোখ মেলে হাঁপাতে হাঁপাতে যখন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, চোখ খুলে আর দেখা যায় না ধোঁয়াটে মাঠ, পাঁজর-ভাঙা কাশিতে কাশিতে হাঁচিতে প্রাণান্ত চন্দ্রধর দুহাত মাথায় রেখে জলে-কাদায় দাঁড়িয়ে পড়ল স্থির। জোয়াল-কাঁধে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে বলদদুটো। একটা শাদা বক এসে বসল লাঙলে। হুঁস নেই। যখন আর দাঁড়িয়ে থাকাও সম্ভব নয়, লাখো লাখো ছুঁচের ফোঁটায় মরে যাচ্ছে, হঠাৎ যেন সে এক শক্ত-প্রাকৃতিক বৃক্ষ, হাজার জলঝড়েও যে কাঁপে না কখনও। কাঁদে না।

রাতের আঁধার। একটানা ব্যাঙের-ডাক আর ঝিঁঝিরব আর লক্ষ লক্ষ জোনাকিরা ছাড়া নক্ষত্রহীন বাদলারাতের অন্ধকারে যখন অন্য কোনো ধ্বনি নেই, দৃশ্য নেই পৃথিবীতে, প্যাকপ্যাক কাদায় শব্দ তুলে কে এসে দাঁড়াল উঠোনের ধারে—'কুথা র‍্যা চন্দর…'

চন্দ্রধর বেরিয়ে এল। ভূতের ছায়া ফেলে লণ্ঠন-হাতে তারুঠাকুর।

'তপ্‌সের মাঠে দাগ লম্বর একশ সাতাশের জমিটো র‍্যা চন্দর, বমেশ্বার ছেল। এখনে আমার বটেক র‍্যা…'

চন্দ্রধর নির্বাক।

'তা জমিটো তুই কচ্চিস, কর না কেনে। একটোই কডার বটে র‍্যা, একটোই কতা—তুর জমিটো তুই ছাড়বি য্যাখন, আমাকেই লিখে দিবি উটো…'

'উ জমি আমি ছাড়ব নাই গ কত্তা। টেপসই দিব নাই…'

'দিবি, না দিয়ে যাবি কুথাকে র‍্যা মুখ্যু। তিন বিঘেটাক জমি, তাইতে এত গুমোর…' অন্ধকারে দৃশ্যমান নয়, তবু, খ্যাকখ্যাক হাসিতে চেনা যায় তারুঠাকুরের মুখ—'আকাল র‍্যা, দেশ জুড়ে আকাল। লোকে ঘরের মাগবাচ্ছা বিকোচ্চে পেটের টানে! তুই বলছিস জমি…'

'না আ আ আ…' সাপের মুখে ব্যাঙ পড়লে যেমন, একটা বিকট গোঙানি গোঙায় চন্দ্রধর। ছিটকে গিয়ে আছড়ে পড়ল দাওয়ায়। দাওয়ার ধারে খুঁটি ধরে চিৎকার—'বাপঠাকুদ্দায় রেখ্যে গেচেন মাটি। উ আমার দেবোত্তর গ। উ আমি বিচব লাই…'

আকস্মিক চিৎকারে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে অর্জুন এবং পড়শিরা

তারুঠাকুর পিছোয়—'অ্যাঁ, ভাবুটি দেখ কেনে? দেবোত্তর? দেবোত্তরের তুই কি বুঝিস র‍্যা? বামুনকে দেবোত্তর দেখাতে এসচিস?'

ঝিঁঝি আর জোনাকির রাতে ফিরে যাচ্ছে তারুঠাকুর। মানুষটা নেই। থিকথিক আঁধার রাতে লালচে লণ্ঠনের আলো মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

কাছেদূরে শেয়ালেরা ডাকে।

উচ্চনাদ শৃগালরবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, দিনদুপুরে, গৃহস্থঘরের দোরে এক দঙ্গল বুভুক্ষু নারীপুরুষের আর্ত চিৎকার।

রয়ে আসে। হতশ্রী মুখেচোখে, ছিন্নবস্ত্রে যারা আরো বেশি অসহায়।

'আপুনাদের জমি চাষ কইরতে কইরতে আমাদের গতরের হাল এমনটো হল্ল গ কত্তা…'

'শামুকগুগ্‌লি ঝিনুক শালুকপাতা ঘাস খেইয়েঁ খেইয়েঁ পেটটোতে কড়্যা পড়্যে গেল। সি-ও জুটচে নাই গ। ঘাসপাতা কচুও বাড়ন্ত জঙ্গলে…'

প্রার্থী কাঙালদের হল্লাচিৎকারসোরগোলের মধ্যে বেসামাল বাবুমশাইরা। কণ্ঠস্বরগুলো খাটো হয়ে আসে— 'তোরা ত তবু ভিক্ষেয় নেমেচিস র‍্যা আমাদের আগে। সি ত আমাদেরকেও নামতে হবেক। ঘরের সোনাদ্যানা ঘটিবাটি গাইবাছুর সব ঘুচুঁয়ে দিয়েচি। এখন জমিও যেচ্ছ্যে যে আমাদের। কদ্দিন আর পাইরব মানটো রাখতে…'

কান্নাচিৎকার আছাড়িবিছাড়ির মধ্যে কোথাও হদিস না পেয়ে বেহুঁস মানুষগুলো, যখন আর আদর নেই, দয়ামায়া সোহাগ নেই, সমান দুঃখে মিলেমিশে দলা পাকিয়ে যায় নিজেদের মধ্যে—'ই কি আকাল পইড়ল গ! কেমনে বাঁইচবেক মানুষগুলান?'

'বাঁইচবেক নাই। কেও বাঁচবেক নাই…'

হামা দিয়ে উঠে আসে কাতারে কাতারে কালো-কালো ন্যাংটো লোকগুলো। ভগবানপাড়ায় যাবে।

গোটা গাঁয়ে তখন দুচার ঘর দেবতা। লাঠিসোটা নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের সদর রাস্তায় কাঙালমানুষের ভিড়। জনতার মাথার ওপর খাঁড়ার-চোখে ভয়ঙ্কর কেদার কোঙার।

'আপুনেদের ঘরে গরম ভাতের বাস গ কত্তা। টুগদু ক্যানা খ্যান, টুগদু নুন…'

'শুধু ক্যানায় কুলোয় না, নুন চাই বাবুদের! ই কি দানসত্তর নিকি? ভাগ্‌ ভাগ্‌ মুখপোড়া।'

'লুকুইয়েঁ লুকুইয়েঁ আপুনেদের ঘরে, আপুনেদের কজনার ঘরে ভাত ফুটোনো চলে। বাঁশবনের ধারে দুবেলা হাইগতে যায় আপুনেদের ঘরের বৌ ঝি বাচ্ছারা। আমরা দেখি গ…'

কোথায় বন্দুকের আওয়াজ। থরথর কেঁপে ওঠে লোকগুলো।

গাছপালার ডগায় উড়ে যায় ঝাঁক-ঝাঁক পাখি।

পেল্লাই ভারি একটা মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক হাতে চেপে ক্রুদ্ধবিক্রমে তাড়া করছে কেলো সামন্ত।
প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে আরো একদল কঙ্কালসর্বস্ব মানুষ

জলার ধারে হামলে পড়ে অসংখ্য মানুষ। বাছবাছাই নেই। ঘাস তুলছে, জলাজংলা আগছা উপড়োচ্ছে উন্মাদ মত্ততায়

ঘরের দাওয়ায় কাঁদছে নিঃসঙ্গ শিশু

শেয়ালের মতো মাটি আঁচড়াচ্ছে মেয়েরা। হঠাৎ একটা কিছু আবিষ্কার একজনের। কচু। হামলে পড়ল সবাই। কেড়ে খাবার আক্রোশ

নিঃসঙ্গ দাওয়ায় শিশুর মৃতদেহ

এক গোছা প্যাকাটির মুখে আগুন জেলে সাবধানে এগোচ্ছে একজন। আগুন, যেন পরমসম্পদ

লকলকে সাপের জিভ যেমন, মুখে আগুন নিয়ে প্যাকাটিরা এল
উনুনের পাশে বিষণ্ণ চাষি-বৌ। শুকনো পাতায় আগুন। মেটেহাঁড়িতে ঘাস

প্রাচীন বটের নীচে তেলসিঁদুর-মাখা আদ্যিকালের রক্তবর্ণ পাথরকে সাক্ষী রেখে ঘাস চিবোচ্ছে তিনকালখেকো বুড়ি
গলগল গলগল প্রাণান্ত বমি

মাটিকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে, প্রাচীন বটের কঠিন শিকড় যেমন, মাটিতে একজোড়া শক্ত পা

'ছিন্নিছাদ-নেই, হাজাকাটায় ফাটল-ধরা ধুলোকাদার পা থেকে ঊর্ধ্বে উঠে চন্দ্রধর সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। পাথর

উঠোনের অপর পারে জ্ঞাতিভাই অথবা জ্ঞাতিশত্রু শ্রীমন্ত মঁড়ল ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। তেলচিটচিটে কাঁথাবালিশ মেটে হাঁড়িকলসি কোদালশাবল-কাটারি সব কিছুর সঙ্গে বৌ, তিন ছেলে ছেলে-বৌ নাতিনাতনী বুড়ি-মা সকলের সঙ্গে বাপঠাকুদ্দার ভিটের বাইরে বিষন্ন শ্রীমন্ত

উঠোনের বাইরে ভাগে ভাগে বিছিন্ন মানুষেরা চলেছে মিছিল সাজিয়ে। প্রতিটি ভাগে এক-একটি পরিবার। সকলেই চেনামুখ। জন্মসূত্রে লব্ধ পাড়াপড়শি স্বজন স্বজাতি
চাষিপাড়া শূন্য হয়ে যাচ্ছে

উঠোনের মাটিতে হাঁটু-ভেঙে-বসে বেহুঁস অর্জুন। তারই পেছনে, ঘরের দাওয়ায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে সাবিত্রী
উঠোনে পড়ে আছাড়িবিছাড়ি কাঁদছে শ্রীমন্তর বৌ, শ্রীমন্তর বুড়ি মা। বিহ্বল শোকদৃশ্য
শ্রীমন্ত এগিয়ে এল— "না খেয়ে-খেয়ে আর ত চলচে নাই গ দাদা। বলচে সব্বায়, শ'রে গেলে ই যাত্রা বেঁচ্যে যাবেক লোকে। ঘরদোর রইল গ দাদা। দেখো একটু। যদি ফিরি ত…'
তখনও পাথর চন্দ্রধর।
'তুমি রাজা লোক গ দাদা। জোতজমি আচে তুমার। আবাদ কল্লে সি জমিনে, গাই গরুটো বেচ নাই…'
জ্ঞাতি পড়শিদের দুঃখতাপের আবহে চন্দ্রধর কাঁপে না তথাপি
শ্রীমন্ত: 'আট মাসের পোয়াতী বৌটোকে নিয়ে গোপাল গড়াই কাল গেইচে শ'রের লঙরখানায়। আজ লটবরের বৌটো গেল টুকচান আগে। মাস পাঁচেকের হবেক··
তথাপি, যেন বাতাস নেই স্তব্ধ গুমোটে, চন্দ্রধর নিষ্কম্প বৃক্ষ
'তুমার ঘরেও ত পোয়াতী বৌ গ দাদা। ভালয় ভালয় থাক। কাত্তিক ঠাকুরের মতন লাতি হক তুমার। বেঁচেবত্তে থাকুক…'

বোঁচকাবুঁচকি মাথায় বয়ে উঠোন ছেড়ে যাচ্ছে শ্রীমন্ত মণ্ডলের সংসার। চোখের জলে, নীরব দৃষ্টিতে ফিরে-ফিরে তাকায় সবাই। জন্মের-জন্মের ভিটেয় বধিরতা। ওরা রাস্তার জনতায়, আরো একটি উদ্বাস্তু পরিবারের মিছিলে মিশে যেতেই

চন্দ্রধর কাঁপল। ছুটে গিয়ে উঠল ঘরের দাওয়ায়। ঢুকল ঘরের ভেতর

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অর্জুন দমকা হাওয়ায় ছুটে গেল শ্রীমন্তকাকার পরিত্যক্ত ঘরে। উঠোনের দুদিক থেকে দুজন, মুখোমুখি, বিপরীত ঘরে একই সঙ্গে তীব্র বেগে।

প্রায়ান্ধকার ঘরে বাতার নিচে মাথা গলিয়ে দুটো ফাঁকা বস্তা টেনে আনল চন্দ্রধর। আধা আধি নিঃশেষ-প্রায় শূন্যতা
নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সাবিত্রী। বাতার তলায় যেখানে হামা দিচ্ছে শ্বশুর।
'ই কটা ত চাল আচে গ বৌমা। কদিন চইলবেক
দাঁতে আঁচল চেপে কান্না আগলায় সাবিত্রী।
'ঘরে চাল বেখ্যে আজ ভাত খাই নাই ব্যা কদ্দিন। পাল্লাইছে শালারা। আর ভাত বাঁধবি তুই…'
'চাষিপাড়ায় এখনও ত দুচার ঘর আচে গ বাপ …'ভেজা গলায় বলে সাবিত্রী।
'কিন্তুক জেসলাই নাই ঘরে। এক টুসটি আগুনও নাই কুথাও…'
'হা ভাতে শ্যালকুত্তাগুলান ছুট্যে ছুট্যে আইসবেক। উপস করে্য করে্য জ্বলচে যে পেট ·' কাঁধের ছেঁড়া গামছাটা মাটিতে ছড়িয়ে বস্তাটা চন্দ্রধর আরো একটু কাছে টেনে আনে। শূন্য-প্রায় বস্তার কোণ ভাঙে বৃত্তাকারে, দ্রুত হাতে, ব্যস্ততায় দুহাতের আঁজলায় চাল তোলে পাগলের মতো। গামছায় গুনে গুনে তিন আঁজলা চাল। পুটলি বাঁধতে গিয়ে ছেঁড়া গামছার খুঁট গুঁড়িয়ে পড়ে। সেখানে তাপ্পি আঁটতে হয়।
'ই চাল নিয়ে কুথাকে যাবেন গ আপুনি
'চাল কটা ফুটুয়েঁ আনব বামুনবাড়ি থিক্যে…'
সাবিত্রী আঁৎকে উঠল— 'বামুনবাড়ির উনান ছুঁতে দিবেক কেনে আপুনেকে।'

চন্দ্রধর উঠে দাঁড়াল। উঠতে গিয়ে প্রথম অনুভব—চাল বোঝাই আর চাল-বাড়ন্ত' বস্তার কারাক। পেটে পিঠে এক হয়ে যাচ্ছে শরীর। বড়োই দুর্বল।

চালের পুটলি বুকে চেপে চন্দ্রধর উঠোনে নামল।
শ্রীমন্ত খুড়োর পরিত্যক্ত ঘরদোর খুঁজে খুঁজে এককালি ছেঁড়া-চট, একটা চলতা-ওঠা ভাঙা এনামেলের বাটি, কয়েক টুকরো ছোবরার-দড়ি হাতে নিয়ে ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে অর্জুন।
অনাবশ্যকগুলো উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে, অনেকটা চতুর কাঠবেড়ালির মতো' অর্জুন শ্রীমন্ত ঘরের চালায় তড়তড়িয়ে উঠতে চায়।
'কেনে উঠচিস উথেনে? উপসী শরীলে পারবি নাই…'
'ঘরে ত পেলম নাই কিছু। ই খড়গুলান ত আচে। গাইবলদকে খাওয়াব…'
'তিন সনের পচা খড়। গাইও ছোঁবেক নাই…'
'তলার দিকটোয় খড় থাকে ত দেখব। লয় ত বাঁশগুলান আচে। বাবুদের থানে বিচব…'
'বিচবি? পরের ঘর! বলিস কি র‍্যা তুই। ই দুদ্দিনে তুইও জানোয়ার হয়্যা গেলি র‍্যা অজ্জুন…' একই সঙ্গে ক্রোধ আর বেদনায় অস্থির চন্দ্রধর—'
'উদেরটো বিচবি তুই! যখন উরা ফিরো্য আইসবেক…'
'আইসবেক নাই…'
'কেনে? আইসবেক নাই কেনে?' যেন জলবিচুটির জ্বালা। দাউ দাউ জ্বলছে চন্দ্রধর— 'ই সব অলুক্ষুণে কতা বলবি নাই। সাবুধান। চাপড়ে দাঁতকটা ফেলো্য দিব র‍্যা শুয়ার…'
যেন কেউ নেই আশেপাশে। উঠোনের একমাত্র মানুষ চন্দ্রধর আপন মনেই বেহুঁস উদাস— 'স্বজন স্বজ্জেত নিয়ে ঘরদুয়োর চায আবাদ সুখদুখের সন্সার। বেইমান বলে কিনা, ফিরবেক নাই কেও। জম্মো-জম্মো ধর্যো এক ঠেয়ে বাস। সোন্দর গাঁ-টো শ্মশান হইয়ে যাবেক এমনি কর্যে? মা-বিশেলাক্ষীর থানে পুজোপাব্বন আর হবেক নাই বলচিস র‍্যা মুখ-পোড়া…'

শ্রীমন্তর ভাঙা ঘরের চালায় অর্জুন হামা দিচ্ছে তখন। অনেকটা আপন মনেই— 'তুমার বৌমার জইন্যে একটো শাড়ি লাইগবে গ বাপ। ই আবাদের কালে কেনা হয় নাই একটোও। বিটি ছেল্যার এজ্জৎ…'

চন্দ্রধর: 'সি আর কিনবি কুথাকে র‍্যা এখন। গাঙ্গলির হাট বন্ধ কমাস। ল্যাংটো পাছায় দিন ডুকুরে বস্তে থাক পিটি...'

গাছগাছালির ফাঁকে, দূরে, প্রান্তর প্রান্তর জুড়ে ঘন সবুজের মাঠ। ওই, ও। কারা যায়! এখনও মিছিল। চন্দ্রধর এগোয়। যেন দিনদুপুরে নিশির টান।

দিগন্ত-দিগন্ত-জোড়া সবুজ মাঠের কেন্দ্রে পিপীলিকাস্বভাবে একজনের পর একজন মিছিলের মানুষ। নিজেদেরই শ্রমেঘামে আবাদী মাঠের আলে আলে অলৌকিক যাত্রা।
বুকের হাঁপরে দীর্ঘশ্বাস চন্দ্রধরের!

অনন্ত আকাশে এক ঝাঁক শাদা বালিহাঁস।

তারিণী ভট্চাযের সদরে গাঁয়ের হরেক মানুষ। সোনাদানা কাঁসাপেতল রেখে জনে জনে অনেককে টাকা দিয়েছেন তারুঠাকুর। এখন জমি। চাষাভুসোরা কেউ নেই। সবাই শহরে লঙরখানায়। এখন গেরস্তরা। টিপসই কম, দোয়াতে কলম ডুবিয়ে কাগজে দস্তখত।

'একটু পেসাদ পাব গ কত্তা ··' আড়ালে ডেকে চন্দ্রধর বলল কথাগুলো। কানে কানে ফিসফিসিয়ে—'ই চাল কটা ফুটুয়েঁ দিবেন গ আপুনেদের হাঁড়িতে...'
মেদ-থলথল তারুঠাকুর হুঁকোয় ঠোঁট গুঁজে গুরগুর দিলেন গোটাদুয়েক। কুতকুতে চোখে হাসি—'ই চাল তুই কুথাকে পেলি র‍্যা! চুরি না ড্যাকাতি...'
'না, না গ ঠাকুর, ধম্মো। ধম্মো কর‍্যে বলচি...'
'ধম্মো!' খিকখিক হাসেন বামুনঠাকুর। উদোল বুকেপেটে মোটা সুতোর গোছ কালচে পৈতে—'ই আকালে ধম্মের কতা কোস। ধম্মো কুথা র‍্যা! যা যা, রেখে আয় ভিত্‌রে। মাঠাকুরুণকে বল হাঁড়িতে ফেলে দিবেক।'
'আরেকটো কতা গ ঠাকুর...'
'বল্...'
'ক্যানাটো ফেইলবেন নাই গ কত্তা...'

'সিটো হয় না...' খিঁচিয়ে উঠলেন তারুঠাকুর—'সব কি তুই একা খাবি নিকি র‍্যা! অ্যাঁ! গাঁয়ের আর দশটো লোককে দেইখতে হবেক নাই? হুঁ, শোন্, আয় ইদিকে...'
গুটি গুটি এগোচ্ছিল চন্দ্রধর। থমকে দাঁড়াল।
'লে, উ টামনাটো লে। দুটো মাটি ফেলে আয় দিনি পুকুরেধারের বাঁশতলায়।'
চিমসে পেটে জ্বালা বাড়ে। কাতরায় চন্দ্রধর। শকুনি-বুড়ো সুযোগটা নেবে, সে জানত। বিনিখোরাকি বিনিপয়সায় হারামিকে গতর দিতে হবে।

এবং যখন উপায় নেই, টামনাটা টানতে টানতে, কাতরাতে কাতরাতে বাঁশঝাড়ের আলোছায়ায় এসে চমকে উঠল। সেখানে বাগদীপাড়ার খুনে-ডাকাত দুর্হ্ বাগদী আরো একটা টামনা-হাতে। ব্যাটা শহরের হাজতে ছিল ক-বছর।
'তুই?'
সেই দুর্হ্ আর নেই। শুকোতে শুকোতে হাড়ে-চামড়ায় লেপটানো শরীর। হাতের টামনা ফেলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এল। ড্যালড্যালা ভয়ঙ্কর চোখজোড়া—'ই বেলার ভাতের ফ্যানাটো আমি লুব। টুকচান নুন দিবেক বলেচে বামুনকত্তা। তা তুমি কেনে ভাগ বসাইত্তে এলে গ খুড়!'
ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে চন্দ্রধর। কিছুটা বুড়ো হলেও, দুর্হ্র চোখজোড়া আঁধার রাতে ঠ্যাঙারের ক্রোধ। সতর্ক তাকিয়ে থেকে শান্তভাবে—'আমি ফ্যানা লুব নাই।'
'ফ্যানা লিবেক নাই ত মাগনা খাইটতে এয়েচ?'
শক্ত হাতে টামনাটা চেপে ধরতে চায় চন্দ্রধর। লোকটা ভীষণ হয়ে উঠছে এবং কাছেপিঠে কেউ নেই। সে একা। বাঁশবনের ঝিরঝিরে বাতাসে, ফোঁটা-ফোঁটা রোদের নকশায় বাহারের কাকের ডাক।
'ফ্যানা লিবে নাই! ট্যাকা লিবে? তুমাকে ট্যাকা ছোঁয়াবেক উই রক্তচোষা বুড়?'
এবং তখন, এককালের খুনে-ডাকাত দামাল লোকটা ঘাড়ের ওপর হামলে পড়ার আগেই হাড়গোড় বুকপেট গোটা শরীর কাঁপিয়ে ওক উঠল একটা। দস্তি পেটের যন্ত্রণা সামলাতে হাঁটু ভেঙে হুমড়ি খেল চন্দ্রধর। বমি নেই। বমির

জন্ত পেটে দানা ছিল না। পাঁজরাতুটো তুমড়েমুচড়ে ওঁকের পর ওঁক তুলে থরথর কাঁপতে থাকে। নাড়িভুঁড়ির তলানি থেকে খিচুনি দিয়ে মাথার তালু অবদি একটা মিটুলি সাপের তিরতির। জগৎ আঁধার। পিত্তি, বুকগলা চিরে থুতুশ্লেষ্মায় পিত্তির দলা।

আস্তে আস্তে, সাঙাৎ-ইয়ারের ভঙ্গিতে নত হলো মুর্হু। পিঠে হাত রেখে ঠাণ্ডা গলায়—'কী গ খুড়! মরবে নিকি ইখেনে! ঘর চল। হাতটো রাখ না কেনে আমার কাঁধে! ঘর দিয়ে আসব। ছেল্যা ছেল্যাবৌ দেইখবেক মরণকালে…'

কী বলবে চন্দ্রধর! ফ্যাকাসে তুটো চোখ শূন্যে তুলে তাকাল বন্ধুর দিকে— মরবে না। চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে আজ ভাত গিলবে তুদিন বাদে। নিজের জমিনে গতর-খাটানো চাষ, চাষের-চালের ভাত।

বাদলা রাতে জ্যান্ত ভূত ধরতে গিয়েছিল গগন চৌকিদার। রাতের প্রহরী জোর একটা লাথি খেল কোঁৎকায়।

প্রতি রাতেই এই ভূত দেখে গগন। গাঁয়ে যখন মানুষজন তেমন আর নেই, সবাই লঙরখানায়, বামুনপাড়ায় কায়েতপাড়ায় বাবুদের বারকয়েক হাঁক শুনিয়ে নিশুতি রাতের জলকাদায় চলে আসে পাকা সড়কের বেলতলায়। ঘাপটি মেরে বসে থাকে। পর পর দাঁড়-করানো গাড়িগুলো। বন্দুক কাঁধে ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা পশ্চিমা সেপাইরা। চারপাশের গাঁ থেকে বোঝা বয়ে ·.য় কালো কালো ভূতগুলো আসে। বোঝাই গাড়ি চলে যায়।

এমন গোপন খবরটা আর কাউকে সে বলেনি। হা-হাভাতেগুলো ছুটে আসবে কুত্তার মতো। শেষরাতে গাড়িগুলো চলে গেলে বেরিয়ে আসে জঙ্গল থেকে। একটা ঝাঁটা থাকে হাতে। পাকাসড়ক ঝাড় দেয়। পাখিরা নেমে আসার আগেই ছড়ানো-ছিটোন কিছু ভূতুরে-দানা তার প্রতিদিনের উপরি।

বাদলা রাতে সেদিন সে সেপাইদের নজরে পড়ে গেল। বাংলা জানে না ঠ্যাঙারে-গুলো। বোঝানো গেল না—সে-ও রাজার লো˝. গাঁয়ের চৌকিদার। গাড়ি চালায় যারা, অচেনা ভিনগাঁয়ের লোকগুলো বলেকয়ে কিছুটা সামাল দিলো, রক্ষে। নয়তো বেঘোরে প্রাণটা যেত। কেন না, অভিযোগ ছিল, ধান লুটতে গিয়েছিল গগন চৌকিদার।

কাকভোরে ডাক ছেড়ে কান্নায় চিৎকারে ঘাটের-মড়া দারোগাসাহেব, সেপাইসান্ত্রী লাটবেলাট রাজাবাহাদুরের নামে শাপান্তি গাইল শশিবালা।
চৌকিদার ভয়ে মরে—ও মাগী দেবে বুঝি সব ফাঁস করে।

গুটি গুটি আসেন কত্তাবাবুরা—'তুই কেনে গিছলি র‍্যা উদিকে? তুই চোকিদার।
চুরি করবি তুই?'
'আমি চুরি কত্তে যাই নাই গ। আমি চোর লয়…'
'উঁই, উই হল। চোকিদার বলে কতা। হারামি কাঙালগুলার মতন তুই কেনে যাবি! এজ্জৎ নাই তুর?'
'আজ ছমাস বেতন নাই গ কত্তা। এমনটো আকালের দিন…'
'আরে, তুর ঘরে হাঁড়ি চড়চে নাই ত আমাদেরকে বলবি ত সি কতা। দারোগা বাবুর লোক তুই, খপরাখপর দিস সদরে, তুর ভালমন্দ দেখব নাই আমরা?'
এক পালি দু পালি করে গোপনে চাল পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন বাবুরা।
হলুদ গন্ধক-লাগানো এক গোছা প্যাকাটির শলাও হাতে-হাতে দিয়ে গেলেন তারুঠাকুর।
সব মিলিয়ে চৌকিদার-সংসারে এক বেলার সুখ কয়েকদিন।

রাতের আঁধারে চুপি চুপি আসে স্বজাতির মানুষগুলো— 'দারোগাবাবুর থানে খুব যে নিক্যেছিলে গ—ই বছরে ফলন জব্বর। কুথাকে গেল গ ফলনের ধান?'
নিরুত্তর গগন চৌকিদার। ভুল সে বলেনি যদিও,
'রাজার লোক তুমি! আকাল বানায়েঁ মাথাটো ফাইটল তুমার, মরণটে আমাদের…' ফ্যাকাসে চোখে তারা-ভরা আকাশের দিকে তাকায় চৌকিদার।
রাজার মান রাখতে সে স্বজাতির ঘরে বেইমান।

মিটিমিটি তারাগুলো একে একে নিভে আসে। কাকের-ডাকে ফর্সা হয় ভোরের আকাশ।
কাঁথামুড়ি দিয়ে, ঠাণ্ডায়, দাওয়ায় বসে চন্দ্রধর স্থির। পেটের দানাপানির মতো রাতের ঘুমও গেছে চোখ থেকে। ঘরের ভেতর দাপাদাপি চিল্লানি বৌটার। মায়ের পেটে আকাল তো আরো জোরে জোরে দস্যিটা ঘাই মারছে পেটের ভেতর।

আধপাগলা ছেলেটা বেরিয়ে এল আচমকা—'যাও, ইদিক উদিক কুথাকে যাও দিকিন টুকচান...

'কেনে ?'

'বাহ্যিবমিপেচ্ছাবের বাসে তো তিষ্ঠোনো যেচ্ছে না গ। একটো যা ক্যাঁথা ছেল, সিইটেও ধুয়্যে গেল...' অর্জুন বেসামাল। জোয়ান রক্ত ঠাণ্ডা বনতে না-চাইলে যা হয়, রাগী কেউটের মতো ফোঁসে—'ন্যাতোন্যাতো শাড়িটো ইবার ভেজালে আর গিঁটও চলবেক নাই...'

'কিন্তুক কী কইরকি বটেক ?'

'পুকুরধারে লিয়ে যাব উকে...' ঘরের ভেতর কী একটা গোঙানির ডাকে ফিরে তাকাল অর্জুন। লাফ মেরে ঘরে ঢোকার ধাক্কা—'তুমার বৌমা ল্যাংটো গ। উদম ল্যাংটো...'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে চন্দ্রধর। উদল গায়ে লেঙ্গুটির মতো পাছার কাপড়টা আসলে পুরনো ছেঁড়া-গামছা একটা। চটের বস্তা ছিঁড়ে কোনো রকমে পাছায় জড়িয়েছে অর্জুন। শুধু ঘরের সোমত্তা মেয়েছেলেরই অঙ্গবাস নেই। দানা নেই পেটে। কোথায় কাপড় ?

চিতি সাপের কাঁপুনিতে অঙ্গে অঙ্গে ঝলসে উঠল সে। দেশগাঁ উজাড় করে বেবাক মানুষ শহরে লঙ্গরখানায় গেছে বলে কি চাষিপাড়ায় দুচার ঘরও নেই কেউ ? ভদ্দরপাড়ার বাবুরাও কি কেউ এসে পড়তে পারে না এখন ? চন্দ্রধর খোলা-মাঠের পাহারাদার। জমির ধান লুটেছে শয়তানরা। কিন্তু মেয়েছেলের আব্রু ?

বুকে ধিকিধিকি ভয়। এটেল মাটিতে পেচ্ছল কাদায় গভ্ভোবতী মা। অর্জুন কি সামলাতে পারবে একা ! গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিতে সাধ যায় এবং ঝুঁকে পড়তেই ভীতিকর এক দৃশ্যের ধাক্কায়, নিজের অবুঝে হঠাৎ একটা ডাক ছেড়েই চমকে উঠল। কী সব্বোনাশ !

'ভগমান রক্ষে কর। রক্ষে কর গ ঠাকুর...' একটা পাক খেয়েই পালাতে চাইল চন্দ্রধর। কপাল-চাপড়ানিতে স্বগত প্রলাপ—'ই কী দেখ্যু গ ভগমান ? ঘরেল লক্ষ্মী মা আমার। ই কী চামুণ্ডা রূপ গ মায়ের ? ই মেয়ে ত আজই বিয়োবেক। আজ লয়ত কাল। ধাইমা চাই একজনা টুগ্‌চু আগুন, একটো কাপড়...'

ছুটতে ছুটতে মাঠের ধারে নতুন করে চোখের ধাক্কা। ভাদ্দরশেষে মাঠে-মাঠে ঘন সবুজের বাহার। এবারও ফলন জব্বর। নয়ন জুড়োয়।

চন্দ্রধর পা ফেলে। যেন একটা ভাঙাচোরা মানুষের একজোড়া খোঁড়া পা। আঁৎকে উঠল। টাল সামলে হাতের নাগালে একটা করমচা গাছ আঁকড়ে ধরতেই আচমকা ভয়ের ছ্যাঁকায়, বুকের তোলপাড়ে ঝিম মেরে যায়। ঘন নিঃশ্বাসে বুকের হাঁপর, ঠিকরে পড়ছে চোখের মণিদুটো।

কুমোর পাড়ার বড়পুকুরের ওধারে অনেকটা ফাঁকা জমি। তার ওপাশে গাছপালা বনবাদাড়ের মাথা ছাপিয়ে মস্ত নিমগাছের ডালে ডালে ঝাঁকে-ঝাঁকে শকুন। এত শকুন একসঙ্গে মানুষের ভাগাড়ে!

পিত্তিবমির থামচানি পেটের ভেতর। বুকগলাপেট কামড়ে ধরে একটা বিষাক্ত রক্তচোষা জোঁক। ঘেন্না! না ভয়! না জরজারির জ্বালা! জানে না সে। বুঝতে পারে, মরণ আসছে তার। মরণকালে এমনটা হয় মানুষের। কাঁপতে কাঁপতে আঁকড়ে-ধরা গাছটাকে উপেক্ষায় ছেড়ে দিয়ে, দূরে, মস্ত গাছ ভরে গোছা-গোছা শকুনের দিকে চোখ রেখে টলতে টলতে আবার এগোয় পায়ে পায়ে। বড়ো বড়ো হাঁপের নিঃশ্বাস।

কিছুদূরে সামন্তদের বাঁশঝাড়ে সাজগোছ-করা শহরের বাবুরা। চন্দ্রধর অবাক হলো না। নিত্যিনতুন শহুরে-বাবুর আমাদানি গাঁয়ে। হরেকরকম বাবু। হরেক তাদের বোলচাল। খেতে দেয় না কেউ।
এবং তখনই

কায়েতপাড়ার শেষে ঠাকুরপুকুরের লাগোয়া গোটাকয়েক মাটির দোচালা। দুলেপাড়ার বাইরে, বাবুদের বাড়ির নাগাড়ে-কিষেণ আরো ক-ঘর গরিব দুলে। এখন আর কেউ নেই। পেটের টানে সবাই শহরে। নিঝুম ঘরে শেয়াল কুকুর তাড়ায় কে? মেয়েমানুষের গলা! ভেড়েণ্ডা বেড়ার ফাঁক ডিঙিয়ে সে ভেতরে ঢুকল। চরণ দুলের ঘর। ঝোপজঙ্গল ঘাসদুব্বো চারিয়ে গেছে উঠোনময়। মেটেঘরের দিকে এগোয়। এই দুর্দিনে ধানচাল তেলনুন

কাপড়ের আকালে সবই বাড়ন্ত যখন, মানুষেরও আকাল। একজন বয়স্থা মেয়ে-ছেলে আজ তার বড়োই দরকার।

একটা শেয়াল ছুটে গেল চোখের পলকে। ঝাঁপ নেই, দরজা নেই, দাওয়ায় উঠে ঘরের ভেতর উঁকি দিতেই থতমত ধাক্কা। শেয়াল নয়, কুকুর নয, একজন মানুষ। সত্যি-সত্যি মেয়েমানুষ।

'কে! কে বটেক তুই? কী কচ্চিস? কচ্চিস কী এখেনে?'

পুরুষের ছায়ায়, গুটিসুটি মেয়েছেলেটা চকিতে দেয়ালের গায়ে সিঁধিয়ে গিয়ে, বুক পেতে আগলাতে চাইল কিছু।

ঘরে আঁধার ছিল। ছেঁড়াফাটা কাপড়ে-জড়ানো মেয়েছেলেটাকে চিনতে পারল না চন্দ্রধর। দাপটে হাঁকল—'বল্ না কেনে ঘর কুথা? কোন্ জেত?'

সাড়া নেই! পাছা তুলে, আরো কোণে নিজেকে গুঁজে দেবার মুহূর্তে ওর গিঁট-বাঁধা বোচকাটা পেছনে ফাঁকা হয়েই যেতেই ছোঁ মারল চন্দ্রধর।

বৌটা ছুটে এল। আছড়ে পড়ল পায়ে—'লিবে নাই গ দাদা, লিবে নাই। দাদা বল্যে ঙেকেচি। গরিব বুনের এজ্জৎ...'

চন্দ্রধরের হুঁস নেই। ছুটে আসে দরজার গোড়ায়, আলোয়। উন্মাদের জেদে গিঁট খুলতে খুলতে—'কী আছে? কী আছে ইটোতে? কাপড় আছে? কাপড়?'

এবং অবাক হলো। হাহুতাশ থেমে গেছে। আঁধারে লুকিয়ে হাপুসহুপুস কী গিলছে মেয়েছেলেটা! যেন পোটলাপুটলি যায় যাক, এত বড়ো ঢ্যাঙা একটা পুরুষমানুষের সঙ্গে দুদিকে সামলাতে পারবে না বলেই গেলাটা আগে এবং সে কী বীভৎস গেলা!

এবং চন্দ্রধর, নাগালের মধ্যে একটা মানুষ কী খাচ্ছে দেখেও কেড়ে নেবার প্রতিযোগিতায় নেই। হামলে পড়ে গিঁট খুলতেই দুমড়োন-মোচড়ানো এনামেলের থালাগ্লাশের সঙ্গে, কী আশ্চয্যি, খুশিতে খুশিতে নাচন লাগে বুকে —সত্যি একটা বাহারের রঙিন শাড়ি। হোক তেলচিটচিটে নোংরা ফাটা, এই-বা জোটে কোথায় এমন আকালে।

মুহূর্তে, এঁটো ভাতের দলা-চটকানো পাঁচ আঙুলের থাবা তুলে ছুটে এল মেয়েছেলেটা। কী বিচ্ছিরি মানুষের চিৎকার।

'খপদ্দার...' চন্দ্রধর আরো বীভৎস। অবশ শরীরে কুলোয় যতটা, গর্জন। যেন

লাথি, লাথিই কষাবে আর এক পা এগোলে—'চোর। কার ঘরে সিঁদ কেটেচিস, বল্ মাগী, বল্। ই ভাত কুথাকে পেলি তুই ?'
জনমনিষ্যিশূন্য গাঁয়ের নিরিবিলিতে মেয়েছেলেটার চিৎকার কান্না থিতিয়ে এলে চন্দ্রধর এগোল।
বড়ো সহজে শিকারটা কব্জায় এসে যাবার পর তার ফন্দি—এই মেয়েছেলেটাই তার চাই। কে, কার বৌ, কোথায় ঘব, কোন জাত—দরকার নেই জানার। মেয়েমানুষ যখন, মেয়েমানুষের শরীরের নিয়মটা জানে।
একটা মাটির মালসা। তলায় কালিঝুলি। চেটেপুটে খাবার পর পোড়া ভাতের ভ্যাপসা গন্ধ। মালসাটাকে আলোয় এনে দেখল চন্দ্রধর—'ই ভাত কুথাকে পেলি বটেক ?'
'পুকুরধারে…'
বিস্ময় বাড়ে—'ই আকালে তুর জইন্যে ভাত ছেল পুকুরধারে ?'
'অ, সত্যি গ দাদা…' ভয়ে চুপসে গেছে মেয়েটা—'দেখলম, বাবুদের বাড়ির একজনা জোয়ান ছেল্যা মাথায় করে লিয়ে যেচ্ছে কী! কেও ছেল নাই কাছে পিঠে। পিছু পিছু এলম। ভাতকটা পুকুরধারে রেখ্যেই পেন্নাম দিয়ে চল্যে গেল। কুকুর এয়েছেল দুটো। তাড়ায়ে দেলম। পাখিগুলান উড়্যে গেল! ফুল ছেল গ ইটোর মধ্যি। দুব্বো ছেল। ঘিয়ের বাস ছেল। নুন ছেল নাই…'
'করেচিস কী র‍্যা মাগী! করেচিস কী তুই ?' পায়েঁর কাছে লেপটে ছিল মেয়েছেলেটা। চন্দ্রধর চেঁচাল—'কার বাপের ছেরাদ্দ না তেথির মন্তর ছেল র‍্যা। কার বাপের না মায়ের পিণ্ডি চটকালি তুই ইখেনে বস্যে। জেত কি তুর ?'
বৌটা ঝলকে উঠল—'তিন চাদ্দিন দানা নাই গ পেটে। টুকচান ফ্যানার জইন্যে ঘুচ্চি দশগাঁয়ে। কেও দেল নাই। শুধু লাথিঝ্যাটা…'
অবশ দেহেও চন্দ্রধর হঠাৎ যেন কোনো জন্তু ব্যাধ। পায়ের কাছে গোঙাচ্ছে তার সহজ শিকার। আরো জোরে সে খিঁচোল বৌটাকে—'লাজসরম নাই তুর মাগী ? ছেল্যা নাই তুর ? বিটি ? উগুলান খেল কি খেল না, তুই মাগী একলা গিললি এত্তগুলান ভাত ?'
'সবই ত ছেল গ দাদা। কপাল পুড়্যাচে…'
'কেনে ?'
'বাচ্চগুলান নিয়ে মিন্‌সে শ'রে চল্লে গেল…'

"তুই গেলি নাই ?'

'পিরিত করে্য আমায় তালাক দেল গ দাদা। তালাক দেল···

তালাক। শব্দের ধাক্কায় বিহ্বল চন্দ্রধর—'তুই,তুই মোসলমান ?'

কাতর কান্নায় বৌটা ঝিম মেরে গেছে। সবচেয়ে বড়ো ভয়।

যেন, পায়ের তলায় গোঙাচ্ছে মা-বসুন্ধরা। চমকের পর চমকে পাথর চন্দ্রধর।

'গাঁয়ের মড়াখেকো সৈয়দবুড় ঘরবাড়ি সব কেড়ো্য লিলেক। শেষমেশ বললেক···' আঁচল টেনে আর চোখ মোছে না বৌটা। ভ্যাবলা চোখে গোল গোল তাকিয়ে থাকে—'আমার মরদটো ভাল বটেক গ। খুব ভাল। ছেল্যা বিটি লিয়ে শ'রে যাবার কালে বললেক, তালাক দেলম তুকে। সৈয়দের কাছে যা না কেনে! লিকে কর। ভালমন্দ দুটা খেইতে পাবি বটেক···'

ঝিমোন কান্নার রেশটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে এক জায়গায়। ঘরবন্দী চন্দ্রধর। পা দুটো আটকে গেছে মাটির কামড়ে।

'বললেক, গতরটো থাইকতে তুই কেনে যাবি শ'রে ? তুর ব্যাটা তুর বিটি তুরই থাকবেক। রেগে বলেক নাই গ। ঠাণ্ডায় বলেছে কতাগুলান। বাথলের লোকদের সনে ফাঁকি দিয়ে চল্যে গেল। গুথাকি মিন্‌সে সৈয়দবুড় এয়েছিল। ওয়াক-থু দিয়ে পালায়েঁ এয়েছি। কিন্তুক মে'মানুষের শরীল লিয়ে যাব কুথাকে গ পালায়েঁ ? ভিখ্‌ মাগি নাই কুনকালে। এখন ঘুচ্ছি ইদিক উদিক···'

অপলক তাকিয়ে থেকে চন্দ্রধর স্থির। কায়েতপাড়ায় কার বাপের না-মায়ের পিণ্ডি চটকে এক দুপুরের শান্তি পেল মেয়েটা! জানাজানি হলে হাড়গোড় আস্ত থাকবে না ওর এবং আশঙ্কায়-অস্থির চন্দ্রধর পোড়া-কাঁসসাটি হাতে তুলে নিয়ে, ভুলে গেল যবনের এঁটো, দরজা গলিয়ে ছুঁড়ে মারল বাইরে। উঠোনে পড়েই ফেটে পড়ার আওয়াজ। ঘেউ ঘেউ কুকুরের ছুটে-আসা। গন্ধ শুঁকে কুকুরও ফিরে যায়।

'চ', তুই চ' আমার সনে···'

গরুর চামড়ায় শিরশিরানির মতো আরেক ঝলক কাঁপুনি বৌটার—'কুথা ?'

'আমার ঘর। থাকবি আমার সনে···'

'একা মে'মানুষ। ই আকালে পেট লিয়ে কুথাকে যাব গ ? খেইতে দিবেন দুবেলা ?'

'খাবি, আমরা যা খাই। শাকসেদ্ধ, ঘাসপাতা···'

'কিন্তুক…'

চন্দ্রধর নরম হয়ে এল। উবু হয়ে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে। কমবেশি এককুড়ি-দশের সোমত্তা মেয়েছেলে। গতর আছে এখনও। সাবিত্তিরকে আগলাতে পারবে দুহাতে।

সেই কান্না। মাটি লেপটে একটা গোঙানি নিঝুম শূন্যতায়—'তিন-তিনটো বাচ্ছা গ। দুটা ছেল্যা একটো বিটি। উদের জইন্যে মন চায় না অকাজকুকাজ অধম্মো করি। কিন্তুক মে'মানুষের গতর! একা থাইকলেড্যাকাতে লুটবেক। যাই কুথা গ। আপুনি লিবেন ত লিন…'

ঘেন্না ঘেন্না ক্রোধ। তিন লাফে পিছিয়ে আসে চন্দ্রধর। এক লহমায় হাড়েমজ্জায় জলবিচুটির জ্বলুনি। ছ্যা ছ্যা ছ্যা…জ্যান্তমরা সব মিলিয়েও পাঁচ-পাঁচটা ছেলে আর মেয়ে, এতগুলো নাতিনাতনী। সেই বুড়োকে বলে কী আবাগী মাগী? ইচ্ছে হলো, লাথি মারে। চোয়ালদুটো থেৎলে দেয় মাটিতে। এবং যখন ক্রোধের তাড়নায় দুর্বল শরীরটা ফুসছে আক্রোশে, মাটিতে পড়ে মুখ থুবড়ে কাঁপছে মেয়েটা, বাইরে কাদের পায়ের শব্দ। হাসাহাসি কথাবার্তা। ওরা দুজনই সচকিত। মেয়েছেলেটার গোঙানি স্তিমিত। দরজার দিকে ছুটে যায় চন্দ্রধর।

'কে ব্যা! কে র‍্যা উখেনে?'

বাহারের রঙচঙে জামায় পেন্টলুনে জোয়ানমরদ শহরের বাবুরা। সঙ্গে কেলো সামন্ত। তেজারতি কারবার আছে বুড়োর। আকালের দিনে গরিব মানুষের হাঁড় চিবিয়ে আরো মুটিয়েছে লোকটা। আশ মিটিয়ে জমি লুটছে দুহাতে।

'কী র‍্যা চন্দর, কচ্চিস কী ইখেনে?'

'অ্যাঁ…' দরজা আগলাতে চায় চন্দ্রধর— 'যাবন নাই উধারে ··,

'কেনে? কোন্ লবাব র‍্যা তুই? চোখ বাঙাচ্ছিস বটেক…'

ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে বদখত লোকটা। খিকখিক হাসি— 'দেখুন, দেখুন না কেনে। ছুট জেতের লোকগুলার কাণ্ডটো দেখুন একবারটি। শালা খ্যানা জুটছে নাই পেটে, ইদিকে মে'মানুষ লিয়ে ফুত্তি লুটতে লেগেছে হারামজাদা…'

গা-পোড়ানি চেলাকাঠের মার। হাসছেন বাবুমশাইরা। রাগে পুড়লেও দিশেহারা চন্দ্রধর ঠাহর পায় না, কী করবে এতগুলো মান্যিজনের মুখোমুখি।

'এনার আবার লাজ লেগেচে গ। ই মাগী আয়, আয় ইদিকি…' যেন গোয়ালের খেড়ো-গাই, খোঁচাখুঁচিতে লাথি মেরে তুলতে হয় যাকে, কেলো সামন্ত ছোট্ট করে লাথিই মারল একটা।

'খপদ্দার…' পা থেকে মাথা অবদি হলকা। লাফিয়ে পড়ে চন্দ্রধর আড়াল করল মেয়েছেলেটাকে। পলকেই থিতিয়ে এল শরীর। যদিও ভড়কে গিয়ে বেশ কিছুটা ঝাঁকুনি খেয়েছে মানুষগুলো, কিন্তু তার সামনে গাঁয়ের-মাথা কেলো সামন্ত এবং তিন রাঙাবাবু! এবং সে বড়োই দুর্বল।

ভয়ে কুঁচকোন মেয়েছেলেটা বোবা। গুটিসুটি মেরে বেড়ালের মতো সরে আসে খুঁপচি থেকে।

'আচ্ চ্ছা…' এমন ছোট জাতের দাবড়ানিতে পিছু-হটার লোক নয় যদিও, কেলো সামন্ত চোখ পাকাল— 'তুর বেশি রস জমেচে র‍্যা চন্দর। শুঁটকি পেটে দাঁত কেলাতে লেগেচিস। ঠিক আচে। রস ভাঙচি তুর বাঞ্চোৎ। আমার নামও কেলো সামন্তি…'

এবং বাবুদের দিকে চোখ ফেলে— 'চলুন ত, চলুন। এসব ছুট জেতের মরণ, বুল্লেন কিনা! আচে ত ব্যাটার বিঘে তিনেক জমি। ই আকালে সব্বায় লুটতে লেগেচে, তা ই বাবুটোরও লেশা ধরেচে। মে'মানুষের লেশা…'

আঁধার ঘর থেকে চুপি-চুপি বেরিয়ে এসেছিল বৌটা। পালাতে চেয়েছিল। পারল না। পিছু পিছু এসেছেন বাবুরা— 'অ্যাই, অ্যাই নাম কী তোর?'

'জেন্নত গ বাবু। জেন্নত বেগম। রশিদের-মা বল্যে ডাকে লোকে…'

'তুই মুসলমান?'

ঘরের দাওয়ায় বসে পড়ে নিজেই যেন একটা পুটলি। ছেঁড়া ফাটা খাটো কাপড়ে ঘোমটা ওঠে না। জিন্নত ভয়ে মরে।

ঘোমটার ফাঁকে ওর দীঘল চোখের দিকে বাবুদের চাউনি দেখে আরো বেশি উতলা চন্দ্রধর। গতর ভরে একরাশ ক্রোধ নিয়ে অসহায়।

'অ্যাই, কাজ করবি? তোদের গাঁয়ে এত বাবলা গাছ। বাবলার কাঁটা কুড়িয়ে দিবি। টাকা পাবি।'

'ট্যাকা লয় গ বাবু। চাল দিবেন? ভাত?'

'ছাড়ুন ত, উ বেবুশ্যা মাগীটো ছাড়ান দিন…' কেলো সামন্ত— 'ইয়ার চে'

তিজি সোমত্তা মে'ছেল্যা দিব আপনেদের। শালা হ্যানা ছড়ালি কাগের অভাব:?'
'লয় গ বাবু। আমি যাব। যাব গ বাবু। আমাকে লিবেন ?'
মেয়েছেলেটা লাফিয়ে উঠতেই রক্তে রক্তে জেদ। চন্দ্রধর খাবলে ধরল— 'লয়।
তুই যাবি নাই। যাবি নাই তু...'
ভদ্দরবাবুরা হেসে উঠতেই কেলো সামন্ত— 'তুই বাঞ্চোৎ এক দুকুরেই ভোগের
মাগীটোকে বাঁধা করে লিয়েচিস বটেক র‍্যা ?'
বাবুরা সিগ্রেট ধরালেন। দেশলাই ধরিয়ে, হাতের আঁজলার আগুন জনে জনে
সকলের ঠোঁটে ঠোঁটে ছুঁইয়ে গেলেন ওদের একজন। হুঁকোকলকের কেলো
সামন্তও পেয়েছে একটা। ঠোঁটচোয়াল শুয়োরের মতো ছুঁচোল করে সিগ্রেট
ধরাচ্ছে বুড়ো। চন্দ্রধরের লোভ চুকচুক চোখজোড়া আগুনটুকুর দিকে। দেশ-
পাড়াগাঁয়ে সিগ্রেট দেখা যায় না বড়ো একটা। আস্ত একটা দেশলাই!
লোকটার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার দুর্বার সাধ।
ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে দাওয়া ছেড়ে উঠোনে নেমে গিয়েছিল ওরা। মেয়েছেলেটা
পিছু ফিরে তাকাল— 'আমার কাপড়টো...'
বগলে দলা-পাকানো সেই কাপড় চন্দ্রধর ছুঁড়ে মারল। ঘেন্না ঘেন্না ওয়াক্ থুঃ...
থুতু শালা তামাম পিথিমির কপালে।

ভেড়েণ্ডা-বেড়ার আড়ালে মিলিয়ে গেল ওরা।

সাড়াশব্দহীন খা-খা দুপুরের নির্জনে চন্দ্রধর আবার একা।
উঠোনের কাদায় মাটির মালসাটা দু-ফাঁক। একটা সবুজ ফড়িং লাফিয়ে উঠল
গায়ে। বিরক্ত হলো না। দূরে, ঘুরে ঘুরে গাছের পাতার গা শুঁকছে দুটো
রঙিন পেরজাপতি। চন্দ্রধর অপলক তাকিয়ে থাকে।

দুপুর-গড়ানো থরথরে বেলায় ঘরে-ফেরার পর বুকটা ছ্যাঁকা খেল আবার।
ধারালো কাটারি-হাতে তার ব্যাটা! ঘরের ভেতর গোঙানিটা বৃষ্টিশেষে গাছের
পাতা চুইয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল-ঝরার মতো।
চন্দ্রধর সেদিকেই এগোল।
কাটারি উঁচিয়ে তেড়ে এল অর্জুন। মাথায় খুন— 'তুই যাবি নাই, যাবি নাই
উদিক। এগুবি ত মেরেই ফেলব তুকে বুড়...'

চন্দ্রধর মরতে চাইল না। চোখে চোখ রেখে তাকাল ছেলের মুখোমুখি। বাপ-ব্যাটার এক জোড়া চোখ, লকলকে সড়কি উঁচিয়ে দুই শত্তুর যেন দুজনকেই বিঁধতে চায়।

দাওয়ার ধারে ছেঁড়া বস্তায় বাঁধা একটা কিছু। চন্দ্রধর তাকাল— 'কী উটোতে?'

'চাল।'

চাল! মগজের ভেতর আচমকা বিজলি খেলে যেতেই, প্যাচপেচে কাদার-উঠোনে টাল সামলায় চন্দ্রধর। ছুটে যায় দাওয়ার দিকে। এই আকালে চাল এনেছে তার ব্যাটা!

'আধবস্তাটাক চাল দেল শুক্‌নি বুড় তারুঠাকুর…'

'কেনে?'

'জমি ত বিচব নাই। চলবে কি কর‍্যে পেটটো? পোয়াতীর পেট! বলদজোড়াটে আর গাইটো দিয়ে এলম বুড়কে…'

মনে হলো, হাতের কাটারিটা তাক করে ছুঁড়ে মেরেছে অর্জুন। আহত চন্দ্রধর অবিশ্বাস্য আর ভয়ঙ্কর সত্যিটাকে মেনে নেবার আগে গায়েগতরে মোচড় খেয়ে, ছেলের বেয়াদপি বা ছেলে-বৌর গোঙানিও তুচ্ছ হয়ে যেতে, ছুটল গোয়ালের দিকে। সব গেল। এই আকালে সব গেল তার—ভাগচাষির বলদজোড়'. বুকের পাটায় একজোড়া আকাশ।

উঠোনের ওপাশে জ্ঞাতিভাই শ্রীমন্ত বাগের ঘর পেরিয়ে ভাঙাচোরা পোড়ে চালায় তার গোয়াল। মেটে-দেয়াল ভেঙে পড়েছে। চা টা শুকনো খেজুরপাত তালসুপুরি নারকেল হরেক পাতায় ছাওয়া ছিল কোনো রকম। চন্দ্রধর আছড়ে পড়ল। ওরা নেই। অবোলা কেষ্টর-জীব কষ্ট পাচ্ছিল। কমাস ধরেই খড় নেই, খোল নেই, ভাতের-মাড় নেই, জাব দেওয়ার পাট নেই। চরানির ঘাসই সম্বল। পেল্লাই ডাবাটা জলে-জলে টইটম্বুর। গোটা বর্ষার জল। ডাবাটাকে দুহাতে আঁকড়ে, ঝুঁকে পড়ে, ফাঁকা খুঁটি আর এখনও-তাজা গোবরের দিকে তাকিয়ে শোকার্ত চন্দ্রধর বুকের ছটফটানিতে মুখ গুঁজল ডাবাটার বাসি পচা জলে। বিচ্ছিরি ভ্যাপসা গন্ধে এখন আর গা ঘুলোয় না। ক্ষিধেয় ক্ষিধেয় চিমসে-মারা পেটে পিত্তিবমি নেই। গোয়ালের শূন্যতাটা কলজের ভেতর।

'মানুষের পেট ভরলে তবে না গাইবলদ পুষ্যি…' হাতে কাটারি নিয়ে পিছু-পিছু এসেছে অর্জুন।

ক্রুদ্ধ চন্দ্রধর ফিরে তাকাল। মরদ-ব্যাটা আরেক জানোয়ার।
উন্মাদ চন্দ্রধর তখন সত্যি বেসামাল। লাফিয়ে পড়ে গোয়ালের খুঁটোটা টানতে চাইল। দুর্বল শরীরে অসম্ভব। খেজুরপাতা সুপুরিপাতার ভিড়ে একটা বাঁশের ডগা ধরে টান দিতেই নড়বড়ে পুরো চালটাই হুমড়ি খেয়ে মাথায় ভেঙে পড়াব মতো। একটা আছোলা বাঁশের কঞ্চি হাতে তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ছেলের মোকাবিলায়। ছেলেই তার শত্তুর।
'সারখোল ত্যানাপানি কিছু নাই। শুকুয়েঁ শুকুয়েঁ উ গুলান ত মরেই যাচ্চেল। যাক না কেনে, থাকুক গে বামুনবাড়ি। খেয়েদেয়ে বেঁচেবত্তে থাকবেক। ভাগাড়ে যেইতে হবেক নাই…'
'আমার পুষ্যি খায়-না-খায় সি আমি দেখব। তা তুই উদেরকে তালাক দিবাব কে বটেক ?'
তালাক ! অর্জুন ঘাবড়ে গেল। এমনটা কথা বলছে কেন তার বাপ ?
চন্দ্রধর ছুটে আসে— 'তুই, তুই আমার শত্তুর ··'
চকচকে কাটারি নাচায় অর্জুন— 'ঘরে বৌটো শালা মরে যেচ্ছে আর তুই বুড় মাগী লিয়ে ফুত্তি লুটচিস চরণ দুলের ঘরে…'
চিমসে পেটের টানে চোখেব আগুন আবো ভয়ঙ্কর। অবশ রাগে কাঁপে চন্দ্রধর— 'হারামি বজ্জাত কেলো সামন্তির চুকলি বিশ্বেস কল্লি তুই র‍্যা ! আমি তুব বাপ।'
'বেজন্মা বাপ শালা। জ্যান্ত পুতে মারব তুকে মাটির তলায়।'
ছেলের চোখে ঘেন্না। ধারালো অস্ত্রটা খড়িসেব লকলকে ফণা। বেহুঁস চন্দ্রধর একটা লাথি কষাতে গিয়ে পাক খেল। টলে পড়ল মাটিতে। ঝাঁপিয়ে পডল অর্জুন। একেবারে বুকের ওপর।
স্বজন পড়শি কেউ নেই। ভরদুপুরে কে তাকে বাঁচায় ? প্রাণপণ শক্তিতে রুখতে চাইল চন্দ্রধর। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে বাঁচানোর দায়ে যখন দম বন্ধ হয়ে আসে, ন্যাতান্যাতা শরীরে পেটের ভেতর অসম্ভব খিঁচুনি, ছেলের চোখের ঘেন্নাটাই ঘেন্না চাগিয়ে তোলে রক্তে। মরণের সাধ থাকে না। পিত্তিশোধের নেশা জাগে। আচমকা ধাক্কায় সপাটে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই
'বৌটোর পেটের ভেত্‌রে মাস খুবলেচ্ছে র‍্যা তুর ব্যাটা…'
'তুর ব্যাটা তুকে আঁধার দেখাবে র‍্যা শালা…'
অর্জুন ভয় পেল। পলকে ছিটকে গিয়ে উবু হয়ে পড়ল মাটির-ধস-নামা পড়শি-ঘরের দাওয়ায়।

শান্তভাবে উঠে দাঁড়াল চন্দ্রধর। বাঁদিকের কাঁধের গোড়ায় যন্ত্রণা। ডানহাতটা ছোঁয়াতেই রক্ত।

গলগল রক্তে ভরে গেল হাতের পাতা এবং ধুলোকাদামাখা হাতের খাবলায় যন্ত্রণাটা চেপে ধরে কাতরেকুতরে উঠে দাঁড়াবার ক্লান্তিতে, যেন ক্রোধ নেই অভিযোগ নেই, শোনার-জন নেই, নিজের জন্যেই আপন মনে—'উ মে'ছেল্যাটো জেতে মোসলমান, কার ঘরের ছেরাদ্দর পিণ্ডি গিলছেল চরণ দুলের গুন্তি ঘরে বশ্যে। ভাবলম, ধাইমা কর‍্যে লিয়ে আসব উয়কে...'

জলে জলে ভরাট ডাবাটায় আজলা তুলে ক্ষত মুছতে মুছতে—'একটো কাপড় ছেল উয়র কাছে। মাগী চুরি কর‍্যাছে কুখিকে। শ'রের বাবুরা ছেল। ওনাদের একজনার হাতে জেসলায়ের বাশ্‌কো। মন বল্ল, কেড়্যে লিই। কলজের জোর নাই র‍্যা অজ্জুন। লার্‌লম। উ শালা কেলো সামন্তিই কেড়্যে লিয়েচে সব...'

ঝোপে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল চন্দ্রধর। জংলি ধরনের যে-কোনো তিন রকম গাছের পাতা দাঁতে চিবিয়ে রস ঘসলে কাঁটাছেঁড়ায় রক্ত বন্ধ হয়। সাবেকি নিয়মে পাতা খুঁজতে খুঁজতে, দাঁতে চিবোতে চিবোতে—'উ আমাকে দাদা বল্যে ডেকেচে র‍্যা অজ্জুন। উ আমার বুন লয়। আমার বিটি। তুর চে' বড় হবেক টুকচান। আমার শ্যামাটোর মতন। হারামি বাবুদের পানে চোখ তুল্যে তাকালেক র‍্যা ত্যাখন, বুকটা আমার ছলাৎ কর‍্যে উঠল। উথালপাথাল মুখটোতে মায়া জড়াইয়েঁ আছে উয়র। মা-দুগ্‌গার মতন চোখ দুখান। অমন বিটি ঘরে থাকলে বাপের জমিজিরেত হয়, সোয়ামির ঘর আলো হয়। শ্যালগুকুনি টানল র‍্যা উয়কে। উ মাগী নিজেই নিজের কপালটো খেলেক...'

চমকে উঠল। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে অর্জুন ঘরের দিকে ছুটছে। চন্দ্রধর মানে বোঝে না। সে-ও ছুটল পিছু-পিছু।

উঠোনে আঁতুড় গড়বে বলে বাঁশখেজুরপাতার জোগাড় ছিল। ছুটে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল অর্জুন। লাথি মারল। শাটারি দিয়ে এপাশে ওপাশে, হুঁস নেই, পাগলের মতো কোপাতে লাগল বাঁশটাকে। নিজের হাতেই কঞ্চি বানিয়েছে। পা দিয়ে চেপে, নরম শরীরে কষ্ট যদিও, দুহাতে বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে চাড় দিয়ে ভাঙল নিজেই।

চন্দ্রধর হতবাক। মানে বোঝে না খ্যাপামির।

বাপের রক্তখেকো কাটারি উঁচিয়ে, যেন যুদ্ধ-এ যাচ্ছে বীরপুরুষ, অর্জুন লাফিয়ে নামল রাস্তায়।
পেছনে ব্যাকুল চন্দ্রধর—'কুথাকে যাচ্ছিস তুই?'
'কেলো সামন্তির থানে।'
চনমন করে রক্ত—'কেনে? উখেনে কেনে?'
'শহরের বাবুরা গাঁয়ের সব ঝাড় কিনি লিয়েচে গ। বাঁশ কাটলি ট্যাকা দিবেক, খোরাকি দিবেক বইলছে...'
শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ঘাড়ের দাগায় রক্ত বন্ধ হয় না কিছুতেই। বিমূঢ় চন্দ্রধর

'বৌটো রইল বটে গ। ফ্যানাভাত আছে বাটিতে...'
নির্জন গাঁয়ের পথে অর্জুন মিলিয়ে গেল।

গনগনে দুপুরে কাকের-ডাকে ওর গলার-স্বর বিলীন হয়ে যেতেই নিঝুম চন্দ্রধর দাঁড়িয়ে রইল। জংলিপাতা চিবিয়ে মুখটা তেতো। উগড়ে আসছে পিত্তিবমি। থেঁৎলানো পাতার রসের দগদগে ঘায়ে জ্বলুনিটা পুড়ছে যখন, ঘরের ভেতর বৌটার কাতরানি।
ধুঁকতে ধুঁকতে উঠে এল দাওয়ায়।

ঘরের বাতায় শুয়ে মুচড়ে উঠল সাবিত্রী। ড্যালাড্যালা চোখে আতঙ্ক, আতঙ্ক শুধু।
চকিতে কাঁধটাকে চাপা দিতে চায় চন্দ্রধর—'অমন কর‍্যে তাকাস কেনে গ মা? উ কিছু লয়। এমন সমে ভয়ডর পেত্যে নাই। গভ্ভের ছেল্যার চোখ গল্যে যায়...'
যখন আর উপায় নেই। যন্ত্রণায় চোখ খিমচে, দাঁতে ঠোঁট চেপে ঘাড় ফেরাল সাবিত্রী। ফালাফালা একটাই তো কাপড়। তেলচিটচিটে কাঁথায় ঢাকা ছিল পাছাটা। সরে গেছে। খাবলে পায় না দুহাতে।
চন্দ্রধর এগিয়ে এল। ঢেকেচেপে দিতে দিতে—'লাজসরমের কিছু নাই গ। আমি তুর বাপ...'

ঘরের কোণে উদোম বাটিতে ঠাণ্ডা জমাট ফ্যানাভাত। ভাত নেই, শুধুই ফ্যানা। শুধু চালই জোগাড় করেনি তার ব্যাটা। একটু নুনও এনেছে কোত্থেকে।

চোখ বুজে চোঁ-চোঁ গিলতে গিয়ে বুকে লাগে। পেটে মোচড়ানি। বিষ। ঘরে ধান ফুরোবার পর আরো আধবস্তা চাল। আধবস্তা চালের দরে একজোড় ডাগড়াই বলদ আর একটা পোয়াতী গাইগরু—ইয়ারেই আকাল কয়।

ব্যথা উঠল বিকেলের দিকে। পেটের গুন্তিতে ঘাই মারে আকাল।

বাঁ-কাঁধে দগদগে ঘা-এর যন্ত্রণা বয়ে উঠোনে দাওয়ায় ছটফট ছটফট দাপায় চন্দ্রধর। করবে কী সে? গাঁয়ের শ্মশানে মেয়েমানুষের আর্তচিৎকার। পড়শিদের উদোম ঘরে শেয়ালেরা ডাকে।

সাবিত্রী মরে যাচ্ছে। ঘরের-লক্ষ্মী মরে যাবে আজ রাত্তিরেই।

বাগদীবাউরিদুলে আর কেউ নেই গাঁয়ে। তবু এখনও, মঁড়লপাড়া মাঝিপাড়া তাঁতিতামলিজেলেপাড়ায় চষে চষে দুচার ঘর যাদের পাওয়া গেল, অর্জুন মাথা কুটল সকলের দোরে— 'চল, চল না গ তুমরা কেও। বৌটো মরে যেচ্ছে গ আমার…'

জুলুজুলু তাকাল কাঙাল বৌঝি বুড়িরা— 'চাল দিবি র‍্যা! চাল মুড়ি চিঁড়ে! জমি আছে বটেক তুদের। খেইতে দিবি এক বেলা কর‍্যে কটা দিন?'

গাইবলদের বদলা আধবস্তা চালের কথাটা ভাবল অর্জুন। কিন্তু তার আগে

ছুটতে ছুটতে চৌকিদারের ঘর— 'তুমিই আমার মা-জননী গ খুড়ি। তুমার পায়ে পড়ি গ খুড়। ধাইমা একজনা…'

দিনদুপুরে শেয়াল শকুন ঘুরে বেড়াচ্ছে গাঁয়ে। রাতে আর টহলে বেরোয় না গগন চৌকিদার। সরকারবাহাদুর বেতন পাঠাতে ভুলে গেছেন। থানায় গিয়ে দরবার করেও কাজ হয়নি কিছু। কত্তাবাবুদের থানে ভিখ্ মেগে দুচার পালি ধান পাওয়া গেছে এমন দুর্দিনে। সুতরাং সে কি করে অনুমতি দেবে তার বৌকে, কত্তাদের অনুমোদন ছাড়া! বলল— 'সি কেমন কর‍্যে হয় র‍্যা অজ্জুন?'

'তুমি রাজার লোক খুড়। ভালমন্দ দেখ দশজনের…'

‘কিন্তুক…’

কাঁদল অর্জুন। সত্যি-সত্যি অঝোর কান্না— ‘আমার বৌটো মরে যেচ্ছে গ…’

‘শুন্তি পেটে বাচ্ছা বিয়োচ্ছে র‍্যা তুর বৌ, অজ্জুন…’ শশিবালা নরম হলো—

‘কিন্তুক আমি যেয়ে কি কব্ব বল্ দিকিন…’

অর্জুন চোখ তুলে তাকাল।

‘আমার ডর লাগে।’

‘কেনে?’

‘ধাইমার কাজকাম নেয়ম জানি নাই…’

‘এতগুলান বাচ্ছা তুমার?’

‘কিন্তুক পরের আতুড়ে ডর…’মস্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে উদাসীন শশিবালা—‘কিন্তুক সাবিত্তির, ই কেমন কতা বাপ্…’

অর্জুন পায়ে পড়ল— ‘ভগবতী-মা গ তুমি খুড়ি। নেয়তিনেব্বন্ধের তুমি কী কব্বে। ই আকালে কত লোক মচ্ছে ইদুরঅ্যাণ্ডুলার মতন। তবু যদি তুমার আশীব্বাদে…’

‘চ…’

যেন এক থালা গরম ভাত পেল অর্জুন। ফুরফুরে বাস।

আড়ালে গাছতলায় তাকে ডাকল চৌকিদার— ‘খুড়িকে লিয়ে যাচ্চিস, যা। কিন্তুক পাঁচ পালি চাল দিতি হবেক ইয়র জইন্নে…’

‘দিব, দিব গ খুড়। কাল সকালা দিয়ে যাব…’ টুক করে, নিচু হয়ে বুড়োর পায়েব-ধুলো মাথায় নিয়ে অর্জুন— ‘আশীব্বাদ কর গ…’

গগন চৌকিদার মাথায় স্পর্শ রাখল— ‘ভাবিস নাই। মঙ্গল হবেক। ঈশ্বর আছেন…’

ঘুটঘুটি রাতের আধার। আকাশের অগুন্তি তারা আর মাটি ছুঁয়ে হাজার জোনাকির রাতে আতুড় সাজাবার বাঁশ আর বাঁশের-কঞ্চি আর শুকনো খেজুরপাতায় আগুন জ্বেলেছে অর্জুন। লকলকে চিতের আগুন যেন গেরস্তের উঠোনে। থকথকে আঁধারের কালোয় ধোঁয়া দেখা যায় না তেমন, ধোঁয়ার গন্ধ। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে। চারপাশে শেয়ালকুকুরের ডাক। ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা গাছগাছালিও কালো ছায়ায় ভূতের ছবি।

বাপঠাকুদ্দার নিয়মে আতুড় বাঁধা হয়নি উঠোনে। লম্ফপিদিমের তেল নেই, দিনদুপুরেই শেয়ালশকুন। এমন দিনে উঠোনে রাত কাটাতে পারে কোন্ পোয়াতী ? যা হবার, বাচ্চা বিয়োক কি পোয়াতী মরুক, ঘরেই হবে। ছেলের প্রস্তাবে বাদ সাধেনি চন্দ্রধর।

আঁধার রাতের নিশুতি চিরে একটা গোঙানি। গোঙানিটা বাড়তে থাকে। পাথসাটে মোচড় খায় ঘরেবাইরে তিনটে মানুষ।

উঠোনের মধ্যিখানে অস্থির অর্জুন ক্ষণে ক্ষণে শুকনো ডালপালা গুঁজছে আগুনে। এ আগুন জিইয়ে রাখতে হবে। লালচে আগুনে ভয়ঙ্কর তার চোখজোড়া। মাটিতে, পায়ের কাছে টাঙিটা প্রস্তুত।

এক ছিলিম তামাক ! জিভে টাগড়ায় পানসে বিস্বাদে চন্দ্রধর ছুটে যায় দাওয়ার কোণে। হুঁকোটা ঝুলছে। জল-ফেরানো হয়নি কতদিন ! অন্ধকারে হাতড়ায়। ছিটোফোঁটা এক ছিলিম তামাকও যদি থাকত গ এ সময় !

কাছে পিঠে এক সঙ্গে কতগুলো শেয়াল।

সাপের মুখে পা পড়লে যেমন, আরো জোরে, শতগুণ জোরে ভয়ঙ্কর চিৎকারটা ঘরের ভেতর ফেটে পড়তেই, টাঙি নিয়ে বাঘের লাফে দাওয়ায় উঠে এল অর্জুন। চন্দ্রধর দরজার গোড়ায়।

ভয়ের-ঘর থেকে বেরিয়ে এল শশিবালা। কাঁপছে শরীর।

'তুমি কেনে বেরুয়েঁ এলে গ রাখালের-মা ?'

'আমার ডর লাগে।'

'ডর ?'

'কেমনটো কচ্চে গ তুমাদের বৌ !'

গলা চিরে, গোটা শরীর মুচড়ে চিল্লাচ্ছে মেয়েটা। এবার ওর মরণ। আজ রাত্তিরেই মরবে ঘরের-লক্ষ্মী।

আঁধারে দেখে না কেউ কারো চোখ। ভয়ের ফিসফিস শশিবালার গলায়— 'বাচ্ছাটো বেরুয়েঁ এয়েচে গ ! মাথাটো দেখা যাচ্চে মন লয়…'

নিশুতি-চেরা আর্তনাদটা বীভৎস। ঝড়ের মাতনে অর্জুন ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর।

বিহ্বল চন্দ্রধর তাকায় আকাশে। উজ্জ্বল শুকতারা। নিঃশব্দে জোড়হাত উঠে আসে কপালে— 'ই তুমার কী বিধেন গ ঠাকুর।'

কাঁদছে শশিবালা— 'একটো কাপড় অবধি নাই গ তুমাদের? গরিব বল্যে কি একটো আব্রু থাকবেক নাই মে'ছেল্যার?'
জন্মের সাক্ষী, যেন চিত্তের আগুন, জ্বলতে থাকে। লালচে আভায় স্তব্ধবাক দুই প্রবীণ প্রবীণা।

অর্জুন বেরিয়ে আসে। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে, আঁধার রাতের আকাশবাতাসনিস্তব্ধ কাঁপিয়ে খ্যাপাটে চিৎকার— 'গাইগরুর বিয়োনি জাননি বাপ্? কত্তো বিয়ানচ জেবনে। হাতের কেরামতিটো দেখাও দিকিন না কেনে ইবারে। লাজসরম নাই গ, লাজসরম সব আকালে খেচে। গাইমানুষের সব এক দর, এক লেয়ম…'

ডান হাতের তেলোয় বাঁ কাধের যন্ত্রণা চেপে গুটি গুটি এগোয় চন্দ্রধর—যন্তনা! কী যন্তনা গ মানুষের জন্মের। মিত্যুর চে' কঠিন…

গাছের ডাল পুড়িয়ে ঘরের মাটিতে একটা মশাল পুঁতেছিল অর্জুন। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আরো বেশি কষ্ট পোয়াতীর। অস্পষ্ট আঁধার ঘরে রক্ত দেখল চন্দ্রধর। চেঁচাড়ি তৈরিই ছিল। হাতে রক্ত লাগে। রক্তাক্ত হাতে চন্দ্রধর গোঙায়— 'আয় চাঁদ, আয়। পিথিমি ছ্যাখ্, বাহারের পিথিমি…'

রাত্রিশেষে কাকের ডাকে শিশুর কান্না।
অঙ্গে অঙ্গে কাঁপুনি। ভাঙা চোয়াল চারিয়ে খোঁচা-খোঁচা দাড়ির জঙ্গলে ঝিলিক মারে দাঁতের পাটি। টলতে টলতে উঠোনে নামল চন্দ্রধর— 'মরদ ব্যাটা আমার বাপ হয়্যানচে গ, ছেল্যার বাপ…'
বাচ্চা বিয়োবে বলে উঠোনে যে আশ্চয্যি চিতে জ্বেলেছিল অর্জুন, সেখানে ধিকিধিকি জ্বলছে শুকনো আগুন। ডানে বাঁয়ে দুহাতের ডানা মেলে অর্জুন লাথি মারল ছাই-এর গাদায়। শুকনো পাতার কালো ছাই ছড়িয়ে গেল উঠোন জুড়ে। বাতাসে।
পুড়ছে তখনও। বুকের পোড়ানি।
পেট-খালাসের পর বৌটা বাঁচল-কি-মরল হুঁস নেই যখন, আগুন চাইল শশিবালা। তুলতুলে নরম বাচ্চাটাকে আলতো করে রাখতে হবে কোথাও, গরম জলে ধুতে

হবে, রক্তকাদা পেটের ফুলটাকে মাটি-চাপা দিয়ে গাঁথতে হবে ঘর উঠোনের বাইরে, যেন শেয়ালকুকুরে না টানে। এখন আকাশ ভরে শকুন।
'লতুন খোকার পরানবায়ু গ ইয়র মধ্যি। মাটির তলায় গেঁথ্যে দাও, মাটি সরেস হবেক। গাছ হবেক, বছর-বছর ফুল হবেক, বাড়বাড়ন্ত হবেক সন্‌সার। মায়ের পেটের ফুল গ। ভগমান দেচেন। ইটোকে লষ্ট কর নাই। খোকার পর্মায়ু…'
লাথিতে লাথিতে অর্জুন বৃথাই ছাই ওড়ায়। আগুন নেই।

এবং যখন, কালো বর্ণ আঁধারের রং হালকা থেকে আরো হালকা হতে হতে বাবুদের শৌখিন মলমলের মতো ফিনফিনে শাদা হয়ে ওঠে, চারদিকে মিঠে কাকের ডাক, রাত-জাগার অবসাদে গাগতরে যখন আর ভার নেই, চোয়ালের হাড়গোড় ভেঙে মস্ত হাই, তখনই, তিন-তিনটে মানুষকে চমকে দিয়ে আচমকা, ঝোঁটিঝোঁটিং টেনে নিয়ে গিয়ে গলা কাটলে যেমন হয়, ভোরবেলাকার ঠাণ্ডা গাঁ-টাকে ছিঁড়েখুঁড়ে বীভৎস চিৎকার। কচি মেয়েমানুষের গলা। যেন মাঠ থেকে উঠে এসে একটানা কান্নাটা ছুটে যাচ্ছে গাঁয়ের দিকে।
সচকিত চন্দ্রধর উঠে দাঁড়াল শক্ত পায়ে।
বেরিয়ে এল শশিবালা— 'কোন্ আবাগী গ! কার আবার কী হল?'
টাঙি-হাতে ছুটে বেরিয়ে গেল অর্জুন— 'তুমরা উদের দেখবেক গ। বেরুবেক নাই। আমি আসচি বলে…'

মানুষের চিৎকার অথবা মাঠে-হারানো গাইবাছুরের ডাক, ঠাহরের আগেই থরথর থরথর কাঁপছে পায়ের তলার মাটি।
উত্তরদক্ষিণ পুবপশ্চিমের নিশানা নেই, ফর্সা আকাশের অদৃশ্য থেকে প্রবল গর্জনে একটা আতঙ্ক যখন কামড়ে ধরেছে বুকের কলজেটা, শেয়াল কুকুরের হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি চিৎকার, গাছের ডগায় ডগায় চিলশকুনকাকশালিকের ডানা ঝাপটানো চিল্লানিতে বনবাদাড়ঝোপজঙ্গলে সাপখোপের ভয় নেই, লাফ মেরে একটা ন্যাড়া শিমুলগাছ ঠেসে দাঁড়াবার পর, টাঙি ফেলে, দুহাতে কান চেপে বুকের কাঁপুনিতে কিছুটা কাঁপল যদিও, আকাশ ভেঙে দত্যিদানোর বিকট আওয়াজটা তাকে ডিঙিয়ে চলে যাবার শেষে যখন চোখ তুলল অর্জুন, আস্তে আস্তে ঘাড়গর্দানায় মাথা উঁচিয়ে দেখল কাণ্ডটা—হেএই বাপ্‌স্, শালা একটা নয়,

ভুটো নয়, বাবাঠাকুরের ত্রিশূলের মতো ছুঁচোল তিন-তিনটে উড়ুজাহাজ উঁড়ে যাচ্ছে মেঘ ছাপিয়ে সগ্‌গের ওপারে এবং বুকের ধুকপুকানির সঙ্গে লেপটে-থাকা আওয়াজটা দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেলে, একটু একটু করে নিজেকে ফিরে পেয়ে যখন সাহস বাড়ল, টাঙিটা তুলে নিল হাতে। জবরদস্ত মরদের মতো লাগছে নিজেকে। আকাশপাতালপিথিমি কাঁপিয়ে দত্যিগুলো উঁড়ে গেল, সে একা মানুষ, মত্‌তে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে দেখল কাণ্ডখানা। পালাল না।
এবং তখনই খামচি লাগে পাঁজরায়। ঘরে তার রোগা বৌ, নতুন বাচ্চা। এমন পিলে-চমকানি কাণ্ড গোরাসাহেবদের! ওরা যদি ভয় পায়! নতুন খোকা বধির হয়ে যাবে।

আরো একটা ঘটনা।
জনমনিষ্যি-শুন্যি খা-খা গায়ে যখন মরণ ছাড়া কথা নেই কারও, সেখানেও কত কিছু ঘটে যাচ্ছে চুপচাপ।
গাঁয়ের কায়েতপাড়ায় অযোধ্যা নন্দীর মেজো মেয়ে মালতীকে ঘিরে হৈহৈরৈরৈ। মুরুব্বিমাতব্বররা খড়ম উঁচিয়ে তারস্বরে শাসিয়ে যাচ্ছেন বেচারি অযোধ্যাকে— ধোপানাপিত বন্ধ ওদের। একঘরে করা হবে অমন বেবুশ্যা মাগীর বাপকে।

মেঠো রাস্তায় পড়ে কাটা-মুর্গির মতো দাপাচ্ছে সোমত্ত মেয়েটা। কেঁদেকেটে জনে-জনে সকলের পায়ে মাথা কুটে চিল্লাচ্ছে গলা ছিড়ে— 'দোষ লিয় নাই গ, আমার কুনো দোষ নাই...'
কুলটা মেয়ের ছোঁয়া নিচ্ছেন না কেউ। ওয়াক থুঃ ওয়াক থুঃ, ঘেন্না, ঘেন্না আবাগীর কপালে।

ঘটনার কাছে এসে, গাঁয়ের আর দশজনের মতোই অর্জুন থমকে দাঁড়াল। কিছুই যখন বোঝা যাচ্ছে না, শুনল—ভিড় থেকে একটু তফাতে ঘোষ-বাবুদের এক নতুন কুটুমকে বেত্তান্তটা শোনাচ্ছেন পেহ্লাদ কোঙার।
রাঙা-আলু সেদ্ধ আর ছোলা-ভেজানো চিবিয়েও যখন আর চলছিল না, শাকসেদ্ধ কচু শালুকপাতা, এমন কি, কচুরিপানাও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও, অখাদ্যকুখাদ্য খেয়ে বাহ্যিবমিতে প্রাণান্ত হয়ে মরছে মানুষ, বিয়ের-যুগ্যি-মেয়ে মালতী বাবলা কাঁটা কুড়োতে গিয়েছিল মাঠের ধারে ছাতারের বনে। সারারাত

ফেরেনি। অভাবের দিনে কে আর ডাকখোঁজ করে কার? পিদ্দিম নেই, লম্ফ নেই, আঁধার ঘরে বসে গোটা রাত্তির কেঁদেছে ঘরের মানুষগুলো। অযোধ্যা নন্দী একা-একা ঘুরে বেড়িয়েছে আঁধার রাতের জঙ্গলে। হাঁক দেবার সাহস ছিল না। বয়স্থা মেয়ে! যদি বেঁচেবত্তে থাকে, বে-থার ভবিষ্যৎ আছে।

কালে কেটে মরেছে মেয়েটা—নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছে কান্নাটা যখন সুর বদলে সরব হয়ে উঠেছিল ভোরের দিকে, উড়োজাহাজ চাপা দিতে পারল না, ডাক ছাড়তে ছাড়তে মালতী নিজেই ফিরে এলো। মিছে কথা নয়, নিজেই কবুল করেছে—বাবলা কাঁটা তোলার পর কাল সাঝের আঁধারে আর দশটা মেয়ে-ছেলের সঙ্গে কাছারিবাড়ি গিয়েছিল কাজের-বুঝ দিতে। মজুরির বার্লি আর বাজরা নিয়ে ফিরছিল। এক বাবু পেছন থেকে ডাকলেন। দলছুট হয়ে যেতেই আর ফিরতে পারেনি। রাত্তির ফুরোলে পালিয়ে এসেছে।

ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ, থুঃ, থুঃ, ওয়াক…থ্‌থু…চোখ মেলে দেখল অর্জুন, সবাই মিলে থুতু ছিটোল মেয়েটার গায়ে। দাপিয়ে দাপিয়ে এক পা থেকে আরেক পায়ে পড়ে কাঁদল মালতী। কাঠের খড়ম ঠুকে বা খালি-পায়ে লাথিও মারল কেউ কেউ। সবার ওপর তারুঠাকুর— 'ই মে'কে ঘরে তোলে ত ধোপানাপিত বন্ধ অযুধ্যার। কেও যাবেক নাই উদের দোরে। জল ছোঁবেক নাই উদের। দিনকাল খারাপ বল্যে কি ধম্মো নাই, সমাজ নাই গ দেশে? ধম্মের বিধি নিষেধ কি চুলোয় গেচে গ সব?'

সব দেখে সব শুনে অর্জুনের লোভ হলো। গিট-বাধা ছেঁড়া ফাটা নয়, লাল সবুজে আস্ত একটা ডুরে-শাড়ি মেয়েটার পরনে। শাড়ির তলায় ফুলকাটা শাদা সেমিজও একটা। তারও তাগদ আছে। মাঠের নিরালায় অথবা ঝোপে-ঝাড়ে তেমন সুবিধেয় পেলে মেয়েটাকে ন্যাংটো করে সে-ও কেড়ে নিতে পারত। না-হয় বাপের রক্তখেকো কাটারি দিয়ে তুলতুলে নরম গলাটা চিরে দেওয়া যেত একটু। কাকপক্ষীও টের পেত না এমন আকালে।

ভাদ্রশেষে মাঠে মাঠে ডগমগিয়ে উঠেছে সবুজ ধানের চারা। দোল খাচ্ছে বাতাসে বাতাসে। আউশের ক্ষেতে সোনার বরণ। ডাঙার ধার ঘেঁষে আলে আলে মা-লক্ষীর আবাহনে চামর বুলোয় শাদা কাশের বন।

কিন্তু অতিভোজেরও মরণ আছে। কত্তাবাবুদের মরণ।

সাতসকালে আসেন কেদার কোঙার—'তুর গাইবলদগুলান লিয়েচে ভারুঠাকুর। তুর জমিটোও নিকি লিখে দিচ্ছিস র‍্যা চন্দর ?'

কথা কইবার সাধ আর নেই। পেটের জ্বলুনিতে ঘেন্না উগড়ে আসে। ওয়াক-থু।

নতুন খোকা চিল্লাচ্ছে ঘরে। মায়ের বুকে দুধ নেই। টাঙি নিয়ে তেড়ে এল অর্জুন—'কী! কী কতা বলতে এয়েচেন বটে!'

কোঙার ভয় পেল—'কী, ইটো কী? ড্যাকাত মাত্তে এলি নিকি তুই?'

'ড্যাকাত লয় গ। ড্যাকাত লয়, শুকনি। দিনদুকুরে শ্যালশুকনি ঘুচ্চে ইখেনে...' বুক চিতিয়ে দাঁড়াল অর্জুন—'কেনে এয়েচেন? বলেন দিকিন...'

'বলছেলম...'

'অঁ, বলেন...'

আরো দু কদম পিছোয় কোঙার—'তুদের জেতের সব লোক শ'রে যে' মচ্চে। আউশ উঠচে ইদিকে। ক্ষেতির কাজ কব্বার জন নাই দেশে। তা তুরা যে কজনা আচিস, বাঁশ কাইটতে নেগেচিস ক্যাছারিবাড়ির বাবুদের থানে...'

'অভাবের দিনে যা-হোক দেচ্চেন বাবুরা।'

'ভিনদিশি বাবুরা আর কদিনের র‍্যা! দেশগাঁয়ে আমরাই ত থাকব। দেখব বেপদেআপদে...'

'অঁ, খুব ত দেখতে নেগেচেন গ! আকাল এল ত গরিবমানুষের হাড় চিবুতে নেগেচেন শুকনির মতন। জমি-জমি কচ্চেন! জমি বিচব নাই। অঁ, হক কতা...'

উদ্ধত অর্জুনের মুখোমুখি হতবাক কেদার কোঙার—'তাই বল্যে আমাদের কাজ কাম দেখবি নাই? ডাকলে আসবি নাই?'

'আসব নাই কেনে গ কত্তা? জমি বিচব নাই। গতর বিচব। চাষের কাজকাম না থাকে ত ধানের দাদন দিবেন, কচ্ছ?'

কোঙার পিছু হটলেন। নিরাপদ দূর থেকে—'এত বাড় ভাল লয় র‍্যা অজ্জুন। ঘরের দোরে চোখ্ রাঙাচ্চিস বটেক। কাজটা ভাল কল্লি নাই। এক মাঘে শীত যায় না র‍্যা শুয়ার। বুঝবি, বুঝবি দুদিন বাদে...'

কেদার কোঙার চলে যেতেই চন্দ্রধর টলতে টলতে কাতরাতে কাতরাতে আছড়ে

পড়ল দাওয়ার ধারে। ডানহাতটা বাঁ কাঁধের ওপর। ছেলের হাতের ছোবল। পেটের মোচড়ানিতে টানটান যন্ত্রণা—'কাজটো কি ভাল কল্লি র‍্যা অজ্জুন ?'

'কেনে ?'

'হাড়বজ্জাত বুড়োর মুখের উপরি এত্ত বড় কতাটো বল্যে দিলি র‍্যা—জমিটো বিচব নাই। গাইবলদের বদলা আধবস্তা ধান ছেল, সি-ও ত গেললম। কেপ্পনের মতন ফ্যানাভাতে ফ্যানাভাতে চালায়েঁ এখনে ফতুর হঞে গেছি…'

'কেনে গ! বাঁশবাবুরা কাজ দেচেন। বাঁশ কাটব, খোরাকি পাব—বাল্লি আর বাজরা গ…'

'বাজরা!' ভ্রূ কুঁচকে তাকাল চন্দ্রধর—'উটো কী বটেক ?'

'সি ত আমিও জানি নাই গ। তবে বটেক কিছু পেট ভইরাবার অন্ন…' গলার স্বর কিছুটা চঞ্চল অর্জুনের—'কটো ত দিন গ মুটে। শালিধান উঠবেক কটো মাস বাদে…'

পৌষশালির ধান এখনও তিন মাসে। একটা রাতই ফুরোয় না যখন, তিনমাস বহু বছর। হালফিলের বার্লি আর বাজরা

চন্দ্রধর শূন্য চোখে আকাশের দিকে তাকাল

শারদ মেঘে এক ঝাঁক বালিহাঁস।

মেঘের বর্ণে ভাসমান তামাকের হালকা ধোঁয়া।

তারিণী ভট্‌চায্যির সদরে সভায় বসেছেন গাঁয়ের মাতব্বরমুরুব্বিরা। একমাত্র কেলো সামন্ত ছাড়া সকলেই উপস্থিত—এ তো বড়ো দিগদারির কথা। একটা বিহিত চাই এসব অধম্মের। একটা সুপরামর্শ দরকার।

তাঁদের লড়াইটা এবার হাড়হারামজাদা ওই শহরের বাবুদের সঙ্গে। গাঁয়ের বাঁশ কাটতে দেবেন না তাঁরা। নচ্ছার ওই বাঁশের জন্যেই চাষআবাদ লাটে উঠেছে সব। মাঠ থেকে আউস উঠছে না ঠিকমতো, পাট-পচাই-এর কাজও হয়নি ভালো করে। অথচ ধানে পাটে এখন মহাযুদ্ধুর চড়া দর। ছোটজাতের লোকেরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। যে কজন আছে, তারাও আর মান্যি করছে না সমাজপতি মোড়লমাতব্বরদের। ধম্মো বলে আর কিছু থাকল না দেশে। গেরস্তঘরের বয়স্থা মেয়ে লুট…

সুতরাং অযোধ্যা নন্দীর মেয়ে মালতীর ঘটনাটাই বড়ো বেশি প্রাধান্য পেল

পানতামাকের সভায়। সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত—এ নিয়ে তারা দরবার করবেন জমিদারবাবুর কাছে। যাবেন থানায়।
যে করেই হোক, দেশগাঁ থেকে হটাতেই হবে বাঁশবাবু উৎপাতগুলোকে।

বড়ো রকমের একটা ঝামেলা পাকিয়ে ওঠার আগেই অর্জুন বা অর্জুনের মতো মানুষেরা স্বস্তি পেল নতুন করে।
জমিদারবাবু স্বয়ং লোক পাঠালেন গাঁয়ে, ঘোড়ায় চেপে থানার দারোগাবাবুও ঘুরে গেলেন এক পাক। পাড়ায় পাড়ায় ঢোল পেটাল গগন চৌকিদার, সঙ্গে তার ব্যাটা রাখাল— 'এতদ্বারা গ্রামবাসীদেরকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, মহাযুদ্ধুর কায্যে বাঁশ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। সি কারণে বাঁশবাবুদের কায্যে কেহ বিঘ্ন করিলে মহামান্য রাজবাহাদুরের বিরুদ্ধকায্য বলিয়া দণ্ড পাইবেক…'

বেশ একটা বুদ্ধি খেলল অর্জুন।
গাঁয়ের লাগোয়া পোয়টাক ক্রোশ দূরে কালকেতুগড়ে জমিদারের পুরনো কাছারি-বাড়ি। দশ গাঁয়ের বাঁশঝাড় ইজারা নিয়ে সেখানেই থাকেন শহরের বাবুরা। হাজারে হাজারে বাঁশ এসে পড়ছে প্রতিদিন। ধানের ডাঁই-এর মতো বাবলা-কাঁটা। ক্যাঁচর ক্যাঁচর গরুর-গাড়ি বোঝাই করে বাঁশবাবলা নিত্যি কোথায় যায়, জানে না যদিও, দেখে ভিড়মি খেল দশ গাঁয়ের মানুষ—হেএএই বাপ্স্, এসবও নিকি যুদ্ধুফুদ্ধু-এ লাগে!'
লাথিঝাঁটার শেষে সেদিন দুপুরে মালতী আবার ফিরে গিয়েছিল বাবুদের কাছারিবাড়িতে। বাপ অযোধ্যা নন্দী তাকে গ্রহণ করেনি।
সেটাই অর্জুনের বড়ো লাভ। এত বড়ো বড়ো বাবুদের বাঁধা-মাগী তার গাঁয়ের মেয়ে—হাতের মুঠোয় মস্ত সুযোগ। আর দশটা-গাঁয়ের মানুষের চেয়ে একটু আলাদা খাতির চাইল সে। কেঁদেকেটে পড়ল আড়ালে—সেদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনাই সে দেখেছে। দুঃখুতে বুক ফেটে যাচ্ছিল তার। শুকনি বুড়গুলার মরণ হয় না গ! এখন এই দুদ্দিনে গাঁয়ের মানুষ বলে যদি একটু…
বাঁশকাটার মজুরি কয়েক চামচ গুড়্বার্লি আর কয়েক মুঠো বাজরার সঙ্গে আস্ত একটা কাপড় সে বাগিয়ে নিল আড়ালে। লাল ফুল-পাড় সবুজ জমিনে চেকনাই একটা শাড়ি, তৎসহ আরো দুর্লভ কিছু গুছিয়ে নিয়ে কৃতজ্ঞতায় ভেঙে পড়ল মালতীর কাছে—গাঁয়ের আর সব বৌ-ঝিরা যখন ঘরের বাইরে আসতে পারছে

না দিনেমানে, গায়েগতরে একটু জোর পেলে, চাই কি, বাবলাকাঁটা কুড়োবার কাজেও লেগে যেতে পারবে সাবিত্রী। আকালের ঘরে আরো একটু বাড়তি রোজগার। অর্জুন খুশির আবেগে উচ্ছল—'তুই, তুই আমাকে বাঁচালি র‍্যা বুন ··'

পিঠভাঙা এলোচুল নাচিয়ে শাকচুন্নির ঢং-এ খিলখিল খিলখিল হাসি মালতীর—'কাঁটা তুইলতে এলে যে তুমার বৌ আমার মতন পটের বিবি হয়্যা যাবেক গ! দেখচ নাই কেমন সুখ আমার ইখেনে। থালা ভইর‍্যো গরম গরম ভাত চারবেলা···'

তিরতির তিরতির, বাঁশপাতাব কাঁপুনিতে ভয়ার্ত অর্জুন ছুটে পালায়, পালায় ভূতপেত্নীর খাবলা থেকে।

হাসিটা পেছনে তাড়া করে। অমাবস্যায় শ্মশানে পেল্লাই তেঁতুল গাছে বাতাসের শব্দের মতো—'ছুটচ কেনে গ অজ্জুনদা? পালাইস্থ কেনে? শাড়িটো নিলে, সেমিজটো লিবেক নাই? চাল?'

শেষ-বিকেলের রং ধরেছে তখন। শাড়ি এবং অন্যান্য দুর্লভ বস্তু কচুপাতায় মুড়ে টলতে টলতে কাঁপতে কাঁপতে ছুটছে অর্জুন।

আঁৎকে উঠল ঘরে ফেরার পথে। জেলেপাড়ার মুখে গাছে গাছে ডালে ডালে শকুন। নড়ছে না চড়ছে না, ঠায় বসে থেকে মাঝেমধ্যে বিশাল ডানা ঝাপটাচ্ছে দুটো-একটা। এক ডাল থেকে আরেক ডালে, গাছ থেকে গাছে উড়ে যাবার নীচে মাটিতে ভীষণ ছায়া।

ঠাণ্ডা রক্তে চুপসে গিয়ে অর্জুন, আরো যারা দুচারজন দাঁড়িয়ে ছিল, গাঁয়েরই মানুষ, তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'দুলোদাটো মরে গিছে মন লয়···' বুড়ো হরিধন মাঝি গভীর নিঃশ্বাসে।

দুলুখুড়ো! হারানের বাপ! খিদের কামড়ানিটা আরো জোরে খামচে ধরল পেটের ভেতর। কুঁচকে আসে অর্জুন।

'দাঁড়ায়েঁ দাঁড়ায়েঁ দেখব নিকি গ এমন দেশ্য?'

'দেখবেক নাই ত করবেকটো কি বটেক?'

প্রশ্নটা কঠিন। কজন মাত্র মানুষ। আশেপাশে ঘরদোরে কেউ নেই। সব উদোম। তেমন বিপাকে পড়লে দশজনে মিলে বাঘ তাড়ানো যায়। কিন্তু শকুন?

'শ্যাল সিধোল ঘরে। বুড় মরেছেল ত! নিকি পরানটো থাইকতে-থাইকতে শ্যাংড়া বুড়র হাড চিবুত্তে নেগেচে উয়রা ?'
'চিল্লানিটো শোনলম গ ত্যাখন…'
'জ্যান্ত বুড়র চোখজোড়া ঠুইকরে ঠুইকরে খেলেক গ শুকনি…'
জ্যান্ত মানুষের চোখ ঠোকরাচ্ছে শুকনি! গতর টানছে শ্যালকুকুর! এমন একটা দুখের ভাবনায় রক্তে রক্তে, বুকের কল্‌জেয় ঠাণ্ডা বরফের ছ্যাকা পেয়ে অর্জুন স্তম্ভিত নির্বাক। ঠিকরে পড়ছে চোখ। বাক্যি নড়ে না ঠোঁটে।
চোখে ভাসে দুলাল মাঝি। তিন-কুড়ি বয়স-পেরোন বুড়ো। কবে কোনকালে ডান পা-টা ভেঙে গিয়েছিল ভাই-এ ভাইএ শরিকি ঝগড়ায়। আলাদা উনুনে ভাগাভগির সময় নাকি রাগে কুড়ুল মেরেছিল ছোটভাই রগচটা শেতল মাঝি। এই আকালেও বুড়োকে দেখল না কেউ। পড়শিরা নেই। হারান পবান গোববা তিন ছেলেই বালবাচ্চামাগ্‌ নিয়ে শহরে পালাল। ম্যালেরিয়ায় কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো পড়ে পড়ে চেঁচাত দাপাত শাপাস্তি গাইত ঘরে বসে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভিখ্‌ মাগতে বেরুত গেরস্তদের দোরে। এই আকালে কে আর কাকে ভিক্ষে দেয়!
যখন পলকে পলকে বিকেলের আলো বদলে বদলে অমাবস্তের আঁধারে, যে আঁধারে শকুন নেই অথবা পুরো আঁধারটাই শকুনের মস্ত ডানা, বুকের ভয়-ভয় পুটলিটার ভেতর নিজেকে সিঁধিয়ে নিয়ে যেন আঁধার নিয়েই ঘরে-ফেরা। শুধু আঁধার নয়, কচু-পাতায়-জড়ানো সবুজবরন শাড়ি, গুড়বালি বাজরা আর কেউ-টের-পায়নি এক পরম বস্তু—প্রায় আস্ত একটা দেশলাই, হলুদ গন্ধক ছোঁয়ান কিছু প্যাকাটির কাঠি।

চন্দ্রধর ঘাপটি মেরে ছিল কোথায়, ছুটে এসে খাবলে ধরল হাত— 'কী এনেচিস র‍্যা বাপ! দে, দে বাপ, দে দিকিন টুগদু, খাই…'
মাছের মতো পিছলে গেল অর্জুন— 'লয়, ই তুমার বৌ খাবেক আগে। তুমার লাতি ‥'

বিদীর্ণ আকাশ, ভেঙে ভেঙে চৌচির আঁধার রাতের দশদিক। থিকথিক কালোয় গা লেপটে ক্ষিধেয়-উন্মাদ চন্দ্রধর পাক খেয়ে পড়ল চিৎকারে—'দুলু মাঝি আমার চে' বয়েসে বড় ছেল নাই র‍্যা অজ্জুন। উয়রে শ্যালশুকনিতে খেলেক।

ইবারে আমার জমিগুলান থাকবেক নাই। তারু শুকনিকে নিখে দিব। উ জমিটো আমার বটেক র‍্যা, তুর লয়…'

বাপের আছাড়িবিছাড়ি দাপাদাপিতে বুকের কাঁপুনি নেই। ঘরের পিদিম জ্বালায় অর্জুন।
ভাঙাঘর কাঁপিয়ে চিল্লাচ্ছে বাচ্চাটা। ঢ্যাম কুড়কুড় বাদ্যি বাজে না বুকে
জেল্লা-মারা নতুন কাপড়ে সোহাগ ঢলে না বৌ-এর গতরে
মায়ের বুক কামড়ে মাই চাটে খোকা। চিল্লানি। বৌটা কাতরায়
ড্যাবড্যাব চোখ মেলে অর্জুন তাকিয়ে থাকে। মেয়েমানুষের শরীরটাই শালা/ এক তাজ্জব। কোথায় ছিল এই বাচ্চা? এল কুখিকে? সে তো ধানের চারায় এমনতরো নেয়ম।
অবুঝ অর্জুন ছুটে যায়— 'কী? কী র‍্যা বৌ? কী হল তুর?'
বাচ্চাকে বুকে চেপে ডাক ছাড়ে সাবিত্রী— 'ই আকালে এমনটো মরণ এল কেনে গ পেটে? ইয়র অন্নও কি যুদ্ধু-এ খায়? আমার বুকে যুদ্ধু নাই…'

ছাল-ছাড়ানো হাঁসমুর্গি যেমন, লিকলিকে রোগা পটকা বাচ্চা-কাখে সাবিত্রী বন-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে পাগল হয়ে উঠল। যেন মানুষের বাচ্চা নয়, একটা পোকা। পোকার মতোই রোদে পুড়ে জলে ভিজে মরবে জেনে মারধোরধমকেচিল্লানিতে নিজে পাগল হয়ে বুকে আগলে রাখে সোহাগের পুতুল। এনামেলের বাটি-হাতে গেরস্তদের ঘরে ঘরে কাঙাল আর্তনাদ— 'টুকচান ফ্যানা দিবেন গ মা…'
বুক চিরে যায়। চন্দ্র সাক্ষী, সুয্যি সাক্ষী, আকাশবাতাসগাছপালা, সাক্ষী ভগমান। পাপ করি নাই গ জেবনে, ক্ষেতি কার নাই কারুর··
ভাত খেয়ে ফ্যান বিলোবার ভদ্দর গেরস্তও তখন দুচার ঘর মাত্তর। মুখ দেখে দান করেন ভাগ্যমানীরা। দয়া পায় না সাবিত্রী।

দুধেল গাইবাছুর নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে অযোধ্যা নন্দী। কেনার মানুষ নেই।

শিউলি ঝরছে সকালে। ভাদ্রশেষে এখনও ঝাঁকড়া-মাথা কদমগাছে মোয়ার মতো সুডোল ফুল। কিচিরমিচির হরেক পাখি।
বামুনবাড়ির সামনে ফাঁকা জায়গাটায় গোটা-এক গাইবাছুর। হামলে পড়ল সাবিত্রী— 'কী, কী বিইমান লা তুই সুখদা?'

গোলগাল পেটটা ঢাউস বেড়ে উঠেছে এরই মধ্যে। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে জাবর কাটছে নিঝঝুম। পাজর ভেঙে কান্না উগড়ে ওঠে— 'চিনতে পাচ্চিস নাই লা খান্‌কি মাগী ? তুকে সোহাগ কর্যে চর্‍যানি দেতম, জাবনা দেতম র‍্যা পিতিদিন…' দীর্ঘ প্রলম্বিত ঘাড় তুলে তাকাল অবোলা। টলটল টলটল গভীর একজোড়া বোবা চোখ। তাকিয়ে থেকে, তাকিয়ে থেকে সাবিত্রী স্থবির কান্নায় থেমে যায়। অপলক চাউনিতে দুচোড়া অসম চোখ যেন পাথর বনে গেছে।

সাবিত্রী সচল হলো। যেন স্বর্গের আশীর্বাদ। শরতের শিউলির মতো গায়ের ওপর শাদা শাদা মুড়ির দানা।

'খা, খা লো বৌ, খা…'

সাবিত্রী চমকে তাকাল।

পেছনে ছাতিম গাছের তলায় ঢং খেলিয়ে হাসছে মালতী। কোঁচড থেকে মুঠো মুঠো মুড়ি তুলে খাচ্ছে লোক দেখিয়ে। আকালে মরণে এত দুঃখু মানুষের, যেন মুডি-চিবোনোটা মস্ত এক রগড গতব নাচানো মাগীর।

ঘেন্না ঘেন্না ঘেন্না। ও মাগীর মুখ দেখলেও পাপ। ট্যাঁ-ট্যা-কান্নার ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে, অনেকটা ব্যাঙের মতো হাঁটু উঁচিয়ে বসে ঘাসদুব্বোর খাঁজে খাঁজে মুড়ির দানা কুড়োয় সাবিত্রী। হাঁ-করা ছেলেটার মুখে পোরে, নিজেও খায়। পাখিরাও নেমে এসেছে এপাশে ওপাশে।

'অঁ, নইলে আর বলচি কী তুকে। ই ত দ্যাখ না কেনে, কাল রেতে মাংস হল। রাঁধতে হল বাবুদের জইন্যে। মাংস আর ভাত। ব্যস…'

দানা কুড়োতে কুডোতে সাবিত্রী চোখ তুলে তাকাল।

'দুহাতে ট্যাকা হুটতে লেগেচে শ'রের বাবুরা। কাঁড়ি কাঁড়ি ট্যাকা আর ফুত্তি উয়দের। গেলাসে গেলাসে লেশা রাত্তিরবেলা। টুকচান হাতপা ছেড্যে হাই করে যি বসব, টুগদু জিরুব, তারও কি জো আচে লো। এত্তগুলান মদ্দামানুষ। হাড়মাস চিবিয়েঁ খেচ্চে, গাগতরে ব্যথ্‌থা ধরায়েঁ দেল…'

পাছা নাচিয়ে হেলেদুলে আড়মোড়া ভাঙে মালতী। যেন সত্যি-সত্যি ওর গাঁটে গাঁটে, সর্ব অঙ্গে ব্যথা। খিলখিল হাসি—'বাহারের শাড়িটোয় তুকে বেশ মানায়েচে লো বৌ। সিদিন অজুনদা যেয়ে হাতটো ধর্যে বলল—আমার ল্যাংটো বৌ-এর এজ্জৎ যায় লা মালু। তা তুই আমার গাঁয়ের মে'… তা দিয়ে দেলম শাড়িটো। বাবুরা দেচলেন সি পেরথম দিন…'

সাবিত্রী তাকিয়ে থাকে। বোঝে না রহস্য কী।

'খা লো খা। লে...'

সাবিত্রী চমকে উঠল। পাছা দুলিয়ে ঢং খেলিয়ে এগিয়ে আসছে ডাইনি এবং অবিশ্বাস্য, ওর কোচড়ের এতগুলো মুড়ি ও সত্যি দিতে চায়।

এপাশে ওপাশে তাকাতে আরো বেশি ভয়—ছেনাল মাগীর সঙের নাচ দেখতে গাছগাছালি ঘরদোরের ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে এসেছেন বামুনপাড়ার বৌঝিরা। ব্যাটাছেলেদেরও কেউ কেউ। ওদিকে কলাগাছের আড়ালে তারুঠাকুর স্বয়ং। ঘোমটা-টানার অবকাশ নেই। এত এত মানুষের সামনে মাথার আঁচল মাটিতে ছড়ায় সাবিত্রী।

এবং গাঁয়ের মানুষের ভিড় দেখেই যেন বেলাল্লাপনা বাড়ল মাগীর। কোঁচড়ের সব মুড়ি নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে শাকচুন্নির হাসি—'খা বৌ, খা। খেয়ে খেয়ে তাগৎ বানায়েঁ লে শরীলে। যৈবন আচে, বয়েস আচে তুর। আঁটোসাটো বুকপাছা। ভাবনা কি লো তুর...'

শাড়িতে বাধা মুড়ি আর বাচ্চাকে বুকে নিয়ে ছুটতে গিয়ে হুমড়ি সামলায় সাবিত্রী। সব্বোনাশ! হাত বাড়িয়েছে মাগী। ছোঁয়া লাগলে ছেল্যার অকল্যেন।

পেছনে পাছা দোলানো নেত্য আর হাততালি ডাইনির—'সগ্গে যাবি লা বৌ। তুদের গাঁয়ের সব ঘরের বৌ-ঝি সতীলক্ষীদেরকে লিয়ে যাব সগ্গের থানে। লাচবি। ঠাকুরদেব্‌তা তিপ্তি পেলে সোয়ামির জেবন ফির‍্যে পাবি, জমিজিরেত ফির‍্যে পাবেক তুদের শ্বউরভাতার, তুদের ছেল্যার কল্যেণ...'

ছুটতে ছুটতে সাবিত্রী থমকে দাঁড়াল। দূরে দাঁড়িয়ে শোনে, দেখে তারুঠাকুরকে। রাগে বেসামাল বুড়ো চেঁচাচ্ছে দু হাত নাচিয়ে—'ই মাগী ত আরেক কাল হল গ। নিত্যি নিত্যি আইসবে সক্কালবেলা আর ঢং খেলাবে ভদ্দর গেরস্তঘরের দোরে। খড়ম পিট্যে থেঁৎলে দিব কি উয়র মুখ, দারোগাবাবুর লুটিশ লিয়ে বেরুয়েঁ পব্বে উ হারামি গগনটো...'

নিজেরই মস্ত ভুড়িটাকে ঢোল বানিয়ে দুহাতে কাঠি-বাজানোর ভেংচি বামুন-বুড়োর মুখে—'যুদ্ধু, মহাযুদ্ধু চলচে গ এখনে। মহামান্য রাজাবাহাদুরের কায্যে বিঘ্ন করিলে শাস্তি পাইবেক...যেন মহাযুদ্ধুর কামান বন্দুক আগলুয়েঁ রাখচে গ উ ছেনাল মাগীটোকে...'

ক্ষিধেয় ক্ষিধেয়, ক্ষিধে-ভুলে যাওয়া থিতোনো শরীরে সাবিত্রী ছোটে, ছুটতে থাকে, হাঁপায়—'মর মর মাগী, তুই মর। থুঃ থুঃ ওয়াক থুঃ, এত্ত লোক মচ্চে গ আকালে, বেবুশ্যা মাগী, মরণ হয় না তুর…'

মালতী নয়, মরতে বসল অর্জুন। সাবিত্রীর যেমন সত্যবান।
কালীপুরের বাঁশঝাড়ে গাছ কাটতে কাটতে হঠাৎ কাপুনি দিয়ে জ্বর এল দুপুর-বেলা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ লাল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। গনগনে আগুনের রোদে হামা দিয়ে দিয়ে মাটি হাতড়ে, আরো বেশি পুড়তে পুড়তে ঘরে ফিরল যখন, এক পলকে ডাক ছেড়ে ঘর থেকে ছুটে এল সাবিত্রী। আছড়ে পড়ল উঠোনে—ঘরে মরণ এল ইবারে। মব্বে মানুষটো…

ছেঁড়াফাটা সেলাই-উপড়োনো কালো-কুটকুট্টি একটাই তো কাঁথা বাশের বাতায়। বাচ্চাটা কাঁদছিল। লুটিয়ে পড়ে, ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাপায় অর্জুন— 'আর বাঁচব নাই, বাঁচব নাই বাপ। ইবারে সাধের জমি-গুলান…'
রোজের গুড়বার্লিবাজরা আজ দেয়নি বাবুরা।

জমি! চন্দ্রধর পিঠটান শিরদাঁড়ায় নেমে এল উঠোনে। এত বড়ো ফাঁড়া কাটিয়ে ছেলে-বৌ উঠে দাঁড়াল যদি, এবার ছেলে আর নাতি! এখন আর কোনো মানেই হয় না বলার—জমি বিচব নাই।
ছেলের-হাতের-কোপ বাঁ কাঁধের জ্বলুনিতে এখনও দগদগে ঘা। শুধু লাঙলের টিপনি ধরতেই তো নয়, বাঁশ কাটতেও হাতটা লাগে। চকচকে ধারালো কাটারিটা সে কাঁপতে কাঁপতে তুলে নিল হাতে। কাটারি নয়, অমাবস্যের রাতে মায়ের থানে পাঁঠা বলির খাঁড়া।
ঘর ফেলে উঠোন ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

বাতে বা ব্যামোয় নয়, হাতের কাটারি থাবলে ধরে, থুথুরে কুঁজো হয়ে এগোয় চন্দ্রধর। নিজের ছায়াকেই তখন ভয়।
ক্ষিধে। পেট-পোড়ানি ক্ষিধেটা ভেতর থেকে টেনে ধরছে শরীর।

সামনে মাঠ। ডাগোর ডোগোর পৌষশালির ভগায় দুধ জমতে শুরু করেছে সবে। গাছপালায় ঘাসেজঙ্গলে এখনও সাবেকি সবুজ।

যেন নিজেই বইছে নিজের শব। হাঁপাতে হাঁপাতে কাছারিবাড়ির দরজায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল চন্দ্রধর।
বাবুরা সাফ-সাফ জানিয়ে দিলেন— 'হবে না। তোমাকে দিয়ে চলবে না বাপু। তাগদওলা জোয়ানমরদ লোক চাই আমাদের।'
'বুড় হাড়ের তেজ ত দেখেন নাই গ বাবু…'
'আরে বাবা, এ তো শুধু বাঁশ-কাটাই নয়। আরো কাজ আছে। বাঁশ কেটে বয়ে আনতে হবে। গাঁটগুলো চাঁছতে হবে, গাড়িতে তুলতে হবে। একে বুড়ো তাতে আবার একটা হাত জখম। যা করেছিস শরীরটা, তুই তো দাঁড়াতেই পারছিস না…'
কাছেই ছিল কেলো সামন্ত। বাবুদের সাঙাতিতে নেশাভাঙ শিখেছে জোর। দিনদুপুরেই বেসামাল— 'খুব যি বুক চেতিয়েঁ কতা কইছিলি র‍্যা চন্দর। সিদিন সি চরণের ঘরে। মনে নাই? মাগী লিয়ে ফুত্তি লুটছিলি র‍্যা সিদিন। বাবুয়ানি লেশা। এখনে কেনে কাচুমাচু? সোহাগীর মাগী কুথা তুর?'
চারপাশে হাসতে হাসতে দোল খাচ্ছেন বাবুরা। যেন পয়সা দিয়ে বাঁদর নাচ দেখার সুখ।
চন্দ্রধরের হাতে খাঁড়া নাচে, খাঁড়া কাঁপে—ই শালা আরেক শালকুত্তার চিল্লানি। সেই বৌটাকে আচমকা মনে পড়ে যায়। আহা, কি কচিক· সরলপানা মুখ ছিল গ উয়র। চারদিকে তাকিয়ে চন্দ্রধর খোঁজে সেই মুখ। এদের নরকে এদের খপ্পরে…
টকটকে লাল সামন্তিবুড়োর চোখ। মেদ-থপথপ পাহাড়ের শরীরটা বয়ে এগিয়ে আসছে বুড়ো। টলছে চন্দ্রধর। যন্ত্রণা।
'কাঙাল দুঃখীদের মাথায় কাঁঠাল ভেইঙ্গে আকালের মকায় কটো জমি কল্লি র‍্যা চন্দর? বাবুমানুষ তুই…'
হাতের খাঁড়া ছুঁড়ে ফেলে, সহসা, লুটিয়ে পড়ল চন্দ্রধর— 'জমিগুলান বিচব গ কত্তা। বিচব। লিবেন গ আপুনি?'
'আহাহা, কী হল। হল কী তোর?' বাবুরা নেমে আসেন উবু হয়ে।

'আহা ভ্‌ভ্‌তু, কেষ্টর জীব...' কেলো সামন্ত— 'বলি উ চন্দর, এমনটো কচ্চিস কেনে র‍্যা ?'

সেই পিত্তির দলা। পেটের মোচড়ানি থেকে বুক গলা ভেদ করে বেরিয়ে আসতে না-পারার যন্তনা। পিখিমি ঘুরছে। কেমন ঘোলাটে গাছপালাআকাশ মানুষজন।

'জমিটো বিচবি, সি ত ভাল কতা র‍্যা। বড্ড ভাল পেস্তাব। দাঁড়া, কাগজপত্তর লিয়ে আসি। লেখাপড়াটো হয়্যা যাক, টেপসইটো দে...'

'এঁটোকাঁটা, আপুনেদের ফ্যালা-জিনিস যা আচে টুগচু দিবেন গ বাবু। আমি বাঁচব নাই...'

'বালাই ষাট, উ কতাটো কি বলে নিকি র‍্যা...' মাতলামি ছুটে গেছে বুড়ো সামন্তির। বড়োই সজীব।

কাগজ আসে। বেগুনে-কালির গদি-আঁটা-ছাপের বাক্‌শোটা।

'দে বাপু, সুমতিটো হইচেঁ য্যাখন, টেপসইটো দে দিকিন জলদি করো। শালা বড্ড মকায় আজ পেয়েচি বটেক ব্যা তুকে...'

বাঁ-হাত তুলতে হবে। বাঁ-হাতেব বুড়ো আঙুল। চন্দ্রধর নিজেই যেন নেশা-খোব মাতালের মতো। শুধু হাত নয়, গোটা শরীরটাই কাঁপতে কাঁপতে গেঁথে যেতে চাইছে মাটির তলায়।

'টিপসইটা দিয়ে দাও হে, দিয়ে দাও। দেশেব অবস্থা খুব খাবাপ। হাজার হাজার মানুষ না-খেতে-পেয়ে মরছে কলকাতার বাস্তায় ফুটপাথে। জানো না তো, পড়ো না তো খববেব-কাগজ। রোজ যাওয়া-আসা আমাদের...' পালা করে একে একে বাবুবা কানেব কাছে।

চন্দ্রধর ঘেন্নায় তাকাল। আরো কটা কুত্তা।

এবং যখন, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টায় পাথর নাড়ানোর মতোই শক্ত নিজেকে তুলে দাঁড় করানো, প্যাকাটির মতো সরু সরু দুটো হাতেব দিকে চেয়ে চন্দ্রধর খুঁজল নিজেকে। নিত্যি-দেখার-চোখে হদিশই পায়নি এতদিন, শুকিয়ে শুকিয়ে সমর্থ হাতজোড়া হাত নেই আর, সতেজ কলা গাছের শুকনো পাতার মতো ঝুলছে। শরীরটা শরীর নেই, আগুনে দগ্ধালে যেমন হয়, হাড়চামড়ায় শাকচুন্নি।

'যাচ্ছিস কুথাকে র‍্যা চন্দর ?'

উদাস চন্দ্রধর ফিরে যাচ্ছিল। পিছু-ডাকে থমকে দাঁড়াল—'সি ত হবেক নাই গ, হবেক নাই।'

'কেনে হবেক নাই ?' যেন একটা আচমকা থাপ্‌পড়ের অপমান। ঘাড়-শিরদাঁড়ার টানে কেলো সামন্ত সোজা হয়ে দাঁড়াল—'শালা, এখনও তুর থুতনির জোর দেখছি বটেক র‍্যা হারামজাদা...'
ঘেন্নার দিকে দুবার চোখ ফেরাতে নেই। তাকায় না চন্দ্রধর। সামন্তির হল্লায় ভ্রূক্ষেপ নেই। হাঁটতে-না-শেখা শিশু যেমন, অথবা অক্ষম কুঁজো বুড়ো, টলতে টলতে এগোয়—'আমি বুড় বটে গ, আমি মইরব, আজই মইরব। তবে আর ই পাপটো করি কেনে ? উ জমিটো আমার ব্যাটার হবেক, আমার লাতির। তা অজ্জুনকে শুধুইচেন না কেনে...'

'ভাল ভাল খেতে পাবি র‍্যা হতভাগা। ভাল খাবার র‍্যা। বাবুরা খায়...'
আকুল সামন্ত টালটামাল নেশার পায়ে এগোতে চেয়েছিল। বাবুরা বাধা দিলেন। ক্ষিধের জ্বালায় পাগল হলে মানুষ নাকি জলাতঙ্ক রোগী। কামড়ালে রক্ষে নেই। এমন সব কথাই নাকি কোথায় লিখেছে কাগজে।

দূরে, নিমনিসিন্দা গাছের নিচে কয়েকটা কুকুর, কয়েকটা কাঙাল।
কুকুর কাঙালের ভোজে লোভ হলো না তবু। আকাশের দিকে তাকাল চন্দ্রধর। আজ সে মরবে। মরবেই। মরণে ডর নেই তাব। কিন্তু
শিউরে উঠল। কাছারিবাড়ির পেছনে, পুকুরপারের ওপারে বুনোকলমীর জঙ্গল থেকে তাকে ডাকছে কেউ! কোন্ ছেনাল মেয়েমানুষ! আরো একবার এপাশ ওপাশ তাকাতে হয়। কেউ নেই কোথাও। তাকেই! পেটপোড়া দিনে এ আবার কোন্ রহস্য গ! বুড়ো ধামড়া অভাবী মানুষকে ঘোমটা . কে হাতছানি দিয়ে ডাকে কোন্ সোহাগী মাগী ?

ঘাট-বাঁধানো পুকুর। ঘাটের ধারে ভাঙা শিবমন্দিরের ধার ঘেঁষে অশ্বত্থতলায় কলাপাতায়-মোড়া এক কাঁড়ি ভাত! ভাতের সঙ্গে মিলমিশ হলুদপানা ডাল, একটু ব্যঞ্জন।
অঙ্গে অঙ্গে শিহরণ। অবিশ্বেসী নাস্তিকের চোখে ঈশ্বর যেমন, বিশ্বাস করতে পারে না চন্দ্রধর—অ্যাদ্দিন বাদে ভাত্আত! সত্যি-সত্যি ভাত!
রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় হামলে পড়ার শক্তিটুকুও যখন আর অবশিষ্ট নেই, নাভিমূলের খিঁচুনি থেকে দুচোখের মণি অবদি একটা অবশ জ্বালা।

'এমনটো করে খাবেন নাই গ দাদা, খাবেন নাই। বিষম লাগবে…'

অশথছায়ায় মুচড়ে-ওঠা দুটো শক্ত গুঁড়ির ধার ঘেঁষে হাঁটু ভেঙে বসে চন্দ্রধর দুহাতে খাবলে ধরতে চেয়েছিল ভাতের-দলা। হালুম দিয়ে প্রথম গরাস মুখে তুলতেই কান্না পেল তার। বড্ড সরু হয়ে এসেছে কণ্ঠনালীটা, দাঁতের জোর জিভের স্বাদ নেই। চোয়ালের হাড়ে হাড়ে অসম্ভব খিঁচুনি। উর্ধ্বপানে তাকাল করুণ চোখে—অন্নপূর্ণা মা আমার, ভগবতী মা…'

'উই, উই আমার ঘর গ দাদা…' জিন্নত বেগম হাত বাড়িয়ে কিছু একটা দেখাল —'গাইবাছুরের গোয়াল ছেল কুনকালে। সিখেনে থাকতি দেছেন, খেতে দেছেন দুবেলা। আমার ছোঁয়াছানি ত খাবেক নাই বাবুরা।'

হাপুসহুপুস পাগলের মতো গিলতে চায় চন্দ্রধর। পাঁজর-ভাঙা কষ্ট

'ইয়র চে' সৈয়দ মিন্সে ভাল ছেল গ দাদা। ধম্মো থাকত মে'মানুষের…'

হাড়পাঁজর ভেঙে বুকে ঠেকছে গরাস। একটু জল! জল আনেনি বৌটা

'ই আকালে মরদটো কুথাকে গেল। ছেলেটো বিটিটো খেলেক-কি-খেলেক-নাই। আমি আবাগি রাঁধি অধম্মের অন্ন। একটো কতা শুধবো গ দাদা?'

হিক্কার পর হিক্কা। বুকটা চেপে ধরল চন্দ্রধর। কথা কইবার সাধ নেই

'আমার হাতে খাবেক নাই ত আমার শরীলটো কেনে খেচ্ছে গ উয়রা? শ্যাল-শুকনির মতন খেচ্ছে, নিত্যি খেচ্চে…'

ধুলোয় ধুলোয় মাখামাখি কলাপাতাটা দুহাতে গুটিয়ে নিয়ে, সাবধানে, একটা দানা ফেলা চলবে না, প্রতিটি দানা সোনা, সোনাদানা বুকে তুলে চন্দ্রধর উঠে দাঁড়াল।

লোকটার নিরাসক্তিতে ওদিকেও বুক ভাঙে। মুখে আঁচল চেপে কান্নায় কান্নায় কাছারিবাড়ির দিকে ছুট—'আজ দুকুরে দুটো ভাত ফুঁটুয়েঁছেলম গ। পেটটো জ্বলছেল। সি অন্ন আপুনেকে দেলম, আপুনি খান…'

অন্নদানের ভয়ে মাটিতে লুটোনো নিজেরই ছায়ার সঙ্গে পাল্লায় ছুটছে সেই বৌ।

চন্দ্রধর তাকাল না। উল্টোদিকে তার ছুট। মা-লক্ষ্মীর দানা, পরমান্ন বুকে জাপটে হুমড়ি খাবার ভয়।

দিঘির টলোমলো জলে বাঁধানো ঘাট। কিন্তু সেদিকে নয়। ধরে ফেলবে

বাবুরা। আবার সেই ঘাটের-মড়া বুড়ো সামন্তি। ছুটে আসবে নিমনিসিন্দার ফুকুরকাঙালগুলো।
জলার-মাঠের ধারে একটা ডোবা। পলকে পলকে হিক্কায় হিক্কায় বুক ভাঙছে যখন, ডিমি পানায় ভরা জলের দিকে নামল। আঁজলা ভরে জলপান।
কত যুগ বাদে আজ ভাত।

ফিরতে ফিরতে বেলা গড়াল। ঢ্যাঙা তালগাছের ছায়া পুবপারে আরো ঢ্যাঙা হয়ে এখন ফ্যাকাসে।
পেটের ভেতর মুচড়ে-মুচড়ে ঘোলাচ্ছে ভাতের দলাগুলো। ঘন ঘন উদ্গার। ভরাট পেটে আরো বেশি যন্তনা।
ভাঙা শরীরে টলতে টলতে মনা মঁড়লের ফাঁকা ঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। ভেড়েণ্ডা-বেড়ার ওপাশে কারা! ছুটে যাচ্ছে যেন কোন্ মেয়েমানুষ? সাবিত্রীর গলার স্বব—'মর মর তুই, তুই মর। পালা ইখেন থিক্যে···'
ঝাঁকুনি খেল বুকটা। সাঝের নিঝুম কাঁপিয়ে খলখল হাসি। আরো একটা মেয়েছেলে—'সতী থিক্যে পুন্নি লুটবি লো বৌ। মর, তা'লে তুই-ই মর···'
গেরস্তের ঝাঁটা-খাওয়া শেয়াল। চন্দ্রধর ভড়কে গেল। হাড়কাঁপানি খলখল হাসিটা ভেড়েণ্ডা-বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে গায়ের ওপর।
'তুই। তুই এখেনে কেনে র‍্যা মাগী! তুই?'
লাজ নেই সরম নেই। শাকচুন্নির বেহায়া হাসি। মালতী গতর দুলিয়ে নাচে —'তুমার লাতি হইঞে গ খুড়। দেখতে আইছেলম। তা তুমার বৌটোর গতরে বড্ড তেজ বটেক গ। বলে কিনা, আমি বেবুশ্যা মাগী। আমি যুদ্ধু, যুদ্ধু গ খুড়—বাবুরা বলেচেন···'

শেষ বিকেলে গাছে গাছে পাখিদের কলরব। রাতের আঁধার আরো ঘন আরো কালো হয়ে উঠছে।
লোকালয়ের শূন্যতায় বিদঘুটে বিটকেল পেত্নীর হাসিটা দূরে মিলিয়ে যেতেই বিহ্বল চন্দ্রধর, ভরাট পেটের ভারে, দংশনে, বুকে হাত রেখে আরো একটা উদ্গারের তেতো বিস্বাদ সামলে পেছনে তাকা‍্য। গা-ঘোলানো ঘেন্নায় চিড়বিড় চিড়বিড় অবশ শরীর।
ধুঁকতে ধুঁকতে এগোল ঘরের দিকে।

ঘরে শিশুর বীভৎস কান্না। একই সঙ্গে জ্বরের ঘোরে একজন জোয়ানমরদের অস্থির বিলাপ। এই ম্যালেরায় মরেছিল অর্জুনের মা।
উঠোনের ধারে, সাঁঝের আঁধারে হাতটা খাবলে ধরল চন্দ্রধর—'উ মাগী আইছেল কেনে? কী বলছেল তুকে?'
'তুর সোয়ামির চাষের ধান যদি তুই নাই পেলি বৌ, তুর পেটের বাচ্চাটো তুর সোযামি কেনে পাবেক? কেনে পাবেক?
আকাশের শূন্যে চোখ রেখে কথাটার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করল চন্দ্রধর। সাঁঝের আকাশে জ্বলজ্বল ধ্রুবতারা। বিষ জ্বলছে পেটে, মাথায় দাউদাউ আগুন। তার-পরই উঠোন জুড়ে পাক খেল একটা—'বড় গা-জ্বলুনি হক কতাটো বলেছে বটেক র‍্যা উ ছেনাল মে'টো। বড় নিদারুণ কতা ব্যা বটেক, নিদারুণ কতা...'

মরামাছের মতো ঠাণ্ডা শীতল চোখে কাঁপুনি ছিল না। দাঁতে ঠোঁট চেপে থাকার একটা জেদ। থকথক কালো আঁধার আরো ঘন আরো গাঢ় হয়ে গড়িয়ে নামছে। দাওয়ার খুঁটি আঁকড়ে নিশ্চল সাবিত্রী, ঘরের দেয়াল আঁকড়ে যেমন মাকড়সা। দাপাদাপিতে সোয়ামি মরছে ঘরে, বাচ্চাটা বাঁচবে না। কোথায় ভগমান?
সে ভগমান থানে যাবে।

রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলছিল ঘরে। বড়ো কষ্টে ভিখ্-মেগে-আনা এক ফোঁটা তেল। সাঁঝের বেলাটুকুও টিকবে না।
আলো-আঁধারী ঘরে তিনটে মানুষ চোখে চোখ রেখে কেউ চেনে না কাউকে
এককোণে বসে ফিসফিস ফিসফিস, যেন ষড়যন্ত্রের ভাষা, বলছিল চন্দ্রধর—নোয়া-পাড়ার জমিটা সে লিখে দেবে কেলো সামন্তকে। শুধু নোয়াপাড়া কেন, বড়-জলার জমি মিলিয়ে পুরো তিন বিঘেই লিখে দেবে কাল। আজই দিত। শুধু...'
চোত্‌বোশেখের রোদে টিনের চালের মতো পুড়ছে শরীর। কাতরাতে কাতরাতে বাঁশের বাতা থেকে গড়িয়ে নামতে নামতে তীক্ষ্ণ বিতৃষ্ণায় অর্জুন—'সি যদি ছাড়লি বুড়, দুদিন আগে টেপসইটো দিলি নাই কেনে? উপুসে উপুসে গাগতর হেজে গেল। এখনে মরণকালে...'

'লয় লয়, লয় গ লয়…' নিভে আসছে ঘরের পিদিম। আঁধার। আঁধারে আঁধারে যখন ভরে উঠছে ঘর, গলা ছিঁড়ে চিৎকার সাবিত্রীর—'জমি বেচবেক নাই…'
ওরা বাপব্যাটা চমকে তাকাল। বাচ্চাটা কাঁদে।
'জমি বিচবি নাই ত পড়্যে পড়্যে মইরবি ইথেনে? ই শ্মশানে?'
'কেনে গ কেনে? হালহেতল গাইবলদ সবই ত খেলেক আকাল। জমি দিবার পুব্বে আরো কিছু দাও নাই কেনে?'
'কি দিব র‍্যা বৌ? ই আকালের আখায় সবই ত দেলম, যা ছেল আমাদের…'
দীর্ঘশ্বাসে চন্দ্রধর—'এখনে ই জমিগুলান আর বাপঠাকুদ্দার ভিটেটো…'
পিদিমটুকু দপ করে নিভে যেতেই তিনটে ভূতুড়ে ছায়ায় ঘরের ছায়াটা লেপটে যায় শিশুর কান্নায়। কাছাকাছি শেয়ালের চিৎকারে অন্ধকারে মোচড় খেল কেউ।
'কুথাকে যাস? কুথাকে যাস তুই?' অসহায় অক্ষম অর্জুন।
আঁধারে ছুটতে চেয়ে হুমড়ি খেল চন্দ্রধর— 'ই আঁধার রেতে কেনে যাচ্ছিস র‍্যা বৌ? গাঁয়ে মানুষ নাই একজনা। শ্যালশুকনি ঘুচ্চে ইদিক উদিক…'
'আঁধার কুথা গ? চাঁদ উঠচে, বাহারের চাঁদ…'

কৃষ্ণা পঞ্চমী বা ষষ্ঠীর চাঁদ উঠছে আকাশে। আলো-আঁধারে মাখামাখি ঝোপে-জঙ্গলে গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় মাঠে-হারানো গাই গরুর মতোই একা, ভীষণ-ভাবে নিঃসঙ্গ সাবিত্রী নিরুদ্দেশে। ঘোমটা-টানার তাগিদ নেই। তবু আঁচল দিয়ে মুড়ে নিতে হয় মাথা। মানুষজন কেউ কোথাও না থাকলেও, শাকচুন্নি ভূতপেরেতের রাত।
শেয়াল ডাকছে কাছে দূরে। ঝিঁঝিঁর নিঝুম। বর্ষা শেষে এখনও ব্যাঙের ডাক। নিশুতির শূন্যতায় আকাশ ভরে তারা আর ম্যাটমেটে চাঁদের আলোয় মাটিতে নিজেরই ছায়াটা। চাষিপাড়া পেরিয়ে কদমতলার ধার ঘেঁষে মস্ত উঁচু আর গা-ছমছম বটগাছের ছায়া ডিঙিয়ে টলটল টলটল পুণ্যিপুকুরের পার। আগুড়িপাড়ার নিঝঝুম উৎরে মাঠের ধারে পড়তেই বুকের ভয় বাড়ে। দম ফুরোয়।

নিশুতি কাঁপিয়ে কোথায় গরুর-গাড়ির ক্যাঁচর-ক্যাঁচর।
চকিতে সরে গিয়ে ঝোপজঙ্গলের আঁধারে লুকোল সে। কাঁঠাল গাছের আড়ালে। ঘোমটাটা টেনে নিয়ে দাঁতে কাঁমড়ে ধরতে হয়।

সামনে ভয়, পেছনে ভয়। কার যেন পায়ের শব্দ! শরশর শরশর পায়ের তলায়! সাপ! শব্দগুলো মিথ্যে।
সাঁইপাড়া থেকে বেরিয়ে আসছে কারা! বস্তার পাহাড় কাঁধে। একজনের পর একজন কুঁজো মানুষ! গাঁয়ের সব মানুষের চোখ মেলে একা দেখছে সে। এমন দেশ্য! সঙ্গে লোকলস্কর! বন্দুক-কাঁধে সেপাই যেন।
ভূতের মতো একা, সাবিত্রী বেরিয়ে এল আঁধার থেকে। এগোল ধানের পিছু পিছু। চাঁদটাকেই শত্তুর মনে হলো। এমন রাতে ঘরের বৌ পথে নামল যদি, আরো একটু আঁধার রাখলে না কেনে গ ভগমান!

গাছপালায়-ঘেরা বাহারের কাছারিবাড়ি ফ্যাকাসে জ্যোৎস্নায় শান্ত চুপচাপ।

শ্মশানের চিতেয় নিজেকে পুড়িয়ে যখন বেরিয়ে এল, তালনারকেলখেজুরের ডগা ছাপিয়ে চাঁদটা উঠে এসেছে আকাশের অনেক উঁচুতে। দুধবরণ আলোয় ভরেছে মাঠডাঙা।
পাছা-দোলানি খিলখিল হাসি নিয়ে মালতীও এল কাছারিবাড়ির ফটক অবদি—
'তুই এলি আমার গায়ের জ্বলুনি যেছে না লো বৌ। তুকে আনলম, আরো দশটো ঘরের সতীলক্ষ্মীদেরকে টেইন্যে লিয়ে আসব। পুণ্যি লিয়ে যাক কেনে। ই আকালে বেঁচেবরত্‌তে থাকবেক সব্বায়…'
নতুন কাপড় দিয়েছেন বাবুরা। কাপড়ের বোঁচকায় দু-পাই চাল, এক মুঠো ডাল দুটো আলু, দেশলাই। মাঝারি শিশিতে, অবিশ্বাস্য, খানিকটা সরসের তেল। থালা ভরে ভাত দিয়েছিল মালতী। গলায় ঢোকেনি। উগড়ে উঠেছিল পেটের চড়ায়। কলাপাতায় তুলে এনেছে। সঙ্গে দুধের বাটি। গভ্‌ভের পোকা খাবে।
তাপউত্তাপ নেই দেহে, চেতনারহিত সাবিত্রী ফটক পেরিয়ে আসে। শাদা জ্যোৎস্নায় বেহুঁস গাঁয়ের পথ, গাছপালা, মাঠ।

বুনো আকন্দ শেয়ালকাঁটা কলমী জঙ্গল পায়ে পায়ে ভেদ করে সিঁথি-কাটা মেঠো পথে হোঁচট সামলায় সাবিত্রী। পরমরত্ন বুকে
সাঁইপাড়ার মুখে বেলতলায় এসে পড়তেই নোয়াপাড়ার বিস্তীর্ণ মাঠ। চাঁদনি রাতের কুয়াশায়, যদ্দুর চোখ যায়, সবুজ আর দেখা যায় না কোথাও। ধোঁয়ার

বর্ণে ঢাকা। যেন ফিনফিনে মশারি টাঙিয়ে বাবুদের উঠতি-ধান ঢেকে রেখেছেন ভগমান। ডাগর ডোগর বেড়ে উঠছে ধানের চারা, শিশিরে শিশিরে দুধ জমছে ডগায়, নুয়ে পড়ছে ভারে। সোনার বরণ রং ধরবে এবার।
তাকায় না সাবিত্রী। আশ্বিন-শুরুর-ঠাণ্ডা কামড়ে ধরেছে এক-কাপড়ের শরীরটাকে।

উঠোন ভরে আলো। পচা খড়ের চালা ভেঙে জোছনা ঘরের দাওয়ায়। এক-টানা ঝিঁঝির ডাকে শীতের কাঁথার মতোই একটা ভয় জাপটে ধরেছে শরীর। উঠোনের পাতা-উনুনটার কাছে এসে দাঁড়াল সাবিত্রী।
অথচ এই রাতে দুটো জ্যান্ত পুরুষমানুষের জেগে বসে থাকার কথা ছিল। শাসন মানে নি ঘরের বৌ। ঘর ভেঙেছে, কুল ভেঙেছে কুলটা।
আজ আঁচ পড়েনি কতকাল। দাওয়ার কোণে পুরনো মেটে হাঁড়িটা খুঁজল। ভেতরে মাকড়সার জাল। শুকনো ডালপালা পাতা কুড়োনো নেই। ঘরের চাল অনেক উঁচু। পাঁচিলের ওপর গত সনের মটকা ভাঙা পুরনো খড়। লাফিয়ে লাফিয়ে টানতে প্রতিটি লাফে পেটের মধ্যে নাড়িভুঁড়ির খিঁচুনি।
মেটে কলসিতে পুকুরের তোলা জল। কতদিন! কতকাল বাদে হেঁসেলে আগুন। ধোঁয়া! চোখ পোড়ানি ধোঁয়ায় মায়ের বুকে সুখ।
উঠোনের মাটিতে দাউদাউ জ্বলে উঠল আগুন। ধরে রাখতে হয় দুধের বাটি। চাঁদের বাহারে দুধের নিটোল গোল। গভ্‌ভের পোকা খাবে
এই গভ্‌ভে এখন বিষ
তেতে উঠছে এনামেলের বাটি। শাড়ির আঁচল টেনেও ধরে রাখা দায়
এই আগুনে দগ্ধে-মরাই যখন ছিল ভালো, দাঁতে দাঁত চেপে যখন কান্নাকে আটকে রাখার কঠিন লড়াই, পেছনে থপথপ পায়ের আওয়াজ। ছলকে উঠল দুধের বাটি।

'কুথাকে গেছিলিস র‍্যা মা?' বনবাদাড়ে কোথায় ছিল চন্দ্রধর, আলো-আঁধারী থেকে বেরিয়ে এল। কঙ্কাল শরীরটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। ধুঁকছে —'আর চলতে লারব র‍্যা মা। বড্ড দুব্বল...'
শ্বশুরের বাক্যিগুলো ঝাঁটা পেটায় পিঠে। নিঝুম সাবিত্রী বাটিটা মাটিতে রেখে বাঁকানো আঙুলে উষ্ণতা পরখ করে। নাহ্, আরো একটু হোক।

'বাঁশবাবুদের থানে গেছলম তুফুরবেলা। এক থালা ভাত দিচ্ছিল বটেক···,
চমকে তাকায় সাবিত্রী। ব্যাটাছেলেদের কেনে ভাত দেবেন বাবুরা ?
'খেতে লারলম। উপুসে উপুসে পেটে চড়া পড়্যা গেচে। ই পেটে এখনে মরণটোই আচে। গেলম পুকুরধারে। হল নাই। গলায় আঙুল দেলম, বমিটোও হল নাই···' চাঁদনি আলোয় কালো ভূতের মতো এগিয়ে আসছে বুড়ো। নেড়ি কুত্তার মতো হঠাৎ চিৎকার—'তুধ! তুই তুধ এইনেচিস বটেক! কুথাকে পেলি র‍্যা! পেলি কুথাকে ?'
সন্ত্রস্ত সাবিত্রী, মা, বুক পেতে তুধের বাটি আগলায়। ভুলে যায়, সামনে আগুন।
'চাআআল! চাল এইনেচিস বটেক র‍্যা···' ক্ষেপে উঠল বুড়ো। উঠোন জুড়ে শ্মশান-প্রেতের নেত্য! খিকখিক উল্লাস। ছুটে গেল দাওয়ার দিকে। নির্মল তুধেল জোছনায় শাদা চাল, আলু, তেলের শিশি। চন্দ্রধর কাঁপে। ক্লীবহাতে ধরতে পারে না। বুক ঠেলে একটা ধাতব গোঙানি। নিশীথ-নির্জনে পুকুরঘাটে কলসিতে জল ভরে তোলার ধ্বনি যেমন।
এবং তখনই আসল শত্তুর। শেষ যুদ্ধের মোকাবিলায় অঙ্গে অঙ্গে মোচড় দিয়ে সাবিত্রী নিঝঝুম
'কুথাকে পেলি ইসব ?' খুনে-ঠ্যাঙারের চেহারায় লাঠি-হাতে বেরিয়ে এসেছে অর্জুন।
সাবিত্রীর সাড়া নেই।
পুড়ছে, টলে টলে পড়ছে শরীর। তবু, বোঁচা-নাকের মতো ক্ষয়ে-যাওয়া সিঁড়ি ভেঙে পায়ে পায়ে অর্জুন নেমে এসেছে নিচে। থরথরে চোখজোড়ায় বল্লমের ধার।
একই সিঁড়ির ধাপ ডিঙোতে, ওপরে, নিঃশব্দে ঘরের পথ চায় সাবিত্রী। হাতে তুধের বাটি। এবং যখন তুজনই তুজনের নাগালে
'ক্যাছারিবাড়ির বাবুদের থানে গেইছিলিস তুই ?'
অতর্কিতে, কোনো জানান না দিয়েই আচমকা সজোরে একটা লাথি
থুবড়ে পড়ল সাবিত্রী। ছিটকে পড়ল তুধের বাটি। ধবল জোছনায় তুধের কোনো বর্ণ নেই। ভেজা মাটির রঙে কালো কালো নকশায় শুষে নিয়েছেন উঠোনের অগস্ত্যমুনি। কান্না নেই প্রতিবাদ নেই কাতরতা নেই
এবং পা তুলে তুর্বল দেহে অর্জুনও সামলাতে পারেনি নিজেকে। চণ্ডাল ক্রোধ। বেসামাল সেই ক্রোধের আগুনে মাটিতে-লুটোনো শরীরটার ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়ল। গলা টিপে ধরার হিংস্র আক্রোশ—'ই আকালে সব ভাঙে ত তুর গতর ভাঙে না কেনে? বেবুশ্যা মাগী তুই মালু, মালু হয়্যা গেলি?'
শুকিয়ে শুকিয়ে যতই হালকাপলকা, রুগ্ন হোক, একটা জোয়ান মানুষের হাঁটুর চাপ বুকের ওপর। এবং দুহাতের থাবলায় দশটা আঙুল গলাটা টিপে ধরার মুহূর্তে, মরণের সাধ নেই, সারা গায়ে মোচড় দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল সাবিত্রী। আর্তনাদ নেই প্রতিবাদ নেই। হাঁপায়, হাঁপাতে থাকে
শুধু হাড়-কখানা নিয়ে বেঁচে-থাকার কাতরতায় অকাল-অথর্ব চন্দ্রধর কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল গলা চিরে বীভৎস চিৎকারে
জোছনা কাঁপে না, গাছপালার পাতায় পাতায় বাতাস কাঁপে না, রাতনিশুতির শূন্যতায় কেউ আসে না বাখালির মানুষ। প্রতিধ্বনি ঢেউ খেলায়, ছড়িয়ে যায়। শেয়ালশকুনরাও বধির হয়ে গেছে।

তখনও দাহ। সেই চণ্ডাল ক্রোধ। মাজা-ভাঙা খড়িসের তেজে আবার উঠে দাড়াল অর্জুন। লাঠিটা তুলে নিল মাটি থেকে। লাঠি পিটিয়ে হাঁড়ি ভাঙে, কলস ভাঙে, আখার মুখে লাথি। ছুটে গিয়ে দাওয়ায়-রাখা কাপড়টা ধরে টান। ছড়িয়ে দেয় চালডালআলু। ভাঙে তেলের শিশি—'খা মাগী খা, তুর পাপের অন্ন খা...'

কান্নাটা জমছিল কোথাও। বিস্ফোরণে চৌচির হলো। ছেলেকে দুহাতে বুকে জাপটে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সাবিত্রী। জননী উন্মাদিনী
সূয্যি সাক্ষী চন্দ্র সাক্ষী জলমাটিগাছপালা সাক্ষী ভগ্‌মান
আকাশ ভরে চাঁদ ছিল। মর্তের সুখদুঃখতাপের প্রতি নিস্পৃহ কৌতুক
চন্দ্রধর এবং অর্জ্জুন, দুদিক থেকে ছুটে এসে ভূলুণ্ঠিতা সবৎস সাবিত্রীর ওপর আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, গভীর রাতের জ্যোৎস্নালোকে তিনজন মানুষ প্রস্তরী-ভূত স্থির।

ভাঙা ঘরের চালায় একটা শকুন। নক্ষত্রখচিত আকাশের প্রেক্ষিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। কৃষ্ণবর্ণ রেখাচিত্রে অনড়।

পূর্ণ স্থবিরতার বিষাদ-ছায়ায় বিপুল নৈঃশব্দ্যের উচ্চারণ। সাবিত্রীরই কণ্ঠস্বর—

'আমার নাম সাবিত্তির। আম্মিই বেহুলা সতী। আমার মতো সতীলক্ষ্মী কে আছে গ পিথিমিতে? জমির ধান আকালে খেলেক, আমার ছেল্যা আকালে খেলেক। আমার গতর যদি শ্যালে চাটলেক ত যাক, জমি যাক। পোকায় খাক জমিন…'

পরদিন ভোরবেলা। কেলো সামন্তর সদরে, নিভৃতে, কাগজে টিপসই দিল চন্দ্রধর। পর্দায়, শুধুমাত্র খাতক-মহাজনের হাত দুটোই দৃশ্যমান, যেখানে খুশির গমকে চন্দ্রধরের বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলটা নিজেই চেপে ধরেছে সামন্ত—'নিজের থুতুটো নিজেই ত চাটলি র‍্যা চন্দর! তা দুদিন আগে আর পরে। হেঁ হেঁ হেঁ… মাঝের মধ্যি লাত্তিটোকে খেলি। তা যাক, বিঘে পিতি দেড় মণ, তিন বিঘেয় তিন বস্তা ধান তুর পাওনা…'

'ধান লয় গ, চাল…'

'অ, চাল। তা'লে তিন মণ চাল। পাবি, দিব তুকে। ই ত তুর হকের পাওনা বটেক। তা এখনে ত চোরড্যাকাতের কতা শুনি র‍্যা চারপাশে। রেতের বেলা ঘুমনিদ্রা হচ্চে নাই গেরস্তের। যা, এখনে লে, আধমণটাক লিয়ে যা। চলুক না কেনে কটো দিন…'

হাত তিনটে উঠে যেতেই পাকা জামের আকারে কাগজের ওপর আঙুলের ছাপ। চকিতে ছাপটা উঠে এল ক্লোজ-আপে। পর্দা জুড়ে লং-প্লেয়িং রেকর্ডের মাইক্রোওয়েভ রেখায় টিপসই-এর ছবি। কথা নেই, ধ্বনি নেই। স্থির নৈঃশব্দ্যে ছাপের ওপর বিম্বিত উজ্জ্বল অক্ষরমালা

THE FAMINE WAS AN ACT OF GOD

L. S. Amery, Secretary of state for India.

Amrita Bazar Patrika—Tuesday December, 14, 1943.

শব্দাবলি পর্দায় নিশ্চল। আস্তে আস্তে ধ্বনিত হয় নেপথ্যভাষ্য

বার্মিংহামের এক বিক্ষুব্ধ জনসভায় ভারতবর্ষ, বিশেষত বঙ্গদেশ প্রসঙ্গে বললেন মহামান্য ভারতসচিব লিওপোল্ড স্টেনেট আমেরি—মন্বন্তর ঈশ্বরের বিধান। তথাপি আর্তসেবায় দিবারাত্রি প্রাণপাত করে যাচ্ছে ফ্রেণ্ড অ্যাম্বুলেন্স ইউনিট এবং প্রতিদিন বিনামূল্যে খিচুড়ি বিতরণ করা

হচ্ছে প্রায় দেড় কোটি মানুষকে। দৈববাসনার বিরুদ্ধে এতদতিরিক্ত কোনো কর্মে হিজ-মেজেস্টির অনুগতবৃন্দ অক্ষম

অতএব অখ্যাত বা নগণ্য গ্রামপ্রভু শ্রীযুক্ত বাবু কালীধন সামন্ত মহাশয়কে অভিযুক্ত করা নিতান্তই অসমীচীন। টিপসই-এর দিনে চন্দ্রধরকে আধবস্তার মতো চাল দিয়ে তিনি যে আর একটি দানাও হাত থেকে গলাতে পারেননি, তার কারণ পরমেশ্বরসৃষ্ট এই আধি-দৈবিক বীভৎসায় তিনি নিজেও সপরিবারে বিপন্ন

কথাটা সর্বাংশে মিথ্যাচার নয়। সত্যি তার মরাই বা লুকোনো গোলায় ধান ছিল না। ধানের দর বাড়তে বাড়তে নভেম্বরের শেষে এত চড়া, শহরের দিকে অব্যাহত চালানে চালানে লোভসম্বরণ অসম্ভব যেহেতু, শেষপর্যন্ত সম্পন্ন গেরস্তের খোরাকিতে টান। তবে ভরসা, সামনে শালিধানের মরশুম। চন্দ্রধরের আবাদী শস্যসমেত তিন বিঘে সরেস জমির তিন-দশে-ত্রিশ মন ধান থেকেই সাড়ে চার মণ পরিশোধ করে দেবেন প্রসন্ন উদারতায়। অনন্তর তিন বিঘে গুণিতক অনন্ত মহাকালের হিশেবে লাখো লাখো মণ ধানের ভোগস্বত্ব বংশ-পরম্পরায়

বাপঠাকুর্দা চৌদ্দপুরুষের ভিটেয় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। ঘরের দাওয়ায়, ক্যামেরার ফ্রেমে দুদিকে ডানা মেলে, অথর্ব বাপ আর ভাঙাচোরা বৌ-এর কাঁধে হাত রেখে মধ্যবর্তী নেংটি-পরা অর্জুন সকরুণ যিশুখৃষ্ট ভঙ্গিমায়

সর্বাংশে নীরব দৃশ্য।

সারা দেহে জ্বরের কাঁপুনি, দুর্বহ ম্যালেরিয়া। এবং তাকে বহনের ভারে নাজেহাল সাবিত্রী এবং চন্দ্রধর ভেঙে ভেঙে পড়ে।

চন্দ্রধর মাথায় বইছে ছেঁড়া-বস্তায় জড়ানো তেলচিটচিটে পুরনো কাঁথাবালিশের বোঝা, কাঁধে অহেতুক কোদাল, কোমরে নেংটির সঙ্গে বাঁধা কাটারি। সাবিত্রীর মাথায় মেটে-হাঁড়ি, কাঁখে কলস, কোমরে ঝুলছে ভাঙা হারিকেন, একটা ঝাঁটা।

ছোট্ট উঠোনটুকুও দীর্ঘ তেপান্তর

রাস্তায় এসে একবার পেছনের দিকে তাকাল চন্দ্রধর

প্রবৃত্তি তাড়নায় একই ভঙ্গিতে বাস্তুভিটের দিকে ঘাড় ঘোরাতে গিয়ে টালটামাল হুমড়ি খেল অর্জুন

সকলেই সচকিত।

উঠোন থেকে একটা কুকুর লাফিয়ে উঠল দাওয়ায়। ঘরে তার অবাধ প্রবেশ। পর্দা জুড়ে আবার টিপসই-এর উল্লম্ফন। প্রস্ফুটিত শব্দপুঞ্জ

THIS SICKENING CATASTROPHE IS MAN MADE
The Statesman, Thursday September 23, 1943.

ধীরলয়ে আবহকণ্ঠ

অথচ তৎকালীন কলকাতায় ভারতপ্রবাসী ইংরেজ বণিকদের অর্থ-বিনিযুক্ত এবং সিভিলিয়ান সাহেবদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিকের এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হলো—'এই মহামন্বন্তর মানুষের সৃষ্টি।' ইতিপূর্বে সংঘটিত ভারতবর্ষের সমস্ত দুর্ভিক্ষের মূল উৎস প্রধানত প্রাকৃতিক বিপর্যয়। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো নৈসর্গিক হেতুকে দায়ী করা চলে না।...বরং সর্বাধিক লজ্জাজনক ঘটনা, ভাবতবর্ষের আভ্যন্তরীণ সরকারগুলোর—কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক প্রশাসনকর্তাদের সীমাহীন অদূরদর্শিতা এবং পরিকল্পনাবিহীন কর্মকাণ্ড।
কিন্তু চন্দ্রধর বা অর্জুন বা সাবিত্রী জানে না বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো বা লর্ড ওয়াভেল, ছোটলাট স্যর জন হার্বার্ট বা স্যর টমাস্ রাদারফোর্ড কে বা কেমন দেবতুল্য আকৃতি! পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহের দূরত্ব যতটা, তাদের অবস্থান থেকে কলকাতা বা দিল্লীর ব্যবধান আরো অনেক, অনেক আলোকবর্ষ ব্যাপী
শেষ পর্যন্ত তাদেরও সেই অনন্ত অভিযান। মঙ্গলগ্রহে পাড়ি।

প্রান্তর প্রান্তর জুড়ে সোনার ফসল।
অতিদূর থেকে দেখা যায়, স্বর্ণপ্রসবিনী বসুন্ধরায় কটিদেশ নিমজ্জিত ক্ষুদে ক্ষুদে তিনজন মানুষ।
পলকপাতে মনে হতেই পারে, রামায়ণে বনযাত্রার দৃশ্য

ক্যামেরা এগিয়ে যায়। নিবিড় ঘনিষ্ঠ হয়। না, গাণ্ডীবতূণীর নেই। হস্তকুক্ষিগত নোংরা বিছানা, মেটে-হাঁড়ি, কোদালকাটারি ভাঙা-লণ্ঠন আর ঝাঁটা নিয়ে আগে

পিছে চন্দ্রধর সাবিত্রী। মধ্যবর্তী অর্জুন রুগ্ন দেহভারে এক সময় টুপ করে হঠাৎ বসে পড়ল। ডুবে গেল পাকা ধানের সমুদ্রে। অন্তর্হিত তিনজন।
শস্যক্ষেত্রে ছুটে যায় মেঘের দুরন্ত ছায়া।

'আর লারব নাই গ, লারব নাই…' অর্জুনের কণ্ঠস্বর।
'এমনটো শাস্তি কেনে গ ভগমান? ভগ্‌মাআআন…' কফভাঙা জীর্ণ বুকে হাঁপায় চন্দ্রধর।
কান্না নয়, কিছুটা গোঙানির মতো সাবিত্রীর গলার স্বর।
কথা আর্তি গোঙানিকে অনুসরণ করেই ক্যামেরা খুঁজে পেল ওদের। সঙ্কীর্ণ আলপথে বৌ-এর কোলে মাথা রেখে অর্জুন। যেন অরণ্যগহনে সাবিত্রীক্রোড়ে সত্যবান।
হয়তো কপাল চাপড়াতেই হাতটা তুলেছিল চন্দ্রধর। চোখে পড়ল বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা। পাগলের মতো জিভে চাটে সেই আঙুল। রং মোছে না। কেলো সামন্তর কাগজে টিপসই-এর বেগুনি রঙটা এখনও এঁটে আছে আঙুলের চামড়ায়
পর্দাকে আচ্ছন্ন করে আবার টিপসই-এর ছাপ—

175 SALES DAILY AT NARAYANGUNJ
Amrita Bazar Patrika, Monday November 1,1943

নীরব শব্দমালা বাঙ্ময় হলো

ঢাকা জেলার মহকুমা শহর নারায়ণগঞ্জ থেকে খবর এল সাতাশে অক্টোবর—স্থানীয় সাব-রেজিস্টার অফিসে একশ পঞ্চাশ থেকে একশ পঁচাত্তরটি জমি-বিক্রয়ের খতিয়ান নথিভুক্ত হচ্ছে প্রতিদিন। পূর্ববর্তী সময়ে যার গড় অঙ্ক ছিল দশ থেকে পনের।
একই দিনে একই সংবাদ এল পাবনা জেলার বেরা থেকে—ছোট ছোট জমির মালিক বা কৃষিজীবীরা চাষের-ফলনসহ জমির পাট্টা হাতছাড়া করতে বাধ্য হচ্ছেন। স্থানীয় রেজিস্ট্রি অফিসে এ জাতীয় মালিকানা বদল বা জমি-বন্ধকের সংখ্যা প্রতিদিন শতাধিক। এক্ষেত্রে উল্লেখ-যোগ্য, শত শত করোগেটেড-সিট নিয়ে মধ্যবিত্ত মানুষ বিক্রির জন্য প্রতিদিন উপস্থিত হচ্ছেন প্রাত্যহিক বাজারে। শেষ সম্বলটুকু নিঃশেষে উজার করে বরং বেছে নিচ্ছেন মুক্ত আকাশ আপনগৃহ

সুতরাং এক্ষণে, চন্দ্রধর বা সাবিত্রীর জন্য বিশেষ কোনো আহা-উহুঁক সঙ্গত কারণ নেই। দেশের লক্ষ লক্ষ নারীপুরুষের ওরা দুজন আপতত আলের পথে হাঁটে। বিস্তৃত স্বর্ণশোভা মাঠে, বাতাসে বাতাসে দোল খেয়ে পাকা ধানের শিষ ওদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

অনন্ত রেলপথ। দূরে, বহু দূরে বিন্দুর মতো দুজন মানুষ। কোনো রেলগাড়ি দৃশ্যমান নয়। অথচ দ্রুত ধাবমান ক্যামেরা রেলগাড়ির বিকট ধাতব শব্দে ছুটে গিয়ে ওদের ধরল। জীবনে প্রথম রেলগাড়ি-দেখার অভিজ্ঞতায় আতঙ্কিত চন্দ্রধর এবং সাবিত্রী লাইন থেকে সরে ঝোপজঙ্গলের ঢালুতে কান চেপে বসে পড়ল জড়াজড়িতে। তীব্র তীক্ষ্ণ ট্রেন গড়িয়ে যাবার ধ্বনি, আকাশের সেই উড়ুজাহাজের মতোই দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাবার পরও যেন বুকের কাঁপুনিতে থামে না। দুজোড়া কাতর চোখ অসীমে তাকিয়ে নির্নিমেষ
'মত্তে লারলম র‍্যা বৌ, মত্তে লারলম। শুধু তুর তরে…'
স্তব্ধবাক সাবিত্রী বিষাদে মলিন।
'একলা মে'ছেল্যা র‍্যা তুই। সুমত্তা বয়েস তুর…'
'গাগতরে আর লরম মাস নাই বাপ। হাড় কখানায় যৈবন নাই…' কান্না নয়। সাবিত্রী দীর্ঘশ্বাসে নিজের গভীরে— 'ছেল্যার জইন্যে ধম্মো দেলম, ভাতারের জইন্যে জেবন দেতম, ভগ্‌মান লিলেক নাই। আপুনের জইন্যেও সব দিতে পারি-গ বাপ। বাবুরা ছোঁবেক নাই। ই শরীল আকালে খাবেক, পোকায় খাবেক নাই…'
বুড়ো চন্দ্রধরকে হাতে ধরে রেললাইন ডিঙোতে চায় সাবিত্রী। এপার থেকে ওপারে। সমতল নয়, যেন পর্বতারোহীর শৃঙ্গস্পর্শের কঠিন লড়াই।
ওপারে পৌঁছে লেপটে বসে পড়ল চন্দ্রধর। একসুরে প্লেটের মতো উদোম বুক হাতড়ে দীর্ঘ দীর্ঘ যতিতে শ্বাসের টান— 'আর লারব নাই র‍্যা বৌ। লারব নাই। তুই যা…'
সাবিত্রী গা ঘেঁষে বসে থাকে। মস্ত শিরীষ গাছের ছায়ায় দুজনের ক্লোজ-আপ। পেছনে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত, বিশাল আকাশের চালচিত্র।

আকাশে একঝাঁক উজ্জ্বল বালিহাঁস।

অনন্ত রেলপথ সুদূরে বিলীন। উল্টোদিক থেকে আবার একটা ট্রেন। গুরগুর গুরগুর আওয়াজে থরথর কাঁপছে মাটি। যেন আরো একটা আক্রমণ দুর্জ্ঞেয় বাবুমানুষদের।

একটা কাশি উঠল। বুক-ভাঙা বীভৎস কাশিতে চন্দ্রধর ভয়ঙ্কর। প্রচণ্ড বেগে তেড়ে আসছে গাড়ি। ঝাঁপিয়ে পড়ে সন্ত্রস্ত সাবিত্রী শ্বশুরকে টানতে চাইল লাইন থেকে দূরে, বুনো-আকন্দ শেয়ালকাঁটা কাঁটাকুল আশস্যাওড়ার জঙ্গলে।

হাঁপাতে হাঁপাতে উদ্‌ভ্রান্ত চন্দ্রধর। চোখজোড়ায় ভয়ঙ্কর মরণ। তখনও কিছু কথা, কিছু বলতে-চাওয়ার সাধ।

অসহায় সাবিত্রী। আকাশ দিগন্ত জুড়ে স্বর্গের বৈকুণ্ঠ-কাঁপানো মর্মান্তিক আর্তনাদ।

আর্তকণ্ঠ ডুবে যায়। দুরন্ত রেলগাড়ি ঢেকে দিলো ওদের। ট্রেনের কর্কশ বাঁশি, দ্রুতগামী চাকার চিৎকৃত ধাতব ধ্বনি গড়িয়ে যেতে থাকে

গাড়ির বগিগুলো নিঃশেষ হলে সমস্ত পর্দাকে আবৃত করে আবার ফিরে আসে টিপসই-এর ছাপ। অক্ষর খচিত আচ্ছাদন

PITIABLE PLIGHT OF DESTITUTES
DEAD BODIES FLOATING IN CANEL
LIVING SKELETONS WITH NO CLOTH TO COVER
THEIR BODIES
The Sunday Hindusthan Standard December 12, 1943.

আবহকণ্ঠ

ওরা শুধু বাঁচতে চেয়েছে। পেছনে কী হারিয়ে গেল, শোকতাপ বেদনার অবকাশ নেই। সমাজের নৈতিক এবং পরস্পর সংলগ্নতার কাঠামো ভেঙেচুরে পুরোপুরি তছনছ। কান্নায় আকুল এক অসহায় নারী। ছেলেকে বিক্রি করার প্রস্তাবে রাজি না-হলে তার স্বামীর হুমকি —তাকে সুদ্ধু বেচে দেওয়া হবে অন্য কোনো পুরুষের কাছে। সুতরাং বেচারি তার নিজের বাচ্চাকে তুলে দিয়েছে এমন এক রমণীর হাতে, খুব ভালোভাবেই জেনেশুনে, ভিক্ষাযন্ত্র হিশেবে ব্যবহৃত হবে তার সন্তান।

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার একটি ঘটনা। জনৈক মা তার

চিত্তবৈকল্য প্রশমনে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারেন ? মাত্র দুমাসের শিশু সন্তানকে জীবন্ত অবস্থায় পুঁতে দিচ্ছেন মাটিতে। দুর্ভিক্ষ জননীকে বানিয়েছে ডাইনি।

শিরদাঁড়ায় ঝাঁকুনি খেয়ে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই কি থরথর থরথর কেঁপে ওঠে না, যেখানে মাতৃত্বও এত নির্মম ?

মঙ্গলবার, ছাব্বিশে অক্টোবর, তেতাল্লিশ। 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ—ঢাকা জেলার চাষাড়া রেলস্টেশন এবং থানার অদূরবর্তী রাস্তায় একটি কুকুর পাঁচ বছরের শিশুর মৃতদেহ দাঁতে কামড়ে ছুটছে উল্লাসে। গতরাতে কোনো শৃগাল গোগ্রাসে গিলেছে সেই মানবশিশুর কচি মাংস

এবম্বিধ দৃশ্যাবলি যখন ঘটমান বর্তমান, সেক্ষেত্রে আমাদের সাবিত্রী সংক্রান্ত কোনো কাতরতাবোধ বা দুঃখপ্রকাশ নিঃসন্দেহে অর্থহীন। বরং লক্ষণীয়, সাবিত্রী ভাগ্যবতী। তার সাতদিনের সন্তান বা তাজা যুবক স্বামী অথবা পরমপূজ্যপাদ শ্বশুরমহাশয়ের পারলৌকিক অনন্ত শান্তি মোটামুটি নিশ্চিন্ত। কেন না, জীবন্ত অবস্থায় তাদের পবিত্র দেহ শৃগাল বা গৃধ্রলাঞ্ছিত নয়। শুধু তার অশুচি শরীরটাই কুকুরেরা লেহন করেছে।

হয়তো-বা সেই পাপেই তার নিঃসঙ্গ বেঁচে-থাকা।

শুধু তাই নয়, কী এক দুর্বোধ্য অলৌকিক মায়ামন্ত্রে সে পৌঁছে যায় অভীষ্ট লক্ষ্যে। মঙ্গলগ্রহে একা

একা নয়, কলকাতার ফুটপাতে লক্ষ লক্ষ নারীপুরুষের ক্ষুধার মিছিলে সাবিত্রী একজন।

উড়োজাহাজ বা রেলগাড়ির মতোই প্রথম শহর দেখল সে—'হেই বাপস্! ইয়রেই কলকাত্তা বলেক গ লোকে ?' মাথাটা ঘুরছিল। ভিড়মি খেল।

জীবনে প্রথম-দেখা গোরা সৈন্যের লাল মুখ, কুচকুচে কালো নিগ্রো, লাল-পাগড়ির পুলিশ, শ্যামলা রঙের এ. আর পি।

মিলিটারির সাঁজোয়া গাড়ি রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে একের পর এক। দুধারে কাঙালের ভিড়।

মিলিটারির শেষ গাড়িটা চলে যায়। হাঁপাতে হাঁপাতে দুর্বল দেহে সে বসে পড়ল

রাস্তায়। হল্লাচিৎকার চতুর্দিকে। ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকাল উর্ধ্বে।
সারি-বেঁধে চোখ-ধাঁধানো প্রাসাদ অট্টালিকা। কিন্তু বিস্ময় নেই চোখে।
বিস্মিত হবার চোখটাই অন্ধ তখন অথবা গলিত।
নীরব চোখজোড়া আরো উর্ধ্বে উঠে যায়। আকাশ।
আকাশের গাঢ় নীল থেকে বেগুনী রঙে টিপসই-এর ছাপ। নক্ষত্রের মতোই উজ্জ্বল অক্ষরাবলি

HUNGRY MAN TAKES AWAY CAKES FROM S. D. O's DISH
Amrita Bazar Patrika Thursday September 16, 1943

পশ্চাদকণ্ঠ

'সত্যি মজা। অদ্ভুত এক মজাদার খবর এমন বিষাদের দিনে।
চৌদ্দই সেপ্টেম্বর, তেতাল্লিশ! মহকুমাশাসক মিঃ রস আই.সি. এস্-এর সভাপতিত্বে এক মহতী জনসভার আয়োজন হয়েছিল নারায়ণগঞ্জ টাউন হলে, বিকেল পাঁচটায়। সেখানে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক নির্মল কুমার গুপ্ত মহাশয় ঘটমান বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে ভাষণ-দানের জন্য আমন্ত্রিত। মিঃ রস এবং অধ্যাপক গুপ্ত মহাশয় যখন লাইব্রেরি ঘরে চা খাচ্ছিলেন, শতচ্ছিন্ন হতকুচ্ছিত বেশভূষায় জনৈক ক্ষুধার্তের আকস্মিক প্রবেশ এবং প্লেট থেকে সমুদয় কেকবিস্কুট ইত্যাদি নিয়ে দ্রুত পলায়ন।'
মিঃ রস নিশ্চয়ই আশ্বস্ত হয়েছিলেন। বরং কৌতুক। সন্ত্রাসবাদী আততায়ী নয় লোকটা, নিতান্তই ভিখিরি।

পর্বতসদৃশ ম্যানসন পাদদেশে, বন্ধ-দরজায় এক দঙ্গল অর্ধনগ্ন বুভুক্ষু নারীপুরুষের ভিড়ে সাবিত্রী। বহুতল প্রাসাদের দিকে উর্ধ্বমুখী দৃষ্টি। সকলেরই প্রসারিত হাতে এনামেলের বাটি। সমবেত কোরাসে কারও কণ্ঠস্বর স্বতন্ত্র নয়—'একটু ফ্যান দিবেন গ মা। ভগমান রাজরাণী করবেন গ আপুনেদেরকে...'
পুরো দৃশ্যটাই হঠাৎ স্থিরচিত্রে স্থবির হয়ে যায়। নিথর স্তব্ধতা।

আবার টিপসই-এর ছাপ। আবার শব্দমালা

'Cases have been brought to my knowledge of these poor creatures being raped at night while lying on the roads There also appear to be certain people at work who attempt to decoy women who are destitute and without protection No organised effort has so far been made to protect women.'

—MRS VIJAYLAKSHMI PANDIT

Amrita Bazar Patrika Tuesday October 26, 1943

কণ্ঠস্বর

সারা ভারত মহিলা সমিতির তরফ থেকে শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বাংলাদেশে এলেন। ঘুরলেন কয়েকটি জেলা। নারকীয় ক্রূরতায় দেখলেন সমাজচিত্র—শেয়ালশকুনকুকুরের মহোৎসবে নারীমাংস কত সহজ পণ্য।

কলকাতায় মধ্যরাত। অপলক চোখের তীক্ষ্ণতায় ভূর্ত্ত যেমন, নির্জন লাইটপোস্ট ঋজুতায় স্থির। ফুটপাটে শায়িত নানা বয়সের অর্ধনগ্ন হরেক নারী। কয়েকটি কুকুর ঘুরে ঘুরে গন্ধ শুঁকছে মানুষের। প্রতিরোধহীন।
মনে হতেই পারে, মৃত। শবের জঞ্জাল।
সব রকম ধ্বনিবর্জিত শীতল স্তব্ধতায় প্রতিটি মুখের ওপর ক্যামেরা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। মক্ষিকা বিচরণ। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক মুহূর্তে শনাক্তকৃত সাবিত্রী। মুদিত আঁখিপল্লবে করুণ মুখের ছবি।
ক্যামেরা আটকে থাকে। নিবিড়ভাবে আরো ছকদম এগিয়ে গিয়ে তুলে আনে সেই মুখ। পর্দা জুড়ে বিগ ক্লোজ আপ। নিদ্রায় স্পন্দনহীন, পূর্ণ অবয়ব। টিপসই ফিরে আসে না। নিষ্কম্প মুখের ছবি স্থির থাকে।

পশ্চাদবর্তী কণ্ঠস্বর

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী কলকাতার রাজপথে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে যারা এসেছিল, সুবিশাল সেই কাঙাল মিছিলে কুড়ি থেকে পঞ্চাশ বছরের পূর্ণযুবতী অথবা সদ্য বিগতযৌবনা রমণীরাই পুরুষের চেয়ে সংখ্যায় অধিক। যে দেশের সমাজবিধানে যুবতী নারী আত্মীয় পুরুষের প্রহরা ভিন্ন ঘরের আঙিনা ডিঙোয় না কথনও,

অনাত্মীয় শহরের অরক্ষিত ফুটপাথে তাদেরই সংখ্যাধিক্য। এর কারণ বহুবিধ। স্বগ্রামে গৃহত্যাগের আগেই অনাহারে ক্ষুধায় অখাদ্য-কুখাদ্য ভোজনের পরিণাম অজীর্ণ রোগ এবং অপুষ্টিজনিত দেহবৈকল্যে পুরুষেরা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। যেখানে কাজ করবার শক্তি নেই, পুরুষদেহের দাম নেই।

বিপরীতে শহরের লঙরখানায় পুরুষের চেয়ে নারীরাই দাক্ষিণ্য পেয়েছে বেশি।

ফুটপাথ, ডাস্টবিন, কুকুর সমাহারে রমণীমূর্তি

ধারাবিবৃতি অব্যাহত

অথচ অন্যদিকে, প্রাগুক্ত সমীক্ষার অপর সিদ্ধান্ত—মৃত্যুহারে পুরুষ হারিয়ে দিয়েছে মেয়েদের। প্রতি এক হাজার মৃত ব্যক্তির মধ্যে ছ শ একান্নজন পুরুষ এবং তিন শ উনপঞ্চাশজন নারী অথবা প্রতি এক হাজার মৃত পুরুষের বিপরীতে নারীদের সহমরণ সংখ্যা পাঁচশ ছত্রিশ। তাহলে গৃহলক্ষ্মীরা ভিটেমাটি ছেড়ে শহরে এল বেশি, মরল কম। কোথায় গেল তারা? কোথায় সাবিত্রী?

অসহায়দের জন্য অনাথ আশ্রম তৈরি হয়নি তখনও। কিছু সংখ্যক গড়ে উঠেছিল অনেক পরে। যুদ্ধ শেষে।

স্থিরচিত্রে বেশ্যাপল্লি। নোংরা ঘিঞ্জি গলিতে আরো সব মেয়েদের সঙ্গে দরজায় দাঁড়িয়ে সাবিত্রী

কণ্ঠস্বর

অথবা সাবিত্রী বেঁচে ছিল। হয়তো এর পরেও

স্থিরচিত্রে ছেচল্লিশের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডব।
সাবিত্রীকে মাটি ঘেঁষড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কেউ। দুর্বৃত্ত কোনো

কণ্ঠস্বর

আরো একবার ধর্ষিতা সে। ভ্রাতৃগৃহে, ভ্রাতৃ-আশ্লেষে। হতেই

পারে। তামাম ভারতবর্ষই তখন হিজ-ম্যাজেস্টির কাছারিবাড়ি। অথবা হয়তো

সাতচল্লিশ। স্থিরচিত্রে শিয়ালদহ স্টেশন। লাখো লাখো উদ্বাস্তু জনতার জঙ্গলে, আরণ্যক বিভীষিকায় কোলাহলে সাবিত্রী নিঃসঙ্গ একা

কণ্ঠস্বর

সাবিত্রী আবার। বাপের ঘর, স্বামীশ্বশুরের ভিটে ছেড়ে সাবিত্রী অথবা সাবিত্রীরা আবার শহরে। ভাইনি কলকাতা

স্থিরচিত্রে উনিশ শ উনষাট। রাজভবনের সিংহদ্বারে ভুখামিছিল। পুলিশের লাঠির নিচে রক্তাক্ত সাবিত্রী

কণ্ঠস্বর

স্বরাজের কলকাতায় নতুন করে গ্রামের মানুষ। হাজারে হাজারে, অনর্গল স্রোতে—অন্নের প্রার্থনা

স্থিরচিত্রে ছেষট্টির স্বরূপনগর। পুলিশের গুলিচালনায় ভূমিশায়ী কিশোর নুরুল ইসলাম, আনন্দ হাইত। মধ্যবর্তী সাবিত্রী শতচ্ছিন্ন মলিন বসনে

কণ্ঠস্বর

শত মরণেও মৃত্যু নেই যার, সাবিত্রী শহিদের মা

উনিশ শ' একাত্তর। সীমান্তে শরণার্থী শিবির। লক্ষ লক্ষ বিপর্যস্ত মানুষের ভিড়ে এনামেলের-বাটি-হাতে সাবিত্রী আবার লঙরখানায়

কণ্ঠস্বর

কারা যেন খেলা খেলে রাজনীতির গোপন গুহায়। কার্যকারণ প্রশ্ন ব্যতিরেকেই এক সাবিত্রী লক্ষ কোটি সাবিত্রীর গাণিতিক প্রসারণে বিবস্ত্রা পাঞ্চালী শত শতবার।

পর্দায় চলমান বিদ্যুৎ-ট্রেন। ই. এম. ইউ কোচে ভদ্রজনের ভিড়ে সাবিত্রী অগুন্তি স্মাগ্‌লারের একজন। হোমগার্ড অথবা পুলিশ প্রকাশ্যে বিবস্ত্র করতে উদ্যত

তাকে। লড়াকু বৌ-ও লড়তে প্রস্তুত। শাড়ির আঁচল দুশমনদের হেফাজতে সমর্পণ করে চালের পুটলি বাঁচায়। দৃশ্যটা ফ্রিজ হয়ে যেতেই

কণ্ঠস্বর

তথাপি বেঁচে থাকে সাবিত্রী। বাংলার মুখ। যেন অনেক অনেক আকাল পেরিয়ে অসংখ্য বারোমাস্যাশেষে চিরন্তন ফুল্লরা

শতবর্ষের পরমায়ু নিয়ে লোলচর্ম অতিবৃদ্ধা শেতলাবুড়ি বিস্তৃত ক্লোজ-আপে। পর্দায় স্থির। কুঞ্চিত চোখের পাতায় মরা-মাছের ঠাণ্ডা রক্ত। শীতল চাউনি দর্শকশ্রোতাদের দিকে অপলক নির্বাক
স্থিরচিত্র নয়। সচলতা নীরক্ত তবু

কণ্ঠস্বর

'তুমি তো দেখেছো তাঁকে? আমাদের বুড়ি ঠাকুমাকে?
পেয়েছেন বহু তাপ, দেখেছেন বহু পাপ, মৃত্যুও অনেক,
তবুও অম্লান প্রাণ, শুভ্রকেশ সৌন্দর্য আরেক
মর্যাদার, অনেক দেখার রূপ; অথচ সবাকে
নির্বিশেষ মমতায় সংযত উদ্বেগে উপদেশ,
সত্যের অম্লান প্রজ্ঞা নেভেনি বৃদ্ধার জরায়ণে,
সততার আশা দীপ্ত শীতের আকাশ সে-নয়নে,
হিরণ্ময়ী, নিরুপমা, উপমা কী? খুঁজেছো স্বদেশ?
যম নাকি ভয় করে, যম নাকি দূরে রাখে তাঁকে!'

নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় বৃদ্ধার কুঞ্চিত চামড়ার প্রসারে, তোবড়ানো গালে, ভাঁজে ভাঁজে পরতে পরতে উন্মোচিত ফোকলা হাসি। সমাগত প্রজন্মের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি, যেন নিংড়োনো-জীবনের প্রান্তে জরতী ক্ষমায় আত্মজ্ঞান —তথাপি বেঁচে থাকা

ধ্বনিহীন বাক্যহীন শেতলাবুড়ির প্রসন্ন হাসির ওপর সমাপ্তিসূচক ক্ষোদিত বর্ণমালা —'আকাল'।

বলা বাহুল্য, চিত্রনাট্যের একেবারে শেষ শটটা নতুন। লোকেশান নির্বাচনের পর কলকাতায় ফিরে, অনেক ভাবনাচিন্তায় শেতলাবুড়ির সংযুক্তি। শেতলা-বুড়িতেই ছবির শেষ—কোনো রকম মেক-আপ ছাড়াই সাবিত্রীকে মাটির ওপর ধরা গেছে কোথাও। সাজানো-বানানো নয়, বীভৎস সত্য।

সুতরাং চায়ের পরই প্রোডাকশান কন্ট্রোলার সুকুমার বসাককে পরমেশ ডাকলেন কাছে—'সেই বুড়িকে খুঁজে পেলেন ?'

সুকুমার হাসলেন—'বললেন কাল রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায়। এখন ভোর ছটা...'

'অল রাইট, ওকে দেখবেন একটু। দরকার আছে।'

চলেই যাচ্ছিলেন সুকুমার। থামতে হলো।

'ভালো কথা, সবাইকে বলে দিন, আজ সকালে আর কাজ শুরু হচ্ছে না। দেখি যদি দুপুরবেলা...'

'আপনি কি ঘরেই থাকছেন এখন ? না কি...'

'ন্‌না...হ...' পকেটে হাত ঢোকালেন পরমেশ। কিছু ভাবছেন—'নির্মলকে সঙ্গে নিয়ে হাতুই গ্রামটা ঘুরে আসব একবার। শুটিং-স্পটটা একবার দেখে আসা ভালো। হ্যাঁ, জেনারেটারটা কি পাঠিয়ে দিয়েছেন ?'

'না, তাহলে আর এখন কেন যাবে।' সুকুমারের কুণ্ঠিত ভঙ্গি—'কিন্তু আপনি বেরিয়ে গেলে...'

'কেন ? কোনো দরকার আছে ?'

'ওঁরা সকালের দিকে আসবেন বলেছিলেন।'

'কারা ?'

'গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট, স্কুলের সেক্রেটারি হেডমাস্টার...'

'ধ্যাৎ মশাই...' পরমেশ সিগারেট ধরিয়েছিলেন। অতর্কিতে ক্ষেপে গেলেন—'কী ভেবেছেন আপনারা ? কালতু আড্ডা মারতে এসেছি নাকি এখানে ? এত লোকজন, এত টাকার কমিটমেন্ট। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আবোল-তাবোল কতগুলো লোকের সঙ্গে বসে বকবক করব ? ওসব লোকাল ভি. আই. পি-দের আপনি সামলাবেন। দেখবেন, কেউ যেন আমাকে ডিস্টার্ব না করে...'

নিজের ঘরের দিকে ফিরলেন পরমেশ। এবং সুকুমার, গত ত্রিশ বছর ফিল্ম্ চত্বরে অব্যাহত জীবনধারণের পর, বছর পাঁচ সাত পেরিয়ে গেল, পরমেশ

মিত্তিরকেও নিত্যি ঘরকন্নায় হাড়েমজ্জায় চেনেন জানেন বলেই যেন তার উত্তেজনাহীন শান্তভঙ্গি। প্রতিভার ভার বহন যে কী দুঃসহ জ্বালা হাঁকামুটেরা বুঝবে না কোনোদিন।

স্নান সেরে সমবেত প্রাতরাশের পর পরমেশ যখন বেরোলেন, শুধু ক্যামেরাম্যান নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় নয়, অভিনেত্রী তিনজন, অভিনেতা ধ্রুবজ্যোতি এবং বিতোষও তাঁর সঙ্গী। ছোটখাটো একটি দল।

স্কুলবাড়ির ফটকে সকাল থেকেই ভিড়টা বাড়ছিল। নানান ধরনের গ্রামের মানুষের ঘুরঘুর ঘুরঘুর। কমবয়েসী যুবকরা অনেকেই, যারা নেহাৎ-ই গেঁয়ো, পিছু-পিছু এল। দূরে দাঁড়িয়ে দেখল বাকিরা। কলকাতা দেখেছে যারা, স্কুল পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছে অথবা কলেজের পড়া শেষ করে গ্রামে বেকার-বুদ্ধিজীবী, বোঝাচ্ছে শোনাচ্ছে সবাইকে—'ঋত্বিক ঘটকের নাম শুনেছ? সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন? ইনি তেনাদের একজন। হেঁজিপেঁজি নয় গ, মস্ত ডিরেকটর। ভাল ভাল বই করেন। অনেক কিছু ভাবতে হয়! বোঝবার জিনিস থাকে…'

টুকরো কথার খানিকটা কানে এল। হাসলেন পরমেশ—'হাই-থট ব্যাপারটা কী বলো তো? পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক বলছিলেন কাল।'

উচ্ছল নন্দিতা —'হাই-থট্! হাই-থট্ মানে লো-থটের অপোজিট।'

'লো-থট মানে?'

'ওই যেগুলোর জন্যে ওরা সকাল থেকে লাইন দেয়, মারামারি করে, ব্ল্যাকে টিকিট কাটে…'

স্কুলের মাঠ পেরোবার পরও কিছুদূর ফাঁকা জমি। একদিকে মস্ত পুকুরের ধার ঘেঁষে কলাগাছের সারি, তালখেজুরসুপুরি, অন্যদিকে মাস্টারমশাইদের কোয়ার্টার। একই ধাঁচের পর পর তিনটি ব্লক। পাকাবাড়ি। মধ্যবর্তী দোতলা। দুদিন আগে পুজোর ছুটি পেয়ে মাস্টারমশাইরা সপরিবারে পালিয়েছেন। যারা যান নি, এখানেই স্থায়ীভাবে থাকেন বা শুটিং দেখবেন বলে থেকে গেছেন, তাদেরই বৌছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এসেছে বাইরে—এদেরই নাকি দেখা যায় সিনেমার পর্দায়! নকল মানুষগুলো আসল চেহারায়!

বিস্ময়ের চোখগুলো এক পাশে রেখে, অন্যদিকে বৃক্ষরাজি—রাস্তা পেরিয়ে যেতে যেতে নন্দিতা একাই সবাইকে মাতিয়ে রাখতে চায়—'কী ধ্রুবদা, কলকাতায় তো হাঁকডাক করে চাষির দুঃখু, ধানের জমি, জমির লড়াই কি সব নিয়ে নাটকফাটক করেন। বলুন কিছু, বলুন এবার।'

ধ্রুবজ্যোতি হাসল—'কী বলব ?'
'কী বলবেন মানে ? ভুভিক্ষের চাষি সেজে গ্রামে এসেছেন। আচ্ছা বলুন, বলুন তো ওটা কী গাছ ?'
চারদিকেই গাছপালা। ধ্রুবজ্যোতি ডানেবাঁয়ে তাকাল—'কোন্‌টা ?'
'ওই, ওই যে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে, ওর পেছনে। মাটির ঘরটার পাশে…'
'পাকুড়।'
'এই মেরেছে…' এবার মুশকিল নন্দিতার নিজেরই। কলকল হেসে উঠল—'কী পরমদা, ধ্রুবদা ঠিক বলেছেন ?'
'আমি বটানিস্ট নই।'
'আচ্ছা ঠিক আছে…' অদম্য নন্দিতা—'এবার বলুন তো ধ্রুবদা। ঠিকঠিক বলবেন। কত ধানে কত চাল ?'
সবাই হেসে উঠল।
'না, হাসি নয়। এটা ফিল্‌ম্‌। থিয়েটার করতে গ্রামে আসতে হয় না আপনাদের। দিব্যি পাখার তলায় মুড়ি তেলেভাজা খেয়ে মাসের পর মাস রিহার্সেল আর সাজানো স্টেজে হাত পা ছুঁড়ে চাষির দুঃখু। বাট ইট ইজ ফিল্‌ম্‌, বুঝলেন ফিল্‌ম্‌। গ্রামে এসে দিনের পর দিন মশার কামড় খেয়ে অভিনয় করতে হবে আপনাকে।'
'থিয়েটারটা বুঝি ফাঁকি ?'
নন্দিতা আবার নিজের ফাঁদে। ধাক্কা সামলে তাকাল পরমদার দিকে।
'বেশ, বলব সত্যেনকে…' ধ্রুবজ্যোতি সহজ ভঙ্গিতেই স্মিতমুখ—'তোমার দলের নায়িকা কী সব বলছেন আজকাল। সাক্ষী এতগুলো মানুষ, সাক্ষী পরমদা…'
'বলুন না, বলুন। সত্যেনদা কেন, আমাদের দলের সবাই জানে, আই লাভ থিয়েটার, থিয়েটার ইজ মাই একজিস্ট্যান্স…' চলতে চলতে নন্দিতা ঈষৎ সর্তক—'কিন্তু এখানে আসার পর কাল সন্ধ্যে থেকে কেমন মনে হচ্ছে ফিল্‌ম্‌ ইজ ডিফারেন্ট। একেবারে আলাদা কিছু। কী পরমদা, ভুল বলেছি…'
নিজে মগ্নতা থেকে এদের টুকটাক কথাবার্তায় সরে এসেছিলেন পরমেশ। থমকে দাঁড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন পকেট থেকে—'নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝে নাও ভালো থিয়েটার তৈরি না হলে ভালো ফিল্‌ম্‌ তৈরি হয় না কোনো দেশে।'
'কী! হলো তো! নন্দিতা কথা বলবেন আর ?' ক্যামেরাম্যান নির্মল।

'বাঃ রে…' নন্দিতা কিছুমাত্র বিব্রত নয়—'আমার কথাগুলোই তো সবাই মিলে শোনাচ্ছেন আমাকে। অতটত ভেবেটেবে বলেছি নাকি ছাই। ধ্রুবদাকে একটু ক্ষ্যাপাতে চেয়েছিলাম। ক্ষেপলেন না। সে আমি কী করব ?'

নন্দিতার খুকি-খুকি ভঙ্গিটাই এমন, সকলেই কোরাসে হেসে উঠল।

তেঁতুলতলা। মোহনপুর গ্রামের শিরদাঁড়া, একমাত্র পাকা সড়কটা সেই স্টেশন থেকে এঁকেবেঁকে চলে গেছে আরেক প্রান্তে। রিকশ চলে, লরি আসে। ফিল্ম্-ইউনিটের ভ্যান গাড়িগুলোর জন্যেও সুবিধা হয়েছে অনেক। ডানদিকে কিছুটা এগোলেই গ্রামের কেন্দ্রস্থলে বুড়োশিবতলার মন্দির, অশ্বত্থ গাছের চত্বর, দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রামীন ব্যাঙ্ক, পোস্টপিস, প্রতিদিনের বাজার দোকানপাট ভিড় আর কোলাহল। দলের লোকজন নিয়ে বাঁদিকে ঘুরলেন পরমেশ। আরো এক নির্জন অন্তঃপুরের দিকে চলে গেছে সে রাস্তা। মাইল খানেক কিংবা তারও চেয়ে বেশি কিছুটা হাঁটলে শুটিং-স্পট—হাতুই।

বড়ো বেশি খুশি-খুশি নন্দিতা। গোটা শরীর নেড়েচেড়ে তার উচ্ছ্বাস—'আচ্ছা, এটা তো একটা গ্রাম পরমদা ?'

'তোমার সন্দেহ আছে ?'

'না, জায়গাটা দেখুন। কেমন মফস্বল শহর-শহর। আমার এক পিশেমশাই থাকেন কৃষ্ণনগর। জায়গাটা অনেকটা সেরকম।'

'শহরই তো…' বাক্যটা টেনে নিয়েছে বিতোষ—কাল সন্ধেবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। এখানে বাজারে, ওদিকে স্টেশনের কাছাকাছি বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে জমজমাট দোকানপাট, টিউবলাইটের আলোয় মানুষের ভিড়ে জমজমাট। শহরের সবই পাবেন আপনি। একটা দোকানে তো কিংসাইজ সিগারেটও দেখলাম সব রকম। অবিশ্যি ডানহিল ক্যাসেল ফাইভ-ফিফটি-ফাইভ ছাড়া…'

'সে তো কসবায় আহিরিটোলায়ও নেই আপনার…' কারও দিকে কোনো আমল না দিয়ে এপাশে ওপাশে নন্দিতা তাকাল চারদিকে।

গ্রামের কায়েতপাড়া। এপাশে ওপাশে অনেকগুলো দোতলা তিনতলা পাকা-বাড়ি। লম্বা ইটের পাঁচিল। ভেতরের উঠোন থেকে শিউলী গন্ধরাজ পেয়ারা গাছের মাথা-চাগানো হালফ্যাসানের সুন্দর একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। গোলাপী রঙের দোতলা বা আড়াইতলা চেহারার এ বাড়ি

কলকাতার অভিজাত এলাকায়ও খুব একটা বেমানান নয়। দোতলার পার্লারে আধুনিক রুচির ঝকঝকে রেলিং-এ চটের বস্তা।

মুখে আঁচল চেপে নন্দিতা গুটিগুটি এগিয়ে এল—'পরমদা, এ কী? বাড়ির নাম অচলায়তন?'

'হবে। তোমাদেরই মতো কোনো মাসিপিশি হয়তো বাংলায় অনার্স পড়ে। রবিঠাকুরের বই-এর নাম…' পরমেশ ধমকে উঠলেন—'কিন্তু কী হচ্ছে তোমাদের এসব? ঠিকভাবে চলো। দেখছ না কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে লোক?'

বাড়িগুলোর বারান্দায় জানালায়, সদরে, এদিকে ওদিকে গাছপালা ঘরবাড়ির ফাঁকে ফাঁকে ছুটে ছুটে আসছে মানুষ।

স্বভাবধর্মে সংযত মহিলা প্রতিমা দাশ হঠাৎ বললেন—'দেখেছেন! দেখেছেন পরমেশবাবু?'

প্রবীণা অভিনেত্রীর চোখের সরলরেখায় তাকালেন সকলেই। রাস্তা থেকে একটু ভেতরে, ঝোপজঙ্গলের ওপাশে সাবেকি ঢং-এর হলুদ দোতলা বাড়ির ছাদে অ্যান্টেনা। দুটো কাক।

শান্ত ভঙ্গিতে পরমেশ—'কলকাতা থেকে মাত্র মাইল ষাটেক দূরে আমরা আছি এখন। কলকাতা টেলিভিশনের আওতায়।'

'কিন্তু পরমদা, তাই বলে…' নন্দিতা স্তম্ভিত। যেন তাজমহল দেখছে—'তাই বলে অ্যান্দুরের গ্রামে টিভি?'

'আপনার আপত্তিটা কোথায়? গ্রামের মানুষ টি ভি দেখছে বলে? না কি…'

একমুখ ধোঁয়া টেনে নিয়ে পরমেশ, চলতে চলতে—'গ্রামের ভেতর শহর ঢুকে পড়ছে। তোমরা যত সাহেব-মেমসাহেব হতে চাইছ, ওরাই বা বাদ যাবে কেন? তোমাদের দেখে ওরাও আধুনিক হতে চাইছে। নাও এগোও… যেখানে সেখানে এভাবে দাঁড়িয়ে পড়বে না। ছাট্‌স্ নট প্রপার…'

পরমেশের প্রতি সমীহসূত্রে কিঞ্চিৎ বিনম্র সকলেই, কিছুটা চুপচাপ। কিংবা নিজেদের একটু সামলে নেবার ঝোঁকেই হঠাৎ থমকে দাঁড়াবার প্রয়োজন ছিল। ধিকিধিকি এগোচ্ছিল একটা গরুর গাড়ি। এখন গা ছুঁয়ে কাছাকাছি। পেল্লাই ভারি একটা বস্তা কেরিয়ারে চাপিয়ে ভাঙা ঝরঝরে একটা সাইকেল টেনে নিয়ে যাচ্ছিল বারো-চোদ্দ বছরের একটি ছেলে। সসম্ভ্রমে আর্টিস্টদের পথ দিয়ে গিয়ে বেচারি যখন নিজেরই ভারে উল্টে পড়ার মুখে, বিতোষ ধ্রুবজ্যোতি তড়িঘড়ি

ধরে ফেলল। উৎসুক মানুষজনের সঙ্গে ওদের সম্মিলিত হাসাহাসিতে উদাসীন পরমেশ সঙ্কীর্ণ পথটুকু পেরিয়ে গেলেন।

এবং পেরিয়ে গিয়ে চাপা গলায়—'ওই যে বড়ো পাকাবাড়িটা দেখছ, পুরনো দোতলা বাড়িটা, এত বড়ো বাড়ির সবটাই নাকি ফাঁকা। ভূতের বাড়ি···'

'ভূত!' আঁৎকে উঠল আরতি।

হাসলেন পরমেশ। হাত বাড়িয়ে আরতির মাথায় পাঁচ আঙুলের আদুরে বিলি কেটে— 'হ্যাঁ, ওখানেই, ওই ভূতের বাড়িতেই তোমাদের, অর্থাৎ মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা হচ্ছিল···'

'অ্যাঁ! ওই, ওই ভূতের বাড়িতে আমরা থাকব?' চঞ্চলা নন্দিতা।

'না, না, এখন তো আর থাকতে হচ্ছে না। ভয় কী···' ইতস্তত ছড়ানো মুগ্ধ চোখের গ্রামবাসীদের ওপর চোখ বুলিয়ে পরমেশ—'এ বাড়িটার সাত শরিকের সকলেই নাকি বাইরে। আসানসোল বর্ধমান চুঁচুড়ায় ওকালতি চাকরি ব্যবসা। কেউ নাকি আসেনও না কোনোদিন। সব কিছু ব্যবস্থা হবার পর মেয়েদের থাকার জায়গার একটা সমস্যা ছিল। অনেক ঘুরে ঘুরে, লোকজন পাঠিয়ে সুকুমারবাবু মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগও করলেন। বাড়িটা দেখাশোনার জন্যে কে একজন নাকি আছেন এখানে। বড়ো জোতদার। সুধন্য কুণ্ডু না কি যেন নাম। লোকটা কি করল জানো?'

পরমেশ তাকালেন ধ্রুবজ্যোতির দিকে—'এদেশে কাজ করবেন কি মশাই! বিগ্ বাজেট লো-বাজেটের ধার ধারে নাকি কেউ? লোকটা কত হাঁকল জানেন? তিনটে ঘর এক মাসের জন্যে দুহাজার। বায়োস্কোপ কোম্পানি তো সবই বায়োস্কোপ! তিনটে ঘর চেয়েছিলাম। আলো পাখা টয়লেট কিছুই ঠিক নেই। সবই আমাদের করে নিতে হবে···'

'শেষে কী হলো?' আলতো হাসি ঠোঁটে ভাসিয়ে রেখে ধ্রুবজ্যোতি।

'কী আর হবে। লোকটা নাকি অনেক ঘোরাঘুরি করেছে। শেষ পর্যন্ত নাকি আটশ-এ নেমেছিল। হয়তো আরো নামত। সুকুমারবাবু পাত্তাই দিলেন না। এরই মধ্যে স্কুলের মাস্টারমশাইদের কোয়ার্টারটা ব্যবস্থা করে ফেলেছেন···'

'উঃ কি ভাগ্যিস, কি ভাগ্যিস···' হাতের ছোট রুমালে কপালের গালের ঘাম মুছতে মুছতে নন্দিতা— 'ভাগ্যিস মাস্টারমশাইরা ছিলেন···'

'তাহলে আর ভূতুরে-বাড়ি বললাম কেন তখন···' মৃদু হাসিতে পরমেশ—

'তোমাদের এখানে রাখাই যদি স্থির হতো, বলতাম বিয়েবাড়ি। গ্রামের সব মেয়েদের বিয়ে হয় এখানে।'

দোতলার দেয়াল ফাটিয়ে পরগাছা বেড়ে উঠেছে, শ্যাওলা-জমা আদ্দিকালের প্লাস্টার খসে খসে চারদিকে ক্যাটল—বাড়িটার গা ঘেঁসেই যাচ্ছিল ওরা। ওপরে নিচে জানালাগুলো সত্যি বন্ধ। একতলার বারান্দায় দর্শনার্থী গ্রামবাসী কয়েকজন। চুপচাপ ছিল আরতি। হঠাৎ বলল—'দেখো দেখো প্রতিমাদি, কেমন কাঁটা দিচ্ছে গায়ে। এত বড়ো একটা বাড়িতে আমরা মাত্র তিনজন মেয়ে! বাপস্, থাকতামই না আমি...'

'কী করতে ?' পরিহাসে ভ্রূ কুঁচকোলেন পরমেশ।

'ওরে বাব্বা, আমি পালাতাম।'

'পালাতে কোথায় গো শ্রীমতী...' সস্নেহে, হাসতে হাসতে কিশোরীযুবতীর পিঠে হাত—'এখন তো তুমি আমাদের খপ্পরে। জানো তো আমরা আবার ক্যাম্পে পুলিশ রাখি।'

চাপা হাসিটা প্রচ্ছন্ন ছিল সকলের মধ্যে। মুখর হলো।

এবং অবাক হলো, কায়েতপাড়ার শেষে, মফস্বলী আদল পেরিয়ে বনবাদাড় মেটেঘরকুঁড়েঘরের জঙ্গলে পড়তেই কিছুটা অন্যরকম। ভিড়টাও যেন একটু বেশি। দূর থেকে দেখতে পেয়েই ঘরে ঘরে খবরটা পৌঁছে দিচ্ছে কেউ, ছুটে ছুটে আসছে মানুষ—দাওয়ায় বসে ধুঁকছিল যে বুড়ো অথবা সাইকেল চেপে, পায়ে হেঁটে বাজারের দিকে যাচ্ছিল যারা, ঘরউঠোন নিকোতে নিকোতে উঠে এসেছে গৃহবধূ অথবা পুকুরঘাটে এঁটোবাসন রেখে, কাঁচার কাপড় ফেলে কিংবা স্নানের পর ভেজা-কাপড়ে ঘরে ফেরার পথে গাছের আড়ালে শরীর লুকোনো সলজ্জ যে যুবতী, ভিড়ের আনাচেকানাচে তাদেরও দেখা গেল দুচারজনকে। গাছপালা ঝোপঝাড়ের সঙ্গে মাখামাখি স্তম্ভিত জনসমষ্টি। গভীর অরণ্যে ফরেস্ট অফিসারের দল যেমন, স্তব্ধ বিস্ময়ের বনে সহকর্মীদের নিয়ে এগোচ্ছেন পরমেশ।

নন্দিতা বলল—'বাড়িটা বোধ হয় শ খানেক বছর আগেকার পরমদা। এত পুরনো...'

'জানি না।'

'ভাবাই যায় না, দেশে এত এত গরিব মানুষ, মাত্র সাঁয়ত্রিশ বছর আগে এত বড়ো একটা দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এই গ্রামে, আবার একশ বছর আগে এরকম একটা রাজপ্রসাদ বানিয়েছিল কেউ। এখন ভূতের আস্তানা...'

'একশ বছর বলছ ?' ভ্রূ-কুঁচকে কী ভাবলেন পরমেশ—'এইটিন এইটি। হ্যাঁ, মাদ্রাজ ফেমিনের চার বছর পর। কে জানে, সেই মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষের বছরই গড়ে উঠেছিল কিনা...'

'আপনি তো বেশ এখন ফেমিন স্পেশালিস্ট...' বিতোষ তার সিগারেটের টুকরোটা পাশে ছুঁড়ে ফেলল। সকৌতুকে—'অনেকটা ইতিহাসের মাস্টার-মশাইর মতো...'

পরমেশ আমল দিলেন না। ঘুরে তাকালেন পেছনের দিকে—'আনন্দমঠ পড়েছেন প্রতিমা ?'

'পড়েছি।'

'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। পলাশীর যুদ্ধের তের বছরের মধ্যেই দেশের মানুষ মালুম পেয়ে গিয়েছিল, আপনাদের রেনেসাঁসের পুরুতঠাকুররা কী চিজ। বাংলাদেশের চারভাগের তিনভাগ লোকই নাকি মরে গিয়েছিল স্রেফ না-খেতে পেয়ে...'

সকলেই নিঃশব্দে এগোয়। ডানদিকে গরুর খুঁট ধরে দাঁড়িয়েছিল এক বুড়ো। ড্যালাড্যালা চোখে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল, দেখলেই হাসি পায়।

'বাংলামতে বছরটা ছিল এগার শ ছিয়াত্তর। ইংরেজরা তার শতবর্ষ পালন করল ইংরেজি নিয়মে—আঠার শ ছিয়াত্তরে। লণ্ডনের রাণী ভিক্টোরিয়াকে পুরোপুরি ভারতসাম্রাজ্ঞী ঘোষণা করা হলো। সে বছরই মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ। সরকারি হিশেবেই অনাহার মৃত্যুর সংখ্যা পঞ্চাশ লাখের বেশি...'

'আপনি এত সব মুখস্থ করে এসেছেন ?' প্রতিমার সংযত হাসি।

দুধের সরের মতো পাতলা হাসির আভাস পরমেশেরও মুখচোখে—'দুর্ভিক্ষ নিয়ে ছবি করবেন, ডকুমেন্টেশন থাকবে না। কন্‌জার্ভেটিভ ডিজরেলির পয়লা নম্বর সাকরেদ লর্ড লিটন তখন আমাদের ভাইসরয়। এইটটিন সেভেনটি সেভেনে যখন লক্ষ লক্ষ লোক মরছে না-খেতে পেয়ে, লিটন সাহেব দরবার বসালেন দিল্লীতে। যুবরাজমশাই এলেন। কোটি কোটি টাকা উড়ল হিজ একসেলেন্সির সম্মানে। যদি তার ছিটেফোঁটাও মাদ্রাজের জন্যে খরচ হতো, হয়তো বেঁচে যেত কয়েক লক্ষ মানুষ...'

'যাক, আমরা কিন্তু জোর বেঁচে গেছি...' হঠাৎ বিতোষ।

'কি রকম !'

'সত্তর দশকটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেছে। ছিয়াত্তরের বাইসেন্টেনারির গাড্ডায় পড়তে হয়নি আমাদের...'

'আটাত্তরের সেপ্টেম্বর ভুলে গেলেন? সেই ভয়ঙ্কর বন্যা। ষোলটি জেলার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নটি জেলাই ভেসে গেল। কলকাতাও বাদ পড়েনি...' পরমেশ আবার একটা সিগারেট ধরাচ্ছেন—'কিংবা তারও আগে তিস্তার বন্যা...'

'বাঃ রে! সে তো কোনোটাই দুর্ভিক্ষ নয়...' ত্বরিত নন্দিতা—'ফ্লাড। ন্যাচারাল ক্যালোমিটি...'

'হ্যাঁ, ফেমিন সম্বন্ধেও ইংরেজরা একথা বলত। প্রাকৃতিক দুর্যোগেই দুর্ভিক্ষ অন্নাভাব। কথাটা মিথ্যেও নয় তেমন। কিন্তু দুর্গতি তাদেরই, যারা নিত্য-কালে দুর্গত...' পরমেশ যেন আপন মনেই এগোতে এগোতে, আরতির কাঁধে হাত—'ইম্‌পেরিয়ালিস্ট ডিভাইসে যারা মার খেত, এখন তোমাদের ডেভেলপ-মেন্টের ঠেলায় কিন্তু তারাই মার খায়। আবার এদের দিয়েই বলাতে চাও—যুগ যুগ জিও। বন্যা ঠেকাতে ডি. ভি সি বানাবে, ডি. ভি. সি-র জল ছেড়ে বন্যা বানাবে। তারপর রিলিফ-রিলিফ করে চিৎকার, রিলিফের হাঁকডাকে দেশপ্রেমের বান ছোটে তোমাদের...'

'আমরা মানে?'

'ছোটবড়ো হরেক পলিটিকাল পার্টি, সাধুসন্তদের ক্লাব, চ্যারিটি শো-এর নামে তোমাদের নাচগাননাটকের হুল্লোড়। বাবুদের কালচারে বেশ জমে যায় ব্যাপারটা। পভার্টি অব মিলিয়নস—বাবুদের কাছে বেশ ভালো একটা ক্যাপিটাল। ইট সেল্‌স্ ওয়েল...'

'আমরাও কিন্তু এই পভার্টিরই ছবি করতে এসেছি পরমদা...' ধ্রুবজ্যোতি অকস্মাৎ উদ্দাম হাসিতে—'রীতিমত জবরদস্ত ছবি করে কান বার্লিন ভেনিস চলে যাব, এখানে গ্রামের মানুষ বলবে বোম্বাস্টিক হাই-থটের বই ..'

এবং হাসির প্রথম গমকেই, কৌতুকের বিচ্ছিন্নতায় ধ্রুবজ্যোতি বোকা-বোকা ভাবে সহসা বিহ্বল। দলের সকলেই নির্বাক চোখ সরিয়ে নিয়েছে বাঁ থেকে ডানে।

ভ্রূ-কুঞ্চন থেকে নড়েচড়ে পরমেশ প্রগলভতায় চকিতে স্বাভাবিক। নন্দিতাকে—

'কোনারক দেখনে? খাজুরাহো?'

'এখানে খাজুরাহো? কী বলছেন?'

পরমেশ, ঈষৎ গম্ভীর, বাঁক নিলেন বাঁদিকে।

বাঁপাশে চওড়া কাঁচা রাস্তা। দুমাস আগে, লোকেশন দেখতে আসার সময়ও বর্ষার কাদা ছিল। এবড়োখেবড়ো কাদা শুকিয়ে এখন খটখটে। পায়ের তলায় বেঁধে। একদিকে গেরস্তবাড়ি, অন্যদিকে প্রাচীন ভাঙামন্দির। মন্দির ঘিরে বহুদিনের গজিয়ে-ওঠা বনবাদাড়। তারই গা ঘেঁষে পুরনো অব্যবহৃত ইটের পাঁজা। আরো বেশি ঝোপজঙ্গল।

'সাপটাপ নেই তো পরমদা?' বাঁহাতে শাড়িটা কিঞ্চিৎ তুলে সাবধানে পা ফেলছিল নন্দিতা।

'এখানকার লোকেরা তো বলে, একটু বেশি রকমই নাকি আছে।'

'ওম্মা গো…' সর্বাঙ্গে কেঁপে উঠে সর্বকনিষ্ঠা আরতি, লাফ মেরে একেবারে পরমেশের গায়ে।

পরমেশ ওর পিঠে চাপড় মেরে—'এ তো আচ্ছা বিপদ বাচ্চা খুকিটাকে নিয়ে। অলরাইট, তুমি আমার পাশে পাশেই থাকো। একটা কিছু ফণা তুললে আমিই মরব আগে'

'আপনার রোড-সেন্স তো দারুণ পরমদা…' হাসতে হাসতে বিতোষ বলল—'এমন কন্‌ফিডেণ্টলি হাঁটছেন, যেন মোহনপুরেই ঘরবাড়ি…,

'হ্যাঁ, মোড়ের ওই ভাঙা মন্দিরটাই চিনিয়ে দিলো…' এপাশে ওপাশে তাকিয়ে পরমেশ—'হয়তো এখানেও কটা শট নেব। কিন্তু মুশকিলে ফেলেছে ইলেকট্রিসিটির পোস্ট এই শালকাঠের থামগুলো। গ্রামে বিদ্যুৎ দেবার এমন হিড়িক পড়ে গেছে ব্যাটাদের। বুঝলে নির্মল, একটা কায়দা খুঁজতে হবে। সাঁয়ত্রিশ বছর আগের দুর্ভিক্ষের গ্রাম। ফ্রেমের কোণে-খাঁজে বিজলিবাতির তারফার ঢুকে পড়লেই হয়েছে আর কি! অবিশ্যি তেমন সুবিধে পেলে, সুকুমারবাবুকে বলেছি, লোকাল কর্তাদের বলে পোস্টগুলো তুলে ফেলতে হবে এক দুপুরের জন্যে…'

বেশ খানিকটা এগোবার পরই বাঁদিকে আরো একটা বাঁক। মোড় ঘুরতেই বিশাল প্রাঙ্গণ জুড়ে আচমকা এক প্রাচীন মন্দির। খুব উঁচু, মেঘ ছুঁয়েছে তার আটচালার চূড়ার ত্রিশূল। দুদিকে ছটি ছটি করে দ্বাদশ শিবমন্দির। চোর-কাঁটায় আচ্ছন্ন মধ্যবর্তী মাঠ। প্রবেশমুখের ভগ্নস্তূপে, বোঝা যায়, মজবুত সিংহদ্বার ছিল একদা পুরাকালে। এখন খাড়া৺.ড়ি ধুলিসাৎ।

'দেখছেন নন্দিতা, টেরাকোটা। বাংলার ঐতিহ্য…'

'থাক, আর জ্ঞান দিতে হবে না আপনাকে…' বিতোষকে কিছুমাত্র আমল না

দিয়ে নন্দিতা উৎসাহে টগবগ। ছুটেও গেল কিছুটা—'সত্যি পরমদা, প্রতিমাদি দেখো দেখো, ফ্যান্টাস্টিক! গোটা মন্দিরটাই যেন গায়ে গয়না পরে আছে। গিরিশ ঘোষ বিনোদিনীদের যুগের গিন্নিবান্নিদের মতো…'

সমবেত উচ্ছ্বাস—'বাঃ, বেশ বলেছেন তো! অ্যাপ্রেসিয়েশনটাও দারুণ…'

দূরের মন্দিরে পুজোর ঘণ্টা। সোজা সরলরেখায় পরমেশ সেদিকেই এগোলেন। দুর্গম পার্বত্য অরণ্যে নিঃসঙ্গ ঝর্ণার মতোই শান্ত নিরুত্তাপ গ্রামের অভ্যন্তরে অনাদরের প্রাচীন মন্দির। প্রশস্ত দরদালানের প্রায়ান্ধকারে, মেঝেতে প্রখর রোদে নকশা কাটা খিলানের ছায়া। অন্তঃপুরে পেতলের প্রদীপশিখার সঙ্গে তেজী টিউবের আলো। সালঙ্কারা কালীমূর্তি। চারপাশে বারান্দার খাঁজে খাঁজে অবিরাম বকবকম্ পায়রার ছটফট। ভেতরের পুরোহিত ধ্যানস্থ যদিও, অকস্মাৎ ট্যুরিস্ট উৎপাতে দরজায় প্রতীক্ষমান কতিপয় বুড়োবুড়ি নিঃশব্দে তাকালেন। নিজের ঋজুতায় করজোড় বুকে রেখে দাঁড়ালেন পরমেশ। দলের আর সকলেই যখন বিহ্বলতায় পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ, অতর্কিত চমকে ললাট স্পর্শ করে পরমেশ স্থির রইলেন কিছুক্ষণ। বিগ্রহের মুখোমুখি। দুজন বিধবা বুড়ি, দরজা আড়াল করে বসেছিলেন যাঁরা, কোমর ঘেঁষড়ে সরে বসলেন একটু—ভালো করে মাকে দর্শন করো বাছা। কল্যাণ হোক তোমার…

শুধু করজোড় নয়, ভূমিস্পর্শী ললাটে প্রতিমা আনত হতেই আরতি নির্মল সভক্তি প্রণতিতে আরো একটু নিচু হলো। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন পরমেশ, যেখানে, মন্দির প্রাঙ্গণে ধ্রুবজ্যোতি বিতোষ বাক্যালাপে ধূমপানে মগ্ন ছিল নিবিড়।

চাপা গলায় নন্দিতা—'আপনি, আপনি প্রণাম করলেন পরমদা?'

নতুন সিগারেট ধরিয়ে পরমেশ একই ঋজুতায়—'এই এত বড়ো একটা মন্দির কয়েকশ বছর আগে তৈরি হয়েছিল, তোমার আমার টুরিস্ট ইন্টারেস্টে নয়। ওঁদের পুজোআচ্চা ধর্মের জন্যে। ওঁরা যখন এখনও আছেন, ওদের ধর্মটাও আছে, আমি এমন কে তালেবর লোক বলো তো, ওঁদের সামনেই ওঁদের দেবতাকে উপেক্ষা করে চলে যাব!'

'আর যদি মসজিদ বা গির্জা হতো?' সহাস্যে বিতোষ।

'দলবল নিয়ে গিয়ে এরকম অচেনা জায়গায় যদি ফিল্ম্ বানাতে হয় বিতোষ, করতে হবে। ওঁদের ধর্মের কায়দাকায়দাটা যদি জানা না থাকে, শ্রদ্ধাটুকু ভালোবাসাটুকু তো জানানো যায়।'

ওপর ভারি ভারি তত্ত্বভাষ্যে তখন উৎসাহ নেই কারও। ওরা যে-যার-মতো পোড়ামাটির অলঙ্করণ খুঁজতে ছড়িয়ে পড়তেই, কি মনে হলো, পরমেশ বন্ধুভাবে ধ্রুবজ্যোতির কাঁধে হাত রাখলেন—'তখন ঠিকই বলেছিলেন ধ্রুব, কাজ করতে করতে একটা জায়গায় পৌঁছে যাবার পর নিজের কাছেই নিজেকে দাঁড় করাতে হয়—খুব একটা ফাঁকি দিচ্ছি না তো কোথাও? ওটা রেসপেক্‌টিবিলিটি রেস্‌পন্‌সিবিলিটিরই দায়। ওই, ওই দেখুন…'

ধ্রুবজ্যোতি তাকাল। পরমেশ অঙ্গুলিনির্দেশে আকাশের দিকে দেখাচ্ছেন কিছু।

'ওই, ওই যে দেখছেন নারকেল গাছগুলো…'

শিবমন্দির সারির পেছনে পাশাপাশি তিনটে ঢ্যাঙা গাছ।

'থোকা থোকা ডাব ঝুলছে। এখন যদি আপনার ঠাণ্ডা জল খাবার ইচ্ছে হয়, আপনি পারবেন না, আমি পারব না, কিন্তু একজনকে তো ওই গাছের ডগায় পৌঁছোতেই হবে। ছেলেটা কাঠবেড়ালির মতো যত উচুঁতে উঠবে, ততই কিন্তু ওর নিচের দিকে তাকাবার ভয়…'

'হ্যাঁ শুনেছি…' ধ্রুবজ্যোতি তার নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে—'লোকে কথায় বলে—তাল-গাছের আড়াই হাত…'

'ওই শেষ আড়াই-হাত ওঠাটা খুব শক্ত? না? হবে, হতেই হবে…' পরমেশ উৎসাহ পেলেন—'আসলে কিন্তু সেটা ওর ধপাস করে পড়ে যাবার ভয় নয়। তারও চেয়ে বেশি ভয়, আরো আরো ওপরে ওঠার। এখানে হনুমান বিদ্যেটার জন্যে হয়তো বুকে কিছুটা সাহস থাকলেই চলবে আপনার, কিন্তু সেট' যদি আর কোথাও ফলাতে চান একটা বিশ্বাসের জোর চাই। কন্‌ভিকশনের শিরদাঁড়াটা শক্ত না হলে…'

বয়সে জ্যেষ্ঠ, গোটা সাতেক ছবি এখন পর্যন্ত। বারকয়েক নানাবিধ 'রজতকমল'-এর পর কার্লে-ভেভারি মস্কো পর্যন্ত দৌড়েছিল শেষ তিনটে ছবি। আন্তর্জাতিক খ্যাতির মোটামুটি অংশীদার এ-হেন পরমেশ মিত্রের নিবিড় সান্নিধ্যে ধ্রুবজ্যোতি, মাঝারি গোছের কোনো এক গ্রুপ-থিয়েটারের নির্দেশক অভিনেতা কি বলবে, কিভাবে এগোবে ভাবছে যখন

সরে গেলেন পরমেশ। নিজের মধ্যে অশান্ত ঝড়—'অথচ দেখুন, গেঁয়ো বুড়ো-বুড়িগুলোকে। এ হার্ড অব র‍্যাবিটস। নিউক্লিয়ার আর্মস বোঝে না, প্ল্যানিং কমিশনের নাম শোনে নি, বাজেট কি বস্তু জানার দরকার নেই, খবরের-কাগজ

চোখে দেখলেও গপ্‌পো পড়ে। ফুলবেলপাতা পুজোর-ঘন্টা জগতপারম্পুরুষ উপোশটুপোশে শিশুর মতো বেঁচে থেকে দিব্যি কাটিয়ে দিলো জীবনটা। এই বিশ্বাসটা কেড়ে নেবার আগে নতুন কিছু দিতে পেরেছেন এদের ? গ্রামে এসেও তো দেখছেন যুবকদের। ঈশ্বর ভুলিয়ে নাস্তিক বানালেন। হিন্দী বায়োস্কোপের হিরোহিরোইনরা নতুন ঈশ্বর। নাস্তিকরাই আরো আরো বেশি করে পুজোর প্যাণ্ডেল বানাচ্ছে এখানে ওখানে, বাবা তারকনাথের বাঁক-কাধে লম্বা মিছিলে নাস্তিকরাই সংখ্যায় বেশি, ফিল্‌মি মাইকে নতুন কীর্তন···তাই ভয় হয়। যখনই একটা নতুন ছবির কথা ভাবি, প্রত্যেকবারই নিজেকে নিয়ে ভয়···'

'কাজকর্মের কোনো পরিবেশই নেই বলছেন ?'

'এক্‌স্‌জ্যাকটলি···' পরমেশ এগিয়ে এলেন কাছে, সহজ সংযমে, ব্যক্তিত্বের রাশ টেনেও তেতো স্বাদে তাঁর কথা-বলা— 'উটপাখির মতো মুখ লুকোচ্ছেন কোথায় ধ্রুব ? নাটক করেন, চারদিকের এই মার আপনাকে মারে না ? এত লোক নিয়ে দল রাখতে গিয়ে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় টের পান না, কোথায় আছেন ?' কিন্তু ফিল্‌ম ! সে তো আরো মারাত্মক মশাই। লাখ লাখ টাকার কমিটমেণ্ট, আর্টিস্ট টেকনিশিয়ান নন-টেকনিশিয়ান হরেক রকম লোকজন নিয়ে এতগুলো মানুষ, ট্রেড-এর নানান হ্যাজার্ড। সব মিলিয়ে এত বড়ো একটা রাজসূয় যজ্ঞ চালাতে গেলে অ্যামেচার থাকা যায় না মশাই। "নতুন ডিরেকটর"—ওরকম পিঠ-চাপড়ানি সুধাবাক্যে আমি বিশ্বাস করি না। ফিলম-মেকার অ্যামেচার থাকতে পারে না কখনও। একটার পর দ্বিতীয় ছবি যে করবে, তাকেই আমি একজন ম্যাচুয়োর্ড ডিরেকটরের সমান ওজনে মাপব···'

ধ্রুবজ্যোতি চুপ। যেন একটা প্রকাণ্ড মানুষ তাঁর নিজেরই চঞ্চলতায়, নিজেরই ভরাট যন্ত্রণায় বলে যেতে চাইছেন কিছু। সে উপলক্ষ মাত্র। অথচ কিছু না-বললেও যখন নয়— 'এবার তো দারুণ গল্প আপনার। সাবজেক্টটাও ভীষণ ক্রুড —দুর্ভিক্ষ ক্ষুধা। একেবারে বেসিক ব্যাপার আমাদের।'

চারদিক থেকে মন্দিরটাকে একপাক ঘুরে ওপাশে বেরিয়ে এসেছে ওরা। আরতির বুক থেকে খসে-পড়া আঁচলটা উড়ছে বাতাসে। বিতোষের গা ঘেঁষে সহাস্য নন্দিতা। এক নজর চোখ ফেলেও পরমেশ আমল দিলেন না। আরো একটা সিগারেট প্যাকেট থেকে। ধীরে আত্মস্থ ভঙ্গি—'আপনাদের কথা জানি না, ওই ফেমিন আমি দেখেছি। অবিশ্যি খুবই ছেলেবেলায়। কুমিল্লায়

ঈশ্বর পাঠশালা থেকে বেরিয়ে সবে ওখানেই ভিক্টোরিয়া কলেজে ঢুকেছি। প্রমথেশ বড়ুয়ার আমল তখন। ফিল্ম্ করব, মাথায়ই ছিল না। দেশ জুড়ে তোলপাড় চলছে—যুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, মন্বন্তর, আরেক দিকে প্রগতি লেখক-শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ। বুঝে না-বুঝে গোটা দেশের মানুষের সঙ্গে উত্তাপে সেঁকেছি নিজেদের···'

'আপনারা কী বলুন তো। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন? দেখলেন না কী জিনিস! ফ্যানটাস্টিক। আচ্ছা পরমদা, বলুন তো মন্দিরটা কতদিনের পুরনো?'

'দাঁড়াও···' নিরাসক্ত ভ্রূকুটিশাসন নন্দিতার দিকে! পরমেশ আরো নিবিড় ধ্রুবজ্যোতির কানে—'চারপাশটা বিচ্ছিরিভাবে দেউলে হয়ে যাবার পর আজ যখন সেই সময়টা, সেই দুর্ভিক্ষ নিয়ে ছবি করছি, ভীষণভাবে মনে পড়ছে কাঠ বাঙাল যুবকটিকে, দ্যাট হাফ-এডুকেটেড ইয়ং ম্যান, পারহ্যাপস্ হি কুড হ্যাভ ডান্ ইট মাচ বেটার দ্যান হোয়াট আই ক্যান ডু নাউ। এখন সবাই কালেকটিভ মুভমেন্টের কথা ভাবছি, উইথ ভেরি মাচ ইন্‌ডিভিজুয়াল এফোর্ট···'

'হ্যাঁ, কার আগে কে গিয়ে গভর্নমেণ্ট গ্রাণ্টটা বাগাতে পারি।'

'রাইট। রাইট ইউ আর···'

পরমেশ ধ্রুবজ্যোতি দুজনই হেসে উঠল। হাসতে হাসতে পরমেশ নন্দিতার দিকে —'হ্যাঁ, কি বলছিলে তুমি?'

'কিছু না।'

'হ্যাঁ বলছিলে। বলতে দিইনি তখন···' নন্দিতার পিঠে হাত— 'টেরাকোটা! ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞাপন শব্দটা নতুন শিখিয়েছে তোমাদের···'

'না, কক্ষনও না···' নন্দিতা কৃত্রিম ক্ষোভে—'ভাবেন কি বলুন তো। লেখাপড়া কি কিছুই শিখিনি?'

'কী সর্বনাশ···' পরমেশ সদলে মন্দির ছেড়ে বেরোবার উদ্যোগে—'কলেজে ছাত্রছাত্রীদের সেকস্‌পীয়র পড়াও। তুমি লেখাপড়া শেখোনি বলব? গর্দানে কটা মাথা আমার?'

মন্দিরের মাঠে দুটো সরল গাভী ঘাস ভুলে ঘাড় উঁচিয়ে তাকিয়ে ছিল। একই ভঙ্গিতে বাঁশের-কঞ্চি-হাতে নেংটি-পরা এক কালো ছেলে। বাংলা গানে কবিতায় চিত্রকলায়—রাখাল বালক।

হাতুই তখনও কিছুটা দূর।

মোহনপুর গ্রামের প্রত্যন্তে নির্জন তাঁতিপাড়া। অস্তোদয়ে রাতভর যেমন ঝিঁঝির আওয়াজ, আমজামকাঁঠালের ঘনছায়ায়, বাঁশঝাড়ের ঝিরঝির বাতাসে এপাশে ওপাশে ছড়ানো-ছিটোনা ভাঙাচোরা মেটেঘরগুলো থেকে দিনদুপুরে একটানা ধ্বনি, যেন কাঠঠোকরা কাঠ ঠুকরে চলেছে বিরামহীন।

রাস্তা থেকে দূরে, একটু ভেতরের দিকে গাছের ছায়ায় মাটিতে টান-টান সুতো ফেলে কি করছে কতগুলো লোক! একপাশের উঁচু থেকে গড়িয়ে নেমে আরেক প্রান্তে, অনেক দূর অবদি যেন রঙিন সুতোর ছোট্ট এক নদী।

নন্দিনী আরতি উচ্ছল হলো—'ওরা এখানে কী করছে পরমদা?'

নন্দিনীকে জড়িয়ে ধরে আরতি উল্লাসে—'দেখো, দেখো নন্দিতাদি, ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দিচ্ছে। ঠিক ওভাবেই সুতোয় কাঁই লাগায় দেখেছি…'

'না, মাঞ্জা নয়…'

সকলেই থমকে দাঁড়াল।

ভাঙা দোচালার ধার ঘেঁষে দুজন যুবক। একজন অত্যন্ত বিনয়ে—'নরজ-গুড়োনো চলচে সুতোয়। টানায় তুলতি হবে ত…'

অযাচিত প্রবেশ বহিরাগতের। ভ্রূকুটির তীক্ষ্ণতায় পরমেশ তাকালেন আরতির দিকে। কিছুটা বিরক্ত। দুকদম এগিয়ে গিয়ে হাত রাখলেন যুবকটির কাঁধে—'আপনারা এখানেই থাকেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'কী! তাঁত বোনেন?'

'তা ত বুনতেই হয়। পেটের টান…' লজ্জিত ছেলেটি সহসা উদ্বেল—'পলু, আমাদের জ্ঞাতিভাই। এম. কম. পাশ দিয়েচে। কলকাতায় থাকে…'

অন্য যুবকটি সলজ্জ কুণ্ঠায়—'অ্যাই অ্যাই কী হচ্চে! কী বলচিস তুই?'

পরমেশ তাকালেন পলু-নামে সেই যুবকের দিকে— 'কলকাতায় কী করেন? চাকরি?'

'না, একটা স্কুলে পড়াই।'

'আচ্ছা, মাস্টারমশাই! আপনি ত দারুণ লোক। রেসপেক্টেবল্ ম্যান। আমরা ওখানে একটু যেতে পারি?'

'আসুন না আসুন...'

নাম-না-জানা সেই যুবক—'ও ত পলুদেরই সুতো।'

'আপনাদের ঘরে বুঝি এখনও তাঁত বোনা হয়?'

'হ্যাঁ, বাপভাইরা বোনে।'

বাঁপাশের মেটে ঘরটা থেকে অবিরাম খাটাং-খাটাং শব্দ। হয়তো নিরাসক্ত তাঁত বুনে চলেছে কোনো আদ্দিকালের বুড়ো। বায়োস্কোপের মানুষ দেখার সাধ নেই।

রাশি রাশি কচুপাতা জলাজংলা আগাছায় আচ্ছন্ন ঘোলাটে ডোবার পাশ ঘেঁষে সঙ্কীর্ণ পথ। একজনের-পর-একজন হয়ে সতর্ক পা ফেলে পরমেশ এক পলক ঘাড় ফেরালেন পেছনে। বিশেষত মেয়েদের জন্য—'দেখেশুনে সাবধানে এসো কিন্তু। পড়ে যেয়ো না।'

এবং এগোতে এগোতে—'আপনার ভালো নামটা কী পলুবাবু?'

'এককড়ি সুর।'

পিছু ফিরে আরো একবার দেখার চেষ্টা আরতিকে। নাম শুনেই হেসে ফেলতে পারে মেয়েটা। বিতোষের প্রশ্ন—'আপনার মতো এরকম কজনের মাস্টার ডিগ্রি আছে তাঁতিপাড়ায়?'

'আগে ত ছিল না। এখন হচ্ছে। আমাদের স্বজাতির একজন মেডিকেল পড়ছে আর. জি. কর-এ।'

'আপনাদের তাঁতিপাড়ায় মহিলা গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন কেউ?' ধ্রুবজ্যোতি।

ভাঙা বাঁকা মেঠোপথ পেরিয়ে ওদিকে ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁছে পলু হাসল—'না, স্কুল ফাইনাল অবদি পড়েছে দুচারজন। তবে মাঝের-পা..য় বামুনকায়েত পাড়ায় বি. এ পাশ করেচে অনেকেই...'

ফাঁকা জায়গাটুকুতে সুতো ফেলে কাজ করছিল যারা, সকলেই উঠে আসছে। হাঁটুর ওপর অনেকখানি অবদি কাপড় তোলা, প্রায় নেংটি পরে টিঙটিঙে এক বুড়ো, পাতলা চামড়া-লেপটানো শুকনো খেজুরপাতার মতো উদোল বুকে সাম:নে এসে দাঁড়ালেন। আশেপাশে আরো কয়েকজন।

পলু বলল—'আমার বাবা। থিলে পাক দেবার জন্যে আমার দুভাই।'

নমস্কার...' বুকে হাত তুললেন পরমেশ।

প্রতি নমস্কারে নির্বিকার সেই বৃদ্ধ— 'বায়োস্কোপ-কোম্পানির নোক বুঝি আপুনেরা? তা আপুনেদের বায়োস্কোপের বুড়োমতো আরেক জনা ত এয়েচেন

এখেনে। আমাদের হরেনের সনে…'

'কে এসেছেন ?' পরমেশ উদ্বিগ্ন হলেন— 'আমাদের লোক ?'

'আজ্ঞে। তেমনটাই ত বলল হরেন।'

'কে হরেন ?'

'হরেন। আমাদের হরেন। গুপী আওনের ব্যাটা…' শহরের-বাবুদের আগমনে কিছুমাত্র অভিভূত নন পলুর-বাপ। বরং হরেন নামক কোনো এক ব্যক্তির নামোচ্চারণে সর্বাঙ্গে জলুনি— 'মাগবাচ্ছাদেরকে ভাতকাপড় দেবার মুরদ নেই, পালা গে' বেড়ায় ছোঁড়া। লবাব সেরাজতুল্লা সাজে শুয়ার, তাঁতির ঘরে কেষ্ট-ঠাকুর…'

'তা ইসব তুমি এনাদের শোনাচ্চো কেনে ?' পলুর বন্ধু সেই যুবক।

'যা যা…' আরো জোরে খেঁকিয়ে উঠলেন বুড়ো—'উসব বায়েস্কোপ কায়েস্কোপ দে' হবেটা কী আমাদের ? পেটে অন্ন জোটাবে ? উসব বাজারপানে বুড়শিব-তলায় বাবুদের থানে নে' যা। এখেনে কেনে ?'

পরিস্থিতি খারাপ। বুড়ো তার নিজের কাজে ফিরে যাচ্ছেন, সেখানে প্রতিমা নন্দিতা আরতি ঘুরে ঘুরে দেখছিল ব্যাপারটা। মজার জিনিস। অনেকগুলো শাড়ি হবে। যে-শাড়ি ওদের কিনতে হয় অথবা এখনই যে-শাড়ি প্রতিমা দাশের আচ্ছাদন। পরমেশ প্রায় হুকার দিলেন— 'চলে এসো, ডিস্টার্ব করো না ওদের।'

যুবকদের দিকে তাকিয়ে— 'আপনাদের হরেন না কে, কোথায় থাকেন বলুন তো।'

'উই ত। মঙ্গল গুঁইর বাড়ির ওধারে। বেশিদূর না। যাবেন ?'

'হ্যাঁ, ওদের পেলে একটু ভালো হতো।'

'পাবেন কুথাকে…' ছেলেদের মধ্যেই একজন— 'হরেনদা ত ই মাত্তর বেইরে গেলেন ওনাকে নে…'

'কোথায় ?' ভ্রূরেখায় কুঞ্চন পরমেশের।

'উই, উদিকে রাস্তা ধইরে বটতলার পানে…'

চিন্তিত পরমেশ ব্যস্ততায় তাকালেন দলের দিকে, যেখানে খিটকেল বুড়োর ভ্রূকুটি সত্ত্বেও ওরা ঘুরে ঘুরে দেখছিল বাবুঘর, সুতো-গাঁথার কারিকুরি— মেয়েদের এলোচুলে সরু দাঁতের চিরুনি যেমন, গোলাপী জমিনের সুতোয় পান্না কাঁপছে নিখুঁত। মরজা ভড়োনো বিষয়টা কী ? খিলে-পাক-দেওয়া-কাকে

বলে? গুটি পাটি জুয়া অদ্ভুত সব নাম। খুব দূরে দেড় মণ দু মণ ওজনের পেল্লাই দুটো পাথর হঠাৎ বুড়ি হলো কেন? এত সুতোর সবটা বেঁধে নিয়ে তাঁতে তুললে টানা, পোড়েন দেবে মাকু। নলিতে সুতো গাঁথতে হয়। নলি কী? টানাপোড়েন তাহলে তাঁতের কথা? পলু জানাল—বাংলা প্রবচনের অনেকগুলোই নাকি তাঁত থেকে। যেমন একটানা বকে যাচ্ছে কেউ···এখানে একটানায় আটজোড় কাপড়ের সুতো, তার বেশিও হতে পারে।

পাকা রাস্তায় উঠে এসে নন্দিতার আপশোস— 'ইস্, তাঁতটা দেখা হলো না। ফ্যানটাস্টিক। একটা শাড়ি বোনার জন্যে এত ঝঞ্ঝাট!'

পরমেশের স্বস্তি নেই। রীতিমতো উত্তেজিত— 'খুব খারাপ, খুব খারাপ এসব। ভেরি ব্যাড। ইউনিটের এতগুলো লোক। হুটপাট কে কোথায় বেরিয়ে যাবে। কাল সন্ধেবেলা মাত্র এসে পৌঁছেছি। দেখুন, এরই মধ্যে কে এসে তাঁতিপাড়ায় দোস্তি পাতিয়ে ফেলেছে। সবাই তো অ্যাডাল্ট মশাই। কাউকে তো বলা যাবে না কিছু। এ তো আর ছাত্রদের এন. সি. সি কি স্কাউটের ক্যাম্প নয়···'

নির্মল বিনীতভাবে— 'হয়তো সুকুমারদাই···'

'বাজে বকো না। সুকুমারবাবু কেন আসতে যাবেন এখানে? তার কাজের মোটামুটি একটা হিশেব আমার জানা থাকে। তাছাড়া মেটেলড রোড। এলেও পায়ে হেঁটে আসবেন কেন অ্যাদ্দুর? গাড়ি যখন আছে। উনি তো আর আর্টিস্ট নন তোমাদের মতো, প্রকৃতি দেখতে বেরোবেন। কাজের লোক। সময়ের দাম তার কাছে অনেক বেশি।'

চুপচাপ সকলেই। বাচালতার ঠাঁই নেই নেতৃত্বের মুখভারে।

'গ্রাম মশাই, এটা একটা গ্রাম। দেখছেন তো, কিভাবে হালুম-হালুম করে আপনাদের গিলছে সবাই। শুধু শহরের লোক বলে নয়, সিনেমার লোক। আবার বায়োস্কোপের লোক সম্বন্ধে কি রেজিস্ট্যান্স, দেখলেন তো বুড়ো তাঁতিটাকে? এখন যদি এদের বোকাহাবা ভেবে উল্টোপাল্টা কেউ কিছু চালাকি করতে চায়···'

ছোট একটা বাঁক ঘুরতেই পঞ্চায়েতের টিউবকলে কলসি ভরছে দুটি গ্রাম্যবধু। চকিতে ঘোমটা টেনে জবুথবু ফ্রিজ।

পরমেশও থমকে দাঁড়িয়েছেন। গাছপালা কাঁচা মাটির-ঘর ঘন বাঁশঝাড়ের অরণ্যময়তায় এখানে এসে কি রকম বদলে গেছে গ্রামটা। যেন সত্যি সত্যি

নিখাত গ্রাম এবার। পাকা বাড়িটাড়ি নেই, গাছপালা বনজঙ্গল বেশি, রাস্তায় মানুষজন কম।

পরমেশকে বিচলিত দেখে সকলেই চুপচাপ। ধ্রুবজ্যোতি আস্তে বলল— 'পথ ভুল করেছেন?'

'না, রাস্তা তো একটাই। পাকা রাস্তাটা যেখানে গিয়ে ফুরিয়েছে, সেখান থেকেই হাতুই-এর শুরু। মস্ত একটা পুকুর আছে। নামটাও সুন্দর— গোপীদীঘি।'

ঘাড় ফিরিয়ে, একটু দেখেশুনে, দ্রুত পিছিয়ে গেলেন কয়েক পা। সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে, দুহাতের আঙুলগুলো মুঠোর মধ্যে গোল করে, অনেকটা বাইনাকুলারের মতো চোখে তুললেন। বাঁশঝাড়টা দেখলেন বেশ কিছু সময় ধরে। দেখলেন ডানে বাঁয়ে নড়েচড়ে, এগিয়ে পিছিয়ে।

হঠাৎ একটা বাঁশঝাড় বড়োই মনোরম। হতেই পারে। চিত্রনাট্যও তো শেষপর্যন্ত কিছু নয়। দৃশ্যগুলো এখনও বোবা ওই মগজটায়।

সঙ্গীরা নিঃশব্দে সরে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষায় রইল। ঘুরে ফিরে পরমেশ ঝাড়টাকে দেখলেন নানাভাবে। অবশেষে সিগারেট। কাঠির আগুন নেভাতে নেভাতে আপনমনেই—'বাঁশবনের এই আলোছায়ার খেলাটা ভিজুয়ালি এত ভালো। নির্মল, যা মনে হচ্ছে এর ভেতর তো তোমার প্র্যাক্টলি কিছুই ঢুকবে না।'

'সে কি করে হয়…' ক্যামেরাম্যান নির্মল মনোনিবেশে পরখ করে, ভেবেচিন্তে— 'ভেতরে ঢুকতে চান তো কিছু বাঁশ কাটতে হবে।'

'হ্যাঁ, কার ঝাড় কার বাঁশ। কে কাটে। শেষে সত্যি সত্যি বাঁশ দিক আর কি। নাউ লিভ ইট। চলো…'

সকলেই হেসে উঠল। চলতে চলতে, পরমেশ ধীর লয়ে পা ফেলে ফেলে—'বিশ পঁচিশটা বাঁশ না-হয় কেনাই গেল। কিন্তু সবই তো বায়োস্কোপ কোম্পানির। কিছু চাইতে গেলেই হয়তো আবার সেই দুহাজার…'

দুটো মুর্গি রাস্তার পাশে। ঠোঁটে ঠোঁটে ঠুকছে মাটি। দুপাশে আরো কিছু গরিব মানুষের ঘরদোর। বৃত্তাকারে বাঁক ঘুরতেই আচমকা আদিগন্ত খোলমাঠ। কচি ধানের সবুজ। বাঁদিকে গোপীদীঘির টলমল টলমল কাচগুঁড়ো ঢেউ-এ ঢেউ-এ রোদের ঝিলমিল। ছিপ ফেলে বসে ছিল দুটি কিশোর বালক। দুলে-বাগদীবাউরিদের কেউ। উঠে এসেছে পুকুর থেকে।

এবং সত্যি তাই। পাকারাস্তাটা এ পর্যন্ত পৌঁছে হঠাৎ থেমে গেল। বিজলি-

বাত্তির শালকাঠের থামগুলো এর আগেই কখন যে ফুরিয়ে গেছে হদিশ পায়নি কেউ। গোপীদীঘির ধার ঘেঁষে কিঞ্চিদধিক দেড় ফুট চওড়া একটা ধুলোর পথ ডানে বাঁয়ে সবুজ মাঠ চিরে গড়িয়ে গেছে যাট সত্তর গজ অদূরবর্তী আমজাম-কাঁঠালতালসুপুরিখেজুরের ঘন সবুজে। গ্রামটা বিচ্ছিন্ন। বামুনকায়েতদের পংক্তি থেকে দূরে অচ্ছুৎ হরিজনদের মতো।
পরমেশ বললেন—'এই আমাদের হাতুই। আকালের দেশ।'

গাঁয়ের নাম হাতুই। মোহনপুর মৌজায় ছোট একটা বিন্দু। দুশ-আড়াই শ ঘর অন্তেবাসীদের অধিকাংশই দুলে। একেবারে শেষপ্রান্তে কিছু বাউরি। কর্মে বা পেশায় ক্ষেতমজুর—মোহনপুরের বাবুদের ঘরে নাগাড়ে-কিষেন, নয়তো হাল-হেতেল গতর ফেলে বাবুদের জমি চষে আবাদের দিনে। হালবলদের মালিক ভাগচাষি যে দুচারজন, তারাই সম্পন্ন ঘর, মোড়লমাতব্বর। কিন্তু অমাবস্যার আঁধার নামলে ডোবাপুকুর গাছপালা ঘরদোর নিয়ে গোটা গ্রামটাই যেমন ডুবে যায় ঘুটঘুটি অন্ধকারে, মুরুব্বিমাতব্বরি সব লোপাট এক কালো চাদরের তলায়। সম্বৎসরের খোরাকি ধানের জোগান মরাই-এ বাঁধা না থাকলে বছরের শেষে সবার একই রকম পেটের মোচড়ানি। কোনো ফারাক থাকে না কারও। গরিব মানুষের গায়ের গন্ধে তখন সবাই এক। 'কাজের বদলে খাদ্য'—কোদালি আর ঝুড়ি নিয়ে বাচ্চাবুড়োমাগীমদ্দা সকলেরই ছুট। বাবুদের খাতায় নাম লেখানোর দৌড়।
এক কুড়ি দেড় কুড়ি বছরের মধ্যে দেখতে দেখতে মোহনপুর গাঁ শহরগঞ্জের মতো জেল্লা মারতে শুরু করল। রাস্তা পাকা হলো, বিজলি এল, কত আপিশ দোকান-পাট। বাড়বাড়ন্ত বাবুদের সংসার। হাতুই-এর মানুষ দেখে। বাপঠাকুদ্দার আমল থেকে জেনে এসেছে—এমনধারাই নিয়ম। বাবুদের আর্শিতে তাদের মুখ ফেলতে নেই। কেলেকুচ্ছিত মুখের ছায়াটা নাকি ফেটোর মতোই লেপটে থাকে কাচে। কাচ অচ্ছুৎ হয়।
কিন্তু হাতুই-এর মানুষ আজ বেজায় খুশি। যাত্রা নয়, পালাকেত্তন নয়, এমন কি বাবুদের শখের থ্যাটারও নয়, বাহারের সব রঙচঙে মোটরগাড়ি চেপে কলকাতা থেকে বায়োস্কোপের বাবুরা এসে গেছেন গাঁয়ে। মাঠাকরুণ দিদিমণিরাও আছেন কয়েকজন। বাবুদের সুবিধের জন্যে যদিও মোহনপুরের ইশকুল বাড়িতেই

থাকবেন সকলে, যন্ত্রপাতি লোকলস্কর নিয়ে সবাই নাকি হাতুই চলে আসবেন। এখানেই কাণ্ডটা হবে। হাতুই-এর পথঘাট ডোবাপুকুর ভাঙাচোরা ঘরদোর উঠে যাবে বই-এ। দেশে দেশে লোকে জানবে হাতুই-এর নাম, দেখবে হাতুই-এর ছবি। বাপঠাকুদ্দার ঠাকুদ্দা, তার ঠাকুদ্দার আমল থেকে হাজার বছরে এমন পরমভাগ্যি, এমন সুখ হাতুই-এর কপালে জোটেনি কোনোদিন।

অথচ এই নিয়ে মোহনপুরের বাজারে বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে হাতুই-এব ছেলেদের অনাছিষ্টি ঝগড়াতক্কো।

বাবুদের গাঁয়ে সব লেখাপড়াজানা ছেলে। গলার জোর বেশি। তারা বলে—'আরে মুখ্যু বুঝিসনে ত, মোচ্ছবটা ত আমাদের গাঁয়ে র‍্যা, আকালটা তোদেব ওখেনে। দুর্ভিক্ষের বই। তাই শুঁটকি-মারা রোগা-পটকা মানুষ খুঁজতে তোদের গাঁয়ে যাবে। দিনেমানে ক ঘন্টা। সে আর কতক্ষণ? সবটাই আমাদের গাঁয়ে। এখেনে ইলেকট্রিক আছে, আলো আছে, পাখা আছে, পাকা রাস্তা আছে, দোকানপাট নিত্যি-বাজার সবই ত মোহনপুরে...'

ইজ্জতের গোঁ। ছাড়বে কেন দুলেবাউড়ির ব্যাটারা। তারাও শুনিয়ে দিয়েছে—'সি তুমরা যা-ই বল না কেনে গ। বইটাই আসল ত। সি বই তুলতেই না এয়েচেন তেনারা। সি বই আমাদেব গাঁয়ে হবে। হাতুই-এর ছবিই দেখবে দশজনে...'

'যা যা, ভাগ্...' দল বেঁধে গলাবাজিতেই হটিয়ে দিয়েছে মোহনপুরের ছেলেরা। গাঁয়ের সিনেমাতলাটা যেমন তাদেরই গাঁয়ে, 'অন্নপূর্ণা টকিজ'-এর মালিক যেমন তাদেরই গাঁয়ের মানুষ, ফিলিম আর্টিসদের সঙ্গে নিত্যি-ওঠাবসা কথাবার্তা সব তাদের সঙ্গেই হবে, বেশির ভাগ দৃশ্য মোহনপুরেই তোলা হবে, একথা ডিরেকটর-বাবু নিজেই বলেছেন...'

কলকাতায় রেডিও-এ ফুটবল খেলার চিল্লানি ফুরতেই মেতে থাকার মতো একটা জব্বর ফুর্তি পেয়ে গেছে গাঁয়ের মানুষ। নিজেদের ফুটবল খেলা, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে শিল্ড-টুর্নামেন্ট খেলার নেশা, এমন কি দুগ্‌গাপুজোর উৎসব নিয়ে হৈচৈটাও যেন এবছর কিছুটা মন্দা। নবাগত সিনেমা-কোম্পানি একাই শুষে নিয়েছে সব।

সুতরাং গোপীপুকুর পেরিয়ে ধুলোর রাস্তায় নেমে পড়তেই, বায়োস্কোপের বাবু-বিবিদের দেখে ফেলেছিল হাতুই-এর মানুষ। তেজামেজিতে ঘরে ঘরে চারিয়ে গেল খবরটা। ছোট্ট গাঁ। পিলপিল বেরিয়ে এলো বাচ্চাবুড়োমাগীমদ্দা সকলেই।

বাবুদিদিমণিরা পৌঁছোনোর আগেই, গাঁয়ে ঢোকার মুখে অভ্যর্থনার জন্য এক জনতা—লাঠি-ঠুকঠুক বুড়ো থেকে ন্যাংটো বাচ্চা, নেংটিপরা জোয়ানমরদ আর খাটো কাপড়ে বুকপাছা ঢেকে সোমত্ত বৌ-ঝি।
ওদিকে ভরতুপুরের চড়া রোদ মাথায় বয়ে মাঠ পেরোতে পেরোতে হাঁপিয়ে উঠেছে ওরা। প্রতিমা দাশ মাথায় ঘোমটা তুলেছেন এবং মাথায় কাপড় দেবার সামাজিক লাইসেন্সটা জীবনে বিলম্বিত বলেই ছাতাটা সঙ্গে না-আনার জন্য নন্দিতার অনুতাপ। হাইহিলে ঠোক্কর খেয়ে হুমড়ে পড়ছিল আরতি, সময়মতো ধরে ফেলেছে বিভোষ।
পরমেশ বললেন—'কি আর করবে বলো; পাঁচ-পাঁচটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কোটি কোটি টাকা মোহনপুর পর্যন্ত পৌঁছোতেই ফুরিয়ে গেল। খোয়া পিচ আর রোলারগুলো হাতুই পর্যন্ত এগোল না…এগোবেও না কোনোকালে…'
'ভালোই তো…' হাসল ধ্রুবজ্যোতি—'বেশ একটা সাজানো গোছানো ফেমিনের গ্রাম পেয়ে গেলাম আমরা। নইলে হলিউড কি বোম্বের মতো গোটা একটা গ্রামের সেট তৈরি করে…
'হলিউড বোম্বে পুরো একটা গ্রামের সেট বানিয়ে নেয়, এমন খবর আপনি পেলেন কোথায়…'
অপ্রতিভ ধ্রুবজ্যোতি সহসা রক্তিম। এরকম একটি সংবাদ সে শুনেছে বা… পড়েছে কোথায়! অস্পষ্ট স্মৃতির পুঁজি বড়োই দুর্বল।
নির্মল কাজের কথায়—'একটা কথা জিজ্ঞেস করব পরমদা।'
তাকালেন পরমেশ।
'জেনারেটরের ডিজেল পুড়িয়ে, ইলেকট্রিসিটির বাড়তি কানেক্‌শান্ নিয়ে এতদূর এলেন কেন আপনি? মোহনপুরেও তো দেখলাম চাষাভুষো গরিবের কমতি নেই…'
কুঞ্চিত ভ্রূরেখায় অতর্কিতে নিঃশব্দ পরমেশ। বোঝা যায়, এজাতীয় কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে রাজি নন, অথবা ব্যাকরণমতে এবম্বিধ প্রশ্নটা অশিষ্টাচার তার নিজস্ব ধারণায়। তথাপি গোটা শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থুত্‌নিটা চেপে ধরলেন মুঠোয়—'দেখবে, ওখানে গেলেই বুঝবে, বেশ একটা মজা আছে গ্রামটার পুরো চেহারায়। রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি ঝোপজঙ্গল সব নিয়ে পভার্টি পার এক্‌সেলেন্স। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঢোকেনি। ইংরেজ আমল কেন, একেবারে মুঘলপাঠান, চাই কি পালরাজা সেনরাজাদের যুগ…'

দূর থেকেই চোখে পড়েছিল। কাছাকাছি পৌঁছোতেই ওরা ঘাবড়ে গেল। গ্রামের প্রবেশমুখে ভিড়টা আসলে অনেক বড়ো। কালো কালো রোগা রোগা চেহারার অনেক মানুষ। দুর্ভিক্ষের জনতাদৃশ্য।

পরমেশ থামলেন না। আত্মনির্ভর সোজা পায়ে এগিয়ে চললেন তার নিজস্ব মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর দিকে। এরা আছে বলেই তার শিল্প। প্রবাহিত জীবনের ঘাটে তিনি নিজেই এসেছেন। সর্বাঙ্গ অবগাহনে ডুব দিতে হবে। রঙচঙ মেখে যারা জীবন সাজায়, মানুষ বানায়, সেসব এখনও বায়োস্কোপ।

জনতায় মিশে যাবার আগে একবার হাত রাখলেন নির্মলের কাঁধে—'গোটা ছবির দু রিল কি তিন রিল হাতুই-এ। বাকি সবটাই মোহনপুরে। কলকাতায় ইন্‌ডোর নেই।'

কিন্তু আশ্চর্য। জনতা উদ্বেল হলো না। বোকা বোকা বোবা চোখগুলো নিজেরাই সরে যেতে লাগল কিংবা ভাসানের ঠাকুর দীঘির জলে ডুব দেবেন বলে কচুরিপানা গুঁড়িপানা সরিয়ে যেমন তার পথ করে দিতে হয়, কিছু দুলে যুবক ঝাঁপিয়ে পড়ে দুপাশের নারীপুরুষ বাচ্চাবুড়োদের ঠেলেঠুলে সোজা সরল-রেখায় রাস্তা বানিয়ে দিতে শুরু করল। ভোটের আগে মস্ত মস্ত মান্যিজনেরা এলে ঠিক যেমনটা হয়। তফাৎ শুধু, ভোটের বাবুরা দশজনকে ডেকে এনে নিজেদের মতো করে ভিড়টা গুছিয়ে তোলেন। এ বাবুরা ডেরা পিটিয়ে ডাকেননি কাউকে। ভিড়ের মানুষ নিজেরাই দলা পাকিয়ে গেছে। ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা ধোপদুরস্ত বাবুমশাইরা, রঙচঙে দিদিমণিরা কেমন বাহারের পেরজাপতি।

এবং মিশে গিয়ে ওরা প্রায় সকলেই, বিশেষত নন্দিতা অদ্ভুতভাবে বদলে গেল। বাচ্চা মেয়ে জলে নামলে যেমন হয়, দাপাদাপিতে বেসামাল উচ্ছল—'বাঃ, আমার কি যে ভালো লাগছে পরমদা। এভাবে গ্রামদেশে, গ্রামের মানুষ তো দেখিনি কোনোদিন। ফ্যান্‌টাস্‌টিক্…'

ধ্রুবজ্যোতি কিছুটা রাশভারি। ঠোঁট ভেঙে হাসল—'শহরে মধ্যবিত্ত ঘরে মধ্যবিত্ত হয়ে জন্মানোটা তো অপরাধ নয় আমাদের। পরমদার সাইট-সিলেকশানের মতো বার্থপ্লেস সিলেকশানের জন্যে আমাদের দেশটা ঘুরে দেখতে বলেনি কেউ…'

'প্রিসাইসলি ছাট…' ইতিমধ্যে শায়াব্লাউজহীন খাটো কাপড়-পরা এক কিশোরী মেয়েকে জড়িয়ে ধরেছে নন্দিতা। চারপাশের প্রবল গুঞ্জনে কথা বলার অবকাশও নেই তখন। মেয়েটার গাল টিপে—'কি নাম তোমার?'

কাছাকাছি যাকে পেলেন, পরমেশ ধরলেন একজন বুড়ো চাষিকে—'আপনাদের সেই মন্দিরটা কোথায় বলুন তো। খুব বড়ো একটা বট গাছ আছে…'

"বিশেলাক্ষী মায়ের থান গ বাবু। বটতলা…' বুড়ো এবং আশেপাশের আরো কয়েকজন সমবেতভাবে, কৃতার্থ ভঙ্গিতে—'উই উদিকে গ, উদিকপানে…'

নির্মলকে কাছে ডাকলেন পরমেশ—'তুমি এসো আমার সঙ্গে…'

তাকালেন সহকর্মীদের দিকে—'মিশে থাকো ওদের সঙ্গে। কথাবার্তা বলো। গেট ইনটু দেম উইথ লাভ অ্যাণ্ড ডিউ রেসপেকট। প্রায় একটা মাস ধরে তো কম উৎপাত চালাতে হবে না এদের ওপর।'

কিছুটা গলা চড়িয়েই বলল নির্মল—'এই সুযোগ। এবার বুঝে নিন নন্দিতা—কত ধানে কতো চাল। ধ্রুববাবু জানেন না…'

এবং এগোতে এগোতে, পরমেশ কিছুটা এগিয়ে গেছেন বলেই হয়তো, নির্মল চুপি চুপি প্রশ্ন করল পার্শ্ববর্তী বয়স্ক চাষিকে—'ধান থেকে তো চাল করেন আপনারা…'

'অঁ, সি ত ভানতি হয়ই গ বাবু। চাল হবে, চিঁড়ে হবে, মুড়ি হবে…'

'না না, শুধু চাল। এক মণ ধানে কতটা চাল হয় আপনাদের?'

'মণের হিসেব কেমন কর্যো বলব গ বাবু। এক আড়ি আধ আড়ি ধান যখন যা জুটবে কলে নে' যাই। ভাইন্যে দেয়, নে' আসি…'

নির্মল বুঝল না। পাশের এক উৎসাহী যুবক ঘনিষ্ঠ হলো—'বাবু কি জিগ্‌গেস কচ্চেন, আর তুমি কি বলচ গ খুড়! বাবু বলচেন, ধান থিক্যে যে চাল হয় তার হিশেবটা কী…'

"হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক তাই…' নির্মল থই পেল।

'অঁ, তা তুই বল্ না কেনে!'

এবার সেই যুবকই হদিশ দিতে চায়— 'এক বস্তা ধানে আমাদের এক মণ চাল হয় গ বাবু। লতুন ধানে এট্টু কম হতি পারে…'

'এক বস্তা মানে!'

'দেড় মণে এক বস্তা। ইট্টাই লেয়ম…'

'তার মানে!' নির্মল বিস্মিত—'দেড় মণ ধানে একমণ চাল! মাঝখানের আধ-মণ হাওয়া…'

'তাই ত হয় গ বাবু। ইট্টাই লেয়ম…' ছেলেটি আরো নিবিড়—'আমাদের গাঁয়ে সিনিমার ফোটো উঠবে গ বাবু? আমরা উঠব?'

'তুমি সিনেমায় নামতে চাও?'

প্রসন্নতায় গাল ভরে হাসল সেই যুবক।

'স্কুলে পড়েছ?'

'না গ বাবু, পড়া'ত হলনি...'

'এখন কি করো?'

'চাষের কাজকাম, জনখাটা। আপুনি ই বই-এ পাট বলবেন গ বাবু? আর্টিস?'

নির্মল ছুটতে চাইল। ছুটে গিয়ে অদূরবর্তী পরমেশকে ধরার ইচ্ছে।

ভিড়ের প্রায় সবটাই ওদিকে, গ্রামের প্রবেশ মুখে আমবাগানের ছোট মাঠে, 'আর্টিস'দের ঘিরে। তবু যে কেন এই কটা ছোঁড়া এদেরই পিছু পিছু, বোঝা না গেলেও নির্মল তার নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে হাঁপ পেল, পরমেশ যেখানে কিছু বুড়ো বা বয়স্ক চাষির সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত।

যেন কী এক দানবীয় যন্ত্রণা ওর মাটির তলায়। মাটি ফুঁড়ে মোচড়ানো বিশাল বটগাছটার শিকড়ে তেলসিঁদুর-মাখা পুরাকালের কালো পাথর। পাশেই ঠিক মন্দির নয়, মাটির পাঁচিল আর টালির ছাদে দেবতার ঠাঁই। শায়িত শিবঠাকুরের বুকের ওপর দশভুজা ভগবতী মায়ের চরণ। এমন মূর্তি নির্মল দেখেনি কোনোদিন। এদের মন্দিরের মতোই, বিগ্রহের গায়ে গায়ে দীর্ঘ ফাটল। খড়ও বেড়িয়ে পড়েছে কোথাও কোথাও। তথাপি কি পরিপাটি আদরে নিকোনো মন্দিরের মেঝে।

পরমেশ হঠাৎ টেনে নিলেন— 'কি হলো। কী করছ ওখানে। শোনো... এই হলো চন্দ্রধর অর্জুনের চাষিপাড়া। এদের ঘরবাড়িগুলো দেখছ! কি স্যাভেজ চার্ম আছে গোটা গ্রামটায়। সুবিধে মতো এদেরই একটা কি দুটো ঘরবাড়ি বেছে নিয়ে ইনডোরের কাজ করতে হবে। সাবিত্রীর সংসার...'

পকেটের রুমালে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে নির্মল জড়িয়ে গেল। তাকেও মগ্ন হতে হয়।

সামনেই ঘনসংলগ্ন গরিব চাষিদের মাটির ঘর, খড়ের চাল। কোথাও চাল নেই। শুধুই দেয়াল। এক ইঞ্চি দু-ইঞ্চি চওড়া ফাটল দেয়ালের গায়ে। খড়ের পচুনিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে কোনো চাল, বাঁশের ঘুণে বেঁকে পড়ছে কোনো ঘর। বর্ষার জলে ভগমগিয়ে-ওঠা ঝোপজঙ্গলের বাড়াবাড়িটা এখানে অনেক বেশি। পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকে।

দুহাতের মুঠোকে বাইনাকুলার বানিয়ে ঘন ঘন ঘাড় উঁচিয়ে দেখছেন পরমেশ। হঠাৎ উত্তেজিত— 'ওটা, ওটা কার বাড়ি?'

'কোন্‌টা গ বাবু ?'
'একটু যেতে পারি ওদিকে ?'
'চলেন না কেনে ? মান্যিজন আপুনেরা…'
মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে-থাকা একটা গরুর-গাড়ি। তাকে ডিঙিয়ে আমকাঁঠাল গাছের ফাঁকে ফাঁকে পরমেশ ছুটলেন। কাদের বাড়ির তকতকে নিকোনো উঠোন, গোয়ালঘর, গোয়ালের বাইরের গরুকে জাব দেবার মস্ত ডাবা, পচা গোবরের গন্ধ, ঝিঙেশসার মাচা সব পেরিয়ে যেখানে গিয়ে থামলেন, অদ্ভুত একটা ঘর। পুরো ঘরটাই একদিকে হেলে পড়েছে। বারান্দার বাঁশগুলো নড়বড়ে। সিঁড়ির ধাপ দুটো ক্ষয়ে ক্ষয়ে এখন একটা খোঁদল। ওপরের খড়-গুলো পচে পচে হেজে গিয়ে অনেকটা ফাঁক। নিশ্চয়ই বর্ষার জল শীতের শিশির আর গ্রীষ্মের রোদ্দুর আড়াল করতে ঘরটা ঘর নেই আর। গেরস্তর মানসিক সান্ত্বনার জন্য একটা ঘরের কাঠামো। এরই মধ্যে ফাটল-ধরা দেয়াল বেয়ে ভাঙা চালে লাউলতার বিস্তার। শাদা লাউফুল, ভীমের গদার মতো বলিষ্ঠ একটা লাউ পুরো লতাটাকে টেনে গড়িয়ে নামছে।
পরমেশ উৎসাহিত— 'কার ঘর এটা ?'
'আমার গ বাবু। কেনে ?' সামনেই ছিল যারা বুড়ো চাষি, তাদেরই একজন ভয়ার্ত চোখে।
পরমেশ অন্যমনস্কতায় পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিলেন। ঘরটার দিকে তাকিয়ে থাকার মুগ্ধতায়, দীর্ঘ নিরীক্ষণশেষে দেশলাই জ্বালতে গিয়েও থেমে গেলেন। পিছিয়ে এলেন নির্মলের দিকে—'একজাক্‌ট্‌লি এরকম একটা কিছু ভাবছিলাম। শুধু ঘরটার ভাঙচোর ব্রেকগুলো নয়, কাজেরও কিছু সুবিধে হবে। এত বড়ো একটা উঠোন সামনে, লঙ-শটে অনেকদূর অবদি স্পেস পাচ্ছো। আশেপাশে ঘর আছে এতগুলো। কমিউনিটি লিভিং-এর একটা পুরো আদল…'
হঠাৎ লাফ দিলেন আবার। ছুটে গেলেন। উদ্দিষ্ট ঘরটার পাশেই একই রকম বিপর্যস্ত আরো কয়েকটি ঘর। মধ্যবর্তী সরু পথে ঢুকে পড়লেন। গুণমুগ্ধ দুটি ছেলে তার অনুগামী।
উঠোনের মানুষগুলো হতবাক। গোল গোল চোখগুলো নির্মলের দিকে। এবং সেই বুড়ো চাষি করুণভঙ্গিতে—'ই গরিবমানুষের ঘরটা কেনে গ বাবু ? কী হবে ইখেনে ?'

'ছিনিমা হবে ব্যা, ছিনিমা...' হৈ হৈ করে উঠল তার আপন পড়শিরাই। সমবয়সী একজন বুড়ো—'সি ইষ্টিশানের ধারে ছিনিমাতলায় বাহারের ছবি দেখোনি গ। সি বই হবে তুমার ঘরে। তুমি ত গাঁয়ের একজনা মান্তিজন হয়্যা যাবে গ। বরাতজোর...'

'রসমশ্‌করা কচ্চো বটে গ তুমরা ..' ভয়ের চোখে পলক নামে না। জোরহাতে, আরো কাঁচুমাচু হয়ে বুড়ো এগিয়ে আসছে নির্মলের কাছে—'আমার ই ঘরটা কেনে গ বাবু? আরো ত ঘর আচে দশজনার...'

দিশেহারা নির্মল। কি করবে ভাবল। গ্রামের ছবিতে এর আগেও সে আরো দু-তিনবার কাজ করেছে। কিন্তু চাষাভুষোর ইন্‌ডোর সব কলকাতার স্টুডিওতে, সেটে। অল্প যে কটা শট গ্রামের ঘরে তুলতে হয়েছিল, এত ঝামেলা ছিল না। এখন কোথায় ছাই দিকপাল পরমেশ মিত্তির! বন বাদাড়ে ঘুরছে কোথায়! হাতের সিগারেটটা ফুরিয়ে এসেছে। জুতোর তলায় ফিল্‌টারের হলুদটুকু ফেলে সে হাসল— 'আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন অত! আমরা তো পুলিশের লোক নই। বাড়িঘর তল্লাস করে ধরেবেঁধে নিয়ে যাব না কাউকে ..'

'না, না গ বাবু, আরো দশটা ঘর আছে ই গাঁয়ে। উদিক পানে তল্লাস করেন না কেনে! মুহনপুরে কত্তো বড় বড় বাবুদের পাকা দালানকোঠা ..'

'দালানকোঠা তো চাইছি না আমরা। এরকমই একটা ভাঙা ঘর চাই...'

লোকটা মুশকিলে পড়ে। নিজের তরফে কথা বলার শক্তি ফুরোয়।

নির্মলও রেহাই পেল। ঘুরে ঘুরে, আরেক প্রান্তে কোন্ এক গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসছেন পরমেশ। বোঝা যায়, খুশি। ভীষণভাবে খুশি। লম্বা লম্বা পা ফেলায়, হাঁটায়, ডানে বাঁয়ে দৃকপাতহীন তেড়েফুঁড়ে ছুটে আসার ভঙ্গিতেই তার প্রাথমিক তুষ্টি বড়ো বেশি স্পষ্ট এবং ভিড়ের মধ্যে ফিরে এসে স্বমহিম ঋজুতায়— 'এ মাসের বেশ কটা দিন বিরক্ত করব আপনাদের। আমাদের লোকজন আসবে, যন্ত্রপাতি আসবে, খুব ভিড় হবে...হ্যাঁ শুনুন, কথা আছে আপনার সঙ্গে। কী নাম আপনার?'

খাটো কাপড়ের কাছাটা উদোল গায়ে চাদরের মতো জড়িয়ে ভয়ে ভয়ে তাকাল সেই বুড়ো। যেন থানার বড়োবাবু, কিংবা বি. ডি. ও সাহেবের হামলা পড়েছে তার ঘরে।

'ফগু গ বাবু। ফগু দুলে...' বলল তার স্বজাতিরাই।

'আপনার ঘরটা আমরা কিছুদিনের জন্যে ব্যবহার করব। আপত্তি নেই তো আপনার ?'

'না গ বাবু, দিবনি।'

আচমকা ধাক্কা। হাতের মুঠোয় থুতনি চেপে তীক্ষ্ণতায় তাকালেন পরমেশ। তাকিয়ে রইলেন। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল নির্মল, হাতের পাতা ঈষৎ নেড়ে থামিয়ে দিলেন।

'কেনে! দিবে নি কেনে…' সমবেতভাবে চাষি যুবকেরা— 'তুমার ঘর ছিনিমায় উঠবে গ খুড়। কত্তো নোকে দেখবে…কত্তো যশ হবে গ তুমার…'

'যা না, ঘর ত তুদেরও আচে র‍্যা। যা না, নে যা না কেনে সিখেনে…' বুড়ো তেড়েফুঁড়ে খিঁচিয়ে উঠল— 'মাগবাচ্ছা ছেল্যা ছেল্যাবৌ নাত্‌ নে' মাথা গোঁজার ইটুকুন মাত্তর ঠাঁই। কেনে গ গরিবের উপ্‌রে লজর পল্ল গ বাবু আপুনেদের ?'

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল ছেলেরা। পরমেশ হাত নেড়ে নিঃশব্দে বাধা দিলেন। আরো একপলক তাকালেন ঘরটার দিকে। ফণ্ড ডুলের হাড় জিরজিরে ছেঁড়াফাটা জীবনটার মতোই তার জীর্ণ বিদীর্ণ ঘর, যেন এই মুহূর্তে কোনো খাজুরাহো অথবা তাজমহল। চন্দ্রধরকে মনে পড়ে। অর্জুনকে। হাতের কব্জিতে মুঠোটা আরো শক্ত হয়ে আসে। জেদটা তীব্রতর। গোটা শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে আবার সচলতায়— 'আপনার বাড়িতে এসে আমরা আমাদের কাজ করে যাব। সে তো আর এমনি হয় না। আপনাকে পুষিয়ে দেব সব…'

'পুইষ্যে দিবেন গ বাবু…' ফণ্ড ডুলে এবং অন্যান্যরা সহসা মূঢ়বৎ স্থবির আচমকা— 'ট্যাকা দিবেন গ বাবু! ট্যাকা…'

'টাকা চান, পাবেন টাকা। সে সঙ্গে আপনাদের বাড়ির লোকজনদের জন্যে কিছু কাপড়-চোপড় দরকারী জিনিসপত্র…'

যেন সম্মোহ ছড়াচ্ছেন যাদুকর। বশীভূত হতে হতে নির্জীব জড়তায় জনতা বোবা বনে গেছে। পরস্পরের চোখে চোখে তখনও সংশয়, বিস্ময় কিছুটা। ফণ্ড ডুলের পিচুটি-গলা চাউনি ধীরে ধীরে আরো উজ্জ্বল।

শান্তভাবে সিগারেট ধরালেন পরমেশ— 'আপনার ঘরের যা অবস্থা, কাজ করতে গেলে তো আরো ভেঙেচুরে যেতে পারে…'

'সি, সিটেই ত কত্তা গ বাবু…' প্রায় অশ্রুত, ফ্যাসফেঁসে ফণ্ড ডুলের গলার স্বর।

'ঠিক আছে। আমরা এসে আপনাদের ঘরদোর ভেঙে দিয়ে যাব সেও তো

হয় না। ওটা কোনো কাজের কথা নয়…' ভাবলেন পরমেশ। আরো এক-বার তাকালেন ঘরটার দিকে। আঙুলের কাঁচিতে সিগারেট রেখে ডানহাতের বুড়ো আঙুল ঘসছেন কপালের বলিরেখায়— 'এ রকম একটা ঘর নতুন করে বানাতে কতো লাগে মোটামুটি…'

'লতুন, লতুন ঘর বেঁইধ্যে দিবেন গ বাবু?' বর্ষার কাদায় ব্যাঙের মতো ঝাঁপিয়ে উঠল ফগু দুলে।

'না, সে তো এক্ষুনি কিছু বলতে পারছি না। তবু মোটামুটি কি রকম লাগে বলুন তো…'

'ই ভাদ্দর আশ্বিনে এত খড় কুথাকে পাবেন গ বাবু! বাঁশেরও যা দর…' বলল পার্শ্ববর্তী একজন বুড়োমানুষ— 'তা ধরুন না কেনে, হাজার ট্যাকা ত বটেই। গরিব মানুষ, জন খাটি বাবুদের থানে, এত ট্যাকা কুথাকে পাব গ আমরা…'

'হুঁ… ওরকমই কথা রইল তাহলে। আজ বিকেলেই আমাদের লোক এসে কথা বলে যাবেন আপনার সঙ্গে। ঠকাব না আপনাদের। আমরা তো খুব খারাপ লোক নই…'

'সি কি কতা গ বাবু! কী বলচেন! আপুনেরা মান্যিজন…'

ভ্রূ কাঁপিয়ে পরমেশ ইঙ্গিত দিলেন নির্মলকে—'অলরাইট এগোও…'

এগোলেন। আশ্ শ্যাওড়া শেয়ালকাঁটা বুনো আকন্দ ঝোপঝাড় জঙ্গলের মতোই গায়ে গায়ে লেপটে থাকে মানুষগুলো। বায়োস্কোপ-পাগল হৈহুল্লোড়ের ছেলে ছোকরারা নয়, ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা বয়স্ক মানুষজন। প্রায় কানের কাছে ফিসফিসয়ে এক বুড়ো—'উদিক পানে একবারটি যাবেন গ বাবু?'

পরমেশ ঘাড় ফেরালেন—'কেন?'

'আমার ঘরটা দেখবেন।'

পেছন থেকে ঠেলেঠুলে সামনে এসে পড়েছে একজন—'ইটে আমার ঘর গ বাবু কাটাফুটি নেই। ফগুদার চে' বড়…'

'উত্তুরের মাঠের ধারে আমরা ক ঘর বাউরি থাকি গ বাবু…'

'বাবু…'

'বাবু গ…'

পরমেশ বিরক্ত। এপাশে ওপাশে তাকিয়ে এবার ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—'ঘর তো আমাদের একটাই দরকার। অমন করছেন কেন আপনারা?'

লোকগুলো পিছিয়ে গেল—'আর দুটো এট্টা দেখবেন নি গাঁয়ে?'

'আরেকজনের আরেকটা ঘর নিলেও তো আপনারা সেই একই কথা বলবেন তখন।'

জনতা থমকে দাঁড়াল! আর সাহস নেই এগোবার। বাবুমানুষের রাগ।

নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে পরমেশ দ্রুতবেগে এগোলেন। চাষিদের ঘরউঠোন ডিঙিয়ে, গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে ঝোপজঙ্গলের রাস্তায়—'দিলো, দিলো ব্যাটারা হাজারখানেক টাকা প্রডাকশান-কস্ট বাড়িয়ে। পাঁচ ছ'শ টাকায় হবে ভেবেছ! মিনিমাম্ এক হাজার…'

পাশাপাশি নির্মল নিচু গলায়, সবিনয়ে—'ওদের সকলের মধ্যে ওভাবে টাকার কথাটা তুললেন কেন হঠাৎ?'

উত্তর দিলেন না পরমেশ। দ্রুত এগোলেন। চ্যাটচ্যাটে ঘাম জমছে মুখে-চোখে। রুমালে মুছলেন না। আর্ট ডিরেকটর গোপনে করকে ডেট দিয়েছেন আগামী সপ্তাহে। দিন কয়েকের জন্য থাকবে এখানে। সামান্যই কাজ। আসলে সেট-এর কোনো কাজই নেই তেমন। সেট-তৈরি বাবদ বাজেটে ধরে-রাখা পুরো টাকাটাই প্রডাকশনে খরচ করবেন বলে নিশ্চিত যখন, লোকগুলো ফ্যাকড়া বাঁধাচ্ছে। না-হয় এখনও সেট তৈরি করিয়ে নেওয়া যায় কলকাতায় অথবা এখানেই কোথাও। চাষিপাড়ার ঘরদোর উঠোন গোয়াল মরাই পালুই সব নিয়ে স্বাভাবিক বাস্তব ছবিটা কিছুতেই আসবে না। যতো বড়ো, যতো জাঁদরেল শিল্পনির্দেশকই হোক।

ওদিকে 'আর্টিস'দের নিয়ে ভিড়টা তখনও, ঠিক তেমনি সজীব। ছোটেখাটো গ্রাম্য মেলার গুঞ্জন। হাতঘড়িতে ত্বরিত চোখ—দশটা কুড়ি। ছুটতে ছুটতে পরমেশ এসে দাঁড়ালেন যখন, বিরক্ত হলেন। জটলা থেকে বাইরে, একেবারেই বিচ্ছিন্ন আরতি গাছতলার ছায়ায়। ছোট্ট রুমালে ঘন ঘন মুখ মুছছে। গোমড়া মুখে, এমন কি, পরমেশের চোখে চোখ রেখেও কিছুমাত্র কাঁপল না!

'কি ব্যাপার! কি হয়েছে তোমার?'

এক পলক তাকিয়ে আরতি, বিস্বাদের ঠোঁট ভেঙে—'ভালো লাগছে না আমার। গ্রাম-ফ্রাম নিয়ে এত কাব্যি, মাথায় থাক বাবা…'

পরমেশ সরে এলেন। কোথায় ছিলেন প্রতিমা, ভিড়ের ভেতর থেকে এগিয়ে আসতেই—'ওর কি হয়েছে বলুন তো। এমন করছে কেন?'

শাড়ির আঁচল ডান কাঁধে ঘুরিয়ে এনে প্রতিমা, মৃদুভাষে—'থাক, এখানে কিছু বলবেন না ওকে। মেয়েটা যেন কেমন-কেমন…'

'একেবারে কচি খুকি তো নয়। কন্ট্রাকট সই করার আগে ভাবা উচিত ছিল।'
সে যাক গে…'পরমেশ প্রসঙ্গান্তরে—'নন্দিতা কোথায়? ধ্রুবজ্যোতি বিতোষ…'
'ওদিকেই তো গেল কোথায়। ছেলেরা সঙ্গে আছে।'
'কিন্তু ফিরতে তো হবে। কটা বাজে দেখেছেন?'
'আপনি দাঁড়ান। দেখছি আমি। নির্মলবাবু, চলুন তো আমার সঙ্গে…'
পাশেই চুপচাপ সিগারেট টানছিল নির্মল। বলল—'চলুন।'
এবং ওরা এগিয়ে যেতেই, অনেকক্ষণ পরে, পরমেশ তার একান্ত জরুরি নিঃসঙ্গতা পেলেন। এদিকে ওদিকে পাতলা ভিড়টাকে উপেক্ষা করে একা একা এগোলেন। ললাটের বলিরেখায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ।
দুপুরের খাঁ-খাঁ রোদে ঘন সবুজ মাঠ। দিগন্তের একপাশে আচ্ছন্ন মোহনপুর। বনরেখায় মানুষজন না হোক, দুচারটে ঘরবাড়ি গাছপালার ফাঁকে স্পষ্ট। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালেন রাস্তার ধারে,যেখানে এলোমেলো গোটাকয়েক বাবলাগাছ। ঘন ঝোপঝাড় মাঠ পর্যন্ত গড়িয়ে গিয়ে নয়ানজলিতে নেমেছে। সারি বেঁধে বুনো কলমী, দূরে শাদা কাশফুলের শোভা।
সিগারেট হাতে নিয়ে যখন নিরিবিলি একটু আরাম চাইছেন, আকৃষ্ট হলেন নতুন দৃশ্যে।
ছায়া ভেবেই কেউ হয়তো ওদের বেঁধে রেখে গিয়েছিল কাঁঠাল গাছের নিচে। রোদ সরে গেছে। খরখরে রোদ্দুরে দুটি গাভী। তারই একটি হঠাৎ লেজ তুলেছে। বড়োই কৌতুককর দৃশ্য। বাঁ চোখ কুঁচকে ডানচোখে মুঠোর বাইনাকুলার নিতান্তই স্বভাবে। এগিয়ে গেলেন। অনুপুঙ্খ নিরীক্ষণ। নেহাৎ-ই গরু। খুব উঁচু করে লেজ তুলতে পারে না চতুর জানোয়ারের মতো। যেটুকু তুলেছে, তার তলায় বিচ্ছিরি নোংরা কুঁচকোনো মাংসগুলো কাঁপছে। এবার প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠাবৃদ্ধি।
লাফ মেরে তড়াক করে পিছিয়ে এলেন। যে দুচারজন বাচ্চাবুড়ো দেখছিল তাঁকে, খিলখিল হেসে উঠল। গোবর নয়, গোচনা। বড়ো কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন। তীব্র বেগে মাটিতে পড়ে হয়তো ছিটকে এসেছে পায়জামা পাঞ্জাবিতে। ভ্রূক্ষেপ নেই। দেখলেন, গোমাতা কিছু দান করলেন পৃথিবীকে—একবার দুবার, অবশেষে তৃতীয় কিস্তিতে উদ্ধত লেজ গুটিয়ে গেল। নিতান্তই গোচনা, গোময় হলে ছুটে আসত কেউ। গাভীর মলত্যাগে হিন্দুঘরের পবিত্রতা, গরিবমানুষের জীবন-জীবিকা।

টক করে মগজে খেলে গেল। অদূরবর্তী গ্রামবাসীদের দিকে এগোলেন পায়ে পায়ে—'একজন থুরথুরে বুড়ি আছেন না তোমাদের গ্রামে? খুব বুড়ি আর কুঁজো…'

'কে গ বাবু, কার কতা বলচেন?'

'ওই যে…'কপালের ভাঁজে বুড়ো-আঙুলের নখ ঘসতে ঘসতে ভাবলেন পরমেশ। কি বলবেন, কিভাবে বোঝাবেন—'খুব, খুব বুড়ি, শেতলাবুড়ি না কি-যেন নাম! গোবর কুড়োয়…'

'সি ত আমাদের ঘরে মে'ছেল্যারা সব্বায় কুড়য় গ বাবু।'

পার্শ্ববর্তী যুবক, সোৎসাহে—'আপনি বুড়ি-মাটার কতা বলচেন গ বাবু। উ গাঁয়ের নোকে শেতলাবুড়ি ডাকে…'

'অঁ…' বয়স্ক চাষি হদিশ পেয়ে—'সি ত আমাদের স্বজেত লয় গ। উ বাবুদের গাঁ, মোনপুরে উয়র ঘর। বাগদীপাড়ার ধারে…"

'ওকে একবার পাব? ঘরে গেলে…'

'গরিবঘরের মুল গ বাবু। হাঁসমুগ্‌গির মতন। সুয্যি উঠলে একবারটি ছেইড়্যে দিলেন ত দিনেমানে আর ফিরো পাবেন নি। পেটের টানে ঘুচ্চে কুথা…'

'তা হোক। ঘর আছে তো একটা! সন্ধেবেলা ফিরবে তো ঘরে…,

'উয়র ঘর কুথাকে গ বাবু। বুড় হয়্যা হয়্যা ছেল্যা ছেল্যা-বৌ সব ম'ল। উয়র মরণ লেই। নাতি নাত-বৌ দাঁত ঝাড়ে নিত্যি, ঝ্যাঁটা মারে…'

অন্য এক চাষি—'গা গতর ভাল থাকলে মাঝেমধ্যি আসে গ ইদিকপানে। গরিবমানুষে দেয় এক মুঠো পান্তা কি এক গাল দুগাল মুড়ি। রেতের বেলা ঘাপটি মেরো পড়্যা থাকবে বাবুদের গাঁয়ে কারুর দোরে, লয়ত বাজারের চালার তলায়…'

হৈ হৈ করে ছুটে এল ওরা। সবার আগে নন্দিতা।

পরমেশ বুড়ো চাষির দিকে তাকালেন—'দেখা হলে ওকে বলবেন তো একটু, আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। খেতে দেব, টাকা দেব…'

'ফ্যান্‌টাস্টিক, পরমদা সিম্‌প্‌লি ফ্যান্‌টাস্টিক…'

'সবই তো ফ্যান্‌টাস্টিক তোমার কাছে। এমন করছ, যেন আগ্রা বেড়াতে এসেছ। সেকেন্দ্রা ইমতুৎদৌল্লার পর তাজমহলটাই এখনও বাকি…'

'সে আপনি যাই বলুন…' দুহাত নেড়েচেড়ে, গোটা শরীর কাঁপিয়ে নন্দিতা—'ওদের মুড়িভাজা দেখছিলাম। উঃ, রোদেআগুনে জ্বলেপুড়ে এমন খাটছে

বৌগুলো, আমি তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘেমে গেছি। মুড়িভাজার এভরি ডিটেল এখন আমি বলতে পারি আপনাকে…'

'বেশ শুনব। এখন নয়, ক্যাম্পে গিয়ে…' হাতঘড়িতে আবার চোখ। কিছুটা সরোষ ধমকে—'কি করেছ দেখেছ? প্রায় এগারটা বাজিয়ে দিয়েছ। ওদিকে সুকুমারবাবু তো বোধ হয় খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছেন।'

সুতরাং পেছনে কে রইল বা রইল না, যেহেতু খুচরো ঝামেলায় নষ্ট করবার মতো প্রচুর সময় হাতে নেই, পরমেশ এগোতে শুরু করলেন। সম্মুখবর্তী পথে দল থেকে কিছুটা এগিয়ে। একা একা। ভূমণ্ডলজোড়া আগ্নেয় আকাশটা যেমন তাঁর মাথার ওপর, মগজের কোষে কোষে অসংখ্য ভাবনা। আজ দুপুর থেকেই যদি শুরু করা যায় কাজ! প্রথম ক্ল্যাপস্টিক।

এবং তখন, পশ্চাদবর্তী পুরো দলটাই খুশিতে উচ্ছল। ওদের হাসিখুশির নিজস্ব মজায় হঠাৎ নির্মল—'এবারে বুঝলেন তো নন্দিতা, কত ধানে কত চাল! বলুন তো হিশেবটা কী?'

নন্দিতা কৃত্রিম গাম্ভীর্যে—'সে তো আমি জানিই। আমিই তো প্রথম জিজ্ঞেস করেছি আপনাদের! আপনারা বলুন।'

'আমরা যে জানি না, কে বলল আপনাকে…' ধ্রুবজ্যোতি হাসছে—'ঠিক বলছি কি বেঠিক বলছি, ধরবেন কি করে?

'ওসব চালাকি ছাড়ুন। বলুন না, বলুন…' নন্দিতা থমকে দাঁড়াল। যেন মস্ত এক বাজিজেতার খেলা।

'দেড় মণে এক বস্তা ধরে ওরা। এই ধরুন…' সিগারেট সুদ্ধু হাতের কনুইটা বুকের কাছে তুলে, ঠোঁটে বুড়ো-আঙুল কামড়াল ধ্রুবজ্যোতি। কপালের ভাঁজে যেন সত্যি কোনো হিশেবের ভাবনা—'এক বস্তা ধান দিলে এক মণ ধান পাবেন আপনি। অর্থাৎ দেড় মণে এক মণ…'

'এই, এই ধ্রুবদা, কী হচ্ছে এসব…' খোলা মাঠে নন্দিতার উল্লসিত হাসি—'এক্ষুনি, এইমাত্র ওদের কারুর কাছ থেকে জেনে নিয়েছেন ভিড়ের মধ্যে। বলুন, সত্যি বলুন…'

'হ্যাঁ, আপনি যেমন তখন জিজ্ঞেস করলেন ওই মেয়েটিকে।'

'মেয়ে! কোন্ মেয়ে?'

'ওই হলো আর কি। মেয়ে না হয়, বৌ। বলুন, জিজ্ঞেস করেননি? বি অনেস্ট…'

ভাঙা খোলার গরম বালিতে চাল মুড়ি হয়ে ফুটে ওঠার মতোই ভাঙা ভাঙা টুকরো টুকরো হাসিতে দোদুল নন্দিতা।

এবং সমবেত হাসিতে মিশে থেকেও বলতে পারে না নির্মল—নতুন ধানে এক মণ নয়, কিছু কমও হতে পারে। এখন কিছু বলার বিপদ, জালে জড়িয়ে যাবার ভয়।

পিছু ফিরে ধমকে উঠলেন পরমেশ—' রাস্তায় দাঁড়িয়ে করছ কি তোমরা। ফিরতে হবে না! এতটা পথ! খাওয়াদাওয়ার পর আজই তো শুরু করব কাজ...'

ক্যাম্পে ফেরার পথে আরো বিস্ময় ছিল।

ভরদুপুরে গ্রামের নির্জন পথে কেউ আর নেই। ঘরগেরস্তালির কাজকম্মো ফেলে বায়স্কোপের জ্যান্ত নায়ক-নায়িকা দেখার সাধ ফুরিয়েছে অথবা বায়স্কোপের লোকগুলো ফিরছে এখন—জানেই না কেউ।

গনগনে রোদের সঙ্গে বাতাস ছিল। বাঁশঝাড়ে ঝিরঝিরে শব্দ মাঝে মাঝে, গাছপালার পাতায় পাতায় কাঁপুনি। পাখিরা ডাকছে। নিঝুম দুপুর-কাঁপানো কাকের চিৎকার। নৈঃশব্দ্যের ধ্বনি।

মেয়েরা শিথিল চরণ। বিতোষ বলল— 'মেয়ে হয়ে জন্মে বেশ কতগুলো সুবিধে আপনাদের...'

'কেন?' আড়চোখে তাকাল নন্দিতা।

'আপনাদের শাড়ির আঁচলটা অনেকটা নৌকোর পালের মতো। যাবার সময় পালে বাতাস ছিল, তরতরিয়ে ছুটেছেন। আর এখন...'

নন্দিতা চোখমুখ কুঁচকোল। সত্যি ক্লান্ত— 'উঃ, আরো কতোটা পথ! এই সবটা হেঁটে যেতে হবে? বিকশটিকশ পাওয়া যাবে না রাস্তায়?'

'সে যদি আপনাদের ভাগ্যে থাকে ..' হাসল নির্মল— 'গ্রামের মানুষ অত হরবকৎ রিকশ চাপে নাকি আপনাদের মতো। স্টেশনে থাকে গোটাকয়েক। মালপত্তর বইতে হলে আসতে পারে...'

বেশ কিছুটা এগিয়ে থেকে একা একা হাঁটছিলেন পরমেশ। আরতি চাপা গলায়— 'আমাদের কি এখানে রোজ রোজ হেঁটে আসতে হবে নাকি প্রতিমাদি?'

'তুমি কিন্তু আবার একটা ধমক খাবে আরতি...' প্রতিমা তার শান্ত সহজ ভঙ্গিতে— 'ওদের গাড়ি আছে। আজ বেড়াতে এসেছ। কেউ কি গাড়ি চেপে গ্রাম দেখতে বেরোয় ?'

'ধন্যি তোমাদের শখ বাপু! যতো আদিখ্যেতা। এত বিচ্ছিরি আর নোংরা জানলে আমি বেরোতাম ভেবেছ! কক্ষনও না...'

'ছাখ্, আরতি, বেশি বাড়াবাড়ি করবি না...' কিছুটা গলা চড়িয়েই তেড়ে উঠল নন্দিতা এবং কণ্ঠস্বর নামিয়ে এনে— 'তোর কী ? তুই তো মশা-মারার ক্রিম হাতে পায়ে মুখে মেখে নিয়েছিস। এন্‌কেফ্যালাইটিস হবে না...'

'সে কি!' সকলের সঙ্গে কোরাসে হেসে ফেলেছে বিতোষ। হাসতে হাসতে— 'এই দিনদুপুরেও ওসব গায়ে মেখেছেন নাকি আপনি ? দিনে মশা থাকে না...'

আরতির অভিমানী চোখেমুখে ক্রোধ। ওদের হাসাহাসিতে মধ্যবর্তিনী প্রতিমা দাশ—'আঃ কি হচ্ছে তোমাদের ? কি ছেলেমানুষী করছ তোমরা! আগে ঘরে চলো। সেখানে গিয়ে যতো পারো ঝগড়া করো ..'

গ্রুপ থিয়েটারে গোটাকয়েক অভিনয়ের পরই যদি পরমেশ মিত্রের মতো একজন ডিরেকটরের ছবিতে চান্স, অথচ ফিল্‌ম্‌-অভিনয়ের প্রথম অভিজ্ঞতাটাই বড়ো গোলমেলে। ধুলোমাটির ভ্যাপসা গ্রামটা সইছিল না। মেয়েটাকে নিয়ে ওদের ঠাট্টাকৌতুক হয়তো আবো জমে যেত, তখনই আরেক কাণ্ড।

বাঁদিকে সার-বাঁধা কলাগাছ-ঘেরা একটা পুকুরের ধার ঘেঁষে হঠাৎ কিরণময় ভট্টাচার্য। সকলের কিরণদা। সঙ্গে কালো হোঁৎকামতো একটা লোক। ইউনিটের কেউ নয়। হয়তো গ্রামেরই কোনো মানুষ।

প্রতিমা থমকে দাঁড়ালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখ পড়েছে ধ্রুবজ্যোতিদের। নন্দিতার চিৎকারে ফিরে তাকিয়েছেন পরমেশ।

বুনো আগাছার জঙ্গলে জঙ্গলে ভয়ঙ্কর ওদিকটা। রাস্তাকাস্তা আছে-কি-নেই বোঝা যাচ্ছে না ঠিক, দুহাত তুলে লাফাতে লাফাতে আসছেন কিরণময়। ঢলঢলে পায়জামায় হলুদ রঙের শস্তার খাদি পাঞ্জাবি। কাঁচাপাকা চুলের মিশ্রণে শাদাই সংখ্যাগুরু। লম্বা লম্বা বাবরিগোছের চুল ঘাড় ঘোরালেই নাচে।

'কি হে যাচ্ছো কোথায় সব ? নাকি ফিরছ ?'

পুকুরপার থেকে রাস্তায় উঠে আসা পর্যন্ত সকলেরই প্রতীক্ষা এপারে। ঘাট-

বাষট্টির বাস্তব বয়সটাকে মেনে না-চলার অদ্ভুত জেদ থেকে দৌড়ঝাঁপলাফা-লাফিতে ছুটছে মানুষটা। ছুটছে অনেকদিন। প্রায় তিন দশক।

কাছাকাছি পৌঁছোতেই নন্দিতা তার স্বাভাবিক চঞ্চলতায়— 'ও কিরণদা, ওই বনেজঙ্গলে কোথায় গিয়েছিলেন আপনি ? কী করছিলেন ?'

হাঁপাচ্ছেন কিরণময়— 'গিয়েছিলাম সুন্দর একটা জায়গায়। ঝাঁপানপুর। কী হরেন, তাই তো ? ঝাঁপানপুরই তো নাম ?'

'আজ্ঞে…' নোংরা ধুতি আর তালি-মারা হাফশার্ট-গায়ে সেই অদ্ভুত লোকটা এমন ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল, হাসি চেপে থাকাও দুষ্কর ওদের পক্ষে। বোকা হাবা চেহারায় বিনয়ে গলছে। যেন কিরণময় ভট্টাচার্যের আর্দালি পিয়ন।

'কি আছে সেখানে কিরণদা ?'

'কিছু নেই। কিছু-একটা থাকতেই হবে মানে কী ? দুস্থ গাঁ…'

'তাহলে কী করছিলেন সেখানে ?'

'এমনি ঘুরে এলাম। শখ হলো। পেয়ে গেলাম হরেনকে। ও হ্যাঁ…' চকিতে কর্তব্যচঞ্চল কিরণময়— 'কই হে হরেন, শোনো শোনো এদিকে…'

কাঁচুমাচু লোকটা পিছিয়ে ছিল তিনহাত। ছুটে এল।

'ইনি, ইনিই আমাদের ডায়রেকটর। আর এঁরা সবাই আমাদের বন্ধু…'

ভ্রূকুঞ্চনে রীতিমত বিরক্ত পরমেশ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন এক পাশে। যেন অতর্কিতে আক্রান্ত হলেন এবং আত্মরক্ষায় তাঁর নিজস্ব গাম্ভীর্যে— 'এ কী! কী করছেন আপনি ?'

চল্লিশ-একচল্লিশের কমবেশি বয়স্ক একটা লোক, সবাইকে সচকিত করে পরমেশের পায়ে আচমকা নিখুঁত ডাইভ। বাধা পেয়েও বেপরোয়া—'বড় মান্যিজন গ আপনি। চোখে দেখতি পাব, এমনটা ত ভাবিনি জেবনে…'

'কী নাম আপনার ?'

'আজ্ঞে, হরেন আওন…'

'তাঁত বোনেন ?'

দেবতাসমীপে করজোর বরপ্রার্থীর ভঙ্গিতে হরেন আওন বিস্মিত বিহ্বল— 'কত্তো কিছু জানেন গ বাবু আপুনেরা। আমার পদবীতে বুঝে নিলেন, আমি তন্তুবায়…'

বিস্ময়ের ঘোর কাটেনা হরেনের। তাকায় এদিক ওদিক। বাহারের বাবু-দিদিমণিরা মহেশ্বর-মহেশ্বরী!

নাকের ডগায় চশমা রেখে, থুতনি উঁচিয়ে কিরণময়—'বড্ড ভালো লোক হে আমাদের হরেন। রিয়েল আর্টিস্ট। একেবারে গ্রাসরুট ট্যালেন্ট...'

ডানহাতে সিগারেট পুড়ছে। বাঁহাতের বুড়ো আঙুল গালে চেপে স্থিরপলকে তাকিয়ে থাকেন পরমেশ। চড়া রোদ মাথার উপর।

অভিভূত কিরণময়—'ছেলেবেলা থেকে পালা গাইবার শখ। গাঁয়ের ছেলে পাত্তা পাবে কোথায়? চোদ্দ-পনের বছরেই নাকি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল কলকাতা। চিৎপুর পাড়ায় এ অপেরা ও অপেরায় রামসীতা ঔরঙ্গজেব সিরাজদৌল্লাদের জুতো সাফ করে কাটিয়েছে পাঁচ-পাঁচটা বছর। অধিকারী-মশাই বিনে মাইনেয় খেতে পরতে থাকতে দিয়েছে, তাতেই সুখ। হাঁড়ির তলানি কুড়িয়ে শাকচচ্চড়ি দিয়ে দুটো ভাত গেলা আর তরবারির বাক্শোয় ঘুমোনো...'

'তরবারির বাক্শোয় ঘুমোনো!' ছোট রুমাল ছেড়ে শাড়ির আঁচলে চোখমুখের ঘাম মুছতে মুছতে নন্দিতা—'সে আবার কী কিরণদা? তরবারির বাকশোয় মানুষ ঘুমোবে কী?'

'গ্রুপ-থিয়েটারের এম এ পাশ নায়িকা। এসব তোমরা বুঝবে কী? চিৎপুর পাড়ায় দুর্যোধন আলমগীর ক্লাইভ মিরকাশেমদের সঙ্গে এদের ক্লাস-ডিফারেন্স থাকে। রাজাউজিররা সোনার পালঙ্ক পায়। নফর গোলাম কাটা-সৈন্যরা থাকবে কোথায়? ঢালতলোয়ার বইবার যে বড়ো বড়ো বাক্শো থাকে, সেখানেই রাত কাটায়...'

উচ্ছল হাসির তরঙ্গ। লজ্জায় বিনয়ে মোমের মতো গলছে হরেন আওন। হয়তো আরও এগোত কৌতুক, পরমেশ গাঢ় গম্ভীর গলায়—'একে আপনি জোগাড় করলেন কোত্থেকে? একটা রাত তো কেটেছে মাত্র...

কিরণময় হাসছেন—'পেয়ে গেলাম। সকালে তোমার সারথি বলল—মর্নিং শিফটে আজ নাকি কোনো কাজটাজ হচ্ছে না। আপনারা বিশ্রাম করতে পারেন। ব্যস, ছুটি পেয়ে জামাটা গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেরোব কি, স্কুলের দরজায় দেখি, ভেঙে পড়েছে গোটা গাঁয়ের মানুষ। তার মধ্যে এই হরেন যাকেই পাচ্ছে, তাকেই হাতে পায়ে ধরছে—ডেরকটরবাবুর পায়ের ধুলো নেব। একটু কথা কইব তেনার সঙ্গে। সবাই বলছে, দেখা হবে না। উনি বেরিয়ে গেছেন। আমি গেলাম। বললাম—আমায় দিয়ে চলবে হে বাপু! বুড়োমানুষ, সিনেমায় কথা বলব। সেই থেকে হরেনের সঙ্গে। এলাম ওদের তাঁতিপাড়ায়, সেখান থেকে ঝাঁপানপুর...'

গণনাট্যের প্রাচীন শিল্পীকে বিশেষ মর্যাদা—যদিও কন্‌ট্রাক্ট বহির্ভূত চুক্তি, তবু কিরণময় আরো কি বলবেন, বলতে পারেন, হিশেব না কষে পরমেশ এগোতে শুরু করলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় বিচলিত সকলেই যখন চোখ ফেলেছে কিরণময়ের দিকে, সহাস্য কিরণময় ভ্রূকুটি তুলেই পলকে ফিরলেন—'কি হে হরেন, এবারে কি করবে তুমি? পথেই তো পড়বে তোমাদের পাড়া! তুমি ঘরে চলে যেয়ো…'

'চলুন না কেনে গ কাকাবাবু…' দাস্তনম্রতায় প্রায় অশ্রুত হরেনের কণ্ঠস্বর—'ইশ্‌কুল বাড়ি তক্‌ আপুনাদের পৌঁছে দে' আসি…'

'না, এই রোদ্দুরে আপনি আর যাবেন কেন?' বলল ধ্রুবজ্যোতি।

'আমায় কেনে আপনি বলছেন গ দাদা। আমি আপনার ছোট ভাই…'

'সে হবে, সে হবে। এখন চলো তো…' হরেনের পিঠ চাপড়ে লম্বা লম্বা পায়ে এগোলেন কিরণময়—'দেখছ তো, কি রকম চটে গেছেন আমাদের বড়োবাবু…'

'কিরণদা…' নির্মল হাতঘড়িতে চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে দ্রুত—'বেলা আড়াইটে তিনটে নাগাদ প্রোগ্রাম নিয়েছেন পরমদা। এখন বারোটা বাজতে দশ মিনিট…'

যেন স্বভাববশত নিজেদের কব্জির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সবাই।

নির্মল একই ভঙ্গিতে—'এখনও এতটা পথ। তাছাড়া সব মিলিয়ে মাইল দেড় দুই হেঁটে প্রতিমাদিরা তো হাঁটতেই পারছেন না আর…'

'এগোন তো, এগোন…' নন্দিতা—'পা চালিয়ে হাঁটুন। আমরা আছি। সবটাতেই মেয়েদের দোষ আপনাদের। পরমদা সত্যি রে গে গেছেন…'

বিড়ির কৌটো টেনে নিলেন কিরণময়। ছুঁচোলো ঠোঁটে বিড়িটা ধরিয়ে নিয়ে এক মুখ ধোঁয়ায়—'ব্যাপারটা তো খুব সহজ নয় হে। লাখ লাখ টাকার কারবার। নানা ধরনের এতগুলো লোক নিয়ে হাজার দিগদারি। রাগটাগ তো হবেই মাঝে মাঝে। যদি আমরা নিজেরাই একটা ডিসিপ্লিন না মানি। ওপর থেকে ক্যাপ্টেন ঘণ্টা বাজাচ্ছে, তলায় যে লোকটা বয়লারের কয়লা ঠেলছে সে শুনছে না। ও জাহাজ তো ডুববেই। নির্ঘাৎ ডুববে। কার সাধ্যি রক্ষে করে…'

সোজাসুজি রাস্তায় পরমেশ দৃশ্যমান তখনও। বেশি নয়, পঞ্চাশ ষাট গজ দূরে। দ্বিপ্রহরের ছায়াটা গায়ের মধ্যে লেপটে নিয়ে কিছুটা দ্রুত পায়েই এগোচ্ছেন একা।

'এই ভরদুপুরে মাঠে মাঠে কোথায় ঘুরছিলেন কিরণদা? সকালে খেয়েছেন তো কিছু?' সহৃদয় মৃদুতায় প্রতিমা।
'ধ্যাৎ, রাখো তো তোমাদের খাওয়া আর খাওয়া…' এক ঝাপটের পরই কিরণময়ের মুখ অন্যদিকে, অন্যত্র উৎসাহ— 'সে গিয়েছিলাম বটে এক জায়গায়। সকালবেলা পেয়ে গেলাম হরেনকে। ও-ও এক কথায় রাজি হয়ে গেল। চলে গেলাম। জব্বর মজাদার লোকটা। হলা ওঝা…কি হে হরেন, হলা ওঝাই তো নামটা বলল…'
'আজ্ঞে…'
'সে কি কিরণদা! ওঝা! ওঝা কেন? ভূতে ধরেছে নাকি আপনাকে?' নন্দিতা ক্লান্তিহীন। একই ভাবে প্রাণময়।
'হ্যাঁ গো, ভূত। ভূতেই তো পেয়েছে আমাদের। নইলে আর তোমরা, যুবতী সুন্দরী মেয়েরা শহরের সুখের আরাম ছেড়ে এই বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে এসেছ…' বিড়িটা নিভে গেছে। বারদুয়েক টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কিরণময় —'ভূত-তাড়ানো, জলপড়া, তেল-পড়া জলবসন্তের গুটি জিভ দিয়ে চাটা হরেক কাণ্ড জানে ওরা। হাইলি ইণ্টারেস্টিং। পিকিউলিয়ার অবস্কিওর কাল্ট। ক্যানিং ডায়মণ্ডহারবারে বাদা অঞ্চলে যাও, দেখবে গ্রামে গ্রামে ওরা আছে। মেছেদা যাও, গড়িয়ার ওধারে বোড়াল যাও, মাঠে মাঠে ফুলের চাষ। ওই যে কলকাতার বাজারে বাজারে ফুটপাতে এত ফুল, সব আসে কোত্থেকে জানো। ফুলের চাষিরা পাঠায়। আর তোমাদের ফুল পাঠাতে ওরা টপাটপ মরে। ফুলের গন্ধে সাপ আসে। ভোরবেলা ফুল তুলতে গিয়ে কতো যে মরছে রোজ। ওসব জায়গায় ওঝামন্তরের ব্যবসাটা ভালো। আজ প্রায় বছর খানেক ব্যাটাদের পেছনে লেগে আছি। শালারা বজ্জাত, কিছুতেই মুখ খোলেনা বেশি। খালি বাজে বকে…'
'কী, নাটক লিখবেন?'
'সে লিখি আর না-লিখি, জানতে দোষ কী?' চশমার ঊর্ধ্বে চোখ উচিয়ে প্রতিমার দিকে তাকালেন কিরণময়—'হরেনের সঙ্গে আলাপ হতেই বললাম ওকে —ও হে ওঝাটোঝা কে আছে বলো তো তোমাদের গাঁয়ে? একে শহরের বাবু, তায় আবার ফিল্মের লোক। হরেন একেবারে সোজা টেনে নিয়ে গেল মাঠের আলে আলে আড়াই মাইল তিন মাইল…'
'দেখলেন? কথা হলো?'

ধেৎ, এ শালা কিছু জানে না। খালি বাপঠাকুদ্দার নামে তড়পায়। হবে কী করে! গ্রামও কি আর গ্রাম আছে নাকি! সবাই ইন্‌জেকশন চিনে গেছে...'

'কিরণদা, আপনি এসব বিশ্বাস করেন?' কিছুটা বোকার মতো, আচমকা নন্দিতা।

'আরে বাপু, আমার বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে কি আসে-যায়? আমি-তুমি তো কলকাতার উই ক্লাবের মেম্বার সব। আমাদের ক্লাবে মস্ত মস্ত স্পেশালিস্ট এম. এস, এম আর. সি পি, এ. বি. সি ডি বাবুরা আছেন সবাই। আমরা দিব্যি থাকি। আর দেশের কোটি কোটি মানুষের জন্যে পুরনো এল. এম. এফ কি হাতুড়েও জোটে না যখন, ওঝামন্তর থাকে। যাও সেখানে, দেখবে ও শালাদের কি দাপট। গুরু সেজে বসে আছে। যেন বিজয় গুপ্তের নাতির ঘরের পুতিরা সব...'

'কী? কী বললেন যেন, উই ক্লাব...' বিতোষ কৌতূহলী—'সেটা কী বস্তু?'

'বোঝো নি?' ঝাঁকড়া চুল নাচিয়ে ছুঁচোল চোখে তাকালেন কিরণময়—'হরেনকে জিজ্ঞেস করো।'

একটু চড়া গলায়ই বললেন নামটা। হরেন পিছিয়ে ছিল। লাফিয়ে এল—'আমায় কিছু বলচেন গ কাকাবাবু?'

'না, বলছিলাম তোমার পালার কথা। সুন্দর পালা বেঁধেছে, দল গড়েছ।'

'কি যে বলেন গ কাকাবাবু ..' হরেন সঙ্কুচিত। জুলপির ওপর আঙুল ঘসে ঘসে—'পালাটি ত আমরা বাঁধিনি গ। পুরনো পালা। ছেল ্‌'ট্টা বই আমার কাছে ..'

'কি বই?'

'আজ্ঞে, কংসবধের পালা...'

'কংসবধ! বাঃ, সে তো খুব ভালো নাটক...' নন্দিতা—'রাধা নেই আপনাদের?'

'বোঝো কাণ্ড...' থমকে দাঁড়ালেন কিরণময়। ধমকের ভঙ্গি—'কংসবধে রাধা কোথায় পেলে? সে তো বেন্দাবনলীলা...'

নন্দিতা থতমত। অস্বস্তি এড়াতে—'না, না, কোনো নায়িকা নেই ওদের?'

'থাকবে না কেন? দেবকী—কৃষ্ণের মা, নন্দের স্ত্রী যশোদা...'

'সিইটেই ত ঝঞ্জট গ দিদিমণি...' হরেন কিছুটা সাহস পাচ্ছে—'মে'ছেল্যারা আসবে কী। ব্যাটাছেল্যারাই আসচে নি। দল ত হচ্ছে নি তেমনটি। বাবুদের

ঘরে লেখাপড়ার লোক আচে অনেক, ইশকুলের মাঠে থ্যাটার করেন তেনারা, গাঁয়ের মানুষ ভেঙে পড়ে সন্ধ্যায়। আমরা মুখ্যুসুখ্যুমানুষ…'

'ডিরেকটর কে আপনাদের? অর্থাৎ পরিচালক?'

'বামুনপাড়ার নলিনী মাস্টর গ বাবু।'

'সে কি! আপনি নিজে নন?'

হরেন জিভ কাটল—'কি যে বলেন গ বাবু। আমি মুখ্যু মানুষ। নলিনীমাস্টর অনেক জানেশোনে। পাশ দেছেন কটা সি অনেক কাল পুব্বে। এখন উই বাগাটি গাঁয়ের পাইমারি ইশকুলের হেডমাস্টর। ইংজিরিতে এমন কতা কইবেন গ, আপুনেরাও হা হয়্যা যাবেন। কংসের পাট্টে এমনটা জুড়ি পাবেন নি ই তল্লাটের কুথা…'

সকলের মুখেই রুমাল বা আঁচল যদিও, ধ্রুবজ্যোতি স্বাভাবিক—'আপনি অভিনয় করবেন না? কী পার্ট?'

হরেন লজ্জা পেল—'আমিই ত হিরু গ বাবু। কেষ্ট…'

খোলামেলা হাসতে পারছেন কিরণময়—'ওটাই তো গণ্ডগোল করে ফেললে হরেন। এ বয়সে খোকা সেজে কংসবধ করছেন কেষ্টঠাকুর! যাক গে, জানো তো তোমরা, হরেন শুধু হিরো নয়, দলের সেক্রেটারি। ও-ই বলেকয়ে ধরে এনেছে নলিনীবাবুকে। নলিনী গোঁসাই। আগে নাকি কেত্তনের দলে গান গাইতেন। এখনও গান।'

দুপুরের নিঝুম কাঁপিয়ে দূরে, খুব দূরে একটা মাইকের আওয়াজ। মৃদু হাসছিল সবাই, আওয়াজটাকে আমল না দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিরণময়—'কি গে ইন্টারন্যাশনাল উই ক্লাবের মেম্বর বিতোষ, বুঝলে কিছু?'

'কি বুঝব?' বিতোষ হাসতে হাসতে।

দূরের বাঁকে কোথায় অদৃশ্য পরমেশ। তাকে তার দুষ্প্রাপ্য নিরিবিলিটুকু দিতেই যেন এগিয়ে যাবার তাড়া নেই কারো। মাইকের ধ্বনি বক্তৃতা থেকে হঠাৎ গানের চিৎকার হয়ে কাছে আসছে অথবা দলবদ্ধ ওরা এগিয়ে যাচ্ছে বলেই বিয়েবাড়ি কি পুজোপ্যাণ্ডেল ঘনিষ্ঠ আরো।

'খুব তো যাত্রা করে বেড়াচ্ছ, লাখ লাখ টাকার কারবারে কার্লমার্ক্স লেনিন মাও সে তুঙ…হরিজন সমস্যা তো এখন পলিটিকাল ইস্যু রে তোদের! এলেম থাকে তো লেখ্ না শালা শূদ্রক একলব্য নিয়ে নতুন পালা। মিথ্ রিটোল্ড। বছর পঞ্চাশ-ষাট আগে রবীন্দ্রনাথ তো 'চণ্ডালিকা' লিখেছিলেন রে, তোরা কী

করছিস ? সেই চণ্ডালিকা নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছিস রবীন্দ্রসদনে কলামন্দিরে। তোরাই করিস, তোরাই দেখিস…'

হাতপানাকমুখচোখকান গোটা শরীর নিয়ে এমন ভঙ্গিতে কথা বলেন কিরণময়, এবং হাঁটাটাও অদ্ভুত, লম্বা লম্বা পা ফেলে ছোটা। বুড়োর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে যখন সবাই হাসছে, ধ্রুবজ্যোতি কিছুটা সিরিয়াস—'ব্যাপারটা বোধ হয় অত সোজা নয় কিরণদা। এ বিষয়ে কিছু তর্ক আছে আপনার সঙ্গে…'

'হবে, হবে। ঘাবড়াচ্ছ কেন ? করো না তক্কো। কাজকম্মের শেষে রাত্তির বেলা তো আড্ডাই চলবে এখন। জমিয়ে আড্ডা…' মাইকের চিৎকারটা তখন কাছে, খুব কাছে। গলা চড়িয়ে কিরণময়—'এখানকার নতুন বি. এ পাশ বাবুরা গাঁয়ে থিয়েটার করেন প্রতি বছর। জানো, কী নাটক ?'

'এরই মধ্যে এত সব জানা হয়ে গেছে আপনার ?'

'হ্যাঁ গো. কয়েকটা ছোঁড়ার সঙ্গে কথা হলো সকালবেলা। ওদের কাছেই শুনলাম, গত বছর নাকি ওদের নাটক হয়েছিল—"রক্তাক্ত রোডেশিয়া।" বোঝো কাণ্ড, গাঁয়ে একটার বেশি ছুটো ভূগোলের মাস্টার নেই, নাটক হচ্ছে রোডেশিয়া ভিয়েতনাম চিলি…'

'আপনার আপত্তিটা কোথায় ?' ধ্রুবজ্যোতি কিছুটা সংশয়ে।

'আরে বাপু, আমি কে ? কোন্ মাতব্বর ! তোমাদের তামাশাটা দেখি আর কি। মজা লাগে। গাঁয়ের নব্য শিক্ষিতেরা হরেনদের দলে নেবে না—ব্যাটা মুখ্যু। কলকাতায় গিয়ে তোমাদের কাছ থেকে জ্ঞানের কথা শিখে আসবে আধখ্যাঁচরা। লোকে বলবে—শাবাশ। অথচ হাজার হাজার টাকা দিয়ে তোমাদের কলশো-এ ডেকে এনে গাঁয়ের মানুষদের আসলি চিজটা দেখায় মাজার জোরও নেই তেমন…'

মাইকের সেই উন্মত্ত চিৎকার। তারস্বরে চেঁচাচ্ছে একটা মানুষ। এবার একেবারে ঘাড়ের ওপর। যেন শেষ কথাটা বলার জন্যে মরিয়া কিরণময়— 'আর আমাদের হরেন। করবে কি বেচারারা ! ওরা যে-যেমন-পারে অপসংস্কৃতি প্রতিরোধের লড়াইটা লড়ে যাচ্ছে ওদের মতো করে—কংসবধ, বিল্বমঙ্গল, সিরাজের স্বপ্ন…'

বাঁপাশে ভেড়েণ্ডার-বেড়া ঘিরে গেরস্তের কাঁচাবাড়ি, ধানের মরাই, খড়ের পালুই। বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল ওদের। বেশ খানিকটা লম্বা আর সোজা সরলরেখার রাস্তায় একটা সাইকেল রিকশ। একরাশ বিরক্তিতে নন্দিতা— 'এটা কি হচ্ছে

বলুন তো, দুপুরবেলা একটার সময় এভাবে যন্ত্রণা দেয় মানুষকে ? বলে না কেউ কিছু।'

'ছিনেমার পরচার গ দিদিমণি···' হরেন মৃদু স্বভাবে— 'ছিনেমাতলায় নতুন বই এলে পিত্তিবারই এমনধারা বেরোয়। সব্বায়কে বলে যায়, ছাপা-কাগজ দে' যায় হাতে হাতে···'

আষ্টেপৃষ্ঠে বড়ো বড়ো রংবেরং-এর পোস্টার সেঁটে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে রিকশটা। পেছনের দিকে লাউডস্পিকার। প্রলয় ব্রহ্মনাদ আওয়াজটাই শোনা যাচ্ছে শুধু, শব্দের উচ্চারণ নেই। তালপাতার টোকা-মাথায় ঘেমেনেয়ে আস্তে প্যাডেল টানছে রিকশওয়ালা। ভেতরে বসে চেঁচিয়ে যাচ্ছে একটা লোক। পাশে বসে কাগজ ছড়াচ্ছে আরো একজন। পিছু পিছু কাচ্চাবাচ্চা শিশুবালকদের কাগজ কুড়োবার ছুটোছুটি। সব মিলিয়ে উত্তাল নাদব্রহ্মে স্তব্ধ দুপুরের কূজন নেই, গাছপালায় বাতাসের শিরশির স্তব্ধ। খুব দূরে আরো একবার দেখা গেল পরমেশকে। অনেক দূরের ব্যবধানে মিলিয়ে যাচ্ছেন।

'এবার দেখুন, বোম্বাই শহরের নয়ন-ভোলানো মনমাতানো দৃশ্য। কুড়িতলা পঁচিশতলা বাড়ি, রাজপথে মোটর দুর্ঘটনা, হোটেলে ক্যাবারে নৃত্য। সেসঙ্গে শুনুন, দশটি গান। গেয়েছেন কোকিলকণ্ঠী শোভা বেঙ্গসরকার, সুরের রাজা অনন্ত বর্মন···'

পাশ ঘেঁষে যেতে যেতে দুহাতে কান চেপে ছিল আরতি। রিকশর ছোঁড়াটা কি ভাবল, কর্তব্যকর্মে এক মুঠো কাগজ দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারল ওর গায়ে। রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল। দাঁত-কড়মড় রাগে আরতির বিক্ষোভ— 'স্টুপিড, অসভ্য, ইতর···'

এক ঝাঁক কাকপায়রার মতো বাচ্চাগুলো হুড়মুড় খেল ওর পায়ের কাছে। হরেন আগুন তেড়ে ফুঁড়ে ছুটে যাচ্ছিল রিকশটার পেছনে

বিতোষ বাধা দিলো—'কি করছেন ? যাচ্ছেন কোথায় ?'

'ই কেমনধারা ব্যভার বলুন দিকিন নোকটার। লাজ নেই সরম নেই! দিদিমণির গায়ে কাগজ ছোঁড়ে।'

'থাক থাক, হয়েছে···' কিরণময় এগিয়ে এলেন— 'তুমিও তো কম জ্বালাতে শুরু করলে না হে···'

কিন্তু কথা বলা অসম্ভব তখন।

'বোম্বাই-কা-খেল্। অপূর্ব সুযোগ, অপূর্ব সুযোগ। আসুন দেখুন। শ্রেষ্ঠাংশে

বিশ্বের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী মীনা সুলতানা; তৎসহ দৌলত খান্না প্রেমকুমার মেহেরচাঁদ। নৃত্যে মিস লুসি চোপরা। অন্নপূর্ণা টকিজ-এ নতুন বই—হাম ঔর তুম্। প্রত্যহ দুই ঘটিকায়, চার ঘটিকায়। সাইকেল রাখিবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে…'

পেছনের বাঁকে মিলিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। দিবানিদ্রার ঝিমোনো গ্রামে কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে এবার গান— 'কাঁহে মুঝে তুম জংলি কাহে…'

নির্মল বলল— 'কত্তকালের পুরনো রদ্দি গান বাপ্স্। এখনও জংলির গান আছে নাকি বাজারে?'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরতির উদ্গার— 'ও ম্মাগো,সত্যি, এসব গান আবার শোনে নাকি কেউ আজকাল! কত কত ভালো ভালো গান বেরোচ্ছে রোজ…'

পকেট থেকে বিড়ির কৌটো তুললেন কিরণময়— 'ওহে হরেন, এবার তুমি যাও হে বাপু। কাটো। একটা তো বাজে। নাওয়া খাওয়া নেই তোমার?'

'যাই না গ কাকাবাবু, বড় ভাল ভাল সোন্দব কতা কইচেন আপুনেরা…'

'আবে বাপু, আরো ভালো ভালো, অনেক সুন্দর সুন্দর কথা জানি আমরা। শোনা', পর শোনাব, তুমি এখন যাও…'

সবাই হেসে উঠল। বিমর্ষ হরেন।

প্রতিমা বললেন— 'হ্যাঁ, এত বেলা হলো। ওদিকে তো আবার না-খেয়েদেয়ে বসে থাকবেন আপনাদের ঘরের মেয়েরা…'

বিড়ির মুখে ফুঁ দিলেন কিরণময়। আঙুল টিপে নরম কবতে করতে— 'তুমি না-হয় সন্ধেবেলা একবার এসো ওখানে। দেখা হবে।'

'আসব গ কাকাবাবু?' হরেন সহসা উদ্বেল— 'কেউ কিছু বলবেন নি?'

'বলে তো বলবে আমার কথা। আমি ডেকেছি।'

হরেন আওন খুশি। খুব খুশি। কিরণময়ের পায়ের ধুলো নেয়। নিচু হয়ে প্রতিমার দিকে এগোতেই হৈহৈরৈরৈ বাধা পেয়ে, নব্বুই ডিগ্রি সমকোণে কোমরটা নিখুঁত বাঁকিয়ে, জোড়াহাত কপালে ছুঁয়ে ছুঁয়ে সবাইকে নমস্কার করতে করতে পিছোয়। পিছোতে পিছোতে কয়েক-পা গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর পিঠ ঘুরিয়ে সত্যি সত্যি ঘরের দিকে মুখ।

সবাই তাকিয়ে রইল। দেখল ওর অদ্ভুত চলে-যাওয়া।

গাল দুটো তুবড়ে ছুঁচোল ঠোটে বিড়িটা ধরালেন কিরণময়। যেন তাঁর নব-আবিষ্কার প্রাণীটির এবম্বিধ আচরণ তাঁরই মনে মতো একটা-কিছু।

তেঁতুলতলা। পাকা সড়কের সরলপথে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে নিজেদের

সীমানায় পৌঁছে গেছেন সবাই, হিশেব ছিল না। ডানদিকে উঁচু টিলার মতো উঠে গেছে কাঁচা রাস্তা। দেখা যাচ্ছে স্কুলের মাঠ। খুব কাছাকাছি মাস্টারমশাইদের কোয়ার্টার। চারদিকে চড়চড়ে রোদের ঝালর। এক গ্লাশ জলের তেষ্টা অনেক কষ্টে চেপে ছিল সকলেই। নন্দিতা কবুল করতেই সবাই মুখর হলো এবং খিধে, খিধেয় চোঁ-চোঁ করছে পেট।

ক্যাম্পে গিয়ে এক সঙ্গে খেতে বসে যাবে, এমত পরিকল্পনায়, মেয়েরা আর ঘরে ফিরল না কেউ।

চোরকাঁটায় আচ্ছন্ন মাঠে দুর্বার সবুজ লোপাট। এখনও এখানে ওখানে গত বর্ষার থকথক কাদা। সাবধানে পা ফেলে মাঠ পেরোতে পেরোতে হঠাৎ বিতোষ— 'আপনারা যখন আই. পি. টি. এ করতেন কিরণদা, এরকম হরেন আওনদের পেতেন আপনাদের সঙ্গে?'

'ধ্যাৎ, রাখো তো তোমাদের তত্ত্বকথা…' গোটা শরীরে নড়েচড়ে বৃদ্ধ এবার সত্যি ক্ষিপ্ত— 'চাঁদি ফাটছে মাথার ওপর। এখন আবার শুরু হলো তোমার নতুন কপচানি…'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন কিরণদা। বিতোষদা চুপ। এখন আর কোনো কথা নয়, খাওয়া…' ছোট্ট রুমালে কুলোচ্ছে না। শাড়ির আঁচল টেনে ঘসে ঘসে গাল গলা কপাল মুছছে নন্দিতা— 'অবিশ্যি তার আগে এক গ্লাশ জল…'

লাফঝাঁপের হালকা মেজাজে অঙ্গীকার ভাঙলেন কিরণময় নিজেই— 'ওই, ওই তোমাদের আছে এক দোহাই-পাড়ার বাঙালী ন্যাকামি। আমাদের ছিল। অ্যাই ছিল ত্যাই ছিল, অমুকে ছিল, তেমুকে ছিল। তোমরাও তাই করছ বসে বসে। আই. পি. টি. এ! হ্যাঁ হয়েছিল, করেছিল একটা কিছু। এখন তোমা-দেরও কোনো কাজ নেই কম্মো নেই, হাজার গণ্ডা গপ্‌পো ফেঁদে আরো একটা মিথ্‌ বানাচ্ছো। আরে বাপু, ছিল তো, মরে তো যায়নি সবাই। কোথায় মনীষীরা? এখন কী করছে?'

'উঃ…' ত্রিশ-ছোঁয়া চঞ্চলা যুবতী, নন্দিতা হাসতে হাসতে প্রায় জড়িয়ে ধরেছে বুড়োকে— 'ও কিরণদা, আবার কি আরম্ভ করলেন? খাব না আমরা? খিধে পেয়েছে তো…'

কিরণময়ের হুঁস নেই। বুড়ো হঠাৎ ক্ষেপে গেছেন— 'খাবে খাবে, দাঁড়াও। ওই যে মাঠটা দেখছ, ধরো, এত বড়ো একটা মাঠের তুমিই মালিক। তুমি চাষ করলে না, ঘামরক্ত দিয়ে ধানও ফলালে না, ফুলও ফোটালে না। মাটি কি আর

নিষ্কর্মা পড়ে থাকবে ? সে তার ধর্ম পালন করবে ঠিকই। মাঠ ভরে আগাছা জন্মাবে। তখন কপাল চাপড়ে কি লাভ বলো ? তুমিই তো তোমার কাজটা করলে না ঠিকমতো।'

হেসে, স্বভাবের স্নিগ্ধতায় পাশে এসে দাঁড়ালেন প্রতিমা— 'আপনি এবার একটু থামুন কিরণদা। শুনেছি প্রেসার আছে আপনার, সুগারও আছে। চলুন তো, চলুন আমার সঙ্গে…'

"হ্যাঁ, চলো…' এগোলেন কিরণময়।

নির্মল কখন গিয়ে ঢুকে পড়েছে স্কুলবাড়ির ভেতর। পিছু পিছু আরতি।

ভেতর-বাড়িতে তখন বিয়ে বাড়ির উৎসব। একটা ব্যাচ খেতে বসে গেছে। সোর-গোলের মধ্যে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নির্মলকে কি বলছিলেন প্রভাকশন-কনট্রোলার সুকুমার বসাক, সহাস্যে এগিয়ে এলেন— 'কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা ? ভাগ্যিস, পরমদা এসে পড়েছেন। আমি তো গাড়ি পাঠাচ্ছিলাম আপনাদেব খুঁজতে। একটা বেজে গেছে।'

সারি বেঁধে হাপুস হুপুস গেলা। বালতি নিয়ে ছুটোছুটিতে হন্যে হচ্ছে পরিবেশনের লোকগুলো। পংক্তি ভোজের জটলায় হঠাৎ চিৎকার ওপাশ থেকে— 'আসুন কিরণদা, ধ্রুববাবু চলে আসুন। জায়গা আছে। আজ দারুণ জমে গেছে…'

"থ্রি চিয়ার্স ফর সুকুমারদা। সুকুমারদা যুগ যুগ জিও…' গাল ভরে ভাত গুঁজে ওদিকে লাফিয়ে উঠেছে উদয় চৌধুরী। কমার্শিয়াল থিয়েটারের অভিনেতা, আর্ট-ফিল্মে কদর পেয়ে কাল থেকে বেজায় খুশি— 'ফ্রায়েড রাইস আর ফাউল কারি কিরণদা। রান্না মার্ভেলাস…'

"যাও গো, আকালের দুঃখী মেয়ে, খেয়ে নাও…' নন্দিতার দিকে কৌতুকে তাকালেন কিরণময়—'সাবিত্রী হবার আগে নিজের পোশাকে পেট ভরে খেয়ে-দেয়ে নাও। ফ্রায়েড রাইস আর মুর্গির ঠ্যাং। স্যালাডের শসা পেঁয়াজে লেবুটা নিংড়ে নিয়ো একটু। বড্ডো টেস্টফুল…'

চার হাজার বছরের মানব সভ্যতায় বোধ হয় এই প্রথম মোহনপুর গাঁয়ের গাছ-পালা ডোবাপুকুর মাঠ উঠোন ছেড়ে শালিক চড়ুই কাক পায়রা সব পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পালাল একসঙ্গে দল বেঁধে এবং ঘরগেরস্তালির কাজ ফেলে বাচ্চা-

বুড়ো মাগীমদ্দা হরেক মানুষ দলে দলে, ছুটতে ছুটতে এসে হামলে পড়েছে মোহন-পুরের মাঝের-পাড়ায়। গাঁয়ের একমাত্র পাকা সড়কটা যায়নি সেখানে। চওড়া মেটে রাস্তার ধার ঘেঁষে দেবেন সাধুখাঁর মুদির দোকান। তারই পাশে ছোট্ট একটা খুপরিতে বিশু সাঁতরা দোকান খুলেছে চা বিস্কুট তেলেভাজার। ভেতরে বাইরে বাঁশের বাতায় বসে চা-তেলেভাজার সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প করে গাঁয়ের মানুষ। সিনেমার বাবুরা সেখানেই নেমে পড়লেন প্রথম।

দোকান দুটো নাকি ঘণ্টা দেড়েকের জন্যে ইজারা নিয়েছেন বাবুরা। টাকা দেবেন।

বিশাল দৈত্যের মতো গর্জে উঠেছে জেনারেটরটা। একটানা গর্জে যাচ্ছে। গাইবলদবাছুর গোয়ালে ফেরেনি এখনও। ধারেকাছে যে-কটা ছিল, লেজ তুলে পেছনের পাদুটো দাবড়ে গোজ উপড়োতে চাইছে প্রাণের টানে। ভয়ে। চড়-চাপড় মেরে শান্ত করতে প্রাণান্ত তার মালিক। গলকম্বলে আদর বুলোতে বুলোতে শাপান্তি গাইছে নচ্ছার ব্যাটাচ্ছেলে বায়োস্কোপ কোম্পানিকে। মড়া-খেকো নতুন উৎপাত।

হাজার মানুষের ঠেলাঠেলি কোলাহলে সে শাপান্তি শুনছে না কেউ। ভিড় সামলাতে চারটে পুলিশ পাঠিয়েছেন থানার বড়োবাবু। ওরাও নাজেহাল।

বুড়ো চন্দ্রধর হাটের পথে যাবে।

হাঁটুরও ইঞ্চি ছয়েক ওপরে নেংটির মতো মালকোচামারা একটা ধুতি জড়িয়েছেন কিরণময়। উদোল কাঁধে তেল চিটচিটে গামছা। মোটামুটি ফর্সা গায়ে কালি-ঝুলি মাখতে দেন নি পরমেশ। চোখে কপালে সামান্য একটু রং বুলিয়েছেন মেক-আপের শিবনাথ বিশ্বাস। পুরনো একটা ভাঙা ছাতা মাথায় থাকবে— চিত্রনাট্যের এমত নির্দেশ, কি ভেবে, পরমেশ নিজেই বদলে নিলেন। সাঁয়ত্রিশ বছর আগে বামুনপাড়া-কায়েতপাড়া ডিঙিয়ে ছাতা মাথায় হাটে যাবে চাষি! আনরিয়েল।

বর্ষার কাদায় গরুর-গাড়ি গড়িয়েছে দুবেলা। সমান্তরাল রেখায় রাস্তার ধার ঘেঁষে ভারি চাকার গর্ত এখন গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলোয় ভরাট। ওদিকের ঝোপজঙ্গল ছুঁয়ে হাঁটবে চন্দ্রধর।

এপাশে রাস্তার মধ্যবর্তী শক্ত মাটি আর ঘাস-দূর্বার প্রান্তরেখায় প্ল্যাঙ্ক সাজানো হয়েছে অনেক দূর। ক্যামেরার ট্রলি এগোবে দেবেন সাধুখাঁর দোকান অবদি। পরের দৃশ্য বিশু সাঁতরার চায়ের দোকানের সামনে বাতায় বসে কথা বলবেন

বাবুরা, যুদ্ধের তাড়া খেয়ে কলকাতা থেকে গাঁয়ে ফিরেছেন যাঁরা। গেঁয়ো মানুষ-জন ঘিরে ফেলেছে তাঁদের। চন্দ্রধর এসে থমকে দাঁড়াবে।

বিশু সাঁতরার চায়ের দোকানের ঝাঁপ বন্ধই থাকবে। গ্রামদেশে গেরস্ত ঘরেও নাকি চায়ের চল ছিল না সে সময়। চায়ের দোকান অবাস্তব।

প্ল্যাঙ্ক ট্রলি ক্যামেরা সোলার রিফ্লেকটার-স্ট্যাণ্ড সবই প্রস্তুত। কিন্তু কাজ শুরু করা যাচ্ছে না কিছুতেই। দর্শকজনতার উচ্চকিত কোলাহল এমন এক স্তরে, ভিড়ের চাপে ভিড় নিজেই হল্লা বাড়াচ্ছে। উত্তরে দক্ষিণে দড়ি টেনে কর্ডন দিয়েছে পুলিশ। দড়ি টপকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না কাউকে। অথচ দূর থেকে পেছনের মানুষ দেখতে পাচ্ছে না কিছুই। তারা এগিয়ে আসতে চায়। দুপাশের কাঁচা মেটে-ঘরের ভিড়ে কিছু দূরে যে-দুটো একতলা পুরনো পাকাবাড়ি, তার ছাদে গিজগিজ করছে মানুষ। সবচেয়ে বিপদজনক, গাছে উঠেছে ছেলে-ছোকরারা।

বিরক্তি আর ক্রোধে অশান্ত পরমেশ ছুটোছুটি করছেন। দু-দুবার ক্যামেরায় বসেও উঠে এসেছে নির্মল। নিজের পজিশন থেকে ফিরে এসে কিরণময় বসে পড়েছেন শুকনো ঘাসে। চার-চারজন পুলিশের সঙ্গে ছোটবড়ো অ্যাসিস্ট্যান্টরা প্রাণান্ত সকলেই।

এবং এজন্যেই নন্দিতাকে দিয়ে প্রথম শট-এর বাসনা সত্ত্বেও পরমেশ অনেক ভেবে মেয়েদের সঙ্গে আনেন নি। চন্দ্রধর বা কিরণময়কে দিয়েই কাজের শুরু। তিনি নিজেও চারপাশটাকে একটু বুঝে নিতে চান।

আপাতত সবচেয়ে বেশি ঝামেলা পাকিয়েছে ওই লিচুগাছটা।

কোনোরকম পরিকল্পনা ছিল না। স্পটে এসে মজাটা চোখে পড়ল। যে গেরস্তবাড়িগুলোর গা ঘেঁষে হাঁটবে চন্দ্রধর, তাদেরই একটি বাড়ির উঠোনে ঝিঙে শসার মাচার ওপর ফালাফালা শতচ্ছিন্ন নোংরা জামা গলিয়ে অঙ্কের যোগচিহ্ন গোছের আড়াআড়ি দুটো কঞ্চি, যার ডগায় ভুষোকালি মাখা হাঁড়ির ওপর নাক-মুখচোখের বীভৎস কাকতাড়ুয়া। চন্দ্রধর যখন হেঁটে যাবে, খুব স্বাভাবিকভাবেই ভয়ঙ্কর আর ভূতুরে ভেংচিটা খেলে যাবে ক্যামেরায়। কিন্তু মুশকিল, মাচার পেছনে বড়ো একটা লিচু গাছের ডালে ডালে কিছু বাঁদর-ছোঁড়া বসে আছে তখন থেকে। নামছে না কিছুতেই।

ওদের নামাতে ইউনিটের ছেলেদের সঙ্গে গ্রামের কিছু নব্যযুবক, যারা সবরকম সাহায্যের জন্য পরমেশের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সকলেই গলদঘর্ম। তৎসহ পুলিশ।

হাতের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে পরমেশ দ্রুত ছুটলেন। লাঠি উঁচিয়ে চেঁচাচ্ছিল দুজন পুলিশ। বাধা দিলেন—'আপনারা যান, আপনাদের ভয়েই এগোচ্ছে না ওরা। আমাদের মতো আপনারাও তো খুব বেশি আসেন না এদের কাছে। যখন আসেন, লাঠি দেখান…'

চারদিকে হঠাৎ হল্লোড়।

মস্ত একটা মই কাঁধে বয়ে, ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়ছে একটা লোক। বয়স্ক লোকটাকে চেনা-চেনা মনে হলো। কোথায় দেখেছেন যেন!

দ্রুত উঠে এলেন কিরণময়—'হরেন তুমি? তুমি কোত্থেকে?'

'বজ্জাত ছোঁড়াগুলো বড্ড জ্বালাচে গ আপুনেদেরকে। মুখ্যুরা ইয়ার মম্ম বুঝবে কী গ! ধর্যো ধর্যো চাবকাত্তি হয় উগুলানদেরকে…'

আশেপাশের উৎসাহী যুবকেরা—'ই বড় ভাল বুদ্ধি করেচ গ হরেনদা। চল, চল ত দেখি।'

গাছটা উঠেছে গেরস্তবাড়ির ভেতর থেকে। মই নিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকল।

বিচলিত পরমেশ তাকালেন ডানদিকে—'বিপদটা কিন্তু আরো বাড়ছে কিরণদা…'

'কেন, কী হলো আবার?'

'ওভাবে তাড়া করলে তাড়াহুড়োয় যদি দ্রুমদ্রাম পড়ে যায় ছেলেগুলো। হাড়-গোড় ভাঙলে সে আরেক ঝামেলা…'

'ধ্যেৎ, কিচ্ছু হবে না…' কিরণময় উদাসীন—'গাঁয়ের ছেলে। এরকম কত হরবকৎ গাছে উঠছে। পড়েও যাচ্ছে। কিচ্ছু হয় না…'

জনতার উল্লাস হঠাৎ তুঙ্গে। সিনেমার মজা ছেড়ে এখন সার্কাস, সার্কাসের খেল্।

পরমেশ কিরণময় এবং ভিড়ের তাবৎ মানুষ স্তম্ভিত বিস্ময়ে। শসার-মাচা কাকতাড়ুয়া সব ছাপিয়ে চল্লিশ-পেরোনো-বয়সের কাণ্ডজ্ঞানহীন একটা উদ্ভট লোক গাছে উঠছে। অনেকটা ভালুকের মতো।

'কি কিরণদা, কি চেলা জুটিয়েছেন? লোকটা পাগল নাকি?'

'হ্যাঁ, তোমার জন্যে ও শহিদ হবে বলেছে।'

গাছের ছেলেগুলো এবার সত্যি-সত্যি নেমে আসছে। যেন মগজ থেকে শীতল রক্তধারা। কাঁধের তোয়ালেয় ঘন ঘন ঘাম মুছছেন পরমেশ এবং বিস্ময়, গাছটা পরিষ্কার হয়ে যেতেই ইউনিটের ছেলেদের সঙ্গে মিশে গ্রামের যুবকরা

কর্ডনের দড়িটা আরো শক্ত করতে ছুটেছে। জনতার উদ্দাম সোরগোলকে শান্ত করতে বেগার খেটে প্রাণপাত করে যাচ্ছে যারা, সেখানেও সেই লোকটা —হরেন আগুন।

কব্জির ঘড়ি থেকে ভ্রূ কুঁচকে আকাশের দিকে তাকালেন পরমেশ। বেলা গড়িয়ে নামছে দ্রুত। আলোটা খুব বেশি কমে গেলে আরেক বিপদ। সিকোয়েন্সটা আসলে সকালের। সকালের দিকে হাটে যাচ্ছে চন্দ্রধর।

স্বস্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন কিরণময়। নির্মল আবার ক্যামেরায়। গলায়-ঝোলানো লাইট-মিটারটা তুলে, আলোটা মেপে নিয়ে সহকারী ক্যামেরাম্যান লোকনাথ ট্রলিতে নির্মলের পাশে। নির্দেশমতো সোলারগুলো জ্বলল নিভল নড়ল। বাউন্সবোর্ড বাঁকল, স্থির হলো। রিফ্লেকটর-স্ট্যাণ্ডগুলো যথাবিহিত স্থানে, যেমন আদেশ।

ক্যামেরায় চোখ রেখে একবার পরখ করলেন পরমেশ। উঠে দাঁড়ালেন—'অল রাইট, রেডি, ক্যামেরা…'

সিন 9 শর্ট 2 টেক্ 1 সায়লেণ্ট ডে 8 9 80

টেক ওয়ান। ক্যামেরার নাকের ডগায় ক্ল্যাপস্টিক উঁচিয়ে খটাং শব্দে সুভদ্র সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ—'অ্যাকশন…'

এগোচ্ছে চন্দ্রধর। ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে খুশি খুশি, শিথিল চরণ। পূর্ববর্তী দৃশ্যেই থাকছে—বড়ো আদর করে এক থালা পান্তা খাইয়েছে পোয়াতী ছেলে-বৌ। লেবুপাতার সঙ্গে এক দলা নুন আর গোটা চারেক কাঁচা লঙ্কা। ভরাট পেটের সুখে আট গণ্ডা পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে হাটে যাচ্ছে বুড়ো। আট গণ্ডা পয়সার জোর সে জানে। জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই বাড়ছে যদিও, তার নিশ্চিত বিশ্বাস, চাষির ঘরের সুখ কিনতে এই আট গণ্ডার জোর এখনও অনেক, অনেক বেশি। যেতে যেতে মাধব কুমারের দোকানে পৌঁছে ধাক্কাটা খাবে। বাবুদের ভয়ের চোখে যুদ্ধ দেখবে, মহাযুদ্ধ। পৃথিবীতে নাকি যুদ্ধ লেগেছে কোথায়! সৈন্য-সামন্ত বা রাজার-লোক হও বা না-ই হও, সেই যুদ্ধে বেবাক মানুষ মরে।

যেহেতু নীরব দৃশ্য, দুটো হাত আর এক জোড়া চোখ খেলিয়েই বলতে হবে কথাগুলো। অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটলেন পরমেশ। তিন বিঘে জমির আজীবন নিরাপত্তা আর আট গণ্ডা পয়সার তাৎক্ষণিক অহঙ্কার—মূর্খভাবনার আত্মপ্রসাদে মুখেচোখে উজ্জ্বল বিভা। একেই নিরক্ষরতা বলে। ঘাড়পিঠ সোজা রেখে

কাঁধের গামছাটা টেনে উদোল বুকে বুলোনো, হাঁটতে হাঁটতেই অপ্রয়োজনে কাঁধঘাড় মুছে আবার কাঁধে ফেলে রাখা…

'কাট্…'

সব থেমে গেল।

লাফিয়ে এলেন পরমেশ—'রিমার্কব্লি গুড। আপনাকে আর কি বলব কিরণদা!' কিন্তু একটা বিড়ি থাকলে হতো না হাতে?'

'বিড়ি?' কিরণময় হাসলেন—'বিড়ি ধরিয়ে হাটে যাবে গাঁয়ের চাষি? উনিশ' শ তেতাল্লিশে? একটু ভেবে দেখ…'

'কেন?'

'বরং হুকোকল্কে ধরিয়ে দিতে পারো। যেটা এখন অবসোলেট…' গামছা ঘসে' এবার সত্যি সত্যি মুখ মুছলেন কিরণময়—'বিড়ি তো পরে এল। পাকা রাস্তা হাইওয়ে বানাবার পর বাস ছুটল, দূরে যেতে শিখল চাষি। শহরের বাজার বাড়ল গ্রামের দিকে…'

ডানহাতের থাবায় থুতনিটা চেপে ধরলেন পরমেশ। ললাটে কুঞ্চন—'বলছেন!'

'আমি বলব কী! ভাবনাটা তো তোমার…'

'অলরাইট…' কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্বস্থানে ফিরে গেলেন নির্দেশক—'ঠিক আছে। রিটেক…'

একইভাবে আবার তৈরি হলো সবাই। ক্ল্যাপস্টিকের শব্দ তুলে সরে গেল সুভদ্র। টেক্ টু।

চন্দ্রধর হেঁটে গেল। আরো উদ্দীপিত কিরণময়।

'কাট্…' পরমেশ ভরপুর প্রসন্নতায়—'ওক্কে, স্প্লেনডিড কিরণদা, ইউনিক…'

নতুন দৃশ্যের আয়োজন। দেবেন সাধুখাঁর দোকানটাই এখন মাধব কুমারের দোকান হয়ে উঠবে। দোকানটা যেমন আছে তেমনিই থাকবে, শুধু দাঁড়ি-পাল্লার সামনে কাঠের পিঁড়িতে গিয়ে বসবেন একজন। এজন্য অভিনেতার দরকার হয় না, ইউনিটের বুড়ো তারক পণ্ডিতকেই বসিয়ে দেওয়া হবে। যারা শহরের বাবু, বোমার ভয়ে গাঁয়ে এসে যুদ্ধের গপ্পো করছেন, তারা 'একস্ট্রা'-গোছের খুচরো অভিনেতা। মাত্র দেড় দিনের জন্য এসেছেন ক্যাম্পে এবং

যারা গ্রামবাসী, বাবুদের মুখে যুদ্ধের গপ্পো শুনবে, তারা যথার্থই গ্রামবাসী। চারদিকের বিপুল জনতা থেকে তাদের বেছে বেছে খুঁজে বের করতে শুরু করেছে অ্যাসিস্ট্যান্টরা—লম্বা বেঁটে ফর্সা কালো রোগা মোটা হরেক মানুষ।

রেলট্রলি সোলার রিফ্লেকটর নতুন করে সাজানো চলেছে। কর্মব্যস্ততার হট্টমেলায় পরমেশ এপাশ ওপাশ খুঁজলেন কাউকে। খুঁজে পেলেন।

একপাশে কিচিরমিচির বাচ্চাদের সামলাচ্ছিল হরেন। হাতে শুকনো বাঁকানো আম-ডাল—'এগুবিনি, চোপ্‌চোপ্‌…খপদ্দার, এগুবি ত ঠ্যাং খোঁড়া কর্‌ব্যে দেব…'

পরমেশ একজনকে বললেন—'ডাকো ত ওকে…'

খোদ ডেরকটরবাবুর ডাক। হরেন হুড়মুড় ছুটে এল।

'আপনি ত আর্টিস্ট একজন। সিনেমায় নামবেন না ?'

অবিশ্বাস্য স্বপ্নের চমক। ডগমগ খুশিতে কি করবে ভেবে না পেয়ে তাকাল কাকাবাবুর দিকে। এককোণে উদোল বুকে গামছা ঘসছেন কিরণময়। হাতে বিড়ি।

'জামাগেঞ্জি খুলুন। ধুতিটা তুলে নিন আরো। যেখানে দাঁড়াতে বলব দাঁড়াবেন…' মৃদু হেসে পরমেশ কিরণময়ের দিকে—'দাঁড় করিয়ে দেব আপনার পাশে। বেচারিই বা বাদ যায় কেন ?'

ডেরকটরবাবু নিজে ডেকে বলছেন। ব্যাকুল ব্যস্ততায় বুকের বোতাম খুলে কলারটা টেনে, মুণ্ডুটা ঢেকে দিতেই জোড়াতালিমারা জামার কোথায় একটা ছেঁড়ার শব্দ হলো। হুঁস নেই। জামার তলায় গেঞ্জিটা কুচ্ছিত কালো আর ছেঁড়াফাটা। দুই বগলের তলায় খাবলা দিয়ে অনেকটাই নেই। জামাগেঞ্জি খোলাখুলির পর উদোল গায়ে হরেন অকস্মাৎ বিষাদে মলিন—আজ ক্ষৌরি হয়নি কদিন। পরনের কাপড়টার দিকে তাকিয়েও বড্ডো আপশোস। ঘর-কাচা বাহারের একটা ধুতি ছিল তার। যদি জানত…

'নিন, ধুতিটা আরো তুলে নিন। পায়ের চটিটা রেখে দিন। আপনার কাকা-বাবুর মতো।'

কথাগুলো বলেই পরমেশ তাঁর কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন এবং মান্যিগণ্যি একজন আর্টিস্ট হয়ে ওঠার পর, চারদিকের কলগুঞ্জনে শুধু-হাতে দাঁড়িয়ে থাকার অস্বস্তিতে বিব্রত হরেন। কখন কোথায় কিভাবে গিয়ে দাঁড়াতে হবে বলে গেলেন না ডেরক্টরবাবু। জীবনের অসীম কৃতজ্ঞতায় গুটি গুটি কাকাবাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কোন্ এক সিনেমাবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন কাকাবাবু। একবার তাকালেন মাত্র। কথা বলতে লাগলেন।

'কী গ হরেনদা। জ্যামা খুলে দাঁড়িয়ে আছো কেনে? কী করবে তুমি?' পাশে এসে বলল রাখাল মুখুজ্জের কলেজে-পাশ-দেওয়া ছেলে বসন্ত।

'হু...' ফোঁস করে উঠল ইশকুল পাড়ার সত্য দালালের ব্যাটা মিহির—'হুলে-বাগদীবামুনকায়েত আর কজনাকে ত বাছাই করেচেন দেখলাম। সব্বায় দাঁইড়ে আচে ওখেনে। পেটমোটা ডাবাকচিকেও ত দেখলম গ...'

হরেন ক্ষেপে গেল। তার ইজ্জৎ আছে। চেঁচিয়ে বলল—'ডাবাকচি বাউরি আর আমি এক হলাম র‍্যা মি'র। অ্যাঁ...

'নয় কেনে?'

'উদের ঝ্যাড়াইবাছাই করেচেন লায়েবগুমস্তারা। আর ডেরক্টরবাবু নিজে থিক্যে ডেইক্যে আমায় বল্লেন...'

হরেন আগুনকে নিয়ে হাসিমশ্‌করাটা বাড়ছিল। হঠাৎ ডাক পড়ল। মিথ্যে নয়, দেখল সবাই—বুড়ো 'আর্টিস' কিরণময় কাঁধে হাত রেখে বড়ো সোহাগ করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন তাকে—'চলো হে হরেন, চলো। কাজ শুরু হবে।'

দৃশ্যগ্রহণের আয়োজন শেষ। সিক্‌স্-বালভ্-মিনিব্রুট আলো রিফ্লেকটর সব স্থির। ট্রলিতে ক্যামেরা চলবে না এখানে। তিনপায়ার ওপর স্থবির। অদূরে যন্ত্রপাতি সব একটা টুলের ওপর রেখে ছোট মোড়ায় বসেছেন সাউণ্ড রেকর্ডার সিতাংশু আচার্য। আসিস্ট্যাণ্টদের ছুটোছুটি ফুরোয়নি তখনও।

জনতা এবার খুব দূরে নয়, নিবিড়ভাবে ঘিরে আছে দৃশ্যের আঙিনা। ছবি-তোলার ছবি। এত কাঠখড় পোড়ানি এর জন্যে? এত মেহনত!

কম্পোজিশনে লোকজনদের সাজালেন পরমেশ। তারক পণ্ডিত গিয়ে বসলেন মুদির দোকানে পিঁড়িতে, বাবুরা বাইরে বাঁশের বাতায়। গ্রামবাসীদের ভিড়ে হরেনকে রাখলেন ক্যামেরার মুখোমুখি। চন্দ্রধর ফ্রেমে ঢুকে পড়ার পর তার পাশে এসে দাঁড়াবে।

'কেউ কথা বলবেন না আপনারা। হাসবেন না একদম। কথাবার্তা যা বলার সব এঁরাই বলবেন...' বাঁশের বাতায় বসে-থাকা বাবুদের দেখালেন পরমেশ। গ্রামবাসীদের প্রতি—'আপনারা শুধু যে যেভাবে পারেন অবাক হয়ে গিলবেন কথাগুলো। সব কথাতেই ভীষণ ভীষণ ভয় পাচ্ছেন। দুর্দিন এলে, জিনিসপত্রের

দাম বাড়লে কী করেন? ভয় পান না? আঁৎকে ওঠেন না চড়া দর শুনলে? সেই ভয়…'

সবাই হা হয়ে শোনে। মজা। বেশ মজার ব্যাপার তো! ম্যাজিকের যাদুকর যেভাবে কথা বলেন, বলছেন ডেরক্টরবাবু।

'খদ্দেরকে জিনিস দিতে দিতে দোকান থেকে যখন ইনি বলবেন…' মুদির ভূমিকায় তারক পণ্ডিতের দিকে তাকালেন পরমেশ—'দরদামের কথা আর জিজ্ঞেস করো না গো, বাপঠাকুদ্দার দোকানটাও কি আর রাখতে পারব? কারবার লাটে তুলে তো আমাকেও পালাতে হবে। জিনিসপত্রের দাম যা বাড়ছে দিনকে-দিন…'

সবাই শুনছে। পরমেশ দোকানের ঝাঁপতলা থেকে বাঁশের বাতায় বসে-থাকা এক ভদ্রলোকের কাঁধে হাত রাখলেন— 'তারপর ইনি যা বলবেন, তাতেই চমকে উঠবেন আপনারা। আঁৎকে উঠবেন একসঙ্গে। ইনি বলবেন—জিনিসপত্তরের দামের কথা আর কি বলছ গো মাধব। দুবেলা দুটো যে পেটে গুঁজবে গাঁয়ের মানুষ তারও কি জো আছে? যারা মাঠে মাঠে জলে ভিজে রোদে পুড়ে ধান ফলায় তারাই মরবে না-খেয়ে…'

'ঠিক ঠিক, উচিত-কতাটি নেয্য-কতাটি বলেচেন গ ডেরকটরবাবু, একেবারে লাখ কতার এক কতা…' উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল আনাড়ি কাটা-সৈনিকেরা।

বিরক্ত পরমেশ। ক্ষেপে গেলেন—আঃ, কি হচ্ছে এসব। ঠিক কথা বলেছি! হ্যাঁ, ঠিক কথা বলতেই আমরা এসেছি। চিৎকার করবেন না। যা বলছি শুনুন…'

এক ধমকেই মানুষগুলো বাতাস-থেমে-যাওয়া বাঁশঝাড়ের মতো। ঝিম।

'এরপর ইনি বলবেন…' আরেকজন অভিনেতাকে নির্দেশ করে পরমেশ— 'হ্যাঁ, বড় দুর্দিন এল গো, বড় দুঃসময়। এঁরা এঁদের মতো করেই বলবেন কথা-গুলো। আপনারা চোখ গোল-গোল করে শুনবেন আর চমকে চমকে উঠবেন। উনি বলবেন—হাটবাজার থেকে চাল উধাও হে, শহরের দোকানে চাল নেই, গাঁয়ের গেরস্ত মহাজনরা আরো দর চড়বে বলে মরাই আগলে বসে আছে। ফাগুন গিয়ে চৈত্তির পড়ল সবে, চালের দর জানো? বারো টাকা, বারো টাকা মণ যাচ্ছে শহরে…'

'সি কি কতা গ! কী বলচেন গ বাবু?'

পরমেশ ক্ষিপ্ত। ক্ষিপ্ত ক্রোধে ফেটে পড়ার মতো।

দলবদ্ধ হাগুরোল। বাছাই-এর কাটা-সৈন্য কাশী হালদার বলল— 'বারো ট্যাকা বস্তা ধান। ই সব কতা, ই সব গপ্‌পোগাছা থাকবে নিকি গ আপনেদের বই-এ ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ থাকবে। তাই থাকবে। যা বলছি শুনুন...' মালিক মহাজনের দাপটে পরমেশের হাঁক।

লোকগুলো কিছুটা বশ মানে। জয় বাগদী বলে— 'এমনধারা রামরাজত্বি ফের কবে আসবে গ বাবু...'

'রামরাজত্বি! বলছেন কী? কী বলছেন আপনারা ?'

'বারো ট্যাকা মণ চালের দর ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ এই বারো টাকাতেই আকাল এসেছিল দেশে...'

'সি আকাল ফি বছর কেনে আসে না গ বাবু? মাগ্‌বাচ্ছা নে' এট্টু পেটটি ভরো্যে খাই...'

ঝিমিয়ে এলেন পরমেশ। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে হাল ছেড়ে দেবার মতোই অবস্থা। ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট দীপক বসু, ক্যামেরাম্যান নির্মল, সাউণ্ড রেকর্ডার সিতাংশু এগিয়ে এল। হাল ধরলেন কিরণময়। বোঝাবার কিছু নেই। তেমন কোনো গোলমেলেও নয় বিষয়টা। রসরসিকতা হাসাহাসির শেষে আস্তে আস্তে সকলেই শান্ত হয়ে এলে কাজ শুরু করার মতো আবহাওয়া যখন

সিন 9 শট 3 টেক 1 জি. টি ডে 8 9 80

একবার নয়, তিনবার রিটেক হলো। উন্মত্ত ক্রোধে ক্ষোভে বিক্ষোভে মনে মনে কপাল চাপড়ালেন পরমেশ। কিছুতেই গোছাতে পারলেন না। সেই অমার্জিত গ্রাম্য বিহ্বলতা কোথায় হারিয়ে গেছে। চমকায় না, আঁৎকায় না, কাঁপে না। চাপা হাসিটা চাপতে গিয়ে আরো কুৎসিত। শেষপর্যন্ত তাঁর হুঙ্কার— 'প্যাক আপ...'

আজ আর হবে না। কদিন পরে আবার তুলবেন দৃশ্যটা। নতুন একদল লোক নিয়ে। এরা সবাই বাতিল।

ভয় পেল হরেন আওন— 'আম্মিও বাদ নিকি গ কাকাবাবু? আমি ত অঁক তুল্যোছেলম যেমনধারা বল্লেন উনি...'

সমস্ত ঘটনার প্রহসনে বেদনায় কিরণময়ও নির্বাক তখন। পিঠে হাত রেখে চাপড় দিলেন বারদুয়েক। হয়তো আশ্বাস। একটু সান্ত্বনা।

মর্মাহত হরেন আওন কিছুতেই সইতে পারছে না চোটটা— 'উ হারামি আক-জলটার জন্যিই না এমনটা হল গ কাকাবাবু। দশজনাকে ধইর‍্যে দেল কত্তাটা…' হাজিগাঁ-এর আকজল শেখই গলা চড়িয়ে বেশ জোরে জোরে বলেছিল কথাটা— 'বার ট্যাকা মণ চালের আকাল এনেচেন গ বাবুরা। এখন একশ দশ ট্যাকা দর ধানের বস্তা যাচ্চে বাজারে। শুধোও না কেনে, ইয়ারে কি আকাল বলবেন ওনারা…'

বারো ট্যাকা বস্তা ধানের আকাল—যাত্রাপালা ভেঙে যাবার পর যেমন হয়, ছত্র ভঙ্গ জনতার কোলাহলে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই বোঝা গেল, মুখে মুখে চারিয়ে গেছে কথাটা। সে এক আজব তামাশা। আচ্ছা রগড়।

হরা পাগলা, মোহনপুর গ্রামের পঙ্কজ মল্লিক বোঝাতে পারে না—পালাগান অত ক্যাল্‌না জিনিস নয়। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে একজন 'আর্টিস' হতে হয়। পালাগানের প্রতি এই তীব্র আকুতিতেই নাকি বছর পনের বয়সে দেশগাঁ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল হরেন, ওরফে হরেন্দ্রচন্দ্র আওন। পাঁচ-পাঁচটা বছর চিৎপুর পাড়ায় ঘুরে ঘুরে যখন কিছুই হলো না বা কিছুই হবার নয়—এক কুড়ি বয়সে দেশে ফিরে তাতে বসল নতুন করে। বাপ মরে যাবার পর মা বিয়ে দিলেন। হরেন তাঁতি দুই মেয়ে নিয়ে বর্তমানে সংসারকর্মেও নাজেহাল। আলাদা আলাদা উনুনে ভাই দাদারা সবাই ভিন্নঘর। মহাজন ভজনায়ও অক্ষম।

বাউণ্ডুলে নিষ্কর্মা হরেন্দ্রচন্দ্র ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের মতোই একজন। তফাৎ শুধু—তার মগজে আদিদেব ব্রহ্মার বাস। পরের বোঝা বঃ নর চেয়ে নিজের বোঝা বয়ে বেড়ানো অনেক দুর্বহ কাজ। পালার নেশা যায় না মগজ থেকে। লোকে ভাবে—পাগলা…

স্কুলবাড়ির দোতলায়, বিস্তীর্ণ বারান্দার দুই প্রান্তে এক শ পাওয়ারের দুটো আলো জ্বলছিল। তিনটে চেয়ার আর গোটাকয়েক মোড়া, তদুপরি স্কুলের দুটো লো-বেঞ্চি এধারের প্রায়ান্ধকারে, ডিরেক্টরের ঘরের দরজায়। আর্টিস্টদের দুচার-জনকে নিয়ে ছোট্ট আসরে হরেনের আত্মজীবনী শুনছিলেন পরমেশ। রাত তখন আটটার কিছু বেশি।

বাইরে থকথক কালোয় নিঝুম গ্রাম। আলোয় আলোয় ভরাট স্কুলবাড়িটা অদ্ভুত চুপচাপ। রান্নাবান্না চলছে ভেতরের দিকে। এদিকের একতলায়,

সারাদিনের কাজকর্মের পর তাসটাস খেলছে লাইটের লোকজন অথবা ইউনিটের অধস্তন যারা। ওদেরই টুকটাক দুচারটে কথা মাঝে মাঝে। বিপুল নৈঃশব্দ্যে মালগাড়ি গড়িয়ে যাচ্ছে দূরের রেললাইনে। ঝিঁঝিঁর রাত্রির আবহ।

'তুমি যাত্রার অভিনেতা…' আড়মোড়া ভেঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন পরমেশ—'তাহলে তো শুধু পালাগানের অভিনয় নয়, গানও জানো নিশ্চয়ই…'

'আজ্ঞে…' হরেন লজ্জায় বিনত—'ই এট্টু-আধটু। গেঁয়ো নোকের হয় যেমন-ধারা…'

দুর্দম হাসিতে, অবরুদ্ধ বাষ্পের মতোই ভেতরে ভেতরে কাঁপছে সবাই। আরতি তো উঠেই গেল অন্ধকারের দিকে। আঁচলে মুখ চেপে।

পরমেশও হাসলেন—'এবার কিন্তু তোমাকে তুমিই ডাকলাম হরেন…'

'তাই ত ডাকবেন গ ডেরক্টরবাবু। কত মান্নিজন আপুনেরা। ই কি পালার দলে হৃদয়কুমার না মদনগোপাল! উদেরকে আমি জানি। কত্তো কাছে থিক্যে দেখেচি। ওনারা গুণীনোক, ভাল ভাল পাট বলেন। কিন্তু আপুনেদের মতন নয়। খপরের কাগজে নিত্যি ফোটো দেয় আপুনেদের, কত্তো সুখ্যাত হয় ··'

অপ্রতিরোধ্য হাসিটা শেষপর্যন্ত হেসেই ফেলল সবাই।

'বোঝো কাণ্ডটা…' ওদিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন কিরণময়। পায়জামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবিতে ঘরোয়া। এলোমেলো বাবরি গোছের চুল—'কি হে হরেন, হরিসভা বটতলা ছেড়ে একেবারে আর্ট- ফিলমের মাতব্বরদের দলে ভিড়ে পড়েছ! এত বড়ো প্রমোশন! ধকল সইতে পারবে তো?'

পেছনে ফাঁকা চেয়ার টেনে দাঁড়াতেই, ভ্রূ কুঁচকে এমন বিসদৃশ ভঙ্গিতে বৃদ্ধের দিকে তাকালেন পরমেশ, সকলেই অস্বস্তি বোধ করছে এবং চমকে উঠল, তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছেন ডিরেক্টর—'তুমি তো এখন আমাদেরবন্ধু হরেন!'

'আজ্ঞে…' ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ড্যালাড্যোলা চোখ মেলে তাকাল হরেন। মানুষটা আরো কৌতুককর।

'তোমাদের গ্রাম থেকে নানা বয়সের কয়েকজন মহিলাকে বলেকয়ে নিয়ে আসতে পারো?'

'মেছেল্যা! কেনে গ বাবু?'

'একটা দৃশ্য আছে আমাদের। চৌকিদারের বৌ শশিবালা, মানে তোমার প্রতিমা-দিদিমণি পুকুরঘাটে স্বামীর হয়ে সাফাই গাইতে যাবেন। সেখানে গ্রামের বৌ বা মেয়েরা কাপড় কাচছেন বাসন মাজছেন স্নানের জন্যে জলে নেমেছেন…'

লাফিয়ে উঠেছে হরেন— 'উয়ারা ছিনেমায় নামবে গ বাবু ?'

সকলের সঙ্গে পরমেশও স্মিতমুখ— 'হ্যাঁ।'

'কজনা চাই গ আপনার ? ঘরে ঘরে শুধোব সব্বায়কে। ছুট্টে ছুট্টে আসবে দশজনে…'

'হ্যাঁ তুমি বলো, বলে রাখো। কিন্তু এক্ষুনি নয়, যেদিন বলব, ডেকে আনবে সবাইকে…' কোনোদিকে তাকালেন না পরমেশ। হাতের সিগারেট নিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগোলেন। বিষাদের মলিন প্রস্থান।

ওদিকে কোণের ঘরে জনাকয়েক পুরুষমানুষের উদাত্ত হাসি। দরজা বন্ধ করে ক্যামেরাম্যান নির্মল অভিনেতা উদয় চৌধুরী বিমল দাশগুপ্ত আরো কয়েকজন। একটা গন্ধ ভেসে আসছে। চিৎপুরের পুরনো মানুষ হরেনের কাছে গন্ধটা অচেনা নয়।

অন্য দিকে ডিরেকটরের অন্তর্ধানে ঢিলেঢালা অন্তরঙ্গতায় মানুষগুলো কিছুটা নড়েচড়ে উঠল। প্রতিমা দাশ তাঁর সংযত নম্রতায়— 'পরমেশবাবু এভাবে চলে গেলেন হঠাৎ…'

'কাজ আছে…' ধ্রুবজ্যোতি চোখমুখের কুঞ্চনে পায়ের পাতা চুলকোতে চুলকোতে। দুঃসহ মশা— 'আফটার অল ডিরেকটর। লিডর অব দ্য ইউনিট। স্ক্রিপ্‌টটা দেখবেন। কালকের প্রোগ্রাম নিয়ে আরো ভাববেন…'

'হ্যাঁ, টেন্‌শানটা তো কম নয়।'

'কাল সকালে তো শুনলাম, হাতুই। সেই হতচ্ছাড়া গ্রামটায়…' আলতো রসিকতায় নাক কুঁচকোল নন্দিতা— 'কাল সকালেই নাকি আমাকে আবার স্নান করতে হবে ওদের ওই গা-ঘিনঘিনে পুকুরটায়। দেখুন তো প্রতিমাদি, কী যন্ত্রণা…'

ওদিকে সিঁড়ি ভেঙে দল বেঁধে ওপরে উঠছে কারা! নিয়মিত অভিনেতা যারা অথবা যারা ছোটখাটো অভিনয়ের জন্য এসেছেন এক রাত্তির দু-রাত্তিরের ক্যাম্পে —হরদয়াল ঘোষ,নিশীথ বাগচী, কল্যাণ সেন,সোমনাথ বিশ্বাস। হয়তো বেড়াতে বেরিয়েছিলেন গ্রামের দিকে, কাঁচাগোল্লা রসগোল্লা খেয়ে ফিরছেন! বারান্দার ওধারে যে যার ঘরের দিকে চলে যাচ্ছেন।

এবং এদেরই সঙ্গে অসম্ভব ব্যস্ততায় উঠে এসেছেন ক্লান্ত বিধ্বস্ত প্রডাকশন-কণ্ট্রোলার সুকুমার বসাক, ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যাণ্ট দীপক বসু। জামা প্যাণ্ট, এলোমেলো চুল ঘাম আর নিঃশ্বাসেই বোঝা যায় পুরোপুরি বিধ্বস্ত দুজন।

'পরমদা কোথায় ?'

'ঘরে।'

'এখন যে মানুষটার কাছে দাঁড়াব কি করে, ভাবছি। কাছে গেলেই তো এক-চোট খিস্তি ঝাড়বেন প্রথম…' চোখেমুখে কুণ্ঠিত হাসি। সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন সুকুমার— 'বললেই তো হবে না। মানুষের যা অসাধ্য সে আমি পারব কি করে ?'

'তোমার তো কিছু অসাধ্য নেই সারথি…' নিরিবিলি থেকে অনেকক্ষণ পরে কথা বললেন কিরণময়—'ডিরেক্টর যদি হন আমাদের রথী, তুমি তো তাঁর সারথি। শুনেছি, বাঘের দুধও এনে দিতে পারো, যদি দরকার হয়।'

'আর সেই দুধ আনতে গেলে যদি তাগড়াই বাঘটাই ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে কিরণদা…' হাত পা ছড়িয়ে গা-এলানো ভঙ্গিতে বসে পড়েছে দীপক। মস্ত চাপড়ে একটা মশা মারল গর্দানায়—'শ্‌শ্‌শালা, অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে তাতে তো কাজ করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে এখানে। শেষে না স্ক্রিপট্‌টাই পাল্টাতে হয়…'

'সে কি! কী বলছেন ?' পরেমেশের পরিত্যক্ত চেয়ারটা দেখাল নন্দিতা— 'আপনি বসুন না, বসুন সুকুমারবাবু। বড্ডো টায়ার্ড দেখাচ্ছে আপনাকে…'

'সে কি হয়! আমি বসলে চলে ?' একগাল হাসিতে সুকুমারও বসলেন— 'আপনারা জানেন না। দেখেছেন হয়তো। ওদিকে তেঁতুলতলা থেকে বাঁদিকে গেলে খানিকটা দূরে বড়ো বড়ো বাড়ি আছে এখানকার ধনীলোকদের। সেটা এ গ্রামের দেউলপাড়া। সেখানে বেশ বড়ো একটা পুরনো দোতলা বাড়ি আছে। অনেকগুলো ঘর। প্রায় সবটাই ফাঁকা…'

'আমরা মেয়েরা থাকব বলে আপনি ভাড়া নিতে চেয়েছিলেন…' নন্দিতা।

'ও, পরমদা বলেছেন আপনাদের ?' সুকুমার হাসলেন—'সবই তো শুনেছেন তাহলে। বাড়ির মালিকরা থাকলে তবু না-হয় বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা কিছু হতো। এখন মালিকের চেয়ে তার গোমস্তার দর বেশি। সুধন্য কুণ্ডু বলে লোক আছে একটা। জঘন্য জঘন্য, কি বলব আপনাদের! এত নোংরা আর লোভী…'

সুকুমার হঠাৎ থেমে গেলেন। চোখ হরেনের ওপর।

কিরণময় হাসতে হাসতে—'বলো বলো, এ আমাদের হরেন। এ গাঁয়েরই লোক। এখন তোমার আপখোরাকি বিনিমাইনের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। তোমাদের সেবা করতে চায়…'

দীপক সবিস্ময়ে—'আরে, আপনিই না বই নিয়ে সেটে ঢুকে পড়েছিলেন তখন ?'
সবাই হেসে উঠল।

কুণ্ঠিত সুকুমার। গাত্রোত্থানের ভঙ্গিতে—'না থাক। আপনারা গল্প করুন। আমি না-হয় পরমদার সঙ্গে কথা বলে আসি…'

'যাও তো হরেন, তুমি বরং নিচে গিয়ে আমাদের জন্যে আরেক রাউণ্ড চায়ের কথা বলে এসো…

'যাব গ কাকাবাবু ?' তৎপর হরেন লাফিয়ে উঠল—'কুথাকে যাব ? কাকে বলব ?'

'ওই যেখানে রান্নাবান্না হচ্ছে, সেখানে গিয়ে বলুন। যাকে বলবেন তাতেই হবে…' সুকুমারের নির্দেশ।

এবং হরেন অপসৃত হলে প্রায় সকলের মধ্যেই প্রতিমার সস্নেহ উক্তির সর্ববাদি-সম্মত অনুমোদন—'লোকটা ভালো। সত্যি ভালো মানুষ।'

'ভালোমন্দের কথা নয় প্রতিমাদি। বটেই তো। হতেই পারে ভালো লোক। কিন্তু আমার যা অভিজ্ঞতা, আমি আবার চট করে মুখ খুলি না কারও কাছে। গ্রামের মানুষ! জানেন না তো, ও আপনাদের থিয়েটারে ফিলমেই চলে। এই এই দেখুন না, ওই সুধন্য কুণ্ডু। ওর কথাই বলি। এত টাকা লোকটার! সিলিং-এর ওপর নামে বেনামে বিস্তর জমি, গোটা তিনেক পুকুরে মাছের চাষ। তার ওপর দুটো-না-তিনটে চালু দোকান। তবু কি খাই লোকটার…'

'এক মাসের জন্যে দু হাজার টাকা ভাড়া তিনটে ঘরের…'

সুকুমার ঘাড় ফেরালেন বিতোষের দিকে—'হুঁ, এ কি মামদোবাজি নাকি! কে দিচ্ছে ওকে দুহাজার টাকা ? লোকটা অবিশ্যি নিজে থেকেই এক হাজার, আটশ, শেষপর্যন্ত পাঁচশ-এ নেমেছিল। আমাকে প্রায় জ্বালিয়ে মেরেছে। এদিকে গ্রামের অ্যান্টি গ্রুপ, পঞ্চায়েত স্কুল সব কিছুতেই যারা বুড়োগুলোকে হারিয়ে এখন নতুন নেতা, ওঁরা এত সাহায্য করছেন আমাদের! সে আপনারা ভাবতেও পারবেন না। বিশেষ করে, গ্রামের নতুন শিক্ষিত ছেলেরা…'

'ব্যস্, তাহলে আর কী ? ধ্রুবজ্যোতি হালকা হাসিতে—'নাউ ইউথ্ ইজ অন্ দ্য এজেণ্ডা। ওরাই সব। ওরা যেদিকে সেদিকেই তো জিৎ…'

'সে বললে তো হবে না…' উত্তেজিত দীপক—'এখানে এসে যদি এসব হামলা হুজ্জুতি সামলাতেই আপনার দিন কেটে যায়, কাজ হবে কখন ? ওরা তো আলাদা টেনশানে ভোগাবে সবাইকে।'

'ওই, ওটাই আমার কথা…' সুকুমার ঝুঁকে বসলেন—'আমি তো এই ভিলেজ পলিটিক্স্‌টাই এড়াতে চেয়েছিলাম। হাজার হোক, আমরা বাইরের লোক। প্রতিদিন সকাল সন্ধেয় সব সময় ওদের ঘরে ঘরে যেতে হবে আমাদের।'

দূরে হরদয়াল ঘোষ নস্যি গুঁজলেন নাকে। স্তব্ধতায় প্রবল গর্জন।

'কিন্তু আমি তো একটা জিনিস্‌ বুঝতেই পারছি না সুকুমারবাবু…' নন্দিতা ওর কাঁধের আঁচল ডানদিকে ঘুরিয়ে আরো মনোযোগী—'এতে আপনার দোষ কী? পরমদা চটবেন কেন? লোকাল লোকেরা কী করল না-করল, আপনি তো চেষ্টা করছেন সাধ্যমতো…'

'ওঃ…' সদাহাস্যময়তায় সুকুমার আলাদাভাবে উদ্বেগ ভুলতে চান শিল্পীদের কাছে—'সে আবার আরেক ফ্যাচাং। একেবারেই প্রডাকশনের প্রব্লেম…'

দীপক বিষয়টা স্পষ্ট করতে চাইল—'স্ক্রিপ্‌টটা তো পড়েছেন সকলে। একটা সিকোয়েন্স আছে না। বিশাল মাঠ জুড়ে কাজ করছে চাষিরা, তার মধ্যে চন্দ্রধর। আসলে একটা নয়, দুটো সিকোয়েন্স। একবার ধান কাটা হচ্ছে, সাবিত্রী ভাত নিয়ে আসছে শ্বশুরস্বামীর জন্যে। আরেকবার হাল চষতে চষতে চন্দ্রধর দেখবে মানকরের পাকা রাস্তায় মিছিল যাচ্ছে শহরের দিকে। প্রথমটা না হয় ম্যানেজ করা যাবে। আউশ ধান উঠছে। কী শালাশালী না কি-যেন ধান আছে ওদের, সে-ও উঠবে…'

শালাশালী ধান! গমকে গমকে একটা হাসির উচ্ছ্বাস।

'কার্তিকশালি…' সুকুমারও হাসতে হাসতে—'আর্লি-আমনও বলল কেউ কেউ…'

'ওই হলো। একটা সিগারেট দিন তো ধ্রুববাবু…' দীপক ধ্রুবজ্যোতির দিকে হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল—'কিন্তু প্রশ্ন হলো, এখন এই আশ্বিন মাসে হাল-চাষের ফাঁকা মাঠ কোথায় পাবেন? যেদিকে তাকাবেন, হাঁটু ছাপিয়ে কোমর পর্যন্ত বেড়ে উঠেছে সবুজ ধান গাছ। শুধু তো এখানে নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই তো এই এক মাঠ, একই প্রকৃতি…'

'চিত্রনাট্যের সময় ভাবা হয়নি এসব?'

'হবে না কেন। মাঠ তো এখানেও পাওয়া যাচ্ছে। ওই আউশের মাঠ না কি যেন, সে তো বেশ কতগুলো দেখা হলো। লং-শটে খুব বড়োসড়ো কিছু না পাওয়া যাক, ক্লোজে বেশ ভালোভাবেই কাজ চলে যাবে…'

'তাহলে হবে?' ব্যাকুল নন্দিতা।

'হবে কি হবে না, সে কি করে বলব? সেটাই তো পবমদাকে বলতে হবে এখন। জানি ক্ষেপে যাবেন...'

'এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছ হে সারথি...' ওদিক থেকে কিরণময় হঠাৎ। যেন এতক্ষণ ছিলেনই না এখানে—'দেশ জুড়ে চাষের বলদগুলো যখন জিরোচ্ছে তোমরা চললে হাল চষতে। ওদের পাকা ধানে মই দিতে যাবে আর ওরাও তো তোমাদের তামাক সেজে দেবে না হে...'

'সে সব নিয়ে কথা বলতেই তো গিয়েছিলাম গ্রামের দুচারজনের কাছে। সেখানেই তো শুনলাম, সুধন্য কুণ্ডুর বজ্জাতির কথা। জমি দিতে তো অনেকেই রাজি। দেবে না কেন? ধান উঠে গেলে আর আপত্তি কিসেব? বরং দুটো টাকা পাবে ফাঁকা জমি থেকে।'

ওদিকে বাসুকে সঙ্গে নিয়ে দোতলায় উঠে এসেছে হরেন। যদিও বাসু তাকে কিছুই ছাডেনি—বড়ো কেটলি বা থালায়-সাজানো চায়ের কাপগুলো। কিন্তু বিয়েবাড়িব দূর-সম্পর্কিত পিশেমশাইর মতো উৎসাহে টগবগ করছে হরেন। কাছাকাছি এসে কেটলিটা তুলে নিলো। কিছুটা জোবজবরদস্তির দাপটে—'দাও না গ, দাও আমাকে। তুমি পারবেনি...'

'না না, আবার আপনি কেন? দিন না ওকে। ও-ই পারবে...' সুকুমার। কিন্তু মর্যাদা-উদাসীন হরেন কাপে-কাপে চা বিলোতে শুরু করেছে সবাইকে—'নিন না কেনে গ বাবু, নিন। ধরুন গ দিদিমণি। ই টুকুন পাব্বনি আপুনেদের জন্যি...'

কৌতুকটা উপভোগ্য। সকলের প্রচ্ছন্ন হাসির মধ্যে হতবাক বাসু তাকিয়ে থাকে। দেখে অদ্ভুত লোকটাকে।

সুকুমার কিছুটা বিহ্বল। লোকটা কে, কেন এবং কতটুকু—হিশেব না পেয়ে তাকাল পরিচিতদের চোখে। অবশেষে হরেনকেই— 'এতই যদি করলেন, আরো একটু উপকার করে দেবেন আমাদের? আজ রাতে তো আর হবে না। কাল ভোরের মধ্যে অন্তত গোটা পঁচিশেক ডিম কোথায় পাওয়া যেতে পারে বলতে পারেন।'

'ডিম! ডিম গ বাবু! হাঁসের?'

'হাঁস মুর্গি যা হয়...'

'বাজারেই ত পাবেন গ বাবু, গুঁয়ে আশের দোকানে। ইস্টিশানের ধারে...'

'সে কি আর খোঁজ করতে বাকি আছে এখনও। লোক পাঠিয়েছিলাম।

সন্ধেবেলা কুড়িয়ে বাড়িয়ে বাহান্নটা পাওয়া গেল…' আবার ঘাড় ফিরিয়েছেন সুকুমার— 'কাল আবার রববার। সকালের ট্রেনেই আরো আর্টিস্ট, বাইরের লোকজন আসছেন। আপনাদের সবাইকে যে ব্রেকফাস্ট দেব কি করে, সেই ভাবনা। আট পাউণ্ড রুটি দিয়ে যাবে সকালে। সেটা ডেইলি কনট্রাক্ট। কিন্তু শখানেক ডিম রাখা দরকার। নিদেন পঁচাত্তর…'

'দিন না কেনে গ বাবু, নে' আসি…

'কোথায় যাবেন আপনি ?'

'আলে আলে চল্যে যাব গ বাবু। হাজিগাঁ-এ হাঁসমুগ্‌গির মস্ত কাববার বসির শেখের। কলকাতায় চালান দেয়…'

'এত রাতে আপনি যাবেন সেখানে ? কত দূর ?'

'তা দেড় মাইলটাক ত হবেই গ। ই যাব আর আসব।'

'সে কি!' প্রায় একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠলেন ভদ্রজনের—'পাগল নাকি আপনি!'

সুকুমারও বিব্রত তখন। বুকের বোতাম খুলে, জামার গভীবে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছেন— 'এত ব্যস্ত হতে হবে না আপনাকে। কাল সকালে, সে আপনি যখন পারেন এনে দিলেই হবে। পঁচিশ পঞ্চাশ নয়, দেড়শ। যতগুলো সম্ভব…লোক দেব আপনার সঙ্গে। আপনি কেন বইবেন এত মাল ..'

'না গ বাবু, ই আর এমন কি মাল হবে! কাল সুয্যি ওঠার আগেই পৌছে দিব আপুনেদের কেম্পে…'

'না না, বরং আরো কটা টাকা বেশিই রাখুন…' চকচকে একশ টাকার দুখানা নোট। বাড়তি দশটা টাকা হাতে ধরিয়ে দিলেন সুকুমার।

টগবগ খুশিতে লাফাতে লাফাতে চলে গেল হরেন। বাবুদের সেবায় কিছু-একটা দায়িত্ব পেয়ে সে খুশি।

লোকটা সিঁড়িতে অদৃশ্য হবার পর হরদয়াল হঠাৎ বললেন— 'গেঁয়ো মানুষ তো, বড্ড সরল।'

'হ্যাঁ, টুপি পরানোও বড্ড সোজা।'

সবাই চমকে তাকাল।

ফুঁসছে নন্দিতা— 'দেখছেন, বাইরে কী অন্ধকার। এই অন্ধকারে এত রাতে ঘরে ফিরবে লোকটা। একটা টর্চ দেবার কথা পর্যন্ত মনে পড়ল না আমাদের কারুর ?'

'ভুল করছেন নন্দিতা। দিলেও ও নিত না।'

'কেন ?'

'অন্ধকারেই ওরা চলে ফেরে। ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস…'

'সেটা আপনাদের বানানো কথা। অ্যাবসোলুটলি নন্‌সেনস। নেয় না নেয়, ইট ওয়জ আওয়ার ডিউটি…'

গাল ভরে হাসলেন সুকুমার— 'ঠিক আছে, যাবার সময় ওকে একটা বড়ো তিন ব্যাটারির টর্চ প্রেজেন্ট করে দিয়ে যাব আমরা।'

'না, সেটা আমিই করব। যাবার সময় নয়, কালই আমি টাকা দেব। আমাকে একটা ভালো টর্চ কিনে এনে দেবেন তো সুকুমারবাবু। তিন ব্যাটারির দরকার নেই, আমাদের যেমন আছে। দু ব্যাটারির ভালো জিনিস। প্লাস্টিক নয় কিন্তু, স্টিলের…'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল শশী— 'খাবার তৈরি। তারকদা ডাকছেন আপনাদের। আরতিদি সেই তখন থেকে একা একা ঘুরছে বাগানে…'

বাগানে আরতি! টনক নড়ল সকলের। কথায় কথায় খেয়ালই নেই কারও— সেই তখন যে চুপচাপ নেমে গেছে মেয়েটা, এখনও ফেরেনি! সুকুমার বিরক্ত— 'দেখুন দেখি, এই বয়সের একটা মেয়ে কাউকে কিছু না-বলে চলে গেল একা। অথচ নিচে যত ছেলেছোকরারা…'

'সত্যি…' প্রতিমা সস্নেহে—'কি যে একটা মেয়ে। এসে অবদি কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছে না গ্রামটাকে…'

'বেশি ভালোমানুষী করো না তো প্রতিমাদি…' নন্দিতা ঝাঁঝিয়ে উঠল—'বাইশ তেইশ বছরের একটা মেয়ে। কচি খুকি নাকি! ওর নিজের একটা সেন্স অব ডিসেন্সি নেই ?'

'থাক থাক…' সুকুমার ব্যস্ত হলেন—'আপনারাই বা আর রাত করছেন কেন ? খাবারদাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলে…'

শিল্পীরা নেমে গেলে পরমেশের ঘরে ঢুকলেন সুকুমার দীপক। সকলের চলে-যাওয়ার সংবাদে ঘর থেকে ছিটকে বেরোলেন পরমেশ। পেছন থেকে ডাকলেন কিরণময়কে।

সিঁড়ির মাঝামাঝি অন্ধকারে মুখোমুখি দুজন। কিরণময় শিশুর সারল্যে হাসছেন।

'আবার। আপনি আবার শুরু করলেন এই সন্ধেবেলাই...'
'ইউ নিড নট ওয়রি। আমি ঠিক আছি...' উদাস কিরণময়—'উদয় নির্মল বিমল ওরা ডাকল আদর করে। ইচ্ছে হলো...
'আপনার ওরকম হাজারটা ইচ্ছে হোক, আমি ভাবি না। আপনি বাঁচলেন কি মরলেন আই অ্যাম লিস্ট কনসার্নড, সেটা জনগণ দেখবে। আমি ভাবছি আমার প্রডাকশনের কথা। সুগার আছে আপনার, প্রেশার আছে। সব কিছুই জুটিয়ে রেখেছেন। এরপরও...'
দেয়ালে হাত রেখে সিঁড়ির ঢালুতে পা ফেললেন কিরণময়। ধাপে ধাপে পা ফেলতে ফেলতে, নিজেকে সামলে নিয়ে— 'চন্দ্রধরকে আমি চিনতাম। আই স্য হিম ইন মাই মিড টুয়েন্টিস। লোকটা ধুঁকতে ধুঁকতে, ধুঁকতে ধুঁকতে মরে গিয়েছিল আমার বুড়ো বাপটার মতো—স্টার্ভড অ্যাণ্ড স্টার্ভড অ্যাণ্ড স্টার্ভড অ্যাণ্ড ড্রপড ডেড হেল্প্লেসলি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো আই ওন্ট বিট্রে হিম। থিয়েটার ইজ মাই রিলিজিয়ান, ওই শালা থিয়েটারের নেশাটাই পুরো নাস্তিক হতে দিলো না আমাকে। ব্যালেন্স হারাই নি। অন্ধকারে পা ফেলি, সিঁড়ি খুঁজে পাই...
সিঁড়ির বাঁকে আলোটা জ্বলছিল না। সমস্ত স্কুলবাড়িটায় আলোয় আলোয় দীপান্বিতা জ্বেলে আসল জায়গায় কাজের খামতি! কিরণময় অবাক হলেন। বিশাল কুরুক্ষেত্রের রথী পরমেশ মিত্তির, অশিল্পী সুকুমার বসাক সারথি তাঁর। সত্যিকারের কাজের মানুষ বলেই হয়তো ছোট ভুলগুলো থেকে যায় এখানে ওখানে। ভুলগুলো কাজ শেখায়।

সকালবেলা জমজমাটি বাজারের ভিড়ে বিচ্ছিরি একটা কাণ্ড ঘটে গেল। ক্যাটারিং-এর তারকবাবু আর বাসুকে নিয়ে আনাজপাতি কিনতে এসেছিলেন সুকুমার বসাক। কুলি হিশেবে নিযুক্ত দুজন চাষির ছেলেকে নিয়ে তারা এক-কোণে অসহায়।
মোহনপুর বাজার এলাকাটা, বাজার বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা নয়। জন-সমাগম এবং বেচাকেনাটা যেহেতু প্রাত্যহিক এবং প্রাতঃকালীন, তাকে নিতান্ত হাট বলাও অযৌক্তিক। চারদিকে হরেক ধরনের দোকানপাট, রাস্তার দুপাশে তরিতরকারি আনাজপাতি নিয়ে চাষিদের পসরা, চারটে বাঁশের খুঁটি পুঁতে খড়

তালপাতার ছাউনিতে জনাকয়েক জেলের মাছের আসর, মধু চক্কোত্তির দর্জির দোকানের পাশে উঁচু ঢিপিটায় রোজই একটা করে পাঁঠা কি খাসি কাটে তিলে বাগদী। মুণ্ডুর কোনো আলাদা খদ্দের নেই। গুঁড়ো গুঁড়ো করে সেটাও মিশে যায় মাংসচর্বির সঙ্গে।

ভোর থেকেই আশেপাশের গ্রাম থেকে সম্পন্ন গেরস্তরা থলে-হাতে ভেঙ্গে পড়ে এককালি ছোট্ট চত্বরটায়। সকাল আটটা, বড়জোর সাড়ে আটটা পর্যন্ত ভিড়, দরকষাকষি চিৎকার চেঁচামেচি। নটার মধ্যে সব শেষ। ভিড় পাতলা হয়ে গেলে তখন শুধু আড্ডা আর গুঞ্জনটা থাকে। ফার্স্ট ট্রেনে খবরের-কাগজ পৌঁছে যাবার পর ভারতদর্শন বা বিশ্ববীক্ষা। যেহেতু বাংলা-সংবাদপত্রেরই চাহিদা বেশি, চাখুমচুখুম মজাদার গপ্পো প্রতিদিন, খেলার খবর, শুক্রবার 'চলচ্চিত্র সংবাদ।'

গ্রামবাসী খুশিই ছিল খুব। গত শুক্রবার তাদের অখ্যাত মোহনপুরের নাম ছাপার হরফে দেখেছে প্রায় প্রতিটি কাগজে। 'আকাল' ছবির বিশদ বিবরণসহ মোহনপুর গ্রামের ভৌগোলিক পরিচয়।

গ্রামবাসীদের এহেন তৃপ্তিবোধ সুকুমার বসাকের কাজের সুবিধা। বিশেষত স্থানীয় যুবগোষ্ঠী তাব সঙ্গে সহযোগিতায় এক্ষণে অধিকতর ঘনিষ্ঠ।

প্রতিদিন প্রভাতে অনুচর সমভিব্যাহারে তাঁর বাজারে আগমন অনেকটা রাজকীয় প্রবেশের মতো। অন্যূন ষাটজন ব্যক্তিকে নিয়ে তাঁর অতিবৃহৎ পরিবার। কোনো কোনো দিন সংখ্যাটা আরো বেশি। শতাধিক। সুতরাং দুপুরে রাত্তে নিয়মিত মহোৎসব প্রতিপালনের পক্ষে মোহনপুর গ্রামের এই বাজার তার কাছে শুধু ছোট বা অকিঞ্চিৎকর নয়, নিতান্তই তুচ্ছ। দশমণ চাল এবং বস্তায় বস্তায় আটাময়দা আলুপেঁয়াজ ঘি তেলের বড়ো বড়ো টিন, মশলাপাতি ইত্যাদি তিনি কলকাতা থেকেই সংগ্রহ করেছেন পাইকারি দরে। ক্যাম্পের একটি ঘরে সেসব মজুত। রোজকার মাছমাংসের জন্যও বাজার নিষ্প্রয়োজন। দূরবর্তী বলাগড় বাজারের এক ব্যাপারিকে কনট্রাক্ট দেওয়া আছে। প্রতিদিন সকালে গাড়ি যায়। প্রযোজকের প্রতিনিধি নকড়ি দত্ত নিজে গিয়ে দেখেশুনে বুঝে নিয়ে আসেন।

শুধু প্রতিদিনের টাটকা তরিতরকারি আনাজপত্তরের জন্যই এই বাজার। এবং নিত্যপ্রয়োজনের তুলনায় বাজারটাও এত ক্ষুদ্র যে, খুব ভোরের দিকে চাষিরা মাথার বোঝা মাটিতে ফেলার আগেই সব তুলে নিতে হবে তাকে। নচেৎ স্থানীয় চাহিদার খাইটাও বড়ো কম নয়।

চাষিরাও চিনে ফেলেছে তাদের মহারাজাকে। যাদের অনেকেই বাজারে পৌঁছোনোর আগে সওদা নিয়ে চলে যাচ্ছে ইশ্‌কুলবাড়ির দরজায়। কিন্তু এত সামান্য জোগান, কেউ আমল পায় না সেখানে। সুকুমার বাজারে এসে সব কিছু দেখেশুনে বাছাই করে কেনাকাটা করতে ইচ্ছুক।
এবম্বিধ ইচ্ছের মাশুল হিসেবেই সেদিন বিচ্ছিরি একটা ঘটনা ঘটে গেল।
গিজগিজ করছে মানুষজন। ডাঁই-করা শাক নিয়ে বসেছিল তিন-চারজন চাষি বৌ। পালং শাকের সবটাই তুলে নিচ্ছিলেন সুকুমার। হঠাৎ শুনলেন, পিছনে চকিত মন্তব্য—'আকাল। আকাল খেলতে এসে শালারা সত্যি সত্যি আকাল বানালো র‍্যা দেশে।'
ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন সুকুমার।
নীল লুঙি, হাওলুমের জাফ্রান পাঞ্জাবিতে নিধি দেওয়ান কিছুমাত্র বিচলিত নন —'হ্যাঁ হ্যাঁ মশাই, বলচি। আমি বলেচি। বলি, পেয়েচেনটা কী আপনারা? এট্টু কি তিষ্ঠোতে দেবেন নি গাঁয়ের লোকদের...'
'কেন বলুন তো...' সুকুমার তার স্বভাবে হাসতে চেষ্টা করলেন। যদিও পলকেই বুঝে ফেলেছেন, ঘটনাটা গড়াতে পারে। পাশেই দুচারজনের সঙ্গে খাটো-ধুতি ফতুয়া-গায়ে সুধন্য কুণ্ডু।
'দাঁত কেইল্যে হাসচেন যে বড্ডো। বলি দেশের নোকে নিজেদের ঘরসংসারে দুটো খে' পরে থাকবে কি থাকবে নি?'
ভিড়টা কেনাকাটা ছেড়ে জমে যাচ্ছে তাকে ঘিরে। সুকুমার সচকিত হলেন।
'এই যো পালংগুলা কিনলেন বস্তা ভর্যো, কত দব দিলেন...' বড়ো ঠাণ্ডা অথচ দাঁত কিড়মিড় গলার স্বর সুধন্য কুণ্ডুর।
বড়ো সহজে উত্তেজিত হন না সুকুমার। হাসিটা জিইয়ে রাখলেন ঠোঁটে— 'চেয়েছিল তো পাঁচ সিকে করে, রফা হলো এক টাকায়।'
'শোনো গ, শোনো। শুনেচ তোমরা...' সুধন্য কুণ্ডু, খটখটে চোয়ালের প্রৌঢ় মানুষটা তাকালেন ডানে বাঁয়ে—'বলি স্বকয়ে ত শুনলে কত্তাগুলা। বলি আশ্বিন-কাত্তিকে দেশপাড়াগাঁয়ে পালং-এর দর একটাকা? কে কবে শুনেচ গ! কবে শুনব পুঁই বিকোচ্ছে সোনার দরে। লাউকুমড়ো বেচে দালানকোঠা হাঁকাচ্ছে আট-কুড়্যা চাষার ব্যাটা...বলি ভেবেচেন কী! ভেবেচেন কী আপনারা?'
অতর্কিতে চোখে চোখ রেখে আক্রমণ।
'একেবারে যে কলকাত্তা শ'র বাইন্যে দিলেম গাঁ-টাকে। গরিবমানুষগুলো খা-

হোক দুটো বিক্রিবাটার জন্যি কুইড়্যে বাইড়্যে এনে বসে, ভালোমন্দ একটু চোখে দেখতি পায় গেরস্তরা। আপনেদের জন্যি কি আর কিছু ছোঁবার উপায় আচে! ই কটা দিনের মধ্যে আগুন ধইর‍্যে দিলেন বাজারে…'

'আগুন বলে আগুন…' নিধি দেওয়ান তার ফোকলা দাঁতে—'সিদিন কুটুম এল সৈঝের বেলা, ঘরে ত কিছু নেই। এলম দুটো ডিম খুঁজতি। ই কি বলে গ! এট্টা ডিম নেই কুথাও। বলে কিনা বায়েস্কোপ কোম্পানি…'

গাঁয়ের বাজার। আপিশের তাড়া নেই। বৌঝিগিন্নিদেরও ধরাবাঁধা ছক নেই সংসারে। কেনাকাটা ভুলে ভিড়ের মানুষ ভিড় বাড়ায়। হেটো কৌতূহলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিপন্ন সুকুমার দমে গেলেন না। সোজাসুজি দাঁড়ালেন—'এসব কথা আমায় বলছেন কেন?'

'আপনাকে শুধোবনি ত কাকে শুধোব? আপনিই ত বায়েস্কোপ কোম্পানির মেনেজরবাবু…'

'হ্যাঁ। সেখানে ভুল করেন নি আপনারা। কিন্তু আপনাদের বাজারে দরদাম আমরা বাড়াচ্ছি এসব বলছেন কেন। যেসব জিনিস কলকাতা থেকে চালান আসে আপনাদের এখানে, তার কোনো কিছুই কিনছি না এখান থেকে। ডাল তেলঘিনুনমশলাপাতি সব আমরা নিয়ে এসেছি। যদি ফুরোয় আবার কলকাতা থেকেই নিয়ে আসব…'

'খুব যে বক্তিমে ঝাড়তি লেগেচেন মশাই। আপনেদের কাণ্ড জানা নেই কারুর? ঘাসে মুখ বুজ্যে থাকে নিকি গাঁয়ের মানুষ! অ্যাঁ…' বিচ্ছিরি ইতর খিঁচুনি কপিল নন্দীর—'গণু দুলেকে পাইঠ্যে খপর দিলেন বাউরিপাড়ায়, সাঁতালদের ঘরে ঘরে—সক্কাল বেলা পঞ্চাশটা মুগ্‌গি চাই আপনেদের। এক সক্কালে পঞ্চাশটা মুগ্‌গি! গাঁয়ের মানুষ ই কি শুনেচে কোনকালে! ইশ্‌কুলবাড়িতে বস্যে বেশ খানাপিনা চলচে আপনেদের…'

'খানাপিনা কি গ! মোচ্ছব, সকালসন্ধে মোচ্ছব আর ফুত্তি বাবুদের…'

'কাজকম্মের বাড়িতে একটু খাওয়াদাওয়া তো হবেই নিধিবাবু। তাছাড়া মুর্গির কথা বলছেন; মুর্গি তো এভাবে বিক্রি হয় না আপনাদের বাজারে…'

'মুগ্‌গি হয় না তো আনাজপাতি তো বিকোয় মশাই। রাখো ঘোষ আর সন্তোষ ময়রার দোকান থিক্যে যে হাঁড়িতে হাঁড়িতে দই যাচ্চে, রসগোল্লা সন্দেশ যাচ্চে পিত্তিদিন, দেখচেনি গাঁয়ের নোক? মাথার দর ই সিদিন ছেল মশাই কুড়ি ট্যাকা, আপনেরা এলেন ত ধাঁই করে লাফ মারল শালা পঁচিশে…'

'সেটা চিনির দাম বেড়েছে বলে…' খুবই শান্ত সুকুমার—' রেশনে পর্যন্ত চিনির সাপ্লাই বন্ধ কলকাতায়…'

'ছাড়ান দাও গ, ছাড়ান দাও। একে ত শ'রের নোক, তায় আবার বায়েস্কোপ কোম্পানি। তক্কোয় পারবে ক্যেনে ইয়াদের সনে…' কাল্পনিক গদা ঘুরিয়ে, ভীমদুর্যোধনের মতোই দুহাত কাঁপিয়ে একটা কিছু করতে চাইছেন সুধন্য কুণ্ডু—'গাঁয়ের নোকদেরকে ভড়কি দে'বেঁইচে আচে গ ইয়ারা। কথা বেইচ্যেই খায়…' এবং গাঁয়ের মানুষেরা দ্রুত সরে যাচ্ছে ওদিকে। সুতরাং আরো কিছু তীক্ষ্ণ বাক্য এবং অঢেল খিস্তিখাস্তা দম চেপে সহ্য করলেন সুকুমার। ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে সমস্যাটা। কাজ করার অসুবিধা বাড়ছে। তাকালেন চারপাশে। অচেনা মুখের সারি। গুটিকয় পরিচিত। খুঁজলেন যুবকদের—যারা নানাভাবে তাকে সাহায্য করছেন এতদিন। কেউ নেই।

জনতার গুঞ্জন ভেদ করে ঘুরে দাঁড়ালেন। অপমানে গ্লানিতে আনত। বাসু আর মুটেদের নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন তারক পণ্ডিত। ক্যাম্পে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। আজ আর কেনাকাটা নেই।

আত্মগ্লানি দীনতায় মোমের মতো গলতে গলতে, বিস্তৃত মানুষের ভিড়ে নিজেকে বড়ো অসহায়, বড়ো একা, সত্যি সত্যি বিদেশী মনে হলো।

অথচ মগজের মধ্যে প্রতিজ্ঞাটা আরো বেশি শক্ত গ্রানিটে পাকা হতে থাকে। এসব নিয়ে একেবারেই বিব্রত করা চলবে না পরমদাকে। মগ্নতায় ডুবে থেকে নিজের খুশিতে কাজ করে যাচ্ছে যে-মানুষটা, কাজ করতে দিতে হবে তাঁকে।

মোহনপুরের দেউলপাড়ার অভ্যন্তরে অভয়াপদ নাগের বাড়িতে কাজ চলছে এখন। সাবেকি ঢং-এর পুরনো একতলা পাকা দালান, ভাঙা মন্দির, গোয়ালঘর, বড়ো উঠোন ধানের মরাই খড়ের পালুই সব নিয়ে সম্পন্ন গেরস্তের ঘর। সেখানেই মন্বন্তরের দুঃশাসন তারিণী ভট্‌চাযের ভদ্রাসন।

পায়ে পায়ে, অনেকটা ডুব-সাঁতারের মতো ভিড় কাটিয়ে বাজারের বাইরে এসে লোকেশানেই যাবেন ভাবলেন। পরমদাকে বিরক্ত করতে নয়। সেখানে থাকতে পারে গ্রামের ছেলেরা—শ্যামাপদ ভূদেব লক্ষ্মীনারায়ণ বাসু শোভন ষষ্ঠী সমীর মোহন। যথার্থ বন্ধুরা।

মুহূর্তেই বদলে গেল ভাবনার ছকটা। সন্তর্পণে এগোলেন সুকুমার

মাঝের-পাড়ায় মেঠো রাস্তায় দেবেন সাধুখাঁর মুদির দোকান। পাশেই ফাটা-ফুটো মেটেঘরে বিশু শাঁতরার নড়বড়ে চায়ের দোকানে দুচারজন গাঁয়ের মানুষ। উথলে উঠল সুকুমারকে দেখে—'কুথাকে যাচ্ছেন গ মেনেজারবাবু? হেডমাস্টাই-এর বাড়ি?'

হাসলেন সুকুমার।

'আজ ত আপুনেদের ভট্‌ভট্টি মিসিনের কাজ চলচে নাগেদের বাড়ি···'

'হ্যাঁ···' নিঃশব্দে পেরিয়ে যেতে চাইলেন সুকুমার। রাস্তাঘাটে অনাবশ্যক কথা, আশশ্যাওড়া কচুবনের জঙ্গল ডিঙোবার মতো।

'আজ বিকেলে কুথাকে হবে গ বাবু?'

'জেনারেটর চললে আওয়াজেই খবর পেয়ে যাবেন।'

বুড়ো বুড়ো লোকগুলো খুশি—'রাত্তিরের খেলা দেখতি বড্ড ভাল গ। বাহারের আলো।'

দেয়ালে কাঁচা-ঘুঁটের গন্ধ। কলাগাছের বাগান। দুপাশের ঘরবাড়ির মধ্যবর্তী গলিপথে কিছুদূর এগিয়ে নাগরিক কায়দায় সুকুমার কড়া নাড়লেন সদর দরজায়।

'কে?'

স্নানের আগে উঠোনের রোদে গায়ে তেল ঘসছিলেন হেডমাস্টার নিত্যানন্দ সুরুল। গামছা পরে উদোল গায়ে নিজেই উঠে এলেন— 'ও আপনি! আসুন আসুন। ওরে অ খুকু, সদরটা খুলে দে, বসতে দে ওনাকে···'

'দুপুরবেলা। বিরক্ত করলাম···'

'বিরক্ত কেন? আপনারা বিদেশী লোক। কাজেকম্মে এয়েছেন। দরকার পড়লে আসবেন বৈকি। অবিশ্যি আমিও বিদেশী। তবু যা-হোক এ গাঁয়ে আটটা বছর ত কেটে গেল···'

খুকু, অর্থাৎ মাস্টারমশাইর যে-মেয়েটা কাটোয়া কলেজ থেকে বি. এ পাশ করে বসে আছে ঘরে, দরদালানের কোণে জানালা খুলে, টেবিল-ফ্যানের সুইচ টিপে বসার ব্যবস্থা করল। জানালার শিক ছুঁয়ে কাগজি-লেবুর গাছ। মিষ্টি গন্ধ।

বসা মানে, একটাই চেয়ার। বই নেই, খাতাপত্তর কিছু নেই, একটা ন্যাড়া টেবিল দেয়ালের গা ঘেঁষে। সামনে লম্বা বেঞ্চি। দুটো মাত্র ঘরের অনতিদীর্ঘ দরদালান বারান্দার চেয়ে অপরিসর। দূরে, ওদিকের প্রান্তে ভাঙা তক্তপোশের

ওপর কয়েক বস্তা ধান। তলায় আলুপেঁয়াজ। মেঝেতে শতরঞ্চি এখনও। সকাল সন্ধেয় ছাত্রছাত্রীরা আসে। মাস্টারমশাইর কোচিং।

'কী শুটিং দেখতে যাননি আপনারা ?'

'গেছলাম দুদিন। উঃ, যা ভিড়। লোকের মাথা লোকে খায়…' ঘরের দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সলজ্জ যুবতী— 'আজ বিকেলে কোথায় হবে ?'

আপনাদের গাঁয়ে নয়। হাতুই-এ…'

'সাবিত্রীর ঘর ?'

সশব্দে হেসে ফেললেন সুকুমার— 'কী। গল্পটল্প পর্যন্ত দেখছি জানা হয়ে গেছে সব।'

'গপ্পোটা পুরো জানিনে অবিশ্যি। সেদিন বেশ ভালো লাগছিল দেখতে। এত ভালো পার্ট বলছিলেন উনি। আচ্ছা, ওই যো—সাবিত্রীর পার্ট বলছিলেন উনি প্রফেসর ? সবাই বলছে…'

'হ্যাঁ। ইংরেজির অধ্যাপিকা। কলকাতার একটা কলেজে…'

'ওরে বাব্বা, ইংলিশ।' লাল-নীল ছাপা শাড়িতে রোগা কালো শান্ত মেয়েটি চোখের বিস্ময়ে একেবারে থ— 'ইংলিশ পড়ান! আবার বই-এও সাজেন ? কী ভালো মেয়ে বাব্বা…'

হয়তো আরো প্রশ্ন ছিল। অনন্ত কৌতূহলে মাত্র টগবগাতে শুরু করেছিল মেয়েটি, বৌ-কি-মেয়েরই শাড়ি লুঙ্গি করে কোমরে জড়িয়ে ঘরে ঢুকলেন মাস্টার-মশাই। পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বয়স। বড়ো বেশি পান খান। বিচ্ছিরি দাঁতগুলো। কাটা কাটা ঠোঁট দুটো।

সুকুমার উঠে দাঁড়ালেন… 'সেকি! আপনি তেল মেখে চলে এলেন! না, আপনি যান! স্নানটা সেরে আসুন। আমি তো বেশ কথা বলছিলাম আপনার মেয়ের সঙ্গে…'

মাস্টারমশাই বসলেন লম্বা বেঞ্চিটায়— 'না বলুন। কতাবাত্রাটা সেরেই নিই আপনার সঙ্গে। কতক্ষণ আর বসে থাকবেন। কতা ত আমারও আছে সুকুমারবাবু। ভেবেছিলাম, বিকেলের দিকে একবার আমরা যাব আপনাদের ওখানে।'

সুকুমার উৎকণ্ঠ এবার।

'নির্মলবাবু এসেছিলেন ভোরবেলা। ওদের আপিশ আছে। সেকেণ্ড ট্রেনে যান। আজ থার্ড ট্রেনে গেলেন…'

'সেক্রেটারির সঙ্গে আপনার কথা হলো? কী বললেন?
'কাল রাত্তিরে নাকি সুধন্যবাবুরা দল বেঁধে গিয়েছিলেন ওনার কাছে। অনেক কত্তা শুনিয়েছেন।'
'বেশ তো, কী বলছেন? ওদের আপত্তিটা কোথায়?'
'ছলের কি অভাব আছে? বলছে হরেক কথা...' কিঞ্চিৎ মেদের শরীর। তেল চুকচুক চামড়ায় দুহাত ঘসছেন মাস্টারমশাই। বুকে, বগলের তলায়, ঘাড়ে গর্দানায় পিঠের দিকে যতটুকু হাত যায়—'আগে স্কুল কমিটিটা ছিল সুধন্যবাবুদের হাতে। সে প্রায় বছর কুড়ি ধরে গাঁয়ের সব কিছুতে ওদেরই রাজত্বি। বছর দুয়েক হল নির্মলবাবুরা ওদের হারিয়েছেন। আমিও তো বাইরের লোক। এখন আমার হয়েছে এক জ্বালা। শ্যাম রাখি না কুল রাখি...'
'আমিও তো আজ প্রায় বছর পঁচিশেক বেশি এ লাইনে আছি মাস্টারমশাই। সব জায়গায়ই কিছু-না কিছু প্রব্লেম হয়ই আমাদের। কিন্তু এখানে এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে...'
'এর সবই পলিটিক্স দাদা, পলিটিক্স্। এই পার্টিবাজিতেই দেশটা গেল...'
'আমরা তো পলিটিক্স করছি না এখানে। ওসব করতেও আসিনি।'
'সেইটেই ত হল কত্তা..' পায়ের ওপর পা তুললেন মাস্টারমশাই। হাঁটুর ওপর লুঙি তুলে পায়ের পাতায় হাত ঘসতে ঘসতে— 'আবার ওরা বলছে, আপনারা পার্টির কতাই বলছেন। ছেলেছোকরাদের, ছোটজাতের লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। কি সব মিথ্যে কতা আছে নাকি আপনাদের বই-এ। আকালের সময় গরিবমানুষদের পেট মেরে, শস্তায় জোতজমি কিনে সব বড় হয়েছে সুধন্য কুণ্ডুরা...'
'কথাটা কি মিথ্যে মাস্টারমশাই...'
'সে ত আমি জানি না। আমি হিস্ট্রি পড়াই না...'
এবার সুকুমার তার নিজের শিরদাঁড়ায় সোজা হতে চাইলেন— 'সত্যি আশ্চর্য মাস্টারমশাই। অবাক লাগে। গ্রামের শাদাসিধে সাধারণ লোকজন এত কোঅপারেট করছেন আমাদের সঙ্গে—যখন যার কাছে যাচ্ছি, যা চাইছি, এত উৎপাত অত্যাচার—কেউ কিছু বলছেন না। শুধু ওই একজন কি দুজন লোক। ওতেও কিছু যেত-আসত না, ওরা আর কী করবেন? কিন্তু আজ যা ঘটল বাজারে...'
'কেন, আজ আবার কী হল?'

ঝুঁকে পড়ে, সুকুমার আস্তে আস্তে বললেম সবটাই। বাজারের ঘটনা। আনুপূর্বিক বিবরণ।
'এটা কিন্তু শুধু সুধন্যবাবু একা নন, গাঁয়ের আরো দশজনেই ত বলছে একথা…'
সুকুমার সন্দিগ্ধচোখে সোজা হয়ে বসলেন। ভদ্রলোক কি রকম যেন বেঁকে যাচ্ছেন একটু।
'ঘরসংসার ত আমাকেও করতে হয় সুকুমারবাবু। জিনিসপত্তরের দাম যেভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এরকম একটা গাঁয়ে কত টাকার মাল আর বিক্রি হয় বলুন। তার সবটা যদি আপনারাই ঝেঁটিয়ে তুলে নেন…'
'কিন্তু সেকথা তো আর কেউ বলছেন না। এত লোক তো ভিড় করে ছিলেন চারদিকে। কথা তো শুধু ওরা দুজনই বললেন। সুধন্যবাবু আর নিধুবাবু…'
'কাল না পরশু রাত্তিরবেলা দীনুবাবুর বাড়িতে কি হয়েছে বলুন তো ?'
'কে দীনুবাবু ?'
'মন্দিরবাকুলের কাছে আপনাদের কাজ হয়েছিল না কাল ?'
মনে মনে হিশেব কষলেন সুকুমার। বললেন— 'হ্যাঁ পরশু রাত্তিরবেলা…'
'সেখানে দীনবন্ধু চট্টখুণ্ডীর ঘরের সামনে কাজ হচ্ছিল আপনাদের। একে রাত্তির, তাতে আবার এত ভিড় হয় আপনাদের ওখানে। কারা, বাঁদর ছোঁড়া কতগুলো, দীনবন্ধুর খড়ের পালুইর ওপর গিয়ে উঠেছিল। টেরই পায়নি কেউ। একেবারে মাচাসুদ্ধু ভেঙেচুরে তছনছ…'
'সেকি !' বিচলিত সুকুমার— 'জানি না তো। এরকম একটা কিছু ঘটলে অন্তত আমার তো নিশ্চয়ই জানার কথা ·'
'না, আপনাদের কী দোষ। ভিড়ের মধ্যে দু পাঁচটা বজ্জাত ছোঁড়া কে কোথায় কী করল আপনারাই বা জানবেন কি করে ? কিন্তু বেচারি দীনুবাবুর কথাটা ভাবুন তো একবারটি। খুব একটা ভালো অবস্থার লোকও নন তেমন। আপনাদের সিনেমা না কী, তার জন্যে এখন যদি দুপাঁচটা মুনিশ লাগিয়ে ওটা নতুন করে বাঁধতে হয়…'
'না না, ছিঃ ছিঃ…' সুকুমার ব্যস্ত হলেন—'আমি আজই খবর নেব। তেমন কিছু হয় তো উনি করবেন কেন। খরচাপাতি সব দিয়ে আমরাই বেঁধে দেব। ছিঃ ছিঃ এরকম একটা ঘটনা ঘ'টে গেছে ! অথচ আমি এখনও জানি না ! আশ্চর্য !'
তৈলাক্ত দেহে অনেকক্ষণ দলাইমলাই-এর পর হাত দুটোকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিচ্ছিলেন মাস্টারমশাই। মাথা নুয়ে আবার বুক ঘসতে শুরু করলেন—

'এ তো শুধু একতরফা নয় সুকুমারবাবু। শুধু সুধন্যবাবু আর নিধুবাবুর কথাও নয়। গাঁয়ের সব লোক আপনাদের সিনেমার তামাশায় মজে আছে। দুচারজনের ওপর যে সত্যি হুজ্জুতি বাড়ছে, সেটা দেখুন…'

বিব্রত সুকুমার। সর্বাংশে নির্বাক।

'এভাবে যদি ট্রাবল বাড়ে তাহলে যে আমরা মরব মশাই। আপনারা তো আপনাদের কাজ সেরে চলে যাবেন। তারপর আমাদের তো এদের সঙ্গেই থাকতে হবে, চলতে ফিরতে হবে। আমরা যাব কোথায়?'

উঠলেন সুকুমার। খুবই বিনম্রভঙ্গিতে— 'এটা তো বড়ো একটা খারাপ ব্যাপার হয়ে গেল মাস্টারমশাই। দীনুবাবু নিজে এসে বলেছেন আপনাকে?'

'দীনবন্ধু বড্ডো শান্ত মানুষ, বড্ডো ভাল। সাত চড়েও রা করবে না কোনোদিন…'

সদর দরজা পর্যন্ত এগোলেন মাস্টারমশাই— 'সুধন্যবাবুরা বলে গেছেন…'

কিছুটা আশ্বস্ত সুকুমার। ঘটনার সত্যতা অথবা অতিরঞ্জনটাই প্রশ্ন হয়ে উঠছে যখন, ঠিক এই মুহূর্তেই বিচলিত হবার মতো কিছু নয়। মাস্টারমশাই সদর পেরিয়ে রাস্তা পর্যন্ত নামলেন— 'সিনেমা বায়স্কোপ তো আর দেখাটেখা হয় না আমাদের। ইচ্ছেও করে না। সিনেমা তোলাও যে দেখছি মস্ত হাঙ্গামা মশাই। টাকায় টাকা নষ্ট, তার ওপর আবার এত ঝকমারি! ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ…'

ভাবছিলেন সুকুমার। স্নায়ুপীড়ায় মন্থর পা দুটো। পথ দীর্ঘতর।

যেভাবেই এগোনো যাক, যে-পথেই, বাজারটা ডিঙোতে হবে। ভিড় ভাট্টা হয়তো তেমন আর নেই। কিন্তু প্রতিদিনের গুলতানিতে যারা আছেন. তাদের কাছে, বিশেষত আজকের সকালের ঘটনার পর, নিজের উপস্থিতিতে আরো বেশি বিতর্কিত হয়ে ওঠার চিন্তা।

এবং তখনই, ভেতর থেকে জেদটা চাগিয়ে ওঠে। গ্রামে বসে কাজ নেই, কম্মো নেই, চাষবাসের অঢেল পয়সায় কতগুলো ফালতু লোক…

বাজারে পৌঁছেই, দুকদম এগিয়ে চমকে উঠলেন।

পরমদা চেয়েছিলেন। কি যেন নাম বুড়িটার' মনে পড়ল—শেতলাবুড়ি। খুব একটা জোর দিয়ে খোঁজাও হয়নি এ কদিন। দুচারজনকে বলেছিলেন। দুর্লভ বুড়ি আজ একেবারে নাকের ডগায়।

স্থির পলকে তাকিয়ে ছিলেন সুকুমার। ভাঙা হাটে যখন বেচাকেনা সবই প্রায় শেষ, মেছো ঘরের শূন্য চালায় কতগুলো গ্যাড়াকুকুর আঁশটে গন্ধে মাটি শুঁকছে, ছড়ানো ছিটোনো জনকয়েক চাষি চাষিবৌ আনাজপাতি নিয়ে বসে আছে তখনও। দুপাশের দোকানপাট সব খোলা, ইতস্তত মানুষজনের কথাবার্তা, গপপো। সুকুমার ভুলে গেলেন, সকলেই দেখছে তাকে। তার প্রতিটি আচরণেই এদের কৌতূহল।

এগিয়ে গেলেন। কৌতূহল তাঁরও। একটা মুদির দোকানের সামনে গ্রামের আরো কিছু গরিব ঘরের কাচ্চাবাচ্চার চেল্লামেল্লির হুড়োহুড়ির মধ্যে রাস্তার ধুলোয় কী খুঁজছে বুড়ি।

'কী দেখছেন?'

পাশে এসে দাঁড়াল একজন। সুকুমার চেনেন না। তাকালেন নিস্পৃহ—'ওরা কী করছে বলুন তো!'

'ময়না আশের দোকানে গম উঠেছে আজ প্রায় দুমাস বাদে। বস্তা তুলতে কিছু ত পড়েই রাস্তায়। গরিবমানুষেরা কুড়োয়…'

'হুঁ…' অকারণ এবং অতিরিক্ত উৎসুক্য প্রকাশে বিপদ যেখানে, সুকুমার কিঞ্চিৎ মাত্র অব্যয়ধ্বনিতে সংযত হলেন—'ও বুড়ি তো বাগদীপাড়ায় থাকে!'

'আজ্ঞে…'

'এখানে যখন আছে, বিকেলের দিকে তো ঘরে পাওয়া যেতেই পারে…'

'সি কি আর বলা যায়…' হাসলেন পার্শ্ববর্তী একজন—'গরিব মানুষ। পেটের টানে কখন কুথাকে যাবে…'

আস্তে আস্তে আবার সেই অবাঞ্ছিত লোকের ভিড়। অস্বস্তি বাড়ে।

'কেনে? ওকে দে' কী কব্বেন আপুনেরা? উ ত বুড়ি…'

'আকালের বই কত্তে এসে বুঝি ক্যাঙাল খুঁজচেন গ…' একজন যুবক।

চারদিকে হাসি। কোনো অসভ্যতা ছিল না কোথাও। নিতান্তই সহজ সারল্যে কয়েকটি প্রশ্ন। সুকুমার নিঃশব্দে ফিরতে চাইলেন।

কিন্তু কিছুই-জানে-না বুড়ি লোভে লোভে দিশেহারা উন্মাদ। ভাঙাবাঁকা গাছের ডাল তার লাঠি, লাঠি ফেলে হামা দিয়ে দিয়ে পুরনো এনামেলের বাটিতে দুর্মূল্য খাদ্যসংগ্রহে। বুকে পাছায় কাপড়ের ঠিক নেই। ভোরের উঠোনে দানা ছড়ালে, পুণ্যার্থীকে ধন্য করতে যেমন আকাশ থেকে নেমে আসে স্বর্গীয় পাখিরা, তেমনি দেবশিশুদের ভিড়ে একজন শতবর্ষের বৃদ্ধা।

ক্যাম্পের দিকে চলতে শুরু করেছিলেন। থমকে দাঁড়ালেন।

একটি অল্পবয়সী ছোকরা ছুটে গেছে বুড়ির সামনে—'তুমার কপাল খুল্যাচে গ দিদ্মা। যাও না কেনে। সিনিমায় নাইম্যে দিবেন বলচেন বাবুরা। কী ভাগ্যি মাইরি…'

ছেলেটি বলল, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক চড়া গলায়। বধির শেতলাবুড়ি পিচুটি-গলা কুতকুতে চোখ তুলে তাকাল।

ভিড়ের মধ্যে আরো একজন—'কালিয়া কোম্মা মণ্ডামেঠাই ভালমন্দ আরো কত-কী গ এব্‌লা ওব্‌লা রোজ সাঁটাচ্চেন আকালের বাবুরা। বুড়ি যা, বরাত করেচিস জোর…'

তুমুল হাস্যরোল।

'আটকুড়্যার ব্যাটারা, কী বলচিস র‍্যা? কী বই্‌লতি নেগেচিস…' বুড়ি ক্ষেপে গেছে। রাগের ঝোঁকে গাছের-ডাল লাঠিটা কুড়োতে গিয়ে আরো বেশি লেপটে বসে পড়ল মাটিতে। কাঁপা কাঁপা কর্কশ চিৎকারে কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না যদিও, বুড়ির আক্রোশকে ঘিরে পাগলী ক্ষ্যাপানো ছেলেছোকরাদের মজা আর তামাশার হুল্লোড়।

বড়ো বিচ্ছিরি লাগল। সুকুমার এগিয়ে গেলেন—'কেন? কেন এমন করছেন আপনারা। ওকে বিরক্ত করছেন কেন খামোকা?'

ছেলেরা সংযত হলো। যখন ওরা সরে যাচ্ছে হাসতে হাসতে, সুকুমার দেখলেন —আলুথালু শাদা চুলে অপরিচ্ছন্ন জট, লোলচর্ম শিথিলতায় গলিত রবারের মতো কুঁচকোনো চামড়া, ঝুলো-ঝুলো থুতনিগাল, ঝুলো মাই। চেঁচাতে চেঁচাতে ধুঁকতে ধুঁকতে চলে যাচ্ছে বুড়ি—'গুখেকো ঘাটের মড়া মর, মর তুরা… …'

প্রায় অচল, কুঁজো বুড়িকে নিয়ে কি করবেন পরমদা, যদিও জানেন না, সুকুমার ক্যাম্পের দিকে ফিরলেন। সামগ্রী হিশেবে বুড়িকে বগলদাবা করা যেহেতু দুরূহ তার পক্ষে, হরেনকে বলবেন। হরেনই যোগ্যতম এ কাজে। শুধু সংবাদটা পাওয়া গেল—শেতলাবুড়ি গ্রামেই আছে এখন। ভিখ মাগতে যায়নি কোথাও।

পুরোপুরি দ্বিপ্রহর নয় তখনও। লোকেশান থেকে ফিরে আসার কোনো প্রশ্নই নেই। কিন্তু সুকুমার খুশি হলেন, গ্রামের কয়েকজন যুবক-বন্ধু ক্যাম্পে তারই

জন্য প্রতীক্ষায়। পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের মধ্যে যারা স্থানীয়ভাবে কিছু করে বা কোনো-কিছু-না-করে গ্রামে থেকে নেহাৎ-ই বেকার, তাদেরই কয়েকজন। রেলগাড়ির নিত্যি যাতায়াতে যারা চাকরিতে যায়, তারা শহরে।

'সুকুমারদা, এই ত আপনি। কোথায় ছিলেন সকাল থেকে। আপনাকে খুঁজে খুঁজে আমরা আলা.। দেউলপাড়ায় গেলাম। কেউ কিছু বলতে পারে না। সেই থেকে বসে আছি ইশকুলে...'

সুকুমার হাসলেন— 'আপনারা খেয়েছেন তো কিছু? এই, এই গনু, শোন্ তো এদিকে। এদের জন্যে চা করতে বল্, আর কিছু খাবারদাবার...'

'আজ নাকি বাজারে কি হয়েছে সুকুমারদা...' কিছুটা উত্তেজিত লক্ষ্মীনারায়ণ—' 'ওই সুধন্য বুড়ো নাকি অপমান করেছে আপনাকে?'

সংযত সুকুমার— 'না, তেমন কিছু না...'

'করবেই তো...' খুবই ঠাণ্ডা মেজাজে সাধন— 'ফোকটিয়া হাজারটা টাকা ফসকে গেল বুড়োর। নাগেদের বাড়িটা নিলেন না আপনারা। দু-দুটো দোকান লোকটার। এই যজ্ঞিবাড়ির এত এত কেনাকাটা সব আপনারা আনবেন বাইরে থেকে! কত চোট সইবে বলুন ত লোকটা...'

'গেল-বারের ভোটের সময় ওই নিধু দেওয়ানের ছেলে খ্যাংড়াকাঠি সুবলটা কী রামপ্যাদানিই না খেয়েছিল। ওই লক্ষ্মী, লক্ষ্মী মেরেছিল...'

'ও হারামিকে আমি আবার প্যাদাব...'

সুকুমার আঁৎকে উঠলেন— 'না না সেকি! কী সব বলছেন! ওসব করবেন না। আমাদের আরো ক্ষতি হবে।'

'তাহলে বলুন না, শালারা কি বলেছে আপনাকে...'

'বলছি তো, ওসব কিছু না...' দ্রুত প্রসঙ্গান্তরে সরতে চাইলেন সুকুমার— 'আচ্ছা, আপনাদের গ্রামে দীনবন্ধুবাবু কে আছেন বলুন তো?'

'দীনবন্ধু কী? জনা তিনচার ত আছেন। টাইটেলটা বলুন। কত বয়স?"

'এই, কী যেন সারনেমটা...চট্ট...

'চট্টখুণ্ডী?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই...'

'দীনুদা! দীনুদা আবার কী করলেন? উনি ত ভালমানুষ।'

'সেই তো হলো মুশকিল...' সুকুমারের গালে মুখে স্বল্প হাসির ভাঁজ— 'ভালো-মানুষ বলে গোপনে মার খাবেন, সেটাও তো কাজের কথা নয়।'

'কেন, কী হয়েছে তাঁর ?' ছেলেরা বিস্মিত।

পরশু রাতের বেলা খুব একটা খারাপ কাজ হয়ে গেছে…' বিষণ্ণ ক্লিষ্ট সুকুমার— 'ওদের বাড়ির সামনে আমাদের কাজ হচ্ছিল না সেদিন, ভিড়ের মধ্যে কারা যে ওঁর খড়ের গাদাটা ভেঙে দিয়ে গেল…'

'সে কি কতা! আমরা শুনিনি তো…' লক্ষ্মীনারায়ণ সবিস্ময়ে— 'দীনুদাকে ত আজও দেখলাম, সাইকেলে করে বাজারের দিকে যাচ্ছেন…'

'হ্যাঁ, কথাটা কিন্তু সত্যি। আমি আজই ত কার কাছে যেন শুনলাম…' বাসু কিছুটা গম্ভীর।

'আর হলই-বা, এই আশ্বিন-কাত্তিক মাসে দীনুদার পালুই-এ কত আর খড় ছিল।'

'কম হোক বেশি হোক, সেটা তো কথা নয় সাধনবাবু…' সুকুমার হেসে সিগারেট ঠোঁটে তুললেন— 'কাজ হবে আমার আর ভাঙচুর হবে আপনার বাড়িতে, সে তো হয় না…'

'কী মুশকিলের কতা, কত উট্‌কো লোক রোজ আসছে দূর-দূর গাঁ থেকে। এমন ধারা কাণ্ড ত রোজ হাজারটা হতে পারে। সব কি দেখা যায়…'

'দেখতে হবে…' সিগারেটটা ধরালেন সুকুমার— 'আজ বিকেলে আমি একবার দীনুবাবুর বাড়িতে যাব। আপনারা যদি একটু যান আমার সঙ্গে…'

'কেন? কে দোষ করল আর আপনি ক্ষমা চাইবেন?' ছেলেরা অভিভূত।

'ক্ষমা তো চাইতেই হবে। শুধু ক্ষমা কেন, খড়ের গাদাটা নতুন করে গড়ে দিতে খরচাপাতি যা লাগে সব আমরা দেব। সেটা আমাদের দায়িত্ব…'

ছেলেরা অবাক। বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে বলেই ফেলল লক্ষ্মীনারায়ণ- 'সত্যি আপনারা এত ভাল লোক, আর আপনাদের নামেই এমনধারা বদনাম করে হারামি বুড়ো ভুটো। কিছু ভাববেন না সুকুমারদা। কেউ কিছু করবেনি আপনাদের। করে ত আমরা আছি কী করতে! আমরা থাকতে গাঁয়ের বদনাম হবে, এ কি মাজাকি নিকি…'

ডিমভাজা আর পাউরুটি নিয়ে এল গোবরা। সঙ্গে চা। ছেলেরা সোৎসাহে খেল। ভর দুপুরবেলা।

'কিন্তু সুকুমারদা…'

'বলুন।' শোভেন মুচকি হাসছে— 'ভিড় ত আপনারা আটকাতে পারবেন না। ওটা সম্ভব নয়। এখন ত দেখচি, আপ-ডাউনে রেলগাড়ি বোঝাই করে

অনেক দূর-দূর থেকে লোক আসতে শুরু করেছে। এর পর গাঁয়ের কেউ যদি বলে, আমার ঘটিটা বাটিটা খোয়া গেল, মরাই-এর ধান ভেঙে নিয়েছে কে...'

সুকুমার হাসছেন— 'সে তখন দেখা যাবে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা...'

আস্ত ডিম মুখে পুরে সাধন চেঁচাল— 'ইস, আমাদের পাড়ায় শুটিংটা করুন না একদিন। আমার বাচ্চা ভাইঝিটার গলায় একটা সোনার চেন চড়িয়ে আপনাকেই সাক্ষী বানিয়ে রাখব।'

মস্ত একটা ভ্যান গাড়ি, একটা জিপ, কালো আর নীল দুটো অ্যাম্বেসেডর গাঁয়ের মানুষের অভ্যস্ত চোখে এখন আর নতুন কিছু নয়। ধুলো উড়িয়ে, হর্ন বাজিয়ে এরা প্রায়ই তোলপাড় করছে মোহনপুর হাতুই-এর সকালসন্ধেদুপুর-রাত্তির। উনুনে ভাতের হাঁড়ি রেখে আর ছুটে আসছে না গৃহবধু। রাস্তায় পড়লে ঘাসের কিনারে সসঙ্কোচে অথবা সন্ত্রাসে সরে দাঁড়ায় পথের মানুষ। বাগদীপাড়ার নিরিবিলি মানুষেরা আচমকা ঘাবড়ে গেল বাবুদের হঠাৎ হানায়। বেলা তখন দুটো। পড়ন্ত বেলার চড়া রোদ। গাছপালার কাঁপুনি নেই। নির্জন গ্রামের রাস্তায় জিপ আর নীল অ্যাম্বেসেডরের বেমানান যান্ত্রিক ধ্বনি। গোসাইপাড়ার শ্রীনাথ গোসাইর বাড়ির গা ঘেঁষে বাঁক ঘুরতেই একটা কর্কশ আওয়াজ। পাকা রাস্তা ছেড়ে কিঞ্চিদধিক পাঁচ থেকে সাত হাত চওড়া কাঁচা রাস্তায় নেমে পড়েছে সামনের জিপটা এবং তারই অনুসরণে রাজু দ্রুত স্টীয়ারিং ঘোরাতেই গাড়ির ভেতর মানুষগুলো ঝাঁকুনি-খাওয়া শিশিবোতলের মতো এলোমেলো ঠোকাঠুকি খেয়ে কোনোমতে সামলে নিল নিজেদের। বিশেষত নন্দিতা চেঁচিয়ে উঠল—'এ কি! এ কি! কী হচ্ছে পরমদা?'

পরমেশও ধমকে উঠলেন—'এই রাজু, কী করছিস তুই?'

'কী করব? রাস্তা বহুৎ খারাপ...'

আসলে রাস্তাই নয় এটা। স্পিডোমিটারের কাঁটা শূন্যে আটকে রেখেও গাড়িটা আপাতত গলুই-নাচানো নৌকো। সঙ্কীর্ণ পথে খানখন্দগর্ত দেখে এদিক ওদিক করতে দুপাশের গাছগাছালির ডালপালা ঢুকে যাচ্ছে গাড়ির ভেতর। বড়োসড়ো একটা খেজুরচারার ধারাল পাতার ঝাপটা খেয়ে আরতি আঁৎকে উঠতেই পরমেশ আরো জোরে হুঙ্কার দিলেন—'স্টপ।' সুকুমার বসাককে ছাপিয়ে হাত বাড়িয়ে স্টিয়ারিংটাই ধরে ফেললেন ডান হাতের মুঠোয়।

সবাই নামলেন। সামনের সিটে সুকুমারকে মধ্যবর্তী রেখে ড্রাইভার রাজু আর পরমেশ। পেছনে তিন অভিনেত্রী। সম্মুখবর্তী জিপটাও থেমে গেছে। সেখানে ক্যামেরাম্যান নির্মল বিতোষ ধ্রুবজ্যোতিকে নিয়ে ক্যামরাসহ অ্যাসিস্ট্যান্টরা এবং আজকের এই মুহূর্তের অভিযানের গাইড হরেন আওন।

নির্মল ছাড়া টেকনিসিয়ানরা জিপেই রইলেন ক্যামেরার পাহারায়। বাকিদের নিয়ে এগোলেন পরমেশ। গাড়িটা বেশিদূর এগোল না যেহেতু, কিছুটা হাঁটতে হবে।

পথপ্রদর্শক হরেনের মতে—'বিশি দূর লয় গ বাবু, ই ত কাছেই...'

সুকুমার বসাক প্রদত্ত সংবাদে আজকের প্রোগাম যেমন ছিল, একই রইল। একটু অদলবদল হলো মাত্র। সকলেই যথারীতি চলে যাবে হাতুই। শুধু ক্যামেরা ক্যামেরাম্যান আর সংক্ষিপ্ত দল নিয়ে পরমেশ ঘুরে যাবেন বাগদীপাড়া। বুড়িটাকে যখন গ্রামে দেখা গেছে, যদি ঘরে পাওয়া যায়, ক্যাম্পে তুলে আনার প্রয়োজন নেই। গোটাকয়েক ধ্বনিহীন শট তো মাত্র। বরং নিজের পরিবেশে ওর প্রাকৃতিক নড়াচড়ার মধ্যেই ওকে ধরে রাখার চেষ্টা হবে।

যেতে যেতে, নিচু হয়ে ডাঁটাসুদ্ধ একটা কাশফুল ছিঁড়ে নিয়েছে ধ্রুবজ্যোতি। নন্দিতা আর আরতির বাসনাপূরণে আরো দুটো তুলে দিতে হলো। রাস্তার ধারে সারি বেঁধে কিছু কাশফুল।

নিবিড় গাছপালা ঝোপজঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে সবই মাটির ঘর। গাড়ির শব্দে বেরিয়ে এসেছে গরিবমানুষেরা। মিছিল করে পিছু নিচ্ছে না কেউ। বরং বিস্ময়ের চোখগুলো লোলুপ—তাদের পাড়ায় এসেছেন বাহারের সিনেমাবাবু দিদিমণিরা।

অন্যান্যদের পেছনে রেখে হরেন এবং সুকুমারকে নিয়ে জোর কদম এগোচ্ছেন পরমেশ। বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না এখানে। বিকেলের শিফটে আজ অনেক কাজ।

দৃশ্যটা ভয়ঙ্কর। হুড়মুড় করে সামনের দিকে ভেঙে পড়তে চাইছে খড়ের চালা। পচে পচে কালচে-হয়ে-ওঠা খড়গুলোও অবশিষ্ট নেই। একপাশে আবরণহীন বাঁশের কঞ্চি। তপোবনগোছের ঘন নিবিড় প্রকৃতি সত্ত্বেও ম্যালনিউট্রিশন গোটা বাগদীপাড়ায়। ভাঙা মেটেঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া চট ছড়িয়ে শায়িত এক বুড়ি। কুতকুতে চোখজোড়া চেয়ে-আছে কি বুজে-আছে চেনা যায় না থেঁৎলানো চামড়ার ভাঁজে। কাৎলা মাছের ভঙ্গিতে মুখের-হা। নিঝুম। পাশে এনামেলের তোবড়ানো বাটি, গাছের ডাল-ভাঙা লাঠি সাপের শরীর।

আচমকা একটা ধাক্কা সামলে সকলেই থমকে দাঁড়াল। পরমেশ নিঃশব্দে তাকালেন সুকুমারের দিকে।

সুকুমার গম্ভীর— 'ঘুমোচ্ছে।'

'কেমন কর্যে হবে গ ডেক্টরবাবু, গা ভর্যে জ্বর যি গ বুড়ির···' পণ্ডশ্রমে বড়োই কাতর হরেন। যেন ওরই একটা অপরাধ থেকে গেছে কোথাও। বুড়ির অসুস্থতায়।

'কম্প দে' জ্বর এয়েচে ঢুকুরবেলা। পেটে খানা লেই, পথ্যি লেই। চিল্লাতি চিল্লাতি ঘুইম্যে পইড়েচে···' একজন বুড়ো পরমেশের পাশে।

আশেপাশে আরো যারা বাগদীপাড়ার স্বজনস্বজাতি আপন মানুষেরা, সকলেই চুপচাপ। থানার বড়োবাবু খুনখারাপির তদন্তে এলে ঠিক এমনটা হয়। চোখে চোখে কৌতূহল বাড়ে। কথা থাকে না মুখে।

'জ্বর হয়েছে। কাছেপিঠে ডাক্তার নেই এখানে?' পরমেশ তাকালেন পাশে।

'সি ত অনেক দূর গ বাবু। সি পলাশডাঙা···'

'ঝেড়ে কাশুন দিকিন আপুনেরা। কেনে এয়েচেন ইখেনে?'

পরমেশ চমকে উঠলেন। ভিড়ের মধ্যে বাঁ হাত-কাটা এক যুবক। অপ্রত্যাশিত উদ্ধত ভঙ্গি।

'আমরা ওর একটা ফটো তুলতে চাই।'

'ফোটো খিচ্যে ত সিনিমার পয়সা লুটবেন আপনেরা। গরিব মানুষের কী হবে? ট্যাকা দিবেন? খেতেপত্তে দিবেন উয়াকে?'

কী বলতে এগোচ্ছিল হরেন। পরমেশ টানলেন ওকে। নিজে এগিয়ে গেলেন। ত্রিশ বত্রিশের বেশি হবে না বয়স। সবল শিরদাঁড়ায় এক জোয়ান। অথচ ওরই একটা হাত নেই। কাঁধ থেকে বেরিয়ে-আসা একটা মাংসপিণ্ড ঝুলছে বাঁদিকের বগল ঘেঁষে। মাংসপিণ্ডটা মিশে যেতে পারছে না বগলের তলায় চামড়ার সঙ্গে। বড়শির আংটার মতো কৌণিক। আক্ষেপ নেই অথবা প্রতিবন্ধের আক্ষেপ থেকেই চাষাড়ে চোয়াল আর তীক্ষ্ণ চোখজোড়া।

'দেখুন, আপনাদের কারও কোনো ক্ষতি করতে আসিনি আমরা। আপনাদেরই কথা, আপনাদেরই দুঃখ বা লাঞ্ছনা···' খুব শান্ত, কিছুটা বিনত পরমেশের কণ্ঠস্বর— 'সায়ত্রিশ বছর আগে একবার আকাল এসেছিল দেশে···'

'বাপের আমলের সি আকাল খুঁজতে এয়েচেন? বারো ট্যাকা মণ চালের বস্তা, সি আকাল?' গালের ভাঁজে হাসতে চাইল সে যুবক— 'আকাল এখনে নেই?'

রক্তে রক্তে কেঁপে উঠলেন পরমেশ। চোখে চোখে নন্দিতা ধ্রুবজ্যোতি এবং অন্যান্যরা।

‘আকাল ত আমাদের সব্বো অঙ্গে গ বাবু…’

শহরের বাবুদিদিমণিরা স্তব্ধ যখন

‘জম্মো থিক্যে দেখে আসচি আকাল…’

যুবক নড়ল না। দাঁড়িয়ে রইল। এবং নির্বোধ চোখের ভিড়ে মুখ্যু এক বাগদী ছোঁড়ার বুক চিতিয়ে কথা বলার ধরণ দেখে কেমন ঘোর লাগল হরেনের— ‘তুই এমন ধারা কতা কেনে বলচিস র‍্যা পরান? এনারা মান্যিজন…’

‘কেনে? অমান্যি কর‍্যাচি?,

‘না না, তা নয়…’ যেন ডুবজল থেকে মাথা তোলার প্রথম সুযোগেই হাঁপ ছেড়ে স্বাভাবিক হতে চাইলেন পরমেশ— ‘এখানেই থাক তুমি?’

‘অ্যাঁ…’ হরেন তড়বড়িয়ে— ‘উই ত উয়ার ঘর গ বাবু। উই…’

‘কী নাম বললে? পরান! পরান কী?’

‘পরান. পরান পোড়েল গ বাবু।’ পরান নয়, বলল পার্শ্ববর্তী অন্য একজন। পরান কাটা-হাত উঁচিয়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে। মাংসপিণ্ডটা রেলস্টেশনের সিগনাল-প্লেটের মতো। লাল কি সবুজ সঙ্কেত, ঠিকমতো বুঝে উঠতে না-পারার দ্বিধায় হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে পাততাড়ি গোটাতে চাইলেন পরমেশ— ‘তাহলে আজ তো আর হচ্ছে না আমাদের কাজ। আপনারা বরং ডাক্তার-টাক্তার দেখান। খরচটরচ যা লাগে, আমরাই দেব…’

‘বুড়ির নাম ত খচ্চার খ্যাতায় নেকাই হয়্যা আচে গ বাবু…’ বলল বয়স্ক এক চাষি— ‘পরানকে দেখলেন। উয়ার ছুট্ট ছেল্যাটারও কঠিন ব্যামো। কি লাল ওষুদ দিচ্চেন হিলথ-ছিন্টরের ড্যাক্তরবাবু। সারচেনি। বিনি পয়সার ওষুদে কি রোগ সারে নিকি গ! বলে, ভালমন্দ খাওয়াতি হবে। শোনো কতা। উই যো কতায় বলে না— উদ্ খেতে খুদ নাই, ধরম ঘরে চান্দা। ড্যাক্তরবাবু ত বল্যেই খালাস গ, গরিবমানুষ পয়সা কুথাকে পাবে?’

ভিড় থেকে নিঃশব্দে সরে যাচ্ছে হাত-কাটা মানুষটা। নিজের দাওয়ায় গিয়ে বসল— ‘ইসব কতা কেনে শুধোচ্চ গ ধম্মোখুড়! বকচ কেনে?’

‘বলচি কি আর ইমনি র‍্যা। বাবুরা এয়েচেন ঘরের দোরে। ই হল নেয়ত্তি নেববন্দের কতা। গরিবমানুষে বাঁচবেনি।’

পরমেশ মোচড় ঘুরলেন। তিনি মন্ত্রী বা এম. এল. এ নন। বেলা গড়িয়ে

যাচ্ছে দ্রুত। হাতুই-এ পৌঁছে অপেক্ষা করছে দলের সবাই।

নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফিরে যাবার মুখেই অন্যত্র আরেক দৃশ্য। সকলের অলক্ষ্যে প্রতিমাই দেখেছে প্রথম—বাগদীপাড়ার পুরুষমানুষেরা যখন বাবুদের ঘিরে বটতলা বসিয়েছে পরান পোড়েলের ঘরের দোরে, চারপাশের গাছগাছালির ফাঁকে দূরে দূরে ঘরের দাওয়ায় বৌ-ঝিরাও জড়াজড়ি জটলায় দেখছিল শুনছিল বাবুদের। কৌতূহল কোলাহলের বাইরে যেন 'মচ্চি নিজের জ্বালায়, তুমাদের রসের কেত্তনে আমার কী গ…' এমনি এক উদাস ভঙ্গিতে এক-দেড় বছরের ন্যাংটো রিকেট খোকাকে মাটিতে ফেলে রেখে ফাটাফুটো মাটির পাঁচিল থেকে ঘুঁটে তুলছিল যুবতী-বৌ।

পরমেশ চমকে উঠলেন। আস্তাকুঁড়ের জঙ্গলে এমন এক সুঠাম কাঠামো! ডেরকটরবাবু দেখতে এক ঝলক তাকিয়েছিল মেয়েটা, কৃষ্ণকলি না-হোক, গাভীর মতো ড্যাবড্যাব এক জোড়া চোখ!

ধুলোকাদার ন্যাংটো খোকাকে গাল টিপে আদর করে এগিয়ে এলেন প্রতিমা দাশ—'ওই হাতকাটা মানুষটার বৌ…'

'হ্যাঁ গ বাবু, পরানের বৌ। দুগ্‌গা উয়ার নাম…' জটলার যে অংশটা গায়ে গায়ে লেপটে পায়ে পায়ে এগোচ্ছিল, তাদেরই একজন, বাগদীবুড়ো ধর্মদাস—'অমন জোয়ান মরদ মানুষের হাতটা কেট্যে দেল শরের হারামি ড্যাক্তর। হাত গেল, শ'রের কাজ গেল। ঘরে বস্যে খাবে কি গ বাবু! তবু ত দুগ্‌গা ছেল গ! সোমত্তা বৌটা পরের দোরে খাটচে দিনরাত্তির। চাষের সমে মাঠে যাচ্চে মালিকের ঘরে যাচ্চে।' আবাদের সমে যা-হোক-কর্যে ত চলে গ বাবু। হাতে কাজ নেই ত গরিবের পেটে খ্যানা নেই…'

গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে সুকুমারকে খুঁজলেন পরমেশ। একটু পিছিয়ে পড়েছেন সুকুমার ধ্রুবজ্যোতি হরেন।

ধর্মদাস বলছে—'পরান এট্টা বৌ-এর মতো বৌ পেয়েছেল গ বাবু। বেঁচ্যে গেল ই জম্মে। দেখচি ত রোজ। মিছে বলবনি। মিছে বললে মুক খস্যে পব্বে। মুলো সোয়ামির তেমন রোজগার নেই, কোলের বাচ্চাটার ব্যামো। বড় ছেল্যাটার বয়েস ত সবে বারো না তের। মোট বয় ইস্টিশানে ধানের কলে। বৌটা খেট্যে মচ্চে সকাল্ সন্ধে। মুড়ি ভাজচে চিঁড়ে কুটছে ঘুঁটে গোবর ঘাঁটচে, ইটা উটা বেঁচতে যাচ্চে হাটেবাজারে বাবুদের থানে…'

ঝোপঝাড়ের মধ্যবর্তী সিঁথিকাটা সরু রাস্তা। শার্টপ্যান্টে কোনো অসুবিধা

নেই পরমেশ বা ধ্রুবজ্যোতির। খেজুরচারায় প্রতিমার শাড়ি আটকে গেল।

চওড়া মেঠো সড়কে উঠে সুকুমারকে আড়ালে ডাকলেন পরমেশ—'দেখুন তো, কী করা যায়! ওই বুড়িকে আমার দরকার। মিনিট পনের থেকে আধঘন্টা। দুটো মাত্র শট...'

নিঃশব্দে শুনছেন সুকুমার। সিগারেট ধরাচ্ছেন।

'আর এখানে এসে যখন অদ্ভুত একটা সিচুয়েশানে পড়েই গেলাম...' সিগারেট ধরাচ্ছেন পরমেশ নিজেও—'না-হয় হাতে ধরে কিছু টাকা দিয়ে দিন লোকটাকে। কী যেন নাম বলল...'

'পরান পোড়েল...'

'হ্যাঁ, বেশ ভাঁটিয়াল তো ছোঁড়া। বেশ লেগেছে আমার। এক পলক দেখলাম ওর বৌটাকে। আশ্চর্য তো...'

বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে গোটাকয়েক গরুকে নিয়ে চরানি থেকে ফিরছে একজন বুড়ো চাষ। সঙ্গে আরো দুটো বালক। সারি বেঁধে চলে যাচ্ছে গাভীদল। যেন ভাবনার গভীরে অপলক চোখ রেখে পরমেশ—'মেয়েটাকেও যদি একটু ফ্রেমের মধ্যে ধরা যেত কোনো রকমে...'

'ঠিক আছে। আমি দেখছি। আপনি যান...'

'কী দেখবেন?'

'আপনি কাজে যান। এদিকে ভাববেন না...' নড়েচড়ে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে ফিরলেন সুকুমার—'গাড়িটা ব্যাক করে বোধ হয় পাকা রাস্তায় নিয়ে গেছে রাজু। আপনারা চলে যান। আমিও এখান থেকে হাতুই যাচ্ছি এক্ষুনি। হরেন আমার সঙ্গে থাক...'

সুতরাং ভারমুক্ত নিঃশ্বাসে পরমেশ এগোলেন।

শুধু গাড়ি নয়, এতগুলো লোক বয়ে জিপটাও পৌঁছলো, যেখানে কয়েক শ কৌতূহলী মানুষের ভিড়ে চিত্রনাট্য-নির্দেশে সব কিছু এবং সবাইকে নিয়ে অধীর প্রতীক্ষায় ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট দীপক। কনটিনিউটি সিট সাজিয়ে দ্বিতীয় সহকারী প্রদীপ চৌধুরী। অনাদৃত দুলে পাড়া। ফগু দুলের ভাঙাঘর। খাজুরাহো কি তাজমহল। এদিক ওদিক থেকে ছোট বড়ো সোলারগুলো ঘিরে রয়েছে।

কাটাফুটো কুঁড়ে ঘর। সিক্স-বালব-মিনিব্রুট ক্যামেরার গা ঘেঁষে। পায়ে পায়ে জড়িয়ে, উঠোন পেরিয়ে অনেক দূর অবধি বিজলি বাতির তারগুলো। জেনারেটারটা গর্জে উঠলেই হাজার চোখের সামনে তেজী তেজী আলোর রোশনাই। কণ্ডু তুলের ঘর মহাষ্টমীর রাতে মা-দুর্গার আরতিমঞ্চ কিংবা বাবুদের থিয়েটার।

সহকারী ক্যামেরাম্যানদের কর্মচাঞ্চল্যে বাউন্সবোর্ড আর রিফ্লেক্টারগুলোর অবস্থান স্থির হচ্ছিল। পাশেই রাখো তুলের মেটেঘরের অন্ধকারে দরজায় খিল তুলল নন্দিতা। রঙিন অগাণ্ডি পাল্টে ধুলোকাদায় মলিন গিঁট-বাঁধা লালফুল-পাড় পুরনো মিলের শাড়ি। বিনুনি ছিল না। হেয়ার ক্লিপ তুলে এলোচুলে হাতখোঁপা বাঁধার পর মেকআপম্যান শিবনাথ বিশ্বাস হয়তো হাত দেবেন একটু। একটু রং ছোঁয়াবেন হাতে পায়ে ঘাড়ে অনাবৃত অংশে।

সিন 91 শট 1 টেক 1 জি. টি ডে 13 4 80

গোটা শরীরে ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি নিয়ে বাঁশবাবুদের কাজ থেকে ঘরে ফিরেছে অর্জুন। সর্বাঙ্গের দাহে টলতে টলতে। কাঁপা-কাঁপা হাতে আক্রোশের খাঁড়া, ওরফে শাণিত কাটারি। কাটারিটা ছুঁড়ে ফেলেই আছড়ে পড়ল উঠোনে। দিশেহারা সাবিত্রী চিৎকারে চিৎকারে ছুটে আসবে ঘর থেকে। ঘরদোর শ্মশান করে শহরে চলে গেছে যারা, জনহীন সহায়শূন্য চাষিপাড়ায় পড়শিরা কেউ নেই। চৌকাঠ ডিঙিয়ে ক্ষয়ে-যাওয়া-সিঁড়ির ধাপ গড়িয়ে উঠোনে হামলে পড়ে ভুলে গেল প্রসূতি—গর্ভস্থ সন্তান। সূর্য সাক্ষী, চন্দ্র সাক্ষী, গাছপালাআকাশবাতাস, সাক্ষী ভগবান—ই আকালে সোয়ামি গেলে গভ্ভোয় অজন্মা গ ··
কাঁধের তোয়ালেটা এগিয়ে দিলেন শিবনাথ। গালগলাকপাল আরো একবার মুছে নিয়ে নন্দিতা কিছুটা বিমর্ষ। বড্ডো ভয় করছে তার। পাঁজর ছিঁড়ে সর্বশূন্যতার আর্তনাদটার উৎপাটন। কী ভীষণ, কী নির্মম কঠিন।
পরমেশ সস্নেহে হাত রাখলেন কাঁধে— 'এই তো দেখে এলে একটু আগে। মানুষ···'
হেয়ার-হোয়াইট্নারের ব্রাশটা শিবনাথ আলতো করে ছুঁয়ে দিচ্ছিলেন কিরণময়ের চুলে। কিরণময় এগিয়ে এলেন। একান্তে, কানে কানে— 'কান্নাটা পাবে। সাপোজ ইউ হ্যাভ বিন্ ব্রুটালি রেপড বাই সাম মিসক্রিয়েন্টস, নোন্ অর আননোন, অ্যাণ্ড লেফট্ ডেজার্টেড···'

চমকে তাকাল নন্দিতা। চোখে চোখ রেখে।

নিরাসক্ত কিরণময়— 'আসলে ওই একটাই তো সিকোয়েন্স। মালতীর আর্তনাদটাই আমরা নানাভাবে গোঙাচ্ছি সবাই। কলেজের ক্লাশ নিচ্ছো না। ফেসিং দ্য পিপ্‌ল আফটার বিইং রেপড লাইক দ্য হোল অব বেঙ্গল, নাইনটিন ফর্টি থ্রি—এ ডেলিবারেট অ্যাণ্ড প্রিপ্ল্যানড ইম্পেরিয়ালিস্ট ডিভাইস…থার্ড-রাইখের গ্যাস চেম্বারে যখন হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, তখন, ঠিক একই সময়ে হিটলার-বিরোধীরা এত বড়ো পৃথিবীর মানচিত্রে বেছে নিয়েছিল বাংলা-দেশটাকে। সায়লেণ্ট ডেথ অব থার্টি-ফাইভ ল্যাকস অব পিপ্‌ল, প্রিপস্টরাস মার্ডার…'

ওদিকে নেংটি পরে সিগারেটের শেষটানটুকু সেরে নিচ্ছিল ধ্রুবজ্যোতি—অর্জুন। শেষবারের মতো শিবনাথ আবার একটু রং ছোঁয়ালেন কিরণময়ের বাঁ-কাঁধের ধার ঘেঁষে বুকে। ক্ষুধার ছোবল মেরেছিল ছেলে। দগদগে ঘা-টা থাকবে। সব্বোনাশী আকাল গিলে খাবার আগে পর্যন্ত চন্দ্রধর বইবে বিষক্ষত। অবিশ্বাসের বিষ।

'সায়লেণ্ট সায়লেণ্ট…' সুবিশাল কর্মকাণ্ডকোলাহলে মহিমময় পরমেশ প্রবল হুঙ্কারে— 'গেট রেডি; ক্যামেরা সাউণ্ড…'

অনেক রাত পর্যন্ত কাজ হলো। অনেকগুলো দৃশ্য। শেষপর্যন্ত সহস্রাধিক দর্শকের ভিড় ছিল। যাত্রাপালার আসর ভাঙলে যেমন হয়, জমাট ভিড় গলতে শুরু করল। গায়ে-গায়ে-ধাক্কা। রাত তখন আটটা। চিরাচরিত বিধিমতে ক্ষেত-মজুরের গ্রাম হাতুই-এ মধ্যরাত।

ক্যাম্পে ফিরে ক্লান্ত অবসন্ন মানুষগুলো যে-যার-মতো নিজেদের বিশ্রাম বেছে নিয়েছে। সর্বজনীন চা-জলখাবারের পর কোথাও ঘুম কোথাও তাস কোথাও আড্ডা। রুদ্ধঘরে বিশেষ কয়েকজনের আপ্লুত নেশা।

সত্যভূষণ মল্লিক, পঞ্চায়েত সদস্য হরিনাথ সাঁতরা এবং হেডমাস্টারমশাইকে নিয়ে স্কুলের সেক্রেটারি নির্মল ঘোষ এলেন সন্ধ্যার কিছু পরে। ঘরে ঘরে গিয়ে স্থানীয় যুবকদের খবর দিয়ে এসেছে হরেন—ভূদেব লক্ষ্মীনারায়ণ বাসু মোহন ষষ্ঠী ক্ষ্যাপা শ্যামাপদ মোটামুটিভাবে সকলেই উপস্থিত। দেহেমনে অবসাদে ক্যাম্পে ফেরার পর, যদিও কিছুমাত্র উৎসাহ নেই, পরমেশকে কিছুটা সময় দিতেই হয়। স্থানীয়

কর্তাব্যক্তিদের সম্মানে। সুকুমার বসাক সতর্কভাবে আগলে রইলেন। এখন, এই অবস্থায় কিছুতেই কিছু বুঝতে দেওয়া চলবে না পরমদাকে। বিস্তর জোত জমি আর কাড়ি কাড়ি পয়সা আছে বলে, হালহেতলের জোরে যা-খুশি-তাই করে যাবে সুধন্য কুণ্ডুরা, দেশপাড়াগাঁয়ে সে দিন আর নেই। সুধীজনেরা সমস্বরে এ রকম আশ্বাসই দিলেন পরমেশকে। গ্রামে অন্য মানুষও আছে।

বুড়োদের আড়াল করে যুবকদের নিয়ে বাইরে এলেন পরমেশ। ঠাট্টারসিকতায় কাটালেন মিনিট দশেক। পিঠ চাপড়ালেন। পড়াশুনো আর প্রেম করতে বললেন সবাইকে। বয়স থাকতে থাকতেই ও দুটো সেরে ফেলতে হয়। পরে আর হয় না।

ছেলেরা ভীষণ খুশি। তাদের কাছে পরমেশ মিত্র একটা মস্ত নাম। অথচ কী শাদাসিধে সহজ মানুষ! কাছাকাছি না এলে বোঝাই যায় না খবরের-কাগজের-খবর মানুষগুলোকে। যুগপৎ অভিভূত বিস্মিত তারা।

আসলে খুশিটা তাঁর অন্তর্গত। আজকের কাজকর্মের মধ্যে নতুন নতুন সব অর্থ খুঁজে পেয়ে গেছেন নিজেরই ভাবনাচিন্তাব। সকলেই বড়ো অনুপ্রাণিত ছিল আজ। অসম্ভব ভালো নন্দিতা। এবং সেই একই খুশির টানে সারাদিনের কাজ-কর্মের পর, অবসাদ সত্ত্বেও, জমিয়ে আড্ডার মেজাজ। দোতলায়, দখিন বাতাসের বারান্দায় বসে গেছে অনেকেই। গত পাঁচ সাত দিনেব কাজকর্মের ওপর বেশ কিছু স্টিল-ফোটোগ্রাফ পৌঁছে গেছে হাতে। প্রায় দেড়শর বেশি ছবি। পরমেশ পুরো প্যাকেটটাই নন্দিতার হাতে তুলে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। স্নান সেরে, প্যান্টশার্টের বদলে পায়জামাপাঞ্জাবিতে হালকা হয়ে আড্ডায় বসতে একটু সময় লাগল তাঁর।

তখনও ছবিগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে সবাই। হাতে হাতে ঘুরছে স্টিলগুলো। সকলের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার মুহূর্তে স্টিল-ফোটোগ্রাফার সুকান্ত সান্যালের মুখেচোখে কখনও উদ্বেগ, কখনও প্রসন্নতা।

'ফ্যান্টাস্টিক...' পরমেশের প্রবেশেই নন্দিতার উচ্ছ্বাস—'দেখুন পরমদা, দেখুন...'

চেয়ারে বসার আগে একটা সিগারেট ধরাচ্ছিলেন পরমেশ। পরিচ্ছন্ন স্নানের পর বেশ লাগছে শরীরটা। "খাটাখাটুনির ক্লান্তিতে একটু চাঙা হতে একান্তভাবে নিজের জন্য আলাদা কনিয়াক। মেজাজটা খোলতাই রাখতে ঠিক যেটুকু প্রয়োজন। বললেন—'আমি দেখেছি। এবার তোমরা দেখো...'

'আপনি তো দেখবেনই। সে তো সবাই জানে…' শাদা-হলুদ বুঁটিদার অর্গাণ্ডিতে আজ বড়ো উজ্জ্বল নন্দিতা। সবাইকে ছাপিয়ে এগিয়ে এল—'এমন একটা রাস্টিক ব্যাপার আছে ছবিটায়! ভীষণ ক্রুড। কিন্তু…কিন্তু ক্রুডিটির একটা ডিগ্‌নিটি আছে না! যা গুণ্ডাবদমাশডাকাতদের ক্রুয়েলটি নয়, সেটা এমন দদারুণ এসেছে এখানে…'

হাত বাড়িয়ে ছবিটা নিলেন পরমেশ। সেই দৃশ্য, যেখানে ধারালো কাটারি নিয়ে বাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে অর্জুন। ক্ষুধার আক্রোশ। এবং মরতে চেয়েও যেখানে প্রশান্ত ঔদাসীন্যে যন্ত্রণায় কাতর চন্দ্রধর।

হাসতে হাসতেই ছবিটা ফিরিয়ে দিলেন—'তুমি মেয়ে তো। তাই। পুরুষমানুষকে ওরকম ক্রুয়েল দেখলে ভালো লাগে বেশ।'

সবাই হেসে উঠল।

নন্দিতা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নয়। নিজের জায়গায় ফিরতে ফিরতে—'আসলে কিরণদা এবং দুজনই এত ভালো করেছেন সেদিন। তিনটে টেক্ হলো। আমার মনে আছে। তিনবারই ফ্যান্টাসটিক…'

'আজ কী অদ্ভুত একটা লোক দেখলাম বলুন তো! সেই হাত-কাটা মানুষটা…'

আরেক প্রান্তে বিতোষের বাক্যটা সচকিত করল সবাইকে। ঝলকে উঠল ধ্রুবজ্যোতি—'রিয়েলি। চোখ দুটো দেখেছেন! কী ভীষণভাবে তাকিয়ে ছিল পরমদার দিকে। আমাকে তো এখনও হণ্ট করছে…'

'ওর ওই অ্যাম্পুট-করা হাতের ঘটনাটা শোনা হয়নি। শুনতে হবে হরেনের কাছে…' সামনের বেঞ্চিটায় অর্ধেকের বেশি ফাঁকা। চেয়ারে পিঠ রেখে, বেঞ্চিতে পা তুলে গা এলিয়ে বসেছেন পরমেশ। বললেন—'ওর দেমাক বলুন বোকামি বলুন গোয়ার্তুমি বলুন, সব কম্‌প্লিকেশান কিন্তু ওই কাটা হাতটা থেকে। ডেফিনিটলি দেয়ার ইজ এ স্টোরি…'

'সত্যি…' মৌন থেকে ধীরে ধীরে প্রতিমা দাশ তার স্নিগ্ধতায়— 'এসে অবদি গরিব মানুষ তো কম দেখছি না এখানে। সকালে বিকালে উঠতে বসতে কাতারে কাতারে মানুষ। কিন্তু সবার চেয়ে অবাক করল ওই লোকটা। ওর বৌটা বলছিল —আর তো চলে না গ দিদি। আপনারা পালাগানের দলে কত লোক তো নিচ্ছেন গ। নিন না কেন ওকে। এক হাতে দশটা মানুষের কাজ করবে। অনেক কাজ জানে। নয় তো আমায় নিন। এঁটোকাঁটা সাফ করব, বাসন মাজব, কাপড় কাঁচব, পায়ে আলতা পরিয়ে দেব আপনাদের…'

'আলতা পরিয়ে দেবে…' নন্দিতা হেসে উঠল।
'হ্যাঁ, ও ওর মতো বলেছে কথাগুলো। মানে, কাজ চায় আর কি? পরমেশ-বাবুকে বলার তো সুযোগই পেলাম না। সুকুমারবাবুকে বলেছি…'
চেয়ারের দুদিকের হাতলে কনুই, দুহাতের আঙুলের কজায় থুতনি রেখে বসে ছিলেন পরমেশ। বললেন—'সুকুমারবাবুকে বলেছেন? কখন?'
'আপনারা যখন গাড়ির দিকে এগোচ্ছিলেন। তারই এক ফাঁকে…'
'ব্যস, আর ভাবতে হবে না। ও মেয়ের হিল্লে হয়ে গেছে…' হঠাৎ বিতোষ—'ওই আরেকজন। এইট্থ্ ওয়াণ্ডার অব দ্য ওয়ার্ল্ড। কি যে পারেন আর কি যে পারেন না ভদ্রলোক! এনালজিন নোভালজিন ট্যাবলেটের মতো। সব সমস্যার মুস্কিল আসান।'
'কী যেন তোমাদের বলেছিল ওই বাগদী ছোঁড়া?'
সবাই চমকে তাকাল।
হরদয়াল ঘোষ নিশিথ বাগচীর পেছনে একটু আড়ালে ছিলেন কিরণময়। গলাটা বাড়ালেন। এভাবে আচমকা কথা বললে তাঁর ক্ষ্যাপাটে ধরনের পুরো মুখটাই পায়ে-ঘুঙুর-বাঁধা চানাচুরওলার চোঙার মতো গলা থেকে উঁচিয়ে ওঠে সামনের দিকে, চশমা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় চোখজোড়া, শাদা চুলের বাবরি লাফায়—'কি হে ধ্রুব, বলো না হে! তুমিই তো বলছিলে তখন। কী যেন বলেছিল তোমাদের?'
'বাপের আমলের আকাল খুঁজতে এয়েচেন গ বাবু? আকাল এখন নাই? আকাল তো সর্বাঙ্গে আমাদের…'
'বোঝো কাণ্ড! ও শালা মরবে। কেউ রুখতে পারবে না…'
আড্ডার খোলামেলা হালকা মেজাজ থেকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে যাচ্ছে সকলেই। কিরণময়ের দিকে চোখ।
'আরে বাগদীর পো, দুচার পয়সা কামিয়ে বৌছেলে নিয়ে বেশ তো ছিলি বাপু। কী সব কাণ্ড করে একটা হাত তো খুইয়েছিস, এখন যে জান নিয়ে টান রে তোর। বুঝলে পরম, তোমার চিত্রনাট্যে কথাটা জুড়ে দাও কোথাও। এ একেবারে বুদ্ধ কনফুসিয়াসের স্তরে উঠে গেছে। আমার মতো বানানো ডায়লগ-লিখিয়ে নাট্যকারের সাতজন্মের কম্মো নয়, এমন একটা বাক্যি লেখে…'
পরমেশ মৃদু হাসলেন। চেয়ারের হাতলে দুহাতের কনুই। দুহাতের আঙুলো

আঙুল জড়িয়ে থুতনি ঠেকিয়ে বসে ছিলেন। নড়লেন না। গম্ভীর—'হ্যাঁ, বড়ো ভালো বলেছে কথাটা। খুব ডায়রেক্ট…'

'শুধু ওই কথাটাই না পরমদা, এমন ঠ্যাটা মেরে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা, কথা বলার ভঙ্গিটাই আলাদা। কম্প্লিটলি ডিফারেন্ট…'

হাতের বিড়ি ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছেন কিরণময়। চশমার দুটো কাচে দূরবর্তী বালবের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব। চোখ নেই, বিচ্ছুরিত আলোর রোশনাই। ঘরের দিকে এগোচ্ছিলেন।

বেঞ্চিতে পা রেখেই আয়েসী ভঙ্গিতে পরমেশ ভ্রূ কুঁচকোলেন—'কোথায় যাচ্ছেন?'

'আসছি এক্ষুনি।'

'না, আপনি বসুন…'

হেসে ফেললেন কিরণময়—'বোঝো কাণ্ড! কোথাকার কোন আকাট মুখ্যু নিরক্ষর বাগদী ছোঁড়া কি বলল তোমাদের, খামোকা আমি বক্তিমে ঝেড়ে যাচ্ছি…'

'হ্যাঁ, আপনি তাই করুন। আমরা শুনব।'

সকলের দিকে তাকালেন কিরণময়। নন্দিতা বলল—'যাচ্ছেন কেন কিরণদা। বসুন না।'

'বসব, বসব। যাব আর কোথায়? আসব এক্ষুনি…'

বেঞ্চি থেকে পা তুলতে হলো না পরমেশকে। প্রশস্ত বারান্দায় পরিসর ছিল। হাসতে হাসতে পেরিয়ে গেলেন কিরণময়।

এবং তাঁর প্রস্থানে সকলের মধ্যেই উশখুশ-উশখুশ, যেন কোনো কিছু বুঝে-ফেলা বা স্পষ্ট করে বলতে না-চাওয়ার দ্বিধায় পরস্পরের চোখে-চোখে সবাই নীরব।

'ইমোশনালি ঝাঁকুনি খেলে ক্যাজুয়েলি এমন সুন্দর সব কথা বলেন কিরণদা। জেনুইন একটা ব্যাপার আছে কোথাও…' হঠাৎ বিতোষ।

'কিরণদার কথা!' ওদিকে মুখর হলো নন্দিতা—'আজ বিকেলে, ওই…ওই চিৎকার করে ওঠার শটটাতে যখন খুব ভয় করছিল আমার, কিছুতেই পারছিলাম না। কিরণদা কানে কানে একটা কথা বললেন, আমি চমকে উঠেছিলাম। ভেরি ইন্‌স্‌পায়ারিং…'

'কি কথা? ভুরু তুলে তাকালেন পরমেশ।

কুণ্ঠিত নন্দিতা এপাশ ওপাশ তাকাল—'সে থাক, পরে বলব আপনাকে।'

'সবই তো হলো…' বেঞ্চি থেকে টান-টান পা দুটো তুলে নিয়ে নড়েচড়ে বসলেন পরমেশ—'সব চেয়ে বড়ো রিয়েলিটি তো নিজের স্বাস্থ্য, নিজের শরীরটা। বয়স হয়েছে, সুগার আছে। তবু যদি…'
ডানদিকে ঈষৎ ঝুঁকে বাঁ পকেটে হাত— 'মেডিকেল সায়েন্স তো বোহেমিয়ানিজম্-এর লজিকটা অমন আদুরে মমতায় দেখবে না…'
মাননীয়দের প্রতি সম্ভ্রমে যখন সকলেই চুপচাপ, সিগারেট ধরালেন পরমেশ—'অথচ চন্দ্রধরের জন্যে কিরণদা ছাড়া আর কাউকে তো ভাবতেই পারিনি আমি। এ বয়সের একটা চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে অন্য কারো কথা হয়তো ভাবা যেতেও পারত। কিন্তু আমি পারি না। দুর্ভিক্ষের ওপর ছবি করব, অথচ কিরণময় ভট্চায্ সেখানে জড়িয়ে থাকবেন না…অসম্ভব, অবাস্তব কল্পনা…'
'হ্যাঁ, দুর্ভিক্ষের নাট্যকার…' ধ্রুবজ্যোতি ওপাশ থেকে— 'শুধু নাটক কেন' গল্পও তো লিখেছেন কিছু…'
'শুধু লেখালেখি কেন? আরো বড়ো ব্যাপার…' পরমেশ কিছুটা অলস শৈথিল্যে, চেয়ারে গা এলিয়ে—'কিরণদা তখন পার্টি হোলটাইমার। শিক্ষাদীক্ষার অভিমান সব ছেড়েছুড়ে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই বাউণ্ডুলে মানুষটা চষে বেড়াচ্ছে গোটা বাংলাদেশ। রক্তের তেজ কী তখন! জলপাইগুড়ি থেকে বরিশাল, চট্টগ্রাম থেকে বাঁকুড়া গ্রামেগঞ্জেশহরে নাটক যাত্রা গান। সাবজেক্ট কিন্তু মেইন্‌লি পঞ্চাশের মন্বন্তর…'
'ঠিক, ঠিক তাই…' চঞ্চল হলো নন্দিতা— 'সব সময়েই তো দেখছি, এ ছবিতে কাজ করার জন্যে এত ইনস্‌পায়ার্ড মানুষটা। এত সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন সেদিন…'
'কী?' নিস্পৃহতায় ফিরে তাকিয়েছেন পরমেশ।
'সেদিন লাঞ্চের পর, আপনি ছিলেন না, আপনাদেরই ঘরে বসে ধ্রুবদা বিতোষদা প্রতিমাদি আমি কিরণদার সঙ্গে গল্প করছিলাম। কথায় কথায় হঠাৎ বললেন—আকাল মন্বন্তর! ওসব তো ভারতবর্ষের জীবনে গ্রীষ্মবর্ষার মতো। খরাবন্যামহামারি যেমন। সে কুষাণ যুগেও ছিল, সুলতানী আমলেও ছিল। কিন্তু কোম্পানি আমলেই প্রথম, ইংরেজরা ফেমিনের একটা ক্লাশ-ডিফারেন্স এনে দিলো। যা এর আগে ছিল না…'
'কি রকম?' ডান দিকে ঝুঁকে পড়লেন পরমেশ।
'কী যেন! কী যেন সেই ছড়াটা ধ্রুবদা?'

'খনার বচন…' এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বিতোষ—'যদি বর্ষে আঘনে, রাজা যায় মাগনে। আগেকার দিনে দুর্ভিক্ষ হতো প্রাকৃতিক কারণে। মানবিক কারণে রাজস্ব মুকুব করাই ছিল রাজার নিয়ম। রাজকোষের ক্ষতি, রাজার বা ধনীদেরও ক্ষতি। কিন্তু ইংরেজরা এসে নির্মম হলো। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর রেভিন্যু মাপ করা তো দূরের কথা, ইংরেজরা এত লাঞ্ছনা তৈরি করল, যার চোট বাংলাদেশের মানুষকে সইতে হয়েছে আরো প্রায় পনের কুড়ি বছর…'

'আর তখন থেকেই চেহারা বদলে যেতে লাগল দুর্ভিক্ষের…' আবার নন্দিতা—'নতুন করে মাৎস্যন্যায় বাংলাদেশে। দুর্ভিক্ষ হবে—মরবে গরিব মানুষেরা। তখন থেকেই নাকি নিয়মটা চালু হলো, ধনীরা আরো ধনী হবে, গরিবরা আরো গরিব। ইংরেজরা রেলগাড়ি বানিয়ে দিয়েছে যে! রাস্তাঘাট বানিয়েছে, দূরদূরান্তের বাজার তৈরি করে দিয়েছে। সারপ্লাস এলাকার ধান ডেফিসিট এলাকায় চড়া দামে বিক্রি করে উদ্বৃত্ত অঞ্চলেই দুর্ভিক্ষ বানানোর কানুন তৈরি করে তুলেছে।'

কিছুদূরে উজ্জ্বল আলোর নিচে বেঞ্চি টেনে নিয়ে দুর্ভিক্ষের ছবি দেখছেন প্রতিমা আরতি। একটি একটি করে প্রতিটি স্টিল দেখাচ্ছে সুকান্ত। প্রসন্ন মুখগুলি।

'এমন ক্রিমিনাল তোমরা স্কুলকলেজের মাস্টারমশাইরা…' অল্প করে আড়মোড়া ভাঙলেন পরমেশ—'উনিশ শ এক সালে অ্যান্টনি ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের থার্ড ফেমিন কমিশন-এ ফেমিন-কোড তৈরি হলো। তোমরা অবোধ ছাত্রছাত্রীদের বোঝাও—ওই ফেমিন কোড আর ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের উন্নতির জন্যেই নাকি বিংশ শতাব্দীতে দুর্ভিক্ষ উধাও। পঞ্চাশের মন্বন্তরটা নেহাৎ-ই অঘটন। তার কারণ নাকি শুধুই যুদ্ধ…'

'একটা ব্যাপার কিন্তু আমার কাছে বেশ ধাঁধা পরমদা…' ধ্রুবজ্যোতি দূর থেকে উঠে এল। নন্দিতার পাশে বেঞ্চির ফাঁকায়, যেখানে একটু আগে পা তুলে রেখেছিলেন পরমেশ—'ইতিহাসের এত বড়ো একটা দুর্ভিক্ষ হলো বাংলাদেশে। অথচ এক বছর আগে বেয়াল্লিশের আন্দোলন। 'ভারত ছাড়ো' বলা হচ্ছে ইংরেজদের। ন্যাশনাল স্ট্রাগলের ইতিহাসে এত ভয়ঙ্কর আর হিংস্রতম গণ-আন্দোলন তো হয়নি কখনও। তবু…'

'যদি বলি, আপনাদের ওই 'ভারত ছাড়ো'-ই দুর্ভিক্ষের একটা বড়ো কারণ…'

'অ্যাঁ…' আঁৎকে উঠল নন্দিতা—'ন্যাশনাল স্ট্রাগল দুর্ভিক্ষ বানিয়েছে? কী সব বলছেন পরমদা। আপনাকে তো কেউ আস্ত রাখবে না এসব শুনলে…'

'সে আর কি করা যাবে…' শান্তভাবেই সিগারেটের ধোঁয়া টানছেন পরমেশ—'দুর্ভিক্ষ বানিয়েছে বলছি না তো। বলছি, এতগুলো লোক মরল, দেশের তাবোর তাবোর নেতারা শুধু বক্তৃতা মিটিংমিছিল ছাড়া আর কিছুই করতে পারলেন না। করবেন কী? কোনো কিছু করার মতো অবস্থাই নয় তখন। আগস্ট-আন্দোলনের পর ইংরেজরা কোনো রাজনৈতিক দলকে বিশ্বাসই করতে পারছে না। জনযুদ্ধ লড়ছে জনগণকে বাদ দিয়ে। ভালোমতো একটা রেশনিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা গেল না কোথাও…'

শ্রোতারা নির্বাক।

'বেয়াল্লিশ সালের বিশে ডিসেম্বর দুটো বোমা পড়ল কলকাতায়। দেশটার নাম ভারতবর্ষ। পৃথিবী জুড়ে এত বড়ো যুদ্ধে বিশাল দেশটার ওপর দুটো মাত্র বোমা। এত তুচ্ছ একটা ঘটনা, তার ক্ষয়ক্ষতির হিশেবটাও রাখেনি কেউ। অথচ তার পরের বছরই, শুধুমাত্র সরকারি অঙ্কেই মরে গেল পনের লক্ষ মানুষ। আসল সংখ্যাটা অবশ্যই তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি…'

'সেসব তো জানি। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটল কেন হঠাৎ। নিশ্চয়ই তার অনেক বড়ো কারণ আছে…'

'সে তো আছেই। অসংখ্য কারণ। অনেক বড়ো ইতিহাস…' চেয়ারের ডানদিকে ভর রেখে আরো একটু ঝাঁকিয়ে বসলেন পরমেশ। প্রায় আধাআধি সিগারেটটা ছুঁড়ে দিলেন রেলিং টপকে বাইরে, অন্ধকারে—'একটু পুরনো লোকজনদের জিজ্ঞেস করবেন। সকলেই জানেন—এক ধরনের শস্তা মোটা চাল পাওয়া যেত সে সময়ে। বার্মা রাইস বলত সবাই। প্রতি বছর বার্মা থাইল্যাণ্ড থেকে আড়াই লক্ষ টনের মতো এরকম মোটা চাল আনা হতো আমাদের দেশে। গরিবমানুষেরা খেয়ে বাঁচত। নাইনটিন ফর্টিতে বার্মা ফল করার সঙ্গে সঙ্গে তার আমদানি বন্ধ…'

'কিন্তু ঘাটতিটা কেন? এই যে ঢাকঢোল পিটিয়ে বলি—সোনার বাংলা। এত গান গাই…' ধ্রুবজ্যোতি।

'দ্যাট্স্ এ ডিফারেণ্ট পয়েণ্ট। ডিস্ট্রিবিউশানের গণ্ডগোলটা তো ছিলই। সে এখনও আছে। ঝড়বঞ্ঝাখরা আরো নানাভাবে প্রায় প্রতি বছরই ফসলের ক্ষতি হতো আমাদের। তাছাড়া বাখরগঞ্জের মিহি চাল বিদেশে চালান দিয়ে বাংলাদেশকে ঘাটতি বানাত আমাদের ইংরেজ প্রভুরাই…' উৎসাহ বাড়ে। নিজেকে টানটান রেখে কথার নেশায়, কথাগুলো বলতে পারার আগ্রহে উৎফুল্ল পরমেশ—'আসল

ব্যাপারটা কী জানেন ধ্রুব। ব্রহ্মদেশটা হাতছাড়া হবার পর ইংরেজরা ধরেই নিয়েছিল, আসাম বাংলাদেশ আর রাখা যাবে না। কলকাতা থেকে ওরা আর্মি হেড কোয়ার্টার রাঁচি পিছিয়ে নিয়ে যাবার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিল। অথচ কলকাতাকেও বাঁচাতে হবে। ভারতবর্ষে-প্রস্তুত ওয়র-প্রডাকশনের প্রায় অর্ধেকই তখন তৈরি হতো হুগলী নদীর দুপাশে কলেকারখানায়...'

'দুর্ভিক্ষের সঙ্গে এই ওয়র-স্ট্র্যাটেজির সম্পর্ক?' প্রশ্ন বিতোষের। পায়ের ওপর পা তুলে, হাঁটুতে ডানহাতের কনুই। হাতের মুঠোয় থুত্‌নি রেখে তীক্ষ্ণ চোখ।

'সম্পর্কটা গভীর। বলতে পারেন সেটাই কজ অব দ্য ফেমিন। বাংলাদেশের এই বিশাল শস্যভাণ্ডার শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া যায় না কিছুতেই। জাপানীরা ভাত খায়। এত খাদ্য শত্রুর হাতে তুলে দেওয়ার মানে... হঠাৎ ঘাড়ের ওপর একটা থাপপড়। মশাটা মারলেন পরমেশ—'উঃ...'

'কী পরমদা!' কলকল হাসিতে নন্দিতা— 'জাপানীরা হটল কেন সে খবর কি রাখেন?'

হেসে উঠল সকলেই।

'মোহনপুরের মশার মামা ইম্ফলেতে থাকেন...'

'বিউটিফুল!' পরমেশ নন্দিতার দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং মুহূর্তেই, বিতোষ ধ্রুবজ্যোতির দিকে চোখ রেখে—'ওরা দুভাবে আক্রমণ করল দেশটাকে। প্রথমত, এদেশের চাষআবাদের প্রচণ্ড ক্ষতি করো। দু নম্বর—চাষআবাদ করে ওরা যা ফসল তুলেছে সব লুটেপুটে নাও। প্রথমটা ওদের বোট ডিনায়েল পলিসি। অন্তত দশজন-বইতে-পারে এমন কয়েক হাজার মাঝারি বা বড়ো নৌকো বজরা সব বাজেয়াপ্ত করল। বেশ কিছু ডুবিয়ে দিলো নদীতে...'

'মাই গুডনেস! কেন?'

'আজকের মতো রাস্তাঘাট রেললাইন কোথায় তখন! অন্যান্য গাড়ি সব যুদ্ধে। রিভার ট্র্যান্সপোর্টটা খুব জোরদার। চট্টগ্রাম-চাঁদপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত চালের চলাচল ছিল নদীতে নদীতে। সব বন্ধ হলো। তাছাড়া নৌকো ছাড়া তো দক্ষিণবঙ্গে চাষআবাদ হয়ই না বলতে পারেন...'

'সে তো আমিও দেখেছি হে...'

কিরণময় বেরিয়ে এসেছেন। পাঞ্জাবিটা খুলে পায়জামার ওপর শুধু গেঞ্জি গায়ে। সকলের সঙ্গে পরমেশেরও চোখ। বিতোষের পাশে পুরনো চেয়ারটায় বসতে

বসতে কিরণময়—'ফরিদপুরে কলকাতায় হরদম সাইকেল চেপে ঘুরে বেড়াতাম তখন। সেই সাইকেলেরও লাইসেন্স থাকত। নাম্বার-প্লেটটা ঝুলিয়ে রাখতে হতো হ্যাণ্ডেলে…'
'চাকা থাকলেই বুঝি সব কিছু যুদ্ধে লাগত ওদের?' নন্দিতা হাসতে হাসতে তাকাল কিরণময়ের দিকে—'গরুর গাড়ি, পেরাম্বুলেটর?'
'যাদের খোকারা পেরাম্বুলেটর চেপে আয়ার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, তাদের বাপেদের তো যুদ্ধের ভয় ছিল না। আর গরুর গাড়ি বলছ? ওরা তো নিজেরাই ছুটে গিয়েছিল আত্মনিবেদনে। গাঁয়ের চাল শহরে পাচার করতে হবে না?'
'চালের ওপর লেভি হয়েছিল পরমদা?'
'লেভিটেভি আবার কী? ওসব ফর্মালিটিজ কিছু নেই। ইন্ফ্লেশনের টাকা উড়ছে হাওয়ায়। স্রেফ টাকার লোভ ছড়ানো নয়তো জবরদস্তি। যুদ্ধ বেঁধেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকারকে চাল দাও…' সিগারেটে একটা ছোট্ট টান দিয়ে পরমেশ— 'তেতাল্লিশের নতুন ধান ওঠার মরশুমে প্রতিদিন ধানের দর বাড়ছে। ডিস্ট্রেস সেল-এর ধান বিকোতে চাষির লোভ বাড়ছে। পরম রাজ-ভক্ত ইস্পাহানি হনুমান বক্সরা নেমে পড়েছে মাঠে। তোলা হলো লাখ লাখ টন ধান…'
'আশ্চর্য। ভাবাই যায় না এসব…' বিতোষ, অন্যান্যদের দিকে তাকিয়ে বিশুদ্ধ হাসিতে।
'মডার্ন ওয়র ইজ নট ওঅন অর লস্ট অন্ দ্য বেটল্‌ফিল্ড, বাট ইন দ্য ফ্যাক্টরিজ…' চেয়ারের পেছন দিকের দুটো পায়ায় ভর রেখে দুলছেন পরমেশ। গ্রামের নিশুতি থেকে একটানা ঝিঁঝির ডাকের নৈঃশব্দ্যে দুলতে দুলতে লঘুস্বরে—'তেতাল্লিশের মার্চ মাসে সরকারি অনুরোধে কলকাতার চেম্বার অব কমার্স হঠাৎ স্থির করল, যেহেতু এটা টোটাল ওয়র, যে-করেই-হোক খাইয়ে পরিয়ে রাখতে হবে কলকাতা বা আশেপাশের ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের। ওয়র-প্রডাকশন চালু রাখতে হবে। সুতরাং তারাও ধানচাল সংগ্রহে নেমে পড়ল। এভাবে আরো হাজার হাজার টন…'
পরমেশ থামলেন। ভালো লাগছে তার। দীর্ঘ বারান্দার এপাশ থেকে ওপাশে, তেজী আলোয় ছায়া পড়ছে না কারও। বাইরে, অন্ধকারে নিমজ্জিত বিস্তীর্ণ গ্রামের স্তব্ধতায় নিজেরই কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিতে গম্ভীর। ভেতর থেকে উৎসাহ, ওরফে গাঢ় কন্‌ফিডেন্স—'আপনারা তো আবার রাজনীতি করেন বিতোষ! ভেবে

দেখুন, তেতাল্লিশের আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে, মাত্র চার মাসে যখন মাঠের রাজারা হাজারে হাজারে লাখে লাখে এসে কলকাতায় শবের পাহাড় গড়ে তুলল, শ্রমিকরা দরজা খুলল না কেউ। কোনো ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা দাঁড়িয়ে বলতে পারলেন না সাহস করে—শ্রমিক কৃষক ভাই ভাই। কৃষকভাইরা মরছে। শ্রমিক ভাই যা পেয়েছ, পাচ্ছো, ভাগ করে খাও...'

'বাজে কথা...'

সবাই চমকে তাকাল।

কিরণময় উত্তেজিত— 'ওভাবে নেতি নেতি করে দেখলে সবই তো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায়। সেটা এমন কি কঠিন কাজ?'

'আপনি কী বলতে চাইছেন, বলুন।' পরমেশ শান্ত।

'এর ঠিক এক বছর দু বছর বাদেই ময়মনসিংহের হাজং, রংপুর দিনাজপুর মিলিয়ে নানা জায়গায় যে দুর্ধর্ষ কৃষক আন্দোলন—সে-ও তো দুর্ভিক্ষেরই পরিণাম। মার-খাওয়া চাষিরা রুখে দাঁড়িয়েছিল—আর মরব না। তারও পরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় হুগলীতে কৃষকরা যখন মারকাট্টা লড়তে শুরু করল, চটকল শ্রমিকরা দাঁড়ায়নি তাদের পাশে? ভুলে গেলে?'

'আপনার সঙ্গে আমার তো কোনো বিরোধ হচ্ছে না কিরণদা...' পরমেশ শান্ত, নিরুত্তেজ— 'ওসব দুর্ভিক্ষের পরের ঘটনা। আমি বলছি, এর ইম্‌মিডিয়েট কজ্ নিয়ে। কনসেকোয়েন্স নয়, অ্যান্‌টেসিডেণ্ট। এত বড়ো একটা ঘটনা! লাখ পঁয়ত্রিশ লোকের মৃত্যু। সে তো আর এমনি হয় না। নিশ্চয়ই একটা বজ্জাতি আছে কোথাও...'

সকলেই চুপচাপ। তাকিয়েছে কিরণময়ের দিকে। ক্ষুব্ধ কি৹ময় দুহাতের তেলো ঘসছেন এলোমেলো শাদা বাবড়িতে। চোখজোড়ায় অশান্ত ক্রোধ।

দূরে, নিঝুম রাতে গড়িয়ে যাচ্ছে একটা মালগাড়ি। একটানা দূরবর্তী ধ্বনি। অদূরে, বারান্দার কোণে বেঞ্চিতে বসে প্রতিমা দাশের সঙ্গে আরতি, সুকান্ত। প্রদীপ আর লোকনাথও গিয়ে ভিড়েছে কখন। এদিকের আসরে মগজের কচকচিটা খুব ভারি হয়ে উঠতে পারে জেনেই হয়তো ওদের আগাম আত্মরক্ষা।

উঠে দাঁড়ালেন পরমেশ। শিষ্টতায়, আস্তে আস্তে— 'আপনারা সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস দিনগুলো চোখে দেখেছেন কিরণদা। আপনাদের দেখাটার চেয়ে বড়ো বাস্তব সত্য তো কোথাও কিছু নেই। কিন্তু রাজনীতির রান্নাঘরে এমন

অনেক কিছুই ঘটে, ঘটনাগুলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার সবটা বোঝা যায় না। আজ, সাঁয়ত্রিশ বছর পরে বইপত্তর ঘাঁটলে বোঝা যায় ওই বজ্জাতির মাত্রাটা কতদূর। দেশে একটা দুর্ভিক্ষ আসছে। সবই হিশেবপত্র জানা ছিল ওদের। মার্চ মাসে ফজলুল হক চিফ-মিনিস্টারের গদি ছাড়লেন। কিন্তু হলো কিছু? বাংলাদেশে যখন ক্রাইসিস তুঙ্গে উঠছে, তখন বাংলার চাল যাচ্ছে সিংহলে…'

'সিংহল! মানে শ্রীলঙ্কা? সেখানে কী?' হতবাক বিতোষ— 'সেখানেও কি ফেমিন নাকি?'

'ফেমিন নয়, যুদ্ধ। লঙ্কাযুদ্ধ নয়, বিশ্বযুদ্ধ। বিদেশী রাবণরা খাবে…' বিতোষ ধ্রুবজ্যোতি নন্দিতার দিকে ফিরলেন পরমেশ— 'ব্রহ্মদেশ পতনের পর গোটা সাউথ ইস্ট এশিয়া ওদের হাতছাড়া। ভারত মহাসাগরে নিজেদের কন্ট্রোল রাখার তাগিদে তখন ওরা ঘাঁটি গেড়েছে সেখানে। কয়েক লক্ষ বিদেশী সৈন্য ওই ছোট্ট দ্বীপটায়। প্রতি বছরই কলম্বোতে কিছু কিছু চাল যেত আমাদের। কিন্তু দুর্ভিক্ষের বছর সে চাল রপ্তানি হলো সবচেয়ে বেশি—সাত শ' পঁচাত্তর হন্দর। বলা হলো, ভারতীয় সৈন্যরা খাবে। এখন প্রশ্ন, সব দেশই কি তাদের সৈন্যদের জন্যে এভাবে খাদ্য পাঠিয়েছিল? পাঠায়নি…'

বসে-থাকার ক্লান্তি থেকে পরমেশ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই হয়তো, অথবা নিজেদেরই তাগিদে প্রতিমা দাশ আরতি এবং অন্তান্তরা এগিয়ে আসছে এদিকে। প্রচ্ছন্ন বাঁকা হাসিটা মুখে লেপটে পরমেশ আবার তাঁর চেয়ারে এসে বসলেন— 'বুঝলেন ধ্রুব, দেশের যখন এই কঠিন অবস্থা, কোনো কিছুতেই আর সামাল দেওয়া যাচ্ছে না কোনো দিক, হাজার হাজার মানুষ মরতে শুরু করেছে, মরছে, তখন, তেতাল্লিশ সালের অক্টোবর মাসে গভর্নমেন্ট এক নোটিফিকেশনে হঠাৎ চালের দর বেঁধে দিলো। কী মহৎ উদারতা! একে তো ইনফ্লেশনে টাকার নিজেরই কোনো দাম নেই। চারদিক থেকে লুটেপুটে নিচ্ছে কিছু লোক। চালের দর বেঁধে দেবার পর ব্যবসায়ীরা রাতারাতি সব উধাও। হাটবাজার দোকানপাট সব বন্ধ। যেখানে লাখ লাখ বস্তা চাল মজুত, সেখানে এক ছটাক বিক্রি করার জন্তে কেউ নেই…'

'কোনো লুটপাট হয়নি তখন? কোনো রকম চুরিডাকাতি খুন…'

'না—' ধ্রুবজ্যোতির বাক্য ফুরোবার আগেই পরমেশ বেশ জোর গলায়। তাকালেন কিরণময়ের দিকে।

হাঁটুর ওপর হাঁটু তুলে কিরণময় গোড়ালি চুলকোচ্ছেন। মশা।

'বিভিন্ন বই কাগজপত্তর সার্ভে-রিপোর্ট থেকে যা হিশেব পাওয়া যায়, এমন ঘটনার হদিশ নেই।'

'সেটাই অদ্ভুত…' অনেকক্ষণ পরে নন্দিতা সোজা হয়ে বসেছে— 'আওয়ার পিপল আর সো অনেস্ট অর ফুলস…'

'ওটা কিরণদা জানেন। কিরণদার থিয়োরি…' হাসলেন পরমেশ। তাকালেন কিরণময়ের দিকে—'এখানে আসার দিন গাড়িতে বলেছিলেন…প্রকৃতির নিয়মে বাঘ আর হরিণকে যদি সহাবস্থানে থাকতে হয়, সুন্দর হরিণটাই মরবে। জঙ্গলের নিয়ম।'

'আমি মিথ্ বলছিলাম পরম। মিথ তুমি মানো না…' এককোণে নিরাসক্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর—'অনেক পড়েছ, জেনেছ, সিন্‌সিয়ার্লি একটা ভালো ছবি করছ। তাহলে আজ কেন ওই হাত-কাটা বাগদী লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে এতগুলো জ্ঞানীগুণী লোক তোমরা, সবাই চমকে উঠেছিলে? ও ছোঁড়াও তো বলছে— ও আকালের মানুষ। আকাল সর্বাঙ্গে ওর…'

ঝলকে উঠেই, পরমেশ তাঁর কপালে ভাঁজ তুলে স্থির পলকে সোজাসুজি তাকালেন এবং অন্যান্যরা, চারপাশ অকস্মাৎ ভারি হয়ে ওঠার পর যখন স্তম্ভিত হতবাক, সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছেন কিরণময়। তাঁর কাঁপা-কাঁপা পা-ফেলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার ধাক্কা

'নাগাসাকি-হিরোসিমা, ভিয়েতনামের মাইলাই নিয়ে কলকাতার মাঠেময়দানে তোমাদের এত মিটিংমিছিলবক্তৃতা, কাগজে-কাগজে চোস্ত ইংরেজির লেখা-লেখি। সেসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অবশ্যই সঙ্গত। কিন্তু কেন বলো নি, দশ পনের ত্রিশ বছরে কেন শোনাও নি দেশের মানুষকে—ইম্‌পেরিয়ালিস্ট ইন্‌হ্যানিটির সবচেয়ে বড়ো শিকার আমাদের এই বাংলাদেশ! নিউক্লেয়ার যুদ্ধের আগেই আধুনিক নিউট্রন বোমার কন্‌সেপচুয়াল প্রয়োগ ঘটে গিয়েছিল এদেশে—ঘরদোর ব্যাঙ্কট্রেজারি শস্যভাণ্ডার সভ্যতা সব অটুট থাকে, শুধু পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষ মরে যায় নিঃশব্দে…'

সিঁড়ির তলায় আস্তে আস্তে ডুবে গেলেন কিরণময়। চোখের চশমাটা বাঁ-হাতে খুলে নিয়ে পরমেশ উঠে দাঁড়ালেন। সংহত গাম্ভীর্যে—'যাও তো। যান, সঙ্গে যান আপনারা। একা নামছেন। বুড়োমানুষ, তাছাড়া খুব নর্মালও নন এখন…'

নিচে, মুখর ভোজসভায় যখন উচ্ছ্বাস কলরব, নিজের ঘরের নিভৃতিতে বসে পরমেশ তার দূরাগত ধ্বনি শুনলেন একা।

সুকুমার বসাক এলেন কাজের-কথা নিয়ে—অনেক চেষ্টা করেও বাগদীপাড়ার বৌটাকে আনা গেল না কিছুতেই। মাস্টারমশাইদের কোয়ার্টারে যে বুড়ি মেয়েছেলেটাকে রাখা হয়েছিল মহিলা-আর্টিস্টদের দেখাশোনার জন্যে, ও তো কোনো কম্মেরই না। বড্ডো ভালো হতো বাগদী বৌটাকে পেলে। বৌটাকে বলা হয়েছিল—থাকবে, কাজকম্মো করবে, দুবেলা দুটো ছেলেসুদ্ধ খাবার আর সাত টাকা রোজ। কী অদ্ভুত ফাঁট ওই হাত-কাটা লোকটার! রিকেট ছেলেটা বমিপায়খানায় শুকিয়ে মরছে। খেতে দিতে পারছে না। তবু কিছুতেই রাজি হলো না। সিনেমার লোকেরা নাকি খারাপ। সেখানে পাঠাবে না যুবতী বৌকে…

'আর ওই বুড়ি?'

'বুড়ির চিকিৎসার জন্যে কুড়িটা টাকা দিয়ে এসেছি মোড়ল-গোছের লোকটার হাতে। হরেন চেনে।'

ছোট একটা নিঃশ্বাসে গোটা শরীরে ঝাঁকুনি তুললেন পরমেশ। বাঁ হাতের তেলোয় ডান হাতের ঘুসি। দুহাতের বদ্ধমুষ্টি উঠে আসে নাকের ডগায়—'কিন্তু ওই মেয়েটাকে পেলে বড্ডো ভালো হতো সুকুমারবাবু। এমন একটা ফোক চার্ম আছে পুরো চেহারাটার মধ্যে…অল্ রাইট্, চলুন…'

এবং বারান্দায় এসে, এগোতে এগোতে সুকুমার—'আমাকে একেবারে তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছে লোকটা। দেখছি তো, দুটো পয়সার জন্যে একেবারে চোখে-মুখে মিথ্যে কথা বলে লোকগুলো। যে-যেমন-পারে সুযোগ পেলেই শুধু টাকা খিঁচে নেবার তাল। আর সেখানে…'

'হ্যাঁ, হরেনকে বলবেন তো, আমার সঙ্গে একটু দেখা করতে। জানতে হবে, লোকটা কে, কী এবং কেন…'

পরান পোড়েল

আজন্ম চাষার-ব্যাটা পরান পোড়েল এখন এক বিচিত্র মানুষ।

এখন সে আর কারখানার মজদুর নয়, গ্রামে ফিরে আসার পর ক্ষেতমজুরও নয়। থাকার মধ্যে শুধু একটা জাত আছে তার—সে বাগদী। না-থাকার মধ্যে একটাই মাত্র অভাব—বাঁ হাতটা নেই। এই জাত-থাকা এবং হাত না-থাকার বিড়ম্বনায় অদ্ভুত ক্যাপাটে যুবা এখন দুহাতওলা মানুষের চেয়ে আরো

বেশি খাটতে চায়। অথচ স্বজাতিস্বজনদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কাজ পায় না তেমন। শরীর শুকোয়। গোমরা মুখে ঝিম মেরে থেকে যখন কথা বলে, কী সব শিখে এসেছে শহর থেকে, বাবুদের মতো বুলি কপচায়—লাথি মেরে ভেঙে ফেলতে হবে সব।

আড়ালে-আবডালে পড়শিরাও দাঁত ঝাড়ে—'বাগদীর ব্যাটা বাগদী। বাপ-ঠাকুদ্দার হালহেতল ছেইড়্যা শ'রে গেলি আকাশের চাঁদ ধরতি। বলি হল' ত! এট্টা হাত ত খোয়ালি র‍্যা সিখেনে। এখনে মর গিধধর, মর। মাগবাচ্ছা নে' শুকনো চচ্চড়িও জুটচেনি পেটে…'

সত্যি জোটে না। বছর দেড়-দুই আগেও যখন লম্বা লম্বা সক্ষম দুটো হাত ছিল, দুর্গার জন্য শহর থেকে মিলের শাড়ি এনেছে পরান। বাহারের প্লাষ্টিকের চটি। এছাড়াও শায়াব্লাউজ নকল-সোনার গয়না। নিজের ভাগে-পাওয়া মেটে ঘরটাকে পাকাপোক্ত করে ছাইবে ভাবল যখন, কারখানায় লক-আউট।

দেশগাঁ ছেড়ে তার শহরে যাওয়ার ঘটনাটাও আকস্মিক।

মা মরে গিয়েছিল আগেই। বাপটাও মরল। বাপ ছিল নাগবাবুদের বাড়ি নাগাড়ে-কিষেন। বাপের জায়গায় চলে গেল বড়োভাই হারান। নিজের মাগবাচ্চা চালাতেই দম ফুরোয় লোকটার। ভাই-এর দিকে মন নেই। মাঠের কাজ কিংবা লাথি-ঝাঁটায় আধপেটা ঘরামির দিগদারি ভালো লাগল না পরানের। মোহনপুর ইষ্টিশনের প্ল্যাটফর্মে ঘুরঘুর করত। কালেভদ্রে প্যাসেঞ্জার পেলে বাবুদের মালপত্তর গাড়িতে তুলে দেওয়া অথবা গাড়ি থেকে নামিয়ে ঘর অবদি পৌঁছে দেওয়ার মুটেগিরিতেই বেশি উৎসাহ। উঠতি বয়সের মরদ তখন। দুটো হাতই জিন্দা।

পলাশডাঙা থেকে আসাম রোড অবদি কাঁচা রাস্তাটা পাকা করার জন্য সরকার থেকে লোক এল সে বছর। খোয়া ভাঙার জন্য কিছু লোক নেবে বাবুরা। চালাক চতুর পরান হুঁস পেয়েই ছুটে গেল। নাম লেখাল কন্ট্রাক্টর-বাবুর থানে। চাষের মুনিশ খাটার চেয়ে বাবুদের মজুরি খাটা ভালো। এক-বেলার খোরাকিটা বাদ যায় তো কাঁচা পয়সায় পুষিয়ে যায় লোকসান।

পলাশডাঙার কাজ ফুরোতেই কন্ট্রাক্টরবাবুকে ধরে রইল। বাবুদের নতুন কাজ হবে ব্যারাকপুর বি. টি. রোডের ধারে কোথায়। চলে গেল সেখানে। মন দিয়ে কাজকম্মো শিখল। বাবুরা খুশি।

দুনিয়ায় ভালোবাসার মানুষ কি কম। চতুর পরান সুযোগমতো ধরে ফেলল

আয়েক বাবু। হয়েক কন্দিফিকিরে চাকরিটা বাগাতে কাটল আরো চার পাঁচ মাস। তা হোক। এবার রিবড়ায় মাঝারি একটা ফ্যাক্টরি। পুরোদস্তুর মজত্বর। ইজ্জৎ-ই আলাদা।

বাহারের প্যাণ্ট গড়াল শহরের দোকানে। চেকনাই শার্ট। মস্ত আর্শির মুখোমুখি বসে লম্বা চুলে সাইজ দেওয়ালো সেলুনের নাপিতকে দিয়ে। তিন মশলার ট্র্যানজিস্টার হাতে ঝুলিয়ে গাঁয়ে ফিরল যেদিন, চোখ টেরিয়ে দেখল বেবাক মানুষ—'অ্যাঁ। ই কী র‍্যা! দিনে দিনে হল কী র‍্যা দেশকালের! সাতজন্মের মুখ্যু বাগদীর-ব্যাটা! তুই?'

চক্রাবক্রা রঙিন টেরিলিনের বুক পকেটে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই। কারুর নাকের ডগায় ধোঁয়া ছাড়ল না বটে, হুলুস্থুল পড়ল স্বজনস্বজাতির ঘরে—'অতই যদি ফুটুনি বাবুর। দিক না কেনে স্বজেতের নোকদেরকে তুচার পয়সা। ছোঁড়ার বাপ ম'ল, মা ম'ল, কম ত করিনি আমরা দশজনে...'

ঘেন্না! ঘেন্না! ঘেন্না উগড়ে উঠতে চায় গতর ঠেলে। শুঁটকি-মারা পেটে কেন্নোর মতো মানুষ সব। শহরের কারখানা হাজারগুণে ভালো।

কিন্তু চনমনানির বয়স তখন। স্বজাতির ঘরেই তার নেশা।

গোপন কথাটা বলতে পারে না গাঁয়ের মানুষকে। কারখানার ধারেই বিশাল বস্তি। বাঙালী হিন্দুস্থানী হাজার কয়েক মাগীমদ্দার বাস। ঘেঁয়ো কুকুরের মতো জলের কলে ঠেলামেলি, হরেক কাণ্ড নিয়ে নিত্যি খামচাখামচি। খুনখারাপিও চলে মাঝে মধ্যে। সন্ধে গড়ালেই দিশি মালের টান আর বেপাড়ার মেয়েমানুষ। জলে নেমে গাগতর সব শুকনো রাখতে হবে—এমন এক আজব পরীক্ষায় চরিত্তিরটাকে ভেলার মতো ভাসিয়ে রাখে পরান। চরিত্তির না থাকলে স্বজাতির ঘরে তুগ্‌গা বেহাত। তুগ্‌গা না হলে সে আওয়ারা বেজাত বনে যাবে।

সুতরাং ভেবেচিন্তেই কিছু নগদা টাকা পেন্নামী রাখল পাড়ার মোড়ল কিংবা নিজেরও খুড়ো ধর্মদাস বাগদীর হাতে।

ধর্মদাসও খুশি—বাপ-মরা অমন একটা রোজগেরে ছেলে যদি হঠাৎ পুষ্যি এসে যায়, অভাবের ঘরে তবু তুটো পয়সার মুখ! ধীরেসুস্থেই এগোল বুড়ো—'বলি অ ম্যাতো, আমাদের হেঁদোর ছেল্যাটা ত এট্টা মদ্দার মতন মদ্দা হয়্যাচে র‍্যা! অঁ...'

মাতো বাগদী অবাক। ঘরে উঠে এসে পরের ছেলের গীত গাইবার এ আবার কী রস!

'পরান র‍্যা। আমাদের পরানের কতা বলচি...'

'অঁ, সি ত বোঝলম। কিন্তুক কেনে...'

'বলি, মে'টা ত ডাগর হল তুর। দে না কেনে, বাগদীর ঘরে অমন ছেল্যা পাবি কুথাকে দশ গাঁয়ে...'

বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে গুটিয়ে ছিল মাতো। গুটি গুটি উঠে এল— 'বলচ কী গ। অ্যাঁ...সত্যি বলচ?'

'কদিন ধর্যেই পেস্তাবটা মাথার ভিত্‌রে ঘুত্তে নেগেচে। তুকে বলব-বলব ভাবছেলম...'

সুখের কথায় গরিব মানুষের ভয়। ইতিউতি তাকায় মাতো। কানে কানে ফিসফাস— 'সি ত তুমি বলচ! উ ছেল্যা ত এখন বাবু হয়্যাচে গ। মস্ত মাতব্বর। শ'রে যে' পয়সা কামাচ্চে ভাল। ই কেল্‌টে মে' কি মনে ধরবে উয়ার...'

'তুর মনটা পুঝ্যে নেলম। উদিকের বুঝটা ইবারে আমিই বুঝব...'

খুশিতে ভরে উঠেছে মাতো। প্রায় জড়িয়ে ধরার ভঙ্গি— 'ই না হলে মুড়ল গ দাদা। দশজনের ভালমন্দ কজন আর ভাবে?

কিন্তু ব্যাগড়া দেবার মানুষ ছিল। বাদ সাধল জ্ঞাতিরা অনেকেই। মায়ের-পেটের-ভাই হারানও একজন।

কিন্তু ধম্মো খুড়ো সাব্যস্ত মানল। বিয়েটা হয়ে গেল।

জীবনভর কারখানায় গতর-খাটানোর নেশায় মজে গেল পরান। কী এক আশ্চয্যি যাদু আছে ঢেউ-খেলানো দুগ্‌গার শরীরটায়। চটকেচাটকেও যেন আর খিদে মেটে না। দুগ্‌গারও তেষ্টা। মরদের বুকের তলায় থরথর কাঁপে।

কারখানার বস্তিতে নিয়ে যাওয়া যায় না অমন সোহাগী বৌকে। কচি তুলতুল বৌটুকুন। ওকে একা ফেলে থাকাও যায় না শহরে। ব্যাণ্ডেল ঘুরে মাত্তর ত ঘণ্টা আড়াই-এর পথ রেলগাড়িতে। বাবুদের মতো ডেলি-প্যাসেঞ্জার হলো পরান। ভোর পাঁচটা চল্লিশে ফার্স্ট ট্রেন। ফিরতে ফিরতে রাত এগারটা।

জ্ঞাতিকুটুমের সঙ্গে তার জীবনের মিল নেই। সে আলাদা।

বছর ঘুরতেই দুগগার পেট ভেঙে বাচ্চা নামল। একটা দুধেল গাই কেনার কথা ভাবল পরান। এত করেও ঘরের চালে খড় পাল্টানো হয়নি তিন বছর।

যেন ঘুমের ঘোরে কথা বলে দুগ্‌গা। স্বপ্নে—টালির ছাদে, ইটের গাঁথ্‌নিতে বড়ো মেটে ঘর হবে আমাদের। জোতজমি হবে, হালবলদ...

দুঃস্বপ্ন নিয়ে অমাবস্তে পুণ্যিমেয় ঘরে ফেরে পরান। ভয় তার জ্ঞাতিকুটুম স্বজন পড়শিদেরই। তার কপাল ভাঙলে খুশি হয় শালারা।

দুগ্‌গা ভয় পায়। ভয়ে ভয়ে শুধোয়— 'এমনধারা কেনে গ তুমার মুখ? বলবেনি আমাকে?'

'তুই বুঝবিনি।'

আঁধার ঘরে লম্ফর আগুন লকলক কাঁপে। পলতের মুখে লাল ফুল। দুগগার দুচোখ ভরে জল— 'কেনে গ! স্বজেতের নোকদের মতন ত হাল ধরচনি তুমি। খরা লেই, বান লেই, অজম্মা লেই তুমার কারখ্যানায়। মা'জনের ধারকজ্জ লেই...'

'স্ট্যারাইক বুঝিস? স্ট্যারাইক ডেকেচে ইউনান। মালিক, হারামি বাঞ্চোৎ লক আউট দিবে বলচে...'

ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে দুগ্‌গা। শব্দগুলোর অর্থ বোঝে না। মরদ তার কত্তো বড় মানুষ! কাজেকম্মে ইংজিরি কইতে হয়।

ইউনিয়ন-নেতাদের অনুমান ঠিক। স্ট্রাইকের নোটিশ পড়ার আগেই লক-আউট ঘোষণা করল মালিক। একদিন সকালে কারখানার গেটে মস্ত তালা। জবরদস্ত পাহারা।

ফুঁসে উঠল কয়েক শ মজদুর। নিত্যি গেট-মিটিং মিছিল শ্লোগান।

পরান রোজকার মতো কারখানায় যায় তবু। মিটিং মিছিলের পর ইউনিয়নের ছাপ-মারা বাকশো ঝাঁকিয়ে রেলগাড়িতে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, রাস্তায় টাকা আর জনগণের সমর্থন-সংগ্রহ।

ভয়ে তরাসে কুঁচকে যেতে যেতে দম বন্ধ হয়ে আসে। কান্নায় কাঁপে দুগগা। মরদ তার অঙ্গ ছোঁয় না কেনে? রাত্তিরে মাদুর ছড়িয়ে ঘরের দাওয়ায় একা একা শোয়। অথচ ওরই চাষের ফলন নতুন করে ঘাই মারছে পেটে। দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে শরীর। দুগ্‌গা গোপনে আড়ালে উনুনের পোড়ামাটি চিবোয়।

ধোপানাপিত বন্ধ না করলেও পড়শিরা কেউ আর আপনমানুষ নয়। চারপাশ ঝাপটে ধরেছে জীবনটাকে। পরান পাগল হয়ে ওঠে।

'জম্মো জম্মো চাষার ব্যাটা, বাবু সাজতে গিছল শ'রে। ফানুস ফুট্টুস...'

দিশেহারা পরান রুখে দাঁড়াল একা—তার যে এমন দশা, সে তো তার একার নয়। এমনধারা হাল হয়েছে আরো কয়েক শ শ্রমিকের। মালিক মহাজনের

পা-চাটা চাষা। ভেড়ুয়ারা বুঝবে কী এসবের? জুলুমবাজির সঙ্গে এককাট্টা দাঁড়িয়ে লড়তে জানে মজতুর...

বড়ো-গলার বড়াইটাই কাল হলো আরো। গাঁয়ের অন্ন বন্ধ। জোতজমির কাজ শেখেনি পরান। ঘরামির কাজ দেয় না কেউ। কারখানার লক-আউট টানা পাঁচ মাসের পর এখনও চলছে...

একদিন একটা ঝুড়ি কিনে নিয়ে এলো মংলাপুরের হাট থেকে। জষ্ঠি মাসের শেষ। সেবছর ভালো ফলন হয়েছিল ঘরের পাশে শসার মাচাটায়।

কোলের বাচ্চাটা দুধের কাঙাল। গাই-এর দুধ দুইয়ে পোয়াতী দুগগা যায় গেরস্তদের ঘরে ঘরে, মাস্টারমশাইদের কোয়ার্টারে।

ঝুড়ি ভরে কচি শসা। নারকেল মালায় নুন আর একটা লম্বা ছুরি। রেল-গাড়িতে চাপল পরান। টিকিট নেই, ভেণ্ডার লাইসেন্স নেই। ধরা পড়লে রেলবাবুদের কালো কোটের পকেটে গুঁজে দিতে হয় আট আনা এক টাকা। হরেক ভেণ্ডারদের সঙ্গে নিত্যি ঝগড়া অথবা দোস্তি।

খেজুরপাতায় গড়া উঠোনের আঁতুড়ে নতুন বাচ্চা বিয়োল দুগ্‌গা। আরো একটা ছেলে।

জষ্ঠির গরমে কেড়ে নিয়ে চাখুমচুখুম খায় প্যাসেঞ্জারবাবুরা। লাভে লোভে মাতাল হলো পরান। যতদিন শসা থাকবে মাচাটায়, তাকে পাল্লা দিতে হবে দুরন্ত রেলের চাকার সঙ্গে। এবং তখনই একদিন

শেষ রাত্তির থেকে আকাশ ভেঙে জল হচ্ছিল। সকাল আটটা পঁচিশের আপ-এ নবদ্বীপ পৌঁছোল পরান। ফিরতি পথে ধরল কামরূপ। মাঠ দিগন্ত কাঁপিয়ে ছুটছে মেলগাড়ি। গাড়ির সর্বাঙ্গ ভেজা। নৈবেদ্যর থালার মতো সোমরাবাজারের কাঁচাগোল্লার থালা কাঁধে নিয়ে এক কামরা থেকে আরেক কামরায়, রড ধরে, পাদানি থেকে পাদানিতে পা বাড়িয়ে, নিঃশ্বাসে সতর্কতায় পেরিয়ে গেল সুখারিয়ার বলাই ঘোষ। তারই পিছু পিছু ঝুড়ি-কাঁধে পরান। ঝড়ের সঙ্গে পাল্লায় রক্তে রক্তে নেশা। মরণ খেলা। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রুদ্ধনিঃশ্বাসে পা বাড়িয়ে ওপাশের পাদানিটা ছুঁয়েও ফেলেছিল ঠিক-ঠিক। কেঁপে উঠেছিল কাঁধের ঝুড়িটা। মাল বিকিয়ে গিয়েছিল আধাআধি। বোঝাটা অনেক হালকা। দুদিকের পাদানিতে পা রেখে, একদিকের রড ধরে হাতে হাতে ঝুড়িটা পৌঁছে দেওয়ার কথা ওপারের বলাইকে। দিয়েও ছিল। কী যে হলো হঠাৎ! বৃষ্টি ভেজা হাতলগুলো আরো পিচ্ছল। কোনোরকম আমল না দিয়ে গাড়িটা তেড়ে

পেরিয়ে যাচ্ছে গুপ্তিপাড়া প্ল্যাটফর্ম। ডান হাত ছেড়ে বাঁদিকে হাসতে হাসতেই পেরিয়ে এসেছিল সে, রোজকার মতো, এরই মধ্যে জোর ব্লপ্ত হয়ে গেছে খেলাটা। মেঘলাদিনের মস্ত আকাশ হঠাৎ দোল খেল। যেন চলন্ত গাড়িটাই বাঁদিকে হেলে পড়ে তাকে নিয়ে থেঁৎলে পড়ছে মাটিতে। গাড়ির আওয়াজ ছাপিয়ে বীভৎস চিৎকারে জীবনে প্রথম মরণ দেখল পরান।

জ্ঞান ফিরল যখন, হাতপা-বাঁধা হাসপাতালের খাটে শুয়ে আছাড়িবিছাড়ি কাঁদতে দেখল তুগ্‌গাকে। বাপ মাতো বাগদী আর ধম্মোখুড়ো ছাড়া স্বজনস্বজাতি কেউ নেই। আশেপাশে ঘিরে গাঁয়ের ডাক্তারবাবুর ছেলে ভূদেব, হালদারপাড়ার লক্ষ্মীনারায়ণ, তাঁতিপাড়ার শ্যামাপদ, পলাশডাঙার ষষ্ঠী সমীর। সেই দুদ্দিনে একজন বাগদীর জন্ম অনেক করেছে বাবুদের বাড়ির ছেলেরা।

প্রাণে বেঁচে এল পরান। বাঁ-হাতটা নেই।

কারখানার দরজা খুলল পাক্কা ন-মাস বাদে। মজদুরভাইরা দুঃখ পেল। ইউনিয়নের বাবুরা বললেন—'মাইনের বকেয়া ছাড়াও কিছু ক্ষতিপুরণ পাইয়ে দেবার চেষ্টা করব। চাঁদা তুলে না-হয় একটা চায়ের দোকান করে দেব কারখানার পাশে। বৌবাচ্চা নিয়ে আয়…'

পরান যায়নি। গতর-ফাঁপানো অমন ডাগর বৌ নিয়ে কারখানার বস্তিতে যাবে না সে।

বুড়ো ধম্মোদাস বলল— 'লেয়তি। লেয়তি খণ্ডাবে কে গ।'

স্বজাতির কুট্‌নি— 'চাষার ব্যাটা নাঙল ধললনি ঘেন্নায়। হাতটা কেইড়ে নে' শাস্তি দিলেন মা-নক্ষী। উদিকে ভাত দিলেন নি বিশ্বকম্মাঠাকুর…'

মিছে, মিছে কথা সব। মালিকের হারামিপনাকে বুঝছে না কেউ। মজদুরির নামে বদনাম? হাত-কাটা পরান পোড়েল মাথা কোপায় ভাঙা ঘরের মাটিতে— 'কারখানার মিসিনে আমার এমনধারা হয়নি গ। রেলে কাটা পড়্যাচে হাত…'

বুক চিতিয়ে দাঁড়াল সে। এক হাত নিয়ে দু হাতওলা মানুষের মতো বাঁচার লড়াই। একটা হাতে কোদালি-মারা যায় না কখনও। ডান হাতের কব্জিতে ধারাল কাটারিটা চেপে ধরল। এখনও দুটো সবল পা আছে তার। বুকের তেজ। কিন্তু কাজ নেই। কাজ কেড়ে নেয় দুহাতওলা স্বজনস্বজাতিরা।

'কাজের বদলে খাদ্য'— মাঝেমধ্যে গম আর টাকা এলে জানান দেন বাবুরা। লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা। কাজ দেন না বাবুরা। গম আর টাকা দেন। পরান কোঁচড় ভরে আনে। তারপর আর লজ্জাটাও থাকে না। আগে তো বাঁচা।

দুহাতওলা বৌ-এর রোজগারে দুটো বাচ্চা নিয়ে চারটে পেট। পরের দোরে মুড়ি ভাজে, চিঁড়ে কোটে, ঘুঁটে বেচে, চাষের কাজে যায় সোমত্তা বৌ।

দুগ্‌গা দগ্ধে মরে সেই পোড়ানিতে। বড়ো ছেলেটা হাড়চিমসে হয়ে শুকোচ্ছে প্রতিদিন। কোলের বাচ্চাটার আঁতুড় থেকেই মরণ। খেটে মরে দিনরাত, মরদ তাকে ছোঁয় না। কপাল কুঁচকে শুধু সন্দ আর অবিশ্বেস।

বিষফোঁড়াটা পাকছিল তলায় তলায়। পুঁজরক্ত বেরোল—'ছেল্যাটা মর‍্যে যাচ্চে। ওষুদ লেই পথ্যি লেই। ফুটুনি মেয়্যে বললে কেনে যাবনি। দুবেলার খোরাকি দিবেন বাবুরা। সাত ট্যাকা রোজ দিবেন বলেচেন।'

'না, তুই যাবিনি।'

'কেনে! কেনে!' ঢোঁড়া মেটুলি সহসা খড়িস হয়ে ওঠে। চিৎকারের সঙ্গে কান্না। ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ সে কান্না দুগ্‌গার— 'দাসী হয়্যা যাই না বাবুদের থানে? খ্যানা জুটাইনে তুর, তুর বাচ্ছাগুলার? রেতের বেলায় ছিনিমার দিদিমণিদের সনে শোব, সন্দ কেনে তুর?'

ঘরের কোণে ছুটে যায় পরাণ। ধারালো কাটারিটা তুলে আনে— 'যাবি ত যা। দুর হয়্যা যা। আসবিনি ই ঘরে। ফের আসবি ত কাটারি দে' কুইপ্যে মারব তুকে। ফাঁসি যাব। দুটো অন্নের জন্যি শালা জলতি হবে নি কারুক্কে…'

পোকার মতো টিঙটিঙে ন্যাংটো খোকাকে বুকে লেপটে দুগ্‌গা হাহুতাশে কাঁদে। ভুল নেই আপশোসের হিশেবে—সাত টাকা রোজে একমাসের কাজ। অনেক, অনেক ট্যাকা।

আক্রোশ কাঁপে হাতের মুঠোয়। লকলকে কাটারিটা নিয়ে বেরিয়ে আসে পরান। নিজের আগুনে নিজেই দগ্ধায়। দশজনকে ডেকে শোনাতে পারে না গলা-ফাটানো চিৎকারে—ওদের ডেরকটরবাবুর চাউনিটা সে দেখে ফেলেছিল। ভুরু নাচিয়ে, কপালে ঢেউ খেলিয়ে মাছের-কোঁচ ছোড়ার মতো তাকিয়েছিল দুশমন। চশমা খুলে, দুহাতের মুঠো পাকিয়ে, মুঠোর ভেতরকার ফুটো দিয়েও একবার, নানাভাবে পরখ করে দেখা। বেসরম ওই চাউনিটার দিকে তাকিয়ে হা বনে গিয়েছিল পড়শিরা। ন্যাদা বাগদীর পোড়োঘরের পাঁচিলে ঘুঁটে তুলছিল দুগ্‌গা। খেয়াল করেনি, হুঁস থাকলেও নজর দেয়নি তেমন—বাহারের জামাপেন্টলুনের এক পরদেশী বাবু চোখ মেলে শরীর চাটছে ওর।

এবং সেখানেই পরান পোড়েলের ভয় অথবা রাগ—চারটে মানুষের জন্যে এখন

তো ওই এক জোড়া সবল হাত। হাত জোড়া চলে গেলে চার-চারটে পেটে আকাল।

যদি বলা হতো, নন্দিতা বা প্রশান্তজ্যোতি বা কিরণময় ভটচার্য ভীষণভাবে অসুস্থ হঠাৎ, কলকাতা পাঠাতে হচ্ছে আজই, এক্ষুনি, অথবা যদি খবর হতো, পুলিশ-প্রহরা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট ঘর থেকে লক্ষাধিক মুদ্রার দুর্মূল্য ক্যামেরাটা চুরি গেছে কাল রাতে, হয়তো এতটা ক্ষিপ্ত বা উত্তেজিত হতেন না পরমেশ।
সকালে চায়ের পর আরতি এসে দাঁড়াতেই, চশমা খুলে কুঞ্চিত চোখে তাকালেন। সেই তীক্ষ্ণতায়, যার খোঁচায় একটি মেয়ে পুড়ে যেতে পারে।
কাজে বেরোবার আগে গাড়িতে ওঠার সময় তখন। সহযোগীরা কেউ বুঝল, অনেকেই বুঝল না। থমকে দাঁড়িয়েছে যে-যার-মতো। শুধু নন্দিতা আর প্রতিমা দাশ অস্বস্তি, বিরক্তিতে নিস্পৃহ কিঞ্চিৎ।
এবং আরতি, রং-মেলানো শাড়িব্লাউজে সাজগোজে অপ্সরা যুবতী দাঁতে-দাঁত চেপে নতমুখ যদিও, সপ্রতিভ। সঙ্কোচের চেয়ে অভিমান বেশি। এতগুলো মানুষের সামনে কেন তাকে অপমান ?
'মানে কী! মানে কী এসবের?' ভেতরের প্রচণ্ড দাহে জ্বলতে গিয়ে 'কি বলবেন, কি করবেন' ভেবে না-পেয়ে অশান্ত পরমেশ ডান হাতের পাতায় থুতনি চাপলেন সজোরে। তাকালেন দীপকের দিকে— 'তোমরা রওনা হয়ে যাও আমি আসছি একটু পরে। শিবনাথবাবু, আপনি থাকুন তো একটু…'
মেকআপম্যান শিবনাথ বিশ্বাস নিজের আড়ষ্টতায় সরে দাঁড়ালেন এবং অন্যান্যদের এগোনোর সঙ্গে যেন ছুটি, আরতি নড়ে উঠতেই আবার একটা ধমক— 'দাঁড়াও তুমি যাবে না। আমাদের সঙ্গে থাকতে না-পারার ব্যবস্থাটা তুমি নিজেই করেছ…'
চিন্তিত, বিচলিতও কিছুটা। হাতের তেলোয় থুতনি চেপে পরমেশ স্কুলের সদর থেকে অদূরবর্তী বারান্দার দিকে এগোলেন। পিছু পিছু শিবনাথ, আরতি যেন অনির্দিষ্ট নির্দেশ—ওদেরও আসতে হবে।
নিরিবিলিতে অগ্নুৎপাত— 'কী! কী ভেবেছ তুমি! খুব বড়ো আর্টিস্ট মনে করছ নিজেকে? ভ্রূ প্লাক করে উর্বশী রম্ভা সাজতে চেয়েছ? কার অনুমতি নিয়েছিলে? একবার জিজ্ঞেস করেছিলে আমাকে?'

আশ্চর্য। চোখে চোখ রেখে মেয়েটা তাকাল বটে, ভীরুতা নেই। ঠোঁটে-ঠোঁট চেপে বিস্ফোরণের প্রচ্ছন্ন ক্রোধ।

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওর টুঁটি চেপে ধরার উত্তেজনা অথবা তুলতুলে নরম গালে একটা থাপ্পড়ের সাধ। দুর্দম অস্থিরতায় সরে এলেন পরমেশ। তাকালেন শিবনাথের দিকে— 'দেখুন তো কিছু করা যায় কিনা। কিন্তু শুধু পেন্ট করে আপনি কতটুকু সামলাবেন ?'

স্বল্পভাষী, বিনম্র শিবনাথ ঘনিষ্ঠ হলেন আরতির কাছাকাছি—'একটু তাকান তো আমার দিকে···'

আরতি মুখ তুলল না। কুড়ি-বাইশ বছরের যুবতী। ক্ষুব্ধ অভিমানে মুখ না তোলার জেদ।

'কী! শুনছ না কী বলছেন উনি ?' পরমেশ চেঁচিয়ে উঠলেন। প্রচণ্ড দাপটে। মুখে আঁচল চেপে গোটা শরীরে থরথর কাঁপছে মেয়েটা।

'ন্যাকামো করো না। বুঝলে, ন্যাকামো করো না। তুমি কী করেছ, কত টাকা ক্ষতি করলে কোনো হিশেব জানা আছে তোমার ? আজই তোমাকে নিয়ে দুটো সিকোয়েন্স টেক হবার কথা। আর আজই তুমি···' গলাটা ধরে আসে। নিজেকে সামলে নিতে পরমেশ থামলেন একটু এবং পরক্ষণেই, আরো বেশি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে— 'ইয়ার্কি পেয়েচ ? মজা! ঢেউ খেলিয়ে নেচে বেড়ানোর জন্যে তোমাকে নিয়ে আসা হয়েছে ? অল্ রাইট, তুমি থাকো, এখানেই থাকবে তুমি···ক্যাম্প থেকে বেরোবে না, এক পা নড়বে না কোথাও···'

প্রচণ্ড বেগে ছিটকে বেরিয়ে এলেন। কিছু দূরে ক্যাম্পের কয়েকজন. ডাকলেন গোবরাকে— 'সুকুমারবাবু কোথায় ?'

'সুকুমারদা তো সকাল থেকেই বাইরে কোথায়···'

'তারকবাবুকে ডাক্।'

এ বয়সের একটি মেয়ে ক্যাম্পে একা থাকবে—এমত ভাবনায় কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত, শুটিং স্পটে টেনে নিয়ে গিয়ে সকলের সামনে ওকে আরো বেশি নাজেহাল করতে চাইলেন না কিছুতেই। তারকবাবুকে নির্দেশ— 'মেয়েটা এখানেই থাকবে। আপনি নিজে কাছে কাছে থাকবেন। সুকুমারবাব এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন এক্ষুনি···'

ক্যামেরাসহ ট্রলিপ্ল্যাক আলোর সরঞ্জাম নিয়ে ভ্যানটা চলে গেছে অনেক আগেই। আর্টিস্টদের পৌঁছে দিয়ে রাজু গাড়ি নিয়ে ফিরবে—এ রকম কথা

যদিও, কব্জিতে সময়ের দিকে তাকিয়ে পরমেশ আর দাঁড়াতে চাইলেন না। অথবা চঞ্চল স্নায়ুভারে কিছুটা স্বস্তির জন্য হাঁটতেই ইচ্ছুক।
এবং হাঁটতে হাঁটতে— 'কী বুঝলেন? কিছু করা যাবে?'
পায়ে পায়ে শিবনাথ। কুণ্ঠিত ভঙ্গি। প্রভাকশনের সঙ্কটে বাক্যহীন।
'হয় না। বুঝলেন মশাই, 'এভাবে চলে না কাজকম্মো...' স্কুলের মাঠ পেরিয়ে মাস্টারমশাইদের কোয়ার্টারের কাছাকাছি পৌঁছলেন। অদূরে তেঁতুলতলা—
'আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে এক মধ্যচাষির ঘরের মেয়ে, ওই দেখুন...'
ডানদিকে তালনারকেল কলাগাছ বাঁশঝাড়ের ফাঁকে একটা পুকুর, পুকুরের অপর পারে অস্পষ্ট গ্রাম্যবধূ অথবা অনূঢ়া যুবতী। পরমেশ বললেন—'যতই রঙকালি দিন, ক্লোজআপ-এ আনা যাবে ওকে? কক্ষনও না। ইম্‌পসিবল্‌...'
কী বলবেন শিবনাথ। ছোট্ট করে হাসলেন।
কায়েতপাড়ার বাঁকে হালকা নীল রঙের গাড়িটা ফিরছে। হাতের সিগারেটটা পাশের ঝোপঝাড়ে ছুঁড়ে ফেলে থমকে দাঁড়ালেন পরমেশ। বাকি রাস্তাটুকু গাড়িতেই যাওয়া যাবে। বয়ে যাচ্ছে সময়।

হাতুই নয়, মোহনপুরের মন্দিরতলায়, প্রাচীন মন্দিরের পেছনে দেওয়ানপাড়ায় আজ কাজ হবার কথা।
ছবির কাজ যতই এগোচ্ছে, আশেপাশে গ্রামাঞ্চলে হরেক গালগপ্‌পো চারিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন ভিড় বাড়ছে। দূরদূরান্তের হাজার হাজার মানুষ। এখন বাচ্চাদের সঙ্গে মেয়েরাও।
দেওয়ানপাড়ার ছোট পরিসরে বিপুল সংখ্যক মানুষের চাপে নিজেদের ঘরদোর সামলাতে নাজেহাল হয়ে উঠছে এলাকার গৃহস্থরা এবং দর্শকজনতা ক্রমেই অধৈর্য। সোরগোল হট্টমেলায় ফিল্মদলের অবস্থাটা বিস্তীর্ণ মাঠের হাইওয়েতে ব্রেকডাউন গাড়ির ভ্রমণবিলাসীদের মতো। একমাত্র ক্যামেরাটা ছাড়া ভ্যান থেকে নামানো হয়েছে সবই। নির্বাচিত স্থান, করালী দেওয়ানের বাড়ির সামনে জেনারেটর স্তব্ধ, সোলারগুলো এক পাশে দাঁড় করানো, বাউন্সবোর্ড রিফ্লেক্টর-ফ্রেমগুলো মাটিতে পড়ে আছে। তাকানো যায় না সেদিকে। সরাসরি রোদ রুপোলি রাংতায়। বিকল্প সূর্য, সামিয়ানাটাও টাঙানো হয়নি নির্দেশ-অভাবে।

এর বেশি কোনো নির্দেশ ফার্স্ট-অ্যাসিস্ট্যান্ট দীপক বসুও দিতে পারছেন না আপাতত। ডিরেক্টর নেই। মেকআপম্যান শিবনাথ বিশ্বাসও অনুপস্থিত। আর্টিস্টদের কাউকে তৈরি করাও অসম্ভব।

ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্যের শট নেবার কথা এখানে। কাকমুর্গির ভোরে জনশূন্য গ্রামের নৈঃশব্দ্যকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে চিৎকারে কান্নায় বাবুদের কাছারিবাড়ি থেকে ছুটে এসেছে অযোধ্যা নন্দীর মেয়ে মালতী। পাগলা কুকুর বা সর্পদংশন নয়, তাকে যুদ্ধ কামড়েছে। উদ্‌ভ্রান্ত সেই ছুটে আসার দৃশ্যটা তোলা হয়নি এখনও। পঁচাশি দৃশ্যের দ্বিতীয় শট—বামুনকায়েত মোড়লমাতব্বরদের পায়ে পড়ে পড়ে কান্নায় কান্নায় মাথা কুটছে মেয়েটা। শক্ত খড়মের গুঁতো ওর কপালে, গায়ে থুতু। সমাজপতি বশিষ্ঠ পরশুরামদের বিচার—আকাল হোক, যুদ্ধ হোক, ধম্মো আছে দেশে। এ মেয়ে কুলটা।

অযোধ্যা নন্দীর ভূমিকায় নির্বাচিত অভিনেতা নিকুঞ্জ বালিয়াল রাজ্য সরকারের কর্মচারী। আপিশ থেকে দুদিনের ছুটি নিয়ে ক্যাম্পে এসেছেন। ঠিক এই মুহূর্তে দীপক তাকে বলতে পারছে না কিছুই। উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতিতে আরতিকে নিয়ে পরমদা ফিরবেন কিনা অথবা আরতি সম্পর্কিত সর্বশেষ কি সিদ্ধান্ত, সে জানে না।

ওদিকে কাজের বিলম্বে জনতা আরো অস্থির। দড়ির বেরিকেড ভেঙে উপচে পড়তে চাইছে ইউনিটের আঙিনায়। হৈহট্টগোল সামলাতে চারজন পুলিশসহ হরেন আওন এবং দলের অন্যান্যরা বিপর্যস্ত-প্রায়।

অন্যদিকে করালী দেওয়ানের সদরঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসেছেন কিরণময় প্রতিমা নন্দিতা ধ্রুবজ্যোতি বিতোষ নিকুঞ্জ এবং অনেকেই—চেয়ার মোড়া টুল বা মাটিতে ছড়ানো মাদুরে। আলোচনা হচ্ছিল। আলোচ্য আরতি।

চশমা সাফ করে চোখে আঁটলেন কিরণময়। বাবরি চুলে নাড়ন দিয়ে হাঁটুতে থাপ্‌পড়—'ওরা নির্দোষ। বুঝলে হে, কোনো অপরাধ নেই ওদের। জম্মো দিয়ে পুরো প্রজন্মের কাছে আমরা দেউলিয়া। এক্কেবারে ফতুর। উই হ্যাভ নো রাইট টু টেক দেম টু টাস্ক...'

জনতার কোলাহল হঠাৎ চরমে। ব্যস্ত হয়ে উঠল ইউনিটের লোকজন।

গাড়ি থেকে নেমে ভিড় ঠেলে এগোচ্ছেন পরমেশ। মুখেচোখে চেহারায় যেন দীর্ঘ, দীর্ঘ দিনের বিষাদের ছায়া। কাছাকাছি পৌঁছতে কোনো কথা বলার সাহস পাচ্ছে না কেউ।

‘আমি বা নন্দিতা একবার যদি টের পেতাম পরমেশবাবু…’ প্রতিমা দাশ ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেন কাছে—‘কিন্তু চুপিচুপি কখন যে করল এটা…’

‘হতো না, বুঝলেন, হতো না। এখন বুঝতে পারছি। ভেরি, ভেরি ব্যাড চয়েজ। এ মেয়ে ভ্রূ প্লাক না করুক, শেষপর্যন্ত একটা কিছু করতই। বাজে, খুব বাজে। বোগাস…’

অসম্ভব তিক্ততায় দীপককে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন পরমেশ। তাকালেন নিকুঞ্জ বালিয়ালের দিকে। গলার স্বর কিছুটা খাদে—‘আপনাকে তো আবার এক ঝামেলায় ফেললাম মশাই। আজ আর কি হবে? মেয়েই নেই। আপনি বাপ হবেন কার?’

নিকুঞ্জ সবিনয়ে হেসে—‘সে আর কী করবেন? হঠাৎ ঘটে গেল।’

পরমেশ দ্রুত কাজের দিকে ফিরলেন। দীপকের প্রতি প্রবল হুঙ্কার—‘প্যাক আপ। এখান থেকে তুলতে বলো সব। দেখি ফাইলটা…’

চিত্রনাট্যের ফাইলটা হাতে কাঁপিয়ে তাকালেন কিরণময়ের দিকে—‘যাঁরা সিলেকটেড আর্টিস্ট, তাঁদেরই সঙ্গে ডেট নিয়ে কি রকম বার্গেন করতে হচ্ছে। ছোট কাজ বড়ো কাজ, যাই হোক, সবাইকে নিয়ে এক জায়গায় থাকতে পারতাম একটা মাস, অনেক ভালো কাজ হতো। এখন আবার নতুন করে উটকো ট্রাবল। আজ সকালটা গেল। এখন ফাইল খুলে আমাকে খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে, যাঁরা হাতের কাছে আছেন, তাদের নিয়ে কোন্ সিকোয়েন্সটা কোথায় তোলা যায়…’

চারদিকে প্রচণ্ড হট্টগোল। মালপত্তর আবার তোলা হচ্ছে গাড়িতে। ‘আজ আর বই তোলা হচ্ছে না’ জেনে জনতা হতাশায় বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত। নানাধরনের আওয়াজ শিস্, খিস্তিখাস্তা। অকারণ গালিগালাজে নাস্তানাবুদ ওদেরই ঘরের ছেলে—হরেন আওন।

কিন্তু এসবের উর্ধ্বে, এরই মধ্যে যেটুকু সময় বা নিভৃতি পাওয়া গেল, করালী দেওয়ানের দাওয়ায় বসে দ্রুত শট-ডিভিশনের দৃশ্যাংশগুলো ঘাঁটতে থাকেন পরমেশ। পাশে দীপক। সকালটা নষ্ট করা যায় না এভাবে। কিছু একটা করতেই হবে যেহেতু এবং দর্শকের ভিড়কে ফাঁকি দেবার এই-ই সুযোগ, নির্দিষ্ট হলো—হাতুই। সাবিত্রীর ঘর। ফণ্ড দুলের ডেরা।

দেহেমনে কেঁপে উঠল নন্দিতা। সেই ভীষণ, ভীষণ দৃশ্যটা অতর্কিতে।
সন্ধে গড়িয়ে রাত গভীর হয়ে আসে। প্রায়ান্ধকার ঘরের ভেতর বাঁশের বাতায় শায়িত পূর্ণগর্ভা সাবিত্রী। গোঙানি, সমস্ত শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে দুঃসহ কাতরানি। আজই একটা কিছু হবে। আজ রাতেই। সব্বোনেশে আকালের দিনে কে আসছে গো! কংসবধের কোন্ গোপাল!
পিদিম জ্বালার তেল নেই। শুকনো কাঠ আর ডালপালা পুড়িয়েছে অর্জুন। আঁধার রাতে চিতের আগুন। চিতের কাঠ এনে গেঁথে দিয়েছে ঘরের মাটিতে। ভয়ঙ্কর লালচে আলোর চোখ পোড়ানি ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অসহায় চৌকিদার-গিন্নি জাপটে রাখতে চায় উথালপাথাল বৌটাকে। পারে না। বাইরে ওর শ্বশুর-সোয়ামি। আঁধার রাতের প্রহরী। বৌটা মরে যাচ্ছে ওদের।
গোটা গ্রাম ঘুরে এক টুকরো কাপড় পায়নি চন্দ্রধর। দু-টাকা আড়াই টাকা দরের এক জোড়া শাড়ি পনের টাকা। সেও পাওয়া যায় না বাজারে। আব্রু নেই গর্ভিনীর।
তেলচিটচিটে চটে ঢাকা থাকবে সাবিত্রীর শরীর। ব্লাউজ-ব্রা তো নয়ই, শাড়িটাও এমনভাবে গুটোনো থাকবে চটের তলায়, মনে হতেই হবে, নগ্নদেহ।
কন্ট্র্যাক্টের আগে দৃশ্যটা নিয়ে কথা হয়েছিল কলকাতায়—'এটা থাকবে। থাকতেই হবে। কোনো কমার্শিয়াল পেঁজেমি নয়। শুধু এটুকুর জন্যে এসব ছবির কোনো কমার্স হয় না। আসলে শিল্পেরই তাগিদ। সৃষ্টির যন্ত্রণা। এই দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে এক বিঘে জমিতে যারা দশ মণ চোদ্দ মণ ধান ফলায়, তোমার আমার মতো ফালতু বাবুদিদিমণিদের চাইতে তারা অনেক অনেক মহৎপ্রাণ। কিন্তু কথাটা আমরা মানি না, মানতে চাই না। গালিগালাজের ভাষায় '·'ল—চাষা। এত এক্স্‌প্লয়েটেশন্ আর ডিস্‌রেসপেক্ট যেমন সত্যি, সৃষ্টির আনন্দটাও মিথ্যে নয়। এরাই ফসল ফলায়, এরাই আকালে মরে। সাবিত্রীর মধ্যে একই সঙ্গে সেই যন্ত্রণা আর সৃষ্টি, বাবুদের তৈরি দুর্ভিক্ষটাকে গায়ে মেখে নিয়ে রক্তে রক্তে, দেহের সমস্ত অণুপরমাণু নিংড়ে নিজেরই সন্তানের জন্ম···সেটা, সেটা সেক্‌স্ নয়···'
কলকাতার কলেজে ইংরেজির অধ্যাপিকা, গ্রুপ থিয়েটারের নামী অভিনেত্রী নন্দিতা রায় মৃদু হাসি নিয়ে সোফার কোণে চুপচাপ।
কিন্তু পরমেশ তার নিজের ভাবনায় মশগুল—'বাজে কমার্শিয়াল ছবিতে যা-সব থাকে, সেগুলোও সেক্‌স্ নয়। আসলে ওগুলো কিছু না। কিচ্ছু না। ইতর

ধাস্টামো। জয় অব ফ্লেশ, সাফারিং অব ফ্লেশ নিশ্চয়ই পার্ট অব লাইফ। পুরো জীবনটাকে ধরতে চাইলে ধরতে হবে সেটাকেও। অবশ্য ঠিকমতো ধরতে জানা চাই। ইউ মাস্ট থ্রো অ্যান্ এস্থেটিক্ চ্যালেঞ্জ...'

'আচ্ছা, আপনি এত কথা কেন বলছেন, বলুন তো পরমদা...' নন্দিতা হেসে ফেলেছিল—'প্রেগন্যান্সিতে নার্সিং হোমে, হাসপাতালে যায় না মেয়েরা! পুরুষ গায়নোর কাছে সমর্পণ করতে হয় না নিজেদের? অ্যাবসোলিউট নেসেসিটি ..'

'এগ্জাকটলি এগ্জাকটলি, তোমার কাছ থেকে এরকম একটা কথাই আমি আশা করেছিলাম। কিন্তু...'

'কিন্তু?'

'না, তুমি একটা কলেজে পড়াও, ছাত্রীরা আছে তোমার। চাকরি...'

'সো হোয়াট! আমার ছাত্রীদের এরকম একটা ম্যাচুরিটির লেভেল থাকবে, আমি তো সেটাই আশা করব। অ্যাট লিস্ট, আই টিচ টু প্রিচ দ্যাট।'

'থ্যাঙ্কস। আমি তাহলে নিশ্চিন্ত হতে পারি। তুমি আসছ। সিকোয়েন্সটার প্রতি, বুঝতেই পারছ, আমার একটু বিশেষ মমতা...'

সুতরাং, এমন একটি দৃশ্যের নির্মাণে আজকের সকালটাই যেন হঠাৎ এক মস্ত সুযোগ। আচমকা ভেস্তে যাওয়ায় দেওয়ানপাড়ার জনতা বুঝতেই পারেনি কোথায় কি হবে। ভিড়টা জমে-ওঠার আগেই নিঃশব্দে পৌঁছে গেল সবাই। শুধু জেনারেটরটাই টেনে আনতে যা-একটু সময়।

নিবিড় রুদ্ধঘরের কাজে প্রয়োজনের লোকজন ছাড়া ইউনিটের বাকি সবাইকে মন্দিরতলা থেকেই ক্যাম্পে ফিরে যেতে বলেছেন পরমেশ। হাতুই পৌঁছেও প্রভাকশনের ঘনিষ্ঠরা অনেকেই ঘরের বাইরে।

ভরতপুরে রাতের দৃশ্য। দুলেপাড়ার অন্ধকার মাটির ঘরে অসুবিধা ছিল না কোনো। স্টুডিওর সেটের মতো প্রতিদিনের কাজের জন্য টাকা পায় ফগু দুলে। সুতরাং সে খুশি। ঘর ছেড়ে দিয়ে বৌবাচ্চা নিয়ে সকলেই বাইরে।

সকালটা নষ্ট হলো না মোটেই। কিন্তু স্থানান্তর এবং অপরিকল্পিত কর্মসূচিতে সব কিছু বন্দোবস্ত করে তুলতে প্রায় দুপুর গড়াল।

সাজগোজে এবং মানসিক প্রস্তুতিতে আরো একটু সময় নিল নন্দিতা এবং প্রতিমা দাশ।

সিন 84 শট 3 টেক 1 সায়লেন্ট নাইট 15 10 83

বদ্ধঘরের ভেতর বীভৎস চিৎকার, দুঃসহ গোঙানি, প্রসূতির দাঁত-চাপা কান্নায় আর্তনাদে গোটা শরীর মুচড়ে মুচড়ে যখন অসহ্য দাপাদাপি, মশালের লালচে আলোয় আরো ভৌতিক আনাড়ি ধাইমা প্রতিমার মুখ।

'ঘাম, ঘাম নন্দিতা, ঘেমে উঠতে হবে তোমাকে···' চাপা গলায় পরমেশ। আবেগের আর্দ্রতায়।

মেক-আপের শিবনাথকে ডাকা হলো। মোলায়েম করে আরো একটু জলের প্রলেপ নন্দিতার কপালে গালে চিবুকে।

বাউন্সবোর্ড-চাপা সোলারের আলো। মেঝেতে সত্যি-সত্যি গাছের ডাল-পোড়ানো আগুন। ক্যামেরায় চোখ ফেললেন পরমেশ। ফ্রেমে আগুনসুদ্ধ ওরা দুজন। খাটো নোংরা শাড়িতে প্রতিমা স্বল্পবাস যদিও, শায়িত নন্দিতা মোচড়ানিতে শরীরটা আরো একবার ভাঙতেই, চমকে উঠলেন পরমেশ। ধাঁধা। ছেঁড়া চটের তলায় নন্দিতা কি যথার্থই নিরাবরণ! নন্দিতা কি করে এমন গর্ভিনী? সুতরাং শুদ্ধতা। কথা নয়, শব্দ নয়, স্পন্দনও নিষিদ্ধ যেখানে, ঝিঁঝির ডাকে সচল হলো ক্যামেরা। নির্মল, ক্যামেরার অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকনাথ এবং দীপক যেন একটু বেশি, কিছুটা অতিরিক্ত ওজনেই শ্রদ্ধায় বিনত, সংযত গম্ভীর—এ কষ্টটা অভিনয়। যদি অন্য কোনো যন্ত্রণা থাকে, নন্দিতাদি ভুলুন···

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়, ধোঁয়ার গন্ধে, গরমে ঘেমেনেয়ে মানুষগুলো অস্থির যখন, ক্যামেরা এক মিনিট দেড় মিনিট চলার পর পরমেশ হাঁকলেন—'কাট্···'

মুক্তি, মুক্তি সকলের।

'ব্রিলিয়ান্ট! নন্দিতা, তুমি জানো না হোয়াট ইউ হ্যাভ্ ডান্···'

'আপনারা একটু বাইরে যাবেন পরমদা···' চিৎ হয়ে শুয়ে নন্দিতা, যেন এবার সত্যি-সত্যি যন্ত্রণায়—'আমি উঠব।'

'খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার?'

'কেন?,

'ভালো করেছ। সত্যি সুন্দর। তবু আরেকটা টেক্···'

নিভৃতে দম নিল সবাই। ইচ্ছা নয়, অনিচ্ছা নয়—নির্দেশ।

সিন 84 শট 3 টেক 2

ধোঁয়া, আরো ধোঁয়া, লকলকে অগ্নিশিখা। গুমোট ঘরের দাহ। সত্যি-সত্যি

যন্ত্রণা এবার। ফার্নেসের আগ্নেয় গুহায় সেদ্ধ হতে হতে কাতরতা চিৎকার শরীরের মোচড়-ভাঙা যখন আর অভিনয় নয়, অথবা অভিনয়শূন্যতাই যেখানে শিল্পের চাহিদা, ফ্রেমের ভেতরে-বাইরে ঘর্মাক্ত বিধ্বস্ত নারীপুরুষ মিলেমিশে, যে-কোনো মুহূর্তেই যখন বিগড়ে যেতে পারে কেউ, আপন ঋজুতায় নিষ্কম্প পরমেশ, যেন পরপীড়নসুখলোভী মশানের জল্লাদ কুঞ্চিত ভ্রূরেখায় স্থির পলকে তাকিয়ে থেকে, তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হাত তুলে, ঈষৎ সামনে ঝুঁকে প্রবল উল্লাসে—'কাট্, কাট্, ও. কে···স্প্লেন্‌ডিড, রিয়েলি ইউনিক···'

মুক্তি। খাঁটি খাঁটি মুক্তি এবার।

কিন্তু এক মুহূর্তও বাড়তি উৎপাত নয়। ক্যামেরা রইল, যন্ত্রপাতি থাক আপতত। চোখের ইশারায় সহযোগীদের একে একে সবাইকে বের করে দিয়ে, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে পরমেশ নিজেও বাইরে এসে দাঁড়ালেন। পেছনে ঝাঁপ টেনে দিচ্ছে দীপক।

উঠোনের ভিড় থেকে ছুটে এলেন সুকুমার।

'আপনি! কখন এসেছেন?'

'এই তো, একটু আগে···'

'ওদিকের সব শুনেছেন?'

'হ্যাঁ···' চোখেমুখে একরাশ বিরক্তি আর ভাবনা নিয়ে সুকুমার—'মেয়েটা যে কী! মাথাটাথা খারাপ নাকি?'

'ওসব আদর ক্ষাদর ছাড়ুন। বজ্জাত। কেন! আবার কিছু করেছে নাকি? কী বলছে এখন?'

'সে যাচ্ছেতাই সব কাণ্ড। ছিঃ ছিঃ···'

'বলুন না স্পষ্ট করে···' দাবড়ে উঠলেন পরমেশ।

'আপনারা চলে আসার পর যতক্ষণ একা ছিল, চুপচাপই নাকি ছিল। মন্দিরতলা থেকে আর্টিস্টরা অনেকেই ফিরে গেলেন। তারপর সে আরেক মূর্তি। চিৎকার চেঁচামেচি কান্নাকাটি। প্লাক করা নাকি এমন কিছু নয়। আজকাল সব মেয়েই করে। আসলে নন্দিতাদি প্রতিমাদির সঙ্গে ওকে এক রকম দেখেন না আপনি। প্রথম দিন থেকেই খারাপ ব্যবহার করছেন···'

পরিশ্রমে গরমে প্যাচপেচে পচা ঘামে জ্বলছিল শরীরটা। পায়ের পাতা থেকে মগজের স্নায়ু পর্যন্ত বারোমিটারের পারার মতো রক্ত চড়ে যাওয়ার ক্রোধ। প্রায় পুরো সিগারেটটাই ছুঁড়ে মারলেন মাটিতে—'এসব নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার

সময় নেই আমার। ইয়ার্কি করতে আসিনি এখানে। কাউকে সঙ্গে দিয়ে গাড়িতে হোক, ট্রেনে হোক, যেভাবে পারেন ওকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন কলকাতায়। ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে যেন ওকে আর দেখতে না হয়…'
সুকুমার বিস্মিত। দ্বিধাগ্রস্ত তবু—'কিন্তু…'
'ওসব কিন্তু টিন্তু আমি বুঝব। আপনি যান…'
ভ্রূক্ষেপহীন উপেক্ষায় কাজের ভিড়ে সরে গেলেন পরমেশ, যেখানে দুলেপাড়ার উঠোনে নতুন দৃশ্যপট রচনায় ব্যস্ত সবাই। নিজেও মেতে গেলেন সহযোগীদের ভিড়ে।
আরো একটা শট নেওয়া হবে এবেলা। দুজনই শিল্পী—প্রতিমা দাশ এবং নন্দিতা।

সিন 55 শট 4 টেক্ 1 জি টি ডে 15 10 80

ভরদুপুরে চুপি চুপি এসেছে শশিবালা। আঁচলে টোপাকুলের চেয়েও ছোট্ট গিঁট। লাল পাথর-বসানো একটা নাকের ফুল, সোনার— 'ইটো রেখ্যে দুটো চাল দিবি লা বৌ ?'
শ্বশুরসোয়ামি ঘরে নেই। নিজেকে আড়াল করে ঘরের দোরে কাতরাচ্ছিল গর্ভবতী সাবিত্রী। চাল! চমকে উঠল শব্দটা শুনে— 'তুমি চোকিদারের-বৌ দিদি, চাল খুঁজচ তুমি ?'
'আঁ, ইয়ারেই আকাল কয়।'

সেদিন রাতে ক্যাম্পের সমবেত-জীবন রীতিমতো এলোমেলো। সরাসরি মুখ খুলছে না কেউ। বৈঠকীতে মৃদু গুঞ্জন।
বিকেলের দিকে কাজ বন্ধ ছিল না। জেদে আর ক্ষিপ্রতায় পরমেশ মিত্তির যেন আরো বেশি বেপরোয়া। চড়া মেজাজে দাবড়ে রেখেছেন সবাইকে। এমন কি, প্রতিমা নন্দিতা ধ্রুবজ্যোতিও কথা বলার সুযোগ পায়নি তেমন। বার-কয়েক কিরণময়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছেন। সেখানেও আলাদা মানুষ।
অন্যভাবে সুকুমার বসাকও বড়ো বিপন্ন এই উদ্ভূত সঙ্কটে। এত বড়ো কর্ম-কাণ্ডের সাংগঠনিক দায়িত্বে তাঁর কর্তৃত্বের যত দাপটই থাক, একটা জায়গায় কর্মসচিবের নাগাল নেই—আর্টিস্ট। শিল্পীরা ডিরেক্টরের আপনজন। সুতরাং

হুকুম-তামিলে গাড়ি আর ড্রাইভারকে দিয়ে আরতিকে পাঠিয়ে দিতেই পেরেছেন শুধু, বোঝাতে পারেন নি। মেয়েটা সব কিছুর বাইরে তখন। এতদ্ব্যতীত ইউনিটের কাজকর্ম সচল রাখার চেষ্টায় তাঁর ভাবনা অন্যত্র। মেয়েটা এভাবে চলে যাবার পর পাঁচমিশেলি কানাঘুসোয় গ্রামবাসীর কাছে খবরটা গপ্‌পো হয়ে উঠতে পারে। দ্রুত ব্যবস্থা নিলেন কিছু। সতর্ক করলেন সবাইকে। এখন তাঁর ভয় শুধু একজনকেই—হরেন আগুন। লোকটা ভালো আর বোকা। না বুঝেও ক্ষতি করে ফেলতে পারে কিছু।

দুপুরে, লাঞ্চের অবকাশে গোটাকয়েক চিঠি লিখলেন পরমেশ। কলকাতায় কয়েকটি গ্রুপ-থিয়েটারের নির্দেশক এবং সরাসরি কয়েকজন অভিনেত্রীকে ব্যক্তিগত অনুরোধ বা জরুরি এস. ও. এস। যদিও জানেন, এ বয়সের একজন অভিনেত্রী বাংলা গ্রুপ-থিয়েটারে খুব বেশি নেই। তাছাড়া পুজোর মাসে দল-গুলোর নানা জায়গায় কল্‌-শো অথবা নিজেদেরই অভিনয়—একাডেমি শিশির মঞ্চ রবীন্দ্রসদনে। তথাপি চিঠি। তথাপি চেষ্টা। চিঠিগুলো নিয়ে আড়াইটার ট্রেনে দীপক চলে গেছে। সব রকম যোগাযোগ করে কালই সন্ধেবেলা ফিরবে নতুবা পরশু সকালে। আরতির পরিবর্তে একজনকে চাই-ই কদিনের মধ্যে। অভিনেত্রী না-হোক, অন্তত এই বয়সের মানানসই কোনো মেয়ে। অভিনয় আদায় করে নেবেন।

বাইরের বাগানে, পাঁচশ ওয়াট আলো থেকে দূরে আলো-আঁধারিতে গোটাকয়েক বেঞ্চি টেনে কথা বলছিল ওরা—প্রতিমা নন্দিতা ধ্রুবজ্যোতি বিতোষ উদয় আর বিমল। সুকুমার এলেন—'পরমদা কোথায় বলুন তো?'

'ওপরেই তো আছেন। কিরণদার সঙ্গে কথা বলছেন দেখলাম।'

'বসুন সুকুমারদা, বসুন...' উদয় নড়েচড়ে জায়গা সাজিয়ে দিলো।

'বসব আর কী। এ তো একেবারে বসিয়েই দিয়েছে...' সুকুমার বিষাদে হাসলেন। গুমোট গরমে গাছপালার স্থবিরতার মতোই সংযত সবাই। যে মেয়ের শোকতাপে এত বিহ্বলতা, ভদ্রলোক যেন তারই কোনো প্রত্যক্ষ অভিভাবক, যাকে শুধু সহানুভূতি সমবেদনা ছাড়া অন্য কারো দেবার কিছু নেই।

সুকুমার সিগারেট ধরালেন—'কাকে কি বলব বলুন দেখি। জীবনে কত বড়ো সুযোগ হারাল, মেয়েটা জানে? কোনো ধারণা আছে ওর?'

'সে আর আপনি কী করবেন?' প্রতিমা দাশ ব্যাগ থেকে সুপুরির টুকরো বের করে মুখে দিলেন।

কিছু বলতে যাচ্ছিল নন্দিতা, সুকুমার বললেন— 'দেখুন, আজ প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আছি এ লাইনে। আপনাদের ওসব মণ্টাজফণ্টাজ জুম-ব্যাক জুম-ফরোয়ার্ড সিলিউট ফ্রিজ্ আর্টফার্ট কিছু বুঝি না। বোঝার চেষ্টাও করি না। কিন্তু দেখে-দেখে একটা অভিজ্ঞতা তো হয়েছে। সে আমি এমনিতেই বুঝতে পারি— সাংঘাতিক ছবি হচ্ছে এটা একটা। প্রডিউসার এ থেকে কী টাকা পাবেন, সে আমি জানি না। কিন্তু পরমদা বিরাট সম্মান পাবেন। প্রাইজটাইজ তো বটেই, তার ওপরও যদি কিছু থাকে···'

'সে তো নিশ্চয়ই। সে আমরা কাজ করেই বুঝতে পারছি।' ধ্রুবজ্যোতি।

'বলুন দেখি, এর মধ্যে খামোকা কী একটা ঝামেলা পাকিয়ে গেল মেয়েটা।'

'ছাড়ুন তো, এ-ও তো আপনাদের আরেক বাড়াবাড়ি···' হঠাৎ নন্দিতা। সুকুমার ঘাবড়ে গেলেন।

নন্দিতা বেশ রেগেই— 'ওকে এত ইন্‌ডিস্‌পেনস্‌বল মনে করছেন কেন আপনারা? ও কি আপনাদের ম্যাগ্‌নেট-স্টার নাকি? আরতি ছাড়া চরিত্রটা করার মতো আর মেয়ে নেই বাংলাদেশে?'

'না, সেটা কথা নয়···' অবশেষে বসলেন সুকুমার। যেন ঘনীভূত সঙ্কটটা, সঙ্কটের গুরুত্বটা সহযোগীদের ব্যাখ্যা করাটাই এই মুহূর্তে বিশেষ জরুরি তাঁর— 'এখানে মাত্র চার সপ্তাহের প্রোগ্রাম আমাদের। কালীপুজোর আগেই স্কুলবাড়িটা ছেড়ে দিতে হবে। এর মধ্যে বেশ কটা দিন চলেও গেল···'

সিগারেটটা হাতে পুড়ছিল উপেক্ষায়। সুকুমার আঙুলের টোকায় ছাই ফেললেন। চিন্তাভাবনার তলানি থেকে আস্তে— 'সেভাবেই আর্টিস্টদের ডেট দেওয়া আছে, ব্যবস্থা করা আছে সব। দু-এক দিনের মধ্যেই আরতির জায়গায় কাউকে চাই। কাজ তো ফেলে রাখা যাবে না কিছুতেই। অ্যাদ্দুর এগোনোর পর ফিরেও যাওয়া যায় না এখন···'

'আপনার সঙ্গে এ নিয়ে কথা হয়নি পরমদার?'

'হয়েছে একটু-আধটু···' সুকুমার উঠে দাঁড়ালেন— 'বেশি কথা বলার আর সময়টা পেলেন কোথায়? কাজই তো করছেন সারাদিন।'

'এ কি! আপনি উঠছেন?'

'হ্যাঁ যাই। পরমদার সঙ্গে কথা বলি একটু। আপনারাও আসুন একটু বাদে···'

'পরমদা তো বললেন— যেমন-চলছে তেমনি কাজ হবে কাল থেকে···'

সুকুমার ম্লান হাসলেন— 'সে তো হতেই হবে ধ্রুববাবু। লাখ চারেক টাকা ইনভেস্টমেন্ট হয়ে যাবার পর তো আর পিছোনো যায় না। প্রডিউসার ছাড়বে কেন? কিন্তু কাজ-হওয়া আর কাজ-চালিয়ে-যাওয়া কি এক হলো?'
'তার মানে! আপনি বলছেন…'
'আমি কিছু বলছি না। বলার কথাও নয় আমার। শুধু ভাবছি, মাথা ঠাণ্ডা রেখে এরপর কি আর আগের মতো কাজ করতে পারবেন পরমদা।'
ফুরফুরে বাতাস ছিল মিষ্টি। গাদা দোপাটির শস্তা আটপৌরে বাগানে বর্ষা-মাখানো বেশ বড়ো একটা গন্ধরাজের গাছ। বাতাসে গন্ধ ছিল। সকলের সংযত মৌনে প্রতিমা দাশ আলতো স্বরে— 'আর প্রব্লেমটাও এমন, আমরা শুধু বোকার মতো বসে থাকতে পারি। পরমেশবাবুর জন্যে একটা কিছু যে করব, তারও উপায় নেই।'
'আমি…আমি কিন্তু সেরকমই একটা কথা ভাবছিলাম প্রতিমাদি…' ফিরেই যাচ্ছিলেন সুকুমার। উৎসাহিত হঠাৎ। আবার বসে পড়লেন বেঞ্চিতে, উদয়ের পাশে— 'একটু চেষ্টা করলেই আপনি কিন্তু একটা কিছু করতে পারেন নন্দিতাদি…'
নন্দিতা চমকে উঠল— 'আমি?'
'আপনি কলেজে পড়ান। আপনি তো জানেন, কোন্ চরিত্র, কেমন চরিত্র। পরমদা কি রকম মেয়ে চাইছেন। ওরকম বয়েসের মেয়েরাই তো আপনাদের ছাত্রী…'
'জানেন সুকুমার বাবু, আপনি কথাটা বললেন। আমি কিন্তু সন্ধে থেকে এ রকমই ভাবছিলাম…'
'কাউকে ভেবে পেলেন?'
'এখান থেকে কি করে সেটা বলব বলুন তো। অনেকেই নাচে, গান গায়, অভিনয়ও হয়তো করে। সেসব খোঁজ করতে হলে তো আমাকে একবার কলকাতা যেতে হয়।'
'সে কি! না না, আপনি যাবেন কি! তাহলে আবার এখানকার কাজকম্মো বন্ধ রাখতে হয়। আপনি চিঠি লিখে দিন না। লোক পাঠাব, তেমন বুঝি তো আমি নিজে যাব।'
নন্দিতা হাসল— 'কোথায় যাবেন? কলেজে তো এখন পুজোর ছুটি।'
আরো একটা ধাক্কা আচমকা। ব্যাকুলতায় সুকুমার হাল ছাড়তে রাজি নন—

'আপনি শুধু নামটাই বলুন, ঘরবাড়ি ঠিকানা বাপমায়ের অনুমতি সব আমি জোগাড় করে নেব।'

'মাই গুডনেস্! শুধু একটা নাম পেলেই কলকাতা শহরে একটা মেয়েকে খুঁজে বের করবেন আপনি?' ধ্রুবজ্যোতি হাসল।

জি-স্কেলের ভরাট গলায় উদয় চৌধুরীর হাসিটা স্কুলবাড়ি কাঁপায়— 'জিনিয়াস। কোথায় লাগে স্কটল্যাণ্ড-ইয়র্ড, সি. বি. আই...'

সুকুমার আমল দিলেন না— 'তাহলে নন্দিতাদি, আপনি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছেন কাল। কালই যাব না। দীপক ফিরুক। তারপর...'

অদ্ভুত ধরনের একটা অস্বস্তিতে নন্দিতা জড়োসড়ো— 'বলুন তো, কি এক ঝামেলায় ফেললেন আমাকে! দাঁড়ান, আগে ভেবে দেখি। আমি একজনের নাম বলব, আপনি খেটে মরবেন। শেষে...'

'আহা, সেসব ভাবছেন কেন? চেষ্টা করলেই যে সাকসেসফুল হতে হবে, এমন কথা নেই কোনো। তাহলে তো কোনো কাজই করা যেত না। ও রকম হাজারটা ফালতু খাটাখাটুনি করতে হয় আমাদের। আর এভাবে খুঁজতে খুঁজতেই না পাওয়া যাবে একজনকে...'

'রাইট ইউ আর...' ডঙ্কা নিনাদে আবার উদয়— 'দশ জায়গায় মেয়ে দেখতে-দেখতেই না এক জায়গায় সানাই-এর পোঁ...ও...ও, হেঁ হেঁ হেঁ...'

'আপনি এরকম করছেন কেন বলুন তো...' পচা দুর্গন্ধের প্রতিক্রিয়া যেমন, নাক-মুখ কুঁচকে যখন বিব্রত সবাই, বিতোষ ঝাঁ করে কাবাড়ির প্যাঁচে আঁকড়ে ধরল উদয় চৌধুরীকে—'দেখছেন, একটা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে...'

'ধ্যাৎ মশাই...' উদয়ও উঠে দাঁড়াল এক ঝামটায়— 'সেই দুপুর থেকে সবাই ঘ্যাম মেরে আছেন। যেন মরে গেছে আরতি। আমার মশাই অত সিরিয়াস ব্যাপারস্যাপার বেশিক্ষণ পোষায় না। একটু ফুর্তিটুর্তি না থাকলে...'

স্বভাবের শান্ত গলায় প্রতিমা— 'কিন্তু আমরা তো পিকনিকে আসি নি উদয়বাবু। এখন যদি মাঝপথে ছবির কাজটাই বন্ধ হয়ে যায়...'

'তাহলে আপনারা থাকুন। যত খুশি ভ্যাজরং ভ্যাজরং করুন। আমরা যাই। বাজার থেকে ঘুরে আসি একটু। চল্ বিমল, ওঠ্...'

'সেকি! আপনারা যাবেন কেন? বসুন আপনারা...' কিছুটা অপ্রস্তুত সুকুমার তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন—'কথাবার্তা বলছিলেন আপনারা, হঠাৎ আমি এসে...তাহলে নন্দিতাদি, আমি বরং পরে কথা বলব আপনার সঙ্গে।'

সুকুমার নন, উদয় চৌধুরী এবং বিমল দাশগুপ্তই আর বসতে চাইলেন না। ওদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকার অপেক্ষায় এবং মোটামুটি একটা দূরবর্তী ব্যবধান তৈরি হবার পর প্রতিমাই কথা বললেন প্রথম—'আপনি ওদের ওভাবে কথাটা বললেন বিতোষ…'

'হুঃ, এসব মালপত্তর সব আসে কোত্থেকে এখানে?' চাপা উত্তেজনা থেকে সরব বিক্ষোভে বিতোষ সুকুমারের দিকে তাকাল—'আপনাদের ফিল্ম-এর কাণ্ড কারখানায় মাঝে মাঝে এমন উদ্ভট সব…'

সুকুমারের আলগা হাসি থেকে নন্দিতা চাপা কৌতুকে—'কিংবা ধরুন, বাঁশ বাবলার ঠিকেদারদের চরিত্রে দুটো পার্ফেক্ট সিলেকশন।'

প্রচ্ছন্ন হাসিগুলো মুখর হলো—'পরমদা ইজ এ ওয়াইজ ম্যান।'

'ওরা গেল কোথায় বলুন তো। এত রাত্তিরে ওদের ঘরে আজ আসর বসেনি? আকালের বাড়ন্ত নাকি সব?'

হালকা হাসিটা গালে জিইয়ে রাখতে হয় সুকুমারকে— 'ওরা এখন বাজারে যাবে। চিত্ত আশের দর্জির দোকানে গ্রামের ছেলেছোকরাদের আড্ডা। গ্যাঁজাবে সেখানে বসে।'

'বিষয় কী? ফিল্ম থিয়েটার আর্ট!'

'বলেন কী। প্রফেসনাল থিয়েটারের রেগুলার আর্টিস্ট। ওদের কদর কত। ছেলেরা তো হা হয়ে শোনে। আপনাদের সম্মান আছে, ওঁদের টাকা আর পাবলিসিটি…'

হন্তদন্ত ছুটে এল হরেন আওন—'আপনি এখেনে গ সুকুমাদ্দা। আপুনেকে খুঁজে খুঁজে ইদিকে আলা…'

'কেন, কী হয়েছে?'

'রান্নাবান্না হচ্চে। তেল কুথা? টিনে যিটুকুন আচে, উতে চলবেনি…'

'আরেকটা টিন বের করে নিতে বলুন না। তারকবাবু কোথায়?'

'উনিই ত বললেন গ। তা ভাঁড়ার-ঘরের চাবি আপুনের কাছে ··

'আমার কাছে!' পকেটে হাত দিয়েই ভ্রূকুঞ্চন থেকে ভ্রম সংশোধনের হাসিতে —'ও হ্যাঁ, তখন স্টক মেলাতে ঘরটা খুলেছিলাম…'

চাবি নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল হরেন। নন্দিতা বলল—'হরেনদা কিন্তু বেশ। ঘর-সংসার ছেড়ে দিব্যি এখন আমাদের একজন…'

সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার—'ওরে বাবা, ওকে ছাড়া এখন তো আমি ভাবতেই

পারি না। সেই সকালে আসবে আর ঘরে ফিরবে রাত দশটায় এগারটায়…'

'আপনি আর তাঁতটাত বুনছেন না হরেনবাবু? আপনার সংসার?'

প্রশংসা স্তুতিতে সঙ্কুচিত হরেন সলজ্জভঙ্গিতে— 'সি ত আমার পরিবার আর মেয়েটা দেখচে গ ধুর্বদা। মায়ে ঝি-এ পালা কর্যে বসচে তাঁতে। কিন্তু আজ মনটা বড় খিঁচড়্যে গেল গ…'

'কেন, কী হয়েছে আপনার?'

'আরতি দিদিমণি এমনধারা এট্টা কাজ কল্ল…'

'সে আপনি ভাববেন না। আমাদের ছবি হবে। যেমন কাজ চলছিল, তেমনি চলবে কাল থেকে।'

'সি ত হবেই গ সুকুমাদ্দা, হতেই হবে গ। গাঁয়ের গরিবমানুষের এমনধারা দুঃখুর কতা! ছেঁড়া নোংরা কাপড় পড়্যা নন্দিনী দিদিমণি যখন পাট বলেন, দুচোখের জল রাখতি পারিনে গ। বুক ফেট্যে যায়। তেমনিধারা ধুর্বদা কাকাবাবু…'

ওরা এ ওর দিকে তাকাল। উদ্দীপিত। বিব্রত কিছুটা। লোকটা কি সত্যি কাঁদছে নাকি! সুকুমার বললেন— 'কিন্তু আপনি চাবিটা নিলেন। ওদিকে ওরা আবার অপেক্ষা করছে না তো!'

'অঁ, যাচ্চি। যাচ্চি গ…' এবং যেতে যেতেও হরেন আবার পেছন ফিরে— 'ই আমি বল্যে দিচ্চি গ, আরতি দিদিমণির বদলা ভাল মে'ছেল্যা এনে দেব গ আমি। আর্টিস…'

'আপনি! আপনি আর্টিস্ট আনবেন হরেনদা?' নন্দিতা উচ্চকিত হলো।

'অঁ গ দিদিমণি। মোয়নপুরের কটা ইস্টিশান বাদেই গ—বাঁশবেড়ে। সিখেন থিক্যে আলে আলে যেতে হয়। ন্যাদামহাটির পঞ্চা বাকুলির মেজ মেয়েটা গ—ঝন্না। গাঁয়ে গাঁয়ে পালা গাইতে যায়। সি আপুনেরা শোনেনি গ। শুনলে ভিড়মি খাবেন। সীতাহরণে সীতা, সিরাজের স্বপ্ন-এ লোৎফা। চোখের জল রাখতি পাব্বেন নি…'

বিস্ময়ে ধ্রুবজ্যোতি উঠে দাঁড়াল— 'কী বললেন? পেমেন্ট নিয়ে গ্রামের মেয়ে এখানে ওখানে অভিনয় করতে যায়?'

'যায় কি গ ধুর্বদা। বাপমাভাইবোনের এতগুলান পেট! পালা গে' এত্ত বড় সংসারটা চালায়।'

ওদিক থেকে প্রতিমা দাশ লঘু গলায়— 'আরতির বিকল্প তাহলে আরো একজন আরতিই ধ্রুববাবু। কলকাতায় আপিশ ক্লাবের নাটকে সবে ঘুরতে শুরু করেছে আরতি…'

'আরতি থাক প্রতিমাদি। ওকে নিয়ে আর আলোচনা নয়। ভাবতে পারেন, গ্রামে প্রফেশনাল ফিমেল আর্টিস্ট!' কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ধ্রুবজ্যোতি তার দুহাতের পাঞ্জায় আঙুল নাচাল— 'কোথায় কি যে, কত কিছু যে হচ্ছে দেশে, ছাই খবরই রাখি না…'

এদিকে তাত্ত্বিক আলোচনা শুরু হতেই সুকুমার হরেনকে নিয়ে এগোলেন। বোধ হয় রান্নাবান্নার কাজে ঘরের চাবিটা এসবের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি।

'এটা যদি হয়, তাহলে কিন্তু একটা দারুণ ব্যাপার হবে ধ্রুবদা।'

ধ্রুবজ্যোতি নন্দিতার দিকে তাকাল—'কোন্‌টা ?'

'নিরেট গ্রাম্য মেয়ে মালতীর চরিত্রে। একেবারে রঅ, আন্‌সফিস্টেকেটেড গার্ল, ভেরি মাচ আপটু টু দ্য সিচুয়েশান…'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান…' হাসল বিতোষ—'হরেনের বড়ো আট্টিস। শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায় দেখুন। 'সীতাহরণ'-এর সীতা দিয়ে পরমেশ মিত্রের ফিল্‌মে মালতী…'

বিতোষের হাসিটা সবাইকে মেনে নিতে হয়। নিঃশব্দে সংক্রামিত।

জিন্নতবেগমের অভিনেত্রী পূর্বা মুখোপাধ্যায় এলেন পরদিন সকালে। সঙ্গে পয়লা নম্বর গেজেটেড-অফিসার স্বামী শৈলেন মুখোপাধ্যায় এবং একটি ভি. আই. পি সুটকেশ। কথামতো দুদিনের কাজ, ক্যাম্পে এক রাত্রির অবস্থান।

পরমেশের জন্যে উপহার এনেছেন শৈলেন—তিন প্যাকেট স্টেট এক্‌স্‌প্রেস। নিজের ব্র্যাণ্ড ডানহিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাসের।

কুঞ্চিত ভ্রূরেখায় পূর্বার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন পরমেশ। স্বামীস্ত্রী—অস্বস্তি দুজনেরই।

'একটা সুন্দর বোন আছে না আপনার ?'

'আমার ?' পূর্বা হাসল—'আমার নয়, ওর। আমার ননদ।'

'অল্ দ্য সেম। অভিনয় জানে ? নাটকটাটক করেছে কখনও ?'

'অভিনয় ? কেন বলুন তো ?'

পরমেশ বিরক্ততায় কিছুটা উদাসীন।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলেন শৈলেন—'তিতিরের যা কিছু অভিনয় সে তো মায়ের সঙ্গে। আমরা রোজই দেখি।'

'কেন?'

'নতুন প্রেম করছে। লেকে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে রোজই বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যায়। তখন নিজেকে সামাল দিতে গিয়ে…'

বিধিমতে এর পর হেসে-ফেলাটাই স্বাভাবিক ছিল। পরমেশ সামনের দিকে এগোলেন। ক্যাম্পে তখন সাজ-সাজ ব্যস্ততা। লোকেশানে যাবার জন্য সকলেই প্রস্তুত।

কিংবা পূর্বার উপস্থিতিতে ঠিক এই মুহূর্তে তিনি জিন্নতবেগম সম্বন্ধেই চিন্তিত কিছুটা। হয়তো আরো একটা গোলমেলে নির্বাচন কিংবা পরিকল্পনার ছকটা ভুল না-হলে পূর্বা মুখোপাধ্যায়ই যথার্থ শিল্পী। জিন্নত-চরিত্রে চালু কোনো অভিনেত্রীকে চাননি তিনি। এক জোড়া চোখ চেয়েছিলেন—ভগবতী চোখ। চোখজোড়াই কথা বলবে শুধু—আতঙ্কে বিস্ময়ে বেদনায়।

এমনি একজন মহিলার কথা ভাবতে ভাবতেই এক সময় মনে পড়ে গিয়েছিল পূর্বার কথা। রেডিও-নাটকে দীর্ঘকাল অভিনেত্রী, টিভি-তেও নাকি দুচারবার আবির্ভূতা। থিয়েটারের মঞ্চে হাত পা নেড়ে দেখেন নি কোনোদিন। অথচ উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। অভিনয়ের শখ। ভিভিয়ান লে, হেলেন হ্বাইগলের সঙ্গে সমকক্ষতার দাবিদার স্ত্রীরত্নকে নিয়ে স্বভাবতই বিচলিত সরকারি প্রশাসনের বড়োকর্তা শৈলেন মুখুজ্জে। প্রশাসন-পারদর্শিতার সঙ্গে দেশের তাবোর তাবোর বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় নিজেকে নথিভুক্ত রাখতে সদাচঞ্চল শৈলেন মার্ক্সবাদ পড়েছেন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিবিষয়ে বিশেষভাবে ভাবিত, ব্রেশট বা রবীন্দ্রচর্চায় মনোযোগী, ফিল্ম্-থিয়েটারের নবতরঙ্গে বিশ্বাসী।

প্রস্তাব শুনে খুব সহজেই রাজি হয়ে গেলেন দুজনই। আনোয়ার শা রোডের শৌখিন প্রাসাদের দোতলায় কফি খেতে খেতে পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে আলোচনা দীর্ঘ সময়। একেবারে ফাঁপা নয়। অর্থনীতির ভালো ছাত্র—সহজেই মালুম হয়। বইপত্র দিলেন। অসংখ্য জর্নাল, সার্ভে রিপোর্ট। পরমেশ নেড়েচেড়ে দেখলেন কিছু। পড়ার সময় ছিল না। পূর্বাকে দেখলেন আরো ভালো করে। আয়ত চোখজোড়া। শৌখিন সুখী মহিলাকে দিয়ে অনাথা নিঃসম্বল গ্রাম্য নারী? অযথা ফিলম নষ্ট না করে আনকোরাকে দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ একটা

চরিত্র। সেদিন চ্যালেঞ্জটা ছিল তাঁর নিজস্ব অহঙ্কার। কিন্তু আজ, আরতির পর কেমন খটকা লাগছে কিঞ্চিৎ।
স্থির ছিল, সকালের দিকে ওরা স্বামীস্ত্রী দুজনই বিশ্রামের জন্য ক্যাম্পে থাকবেন। উৎসাহ-প্রাবল্যে রাজি হলেন না কেউ। কাজ দেখবেন। জেনারেটরের বিকট আওয়াজের সঙ্গে থাকবেন। কিন্তু সেটাও নাকচ। সরকারের অত বড়ো একজন মহামান্য ব্যক্তি আচমকা গ্রামে পদধূলি দিয়েছেন, ছুটে এসেছেন গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামসভার মাতব্বররা। ইশকুলের প্রেসিডেণ্ট সেক্রেটারি হেডমাস্টার, এমন কি, ঠিক সময়ে ঠিক খবর পেয়ে জেলাপরিষদের একজন সদস্য। মোহনপুর গ্রাম এবং চারপাশটা একটু ঘুরিয়ে দেখাবেন—ইশকুল ছাড়াও লাইব্রেরি হেলথ-সেণ্টার পঞ্চায়েতের কাজকর্ম। এবং শৈলেন মুখুজ্জে রাজি হলেন। ভক্ত সমভি-ব্যাহারে তিনি তখন ধুলোয় ঘাসে, মেঠো পথে পদযাত্রায়। হাঁটতে হাঁটতে বললেন—'একটা দুর্ভিক্ষ এসেছিল দেশে। পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ লাখ মরে গিয়েছিল স্রেফ না-খেতে-পেয়ে। দেশটা তখন পরাধীন। আজও দেশ জুড়ে এত হাহাকার, পাঁচ-পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরও অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটছে না মানুষের, তার একটা বড় কারণ আমলাতন্ত্র। শহরের এয়ারকণ্ডিশনড ঘরের ঠাণ্ডা থেকে বেরিয়ে এভাবে রোদে পুড়ে মানুষের মধ্যে হাঁটেন না কোনো আমলাসাহেব। ভোট কুড়োবার দায় নেই তাদের। বাট দে দেম্‌সেল্‌ভ্‌স্‌ ক্রিয়েট দ্য গ্যাপ বিটুইন দ্য পিপল অ্যাণ্ড গভর্নমেণ্ট। দেশ, মানে তো কতগুলো ফাইল আর স্ট্যাটিস্‌টিকাল ইনফর্মেশন নয়। দেশ মানে এই ধুলো ঘাস মাঠ, এই টেরাকোটা...' মন্দিরতলায় পৌঁছে শৈলেন মুখুজ্জে মুগ্ধ জড়বৎ।
অভাজনরা গাছ থেকে পাড়িয়ে কচি ডাব খাওয়ালেন সাহেবকে। অনুধাবনে প্রাণান্ত হলেন। বড্ডো জোরে হাঁটেন সাহেব।
দলবল যন্ত্রপাতি নিয়ে পরমেশ তখন অনেক দূরে। মাইল তিনেক দূরবর্তী স্থানীয় থানায়।

সিন 24 শট 1 টেক 1 জি. টি. ডে 16 10 80

হাঁটু-কাপড়ে ফতুয়া-গায়ে গগন চৌকিদার এসেছে থানায়। হাতে লাঠি। খাতা খুলেছেন দারোগাবাবু। দেশের চাষ আবাদের রিপোর্ট পাঠাবেন শহরে। রিপোর্ট দেবার একমাত্র সূত্র বিভিন্ন গ্রামের নিরক্ষর চৌকিদাররা।
লম্বা একটা সেলাম ঠুকে হাত জোড় করে দাঁড়াল গগন। খুশিতে খুশিতে উচ্ছল

—'লিখ্যে দেন না কেনে! আউস আমনে ভাল ফলন হইছে গ এ বছরটায়। মা-লক্ষ্মী উজার করো সোনা দেছেন গ বাবু। বড়লাট ছুটলাটকে লিখ্যে দেন, পেট পুর্যে খাবেক এবার বেবাক মানুষে…'

চৌকিদার-চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন পরমেশ—'গভর্নমেণ্ট! কোথায় গভর্নমেণ্ট? এদেশের তলানিতে গভর্নমেণ্ট বলে কোনো বস্তু ছিল না কোনো-দিন—না নবাবী-আমলে, না ইংরেজ আমলে। গ্রামে গ্রামে কতগুলো অশিক্ষিত মুখ্যু চৌকিদার ছিল। ছ-টাকা সাত-টাকা মাস-মাইনেয় লোকগুলো রাতের পাহারাদার, দিনে রাজ-প্রতিনিধি। গ্রামের জন্মমৃত্যু, কুইনিনের বড়ি, খুনখারাপি মামলামোকদ্দমা সব কিছুর মতো এই মুখ্যুগুলোই বছরে বছরে চাষের ফলন সম্বন্ধে থানায় যে এজাহার দিয়ে আসত, তারই ওপর তৈরি হতো ইংরেজ সরকারের স্ট্যাটিস্টিক্স্। মন্বন্তরে কত লোক মারা গিয়েছিল, হিশেব দেবে কে? সরকারী অঙ্কে পনের লক্ষ, বেসরকারী সমীক্ষায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ, সাধারণভাবে লোকে বলে পঞ্চাশ লাখ। কোন্‌টা ঠিক? মৃতের হিশেব যারা দেবে সেই গগন চৌকিদাররাই তো শেষপর্যন্ত শহরে শবের পাহাড়ে শেয়াল আর শকুনের খাদ্য নিজেরাই।

চৌকিদারের ভূমিকায় অনবদ্য বিতোষ। ছোটোখাটো সামান্য মেক-আপে শিবনাথ ওর বয়স বাড়িয়ে দিয়েছেন কম করেও বছর দশেক।

বিকেলের শিফ্‌টে পূর্বা। অর্থাৎ জিন্নতবেগম পিণ্ডি চটকাবে বামুনবাড়ির কোন্ মরা বাপ অথবা মায়ের!

এক্ষেত্রেও নতুন সঙ্কট।

হাতুই-এর দুলেপাড়ায় বহুকালের এক মাঝারি পুকুর। ট্যাপাপানার সবুজে ভরে আছে সবটাই। শুধু একদিকে তালগুঁড়ি ঘাট ছুঁয়ে কিছুটা অংশে ঘোলা জল। গত বর্ষার বর্ষণে চারদিক ঘিরে কাঁটাঝোপ বুনোজঙ্গল গায়ে-গা জড়িয়ে থিক্‌থিক। এরই মধ্যে একফালি সরু খাঁড়িতে ধাপে ধাপে পা ফেলে বাকুল থেকে নেমে আসবে মুণ্ডিত মস্তক উপবীতধারী সেই বালক। মাথায় নিয়ে তলানি-পোড়া মাটির মালসা। দূরে, একটা গাছের আড়ালে চুকচুক চোখে তাকিয়ে থাকবে জিন্নত। ওরা চলে যাবার পরই ছুটে আসবে। প্রতিদ্বন্দ্বী দুটো কুকুর।

সবই ঠিক ছিল। ঘাট থেকে হাত-দশেক ভেতরের দিকে, পুকুরের জলেই

একটা শক্ত মাচা বেঁধে ক্যামেরা রাখা হবে। এখন প্রশ্ন, বালক হোক অথবা যুবক, মুণ্ডিত মস্তকের ছেলেটি কে?
মোটামুটিভাবে একটা ছক তৈরি করে রেখেছিলেন পরমেশ। শেষপর্যন্ত যদি কাউকে না-ই পাওয়া যায়, নিজের ড্রাইভার রাজু বা ফাইফরমাসের কর্মী মধুকে রাজী করাবেন। কিন্তু মুশকিল, তেইশ-চব্বিশের রাজুর মাথায় এমন কান-ঢাকা চুলের পরিপাটি, বরং ওর কান কেটে নেবার প্রস্তাবে রাজি হতেও পারে। কিন্তু চুল? অসম্ভব। চাকরি সুবাদে মধু যদিও ফিল্‌ম্‌-ইউনিটে একজন ভৃত্যমাত্র, প্রস্তাবে বেচারিও মুষড়ে পড়েছে।
বাঁচাল হরেন আওন! সব সমস্যাতেই সে যেমন কিছু-একটা করতে পেরে ধন্য হতে চায়, এক্ষেত্রেও নিজেই এগিয়ে এসেছে। দশ গাঁ ঘুরে খুঁজে দেখবে —হপ্তা দেড়-দুয়েকের মধ্যে বাপ-কি-মায়ের কাজে ঘাটকাম হয়েছে কার। উপনয়নের বামুনবাচ্চা নয়তো বাবাঠাকুরের থানে চুলের মানত—একটা ন্যাড়া-পাকড়াবেই সে। কথাবার্তা তো নেই। বোবা দৃশ্যে যেমন-তেমন হলেই যখন চলবে।
সন্ধান এখনও চলছে। কোনো মৃত্যুসংবাদ বা বাবাঠাকুরের ভক্তকে হারেন খুঁজে আনতে পারে নি আজও।
এবং যেহেতু, পূর্বা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত পিণ্ডদান দৃশ্যের চিত্রনির্মাণগত কোনো সংযোগ নেই, পরবর্তী দৃশ্যগুলোই গৃহীত হবে পর-পর আজ এবং কাল।
তেতাল্লিশের ভয়ঙ্কর দিনে জিন্নতবেগমই বাংলার ভগবতী। নিঃস্বতায় কাঙাল অন্নপূর্ণা। মহিষাসুরই সত্য ছিল সেদিন।
পরমেশ মিত্রের সর্বাঙ্গে ঘাম অথবা নিজের মধ্যেই দুর্বার চ্যালেঞ্জ—তিলে তিলে গড়ে তুলতে হবে সেই প্রতিমা।
ছেঁড়াখোড়া ধুলোমাখা পুরনো দিনের ফুল-আঁকা মিলের শাড়ি। লম্বা লম্বা ছেঁড়া-ফাটায় গিঁট। এলোমেলো আলুথালু কেশ। শহরের ঝিলিমিলিকে ভেঙেচুরে নিরেট গ্রাম্যতায় বদলে দেবার প্রক্রিয়ায় মহিলাকে নিয়ে অনেক মেহনত করতে হয়েছে মেক-আপের শিবনাথকে।
বাউরি-পাড়ার ফাটল-ধরা হেলে-পড়া এক জীর্ণ ঘর দৃশ্যের স্থান।

সিন 69 শট 2. টেক 1 সায়লেণ্ট ডে 16 10 80

ঘরের কোণে জিন্নতবেগম গিলছে। ভাতে-ভাতে চটকানো ডানহাতের থাবলায়

আর গালেমুখে নয়, চোখকাননাকচিবুকপেটবুকের প্রতিটি অঙ্গ দিয়ে হাভাতের মতো গেলা। ক্যাম্পের রসুইখানা থেকে মাটির মালসায় সুনখি-এর সঙ্গে বাসমতি চাল এসেছে বিশেষ যত্নে। কোনো অসুবিধা ছিল না পূর্বার।
দৃশ্যগ্রহণের প্রতিটি মুহূর্তে আরো বেশি ক্ষুধার্ত পরমেশ। ড্যালাড্যালা চোখে অপলক তাকিয়ে থেকে, তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন—'কাট্। ব্রিলিয়ান্ট ব্রিলিয়ান্ট পূর্বা। কিন্তু আরো, আরো প্যাশন, আরো তীব্রতা চাই। ওই ভাত, এক মুঠো দুমুঠো ভাতের জন্যে এত বড়ো একটা দুর্ভিক্ষ, লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু। সেই প্যাশনটা কোথায়? বাউণ্ডলেস ডিসায়ার অফ দ্যাট গ্রেট গ্রেট ফেমিন···ইউজ ইওর আইজ। দুটো চোখ দিয়ে গিলুন···'
ক্যামেরাম্যান নির্মলকে নির্দেশ—'বিগ কোজ-আপে ধরবে চোখের দৃষ্টিটা। সেটা ফ্রিজ হবে···'
আবার পূর্বাকে—'চাউনিটা ভয়ের, অবিশ্বাসের। বুড়ো চন্দ্রধর ঘরে ঢুকছে। জিন্নত চিনতে পারেনি তার বন্ধুকে। তার আপন মানুষ।'
পরমেশ পিছিয়ে এলেন—'নাউ গেট রেডি···ক্যামেরা···'
'ফ্যান অফ···লাইট···'

টেক 2

ক্যামেরা সচল হতেই গুমোট ঘরে যখন ক্যামেরারই ধ্বনি ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই, বাক্য নেই, ওঁৎ পেতে থাকেন পরমেশ। আস্তে আস্তে, অতি ধীর লয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রলি। জিন্নতা বেগম খায়। ওভাবে খায় না মানুষ। মুখ নয় দাঁত নয় জিহ্বা নয়, দুটো জলন্ত চোখের হাঁ-এ সত্যি-সত্যি পিণ্ডি গিলছে কোন্ ভূত!
'কাট কাট, ও. কে। ব্রিলিয়ান্ট ব্রিলিয়ান্ট পূর্বা। থ্যাঙ্কস···'
আগুনের ঘর থেকে বেরিয়ে স্বস্তিতে যখন অভিনেত্রীর বিশ্রাম, ছোট ঘরের ভেতর নতুন করে ছুটোপুটি শুরু হলো সকলের। একই দৃশ্যের পরবর্তী অংশের জন্য প্ল্যাক্‌ট্রলি সাজানো, আবার আলোর বিন্যাস, কন্টিনিউটি-সিট নিয়ে ছুটোছুটি প্রদীপের।
'ফ্যান্‌টাস্টিক, ফ্যান্‌টাস্টিক পূর্বাদি···'
প্রতিমা আসেন নি! বিশ্রাম নিচ্ছেন ক্যাম্পে। নন্দিতারও ছুটি এবেলা! তবু সঙ্গে আছে। পূর্বাকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছল—'ওগুলো তুমি খেলে কি করে

ওভাবে ? ডিনার টেবলে এরকম করেই খাও নাকি ? কী শৈলেনবাবু, অ্যাণ্ড ইউ বেয়ার অল্ দিজ্ ননসেন্স...'

বুরোক্র্যাট শৈলেন মুখোপাধ্যায় এক্ষণে কিছুটা জঙ্গলের-বাইরে-বাঘ। সকলের সঙ্গে হাসলেন—'অভিনয়ের মিথ্যেটা এমন সত্যি বানান আপনারা...'

'হ্যাঁ, ভীষণ সত্যিটাকে মিথ্যে বানানোর জন্যে আই. এ এস হতে পারি নি যে...'

তাকাল সবাই।

সারা গায়ে একটা মাত্র নেংটি পরে, যথার্থই চাষা, বিড়ি ফুঁকছেন কিরণময়। মেকআপের পর চন্দ্রধর প্রস্তুত। চরণ ডুলের পরিত্যক্ত ঘরে তার অকস্মাৎ প্রবেশ। পোয়াতী ছেলেবৌ-এর জন্য যেনতেন একটা কাপড় চাই তার, একটু আগুন, ক্ষুদকুড়োও যদি হয় এক মুঠো...

দিন ছোট-হয়ে-আসা আশ্বিনের বিকেলে দ্রুত নিস্তেজ হয়ে আসছে রোদ্দুর। কালা বাউরির ভাঙা ঘরে তখন আলোয় আলোয় নকল দুপুর, মিথ্যে আকাল, সত্যি ইতিহাস। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছে জিন্নত—'শরীল লিবে ত লাও না কেনে গ! কাঙালের খাবারটো লিয়ো নাই, মে'ছেল্যার এজ্জৎ উ কাপড়টো...'

কান্নার দৃশ্যটা তিনবার টেক হলো। কিছুতেই খুশি নন পরমেশ। পরমেশকে খুশি করতে আরো বেশিক্লান্ত, নাজেহাল পূর্বা।

'মনে করুন, আপনার ঘর ছিল। স্বামীসন্তান ঘরদোর সবই ছিল। ধনী নন, ভিখিরিও তো নন। আজ সব গেছে। অচেনা রাস্তায় নিরক্ষর গৃহস্থ-বৌ একা। যে-কোনো সময় যে-কেউ লুটে নিতে পারে আপনাকে। রেপড হয়ে যাবার ভয়...'

আরো একটা টেক ব্যর্থ হবার পর উত্তেজিত পরমেশ। লোকজনের সামনে, পরিবেশ ভুলে কঠিন তিরস্কার। যাচ্ছেতাই ভাষায় অপমানই কিছুটা।

পূর্বা কাঁদল। সত্যি-সত্যি কান্না। পঞ্চম প্রয়াসে পূর্বা জিন্নত হলো। ক্রুর নিষ্ঠুর চন্দ্রধরের পায়ে পড়ে অঝোর কান্নায়, পূর্ণতায় জিন্নতবেগম।

দিনের শেষে কাজের পর, অতিরিক্ত শ্রমে আর ক্লান্তিতে, উর্ধ্বতন যারা, গাড়িতে উঠলেন না কেউ। বরং ফুরেফুরে মাঠের বাতাসে পায়ে পায়ে ক্যাম্পে ফেরার বাসনা।

এবং এগোতে এগোতে নন্দিতা—'এ একটা স্ট্রেঞ্জ কো-ইনসিডেন্ট, না পরমদা!'

'কোন্‌টা?' এলোমেলো চুলে হাত বুলিয়ে পরমেশ ফিরে তাকিয়েছেন।

'আপনার ভগবতীর দৃশ্যটা তুললেন। আজই মহাসপ্তমী।'
হাসলেন পরমেশ। সিগারেটে আলতো চুমুক—'না, পাঁজিপুঁথি দেখে প্রোগ্রাম ঠিক হয়নি। ওটা এই এমনি, এমনি হয়ে গেল...'
'এখানেই আমার একটা কথা আছে পরমেশবাবু...' শৈলেন মুখোপাধ্যায় কিছুটা হালকাভাবেই, স্বভাবের ভারি গলায়।
'বলুন।'
'কিছু মনে করবেন না। আই পুট মাই কোশ্চেন ফর আর্গুমেন্টস সেক। বিষয়টাকে আরো একটু ভালোভাবে বোঝার জন্যে...'
'বলুন।'
'পূর্বাকে চরিত্রটা বোঝাবার সময় কলকাতায়, এমন কি, এখানেও:আপনি ভগবতী অন্নপূর্ণার লজিকে জিন্নত বেগমকে ব্যাখ্যা করছেন।'
'আপনার আপত্তি আছে?'
'আপত্তি! আমি আপত্তি করার কে?' হাসলেন শৈলেন—'সেকুলারিজমের নামে এ যেন কি রকম একটু...'
'স্টেটসম্যান পড়েন?'
সকলেই ধাক্কা খেল। মানে?
'নিশ্চয়ই পড়েন?'
'সে তো পড়তেই হয়।'
'আমি ইতিহাসের ছাত্র নই শৈলেনবাবু। কিন্তু প্রয়োজনের সন তারিখগুলো আমার অদ্ভুত মনে থাকে...' এপাশে ওপাশে তাকিয়ে সংক্ষিপ্ত দলের মধ্যে কিরণময়কে খুঁজলেন পরমেশ। কিন্তু কোথায় বুড়ো! কাজের পরই হয়তো কোথাও বেরিয়ে পড়েছেন। এরই মধ্যে গ্রামে তাঁর অসংখ্য চেলা।
'সাতাশে অক্টোবর, উনিশ শ চুয়াত্তর। স্টেটসম্যান পত্রিকায় একটা ছোট খবর বেরিয়েছিল...' হাতের সিগারেটটা বাঁদিকে ছুঁড়ে মারলেন পরমেশ, যেখানে ঝোপজঙ্গলের ভেতর একটা মেটে ঘরে মিনমিনে পিদিমের আলো। আঁশপাড়ার পূজা প্যাণ্ডেল ক্রমেই কাছাকাছি। ঢাককাঁসরের বাদ্যি উচ্চকিত।
'ছোট খবর। ছোটগল্পের মতো। তারকেশ্বর চালপট্টিতে মাত্র এগার বছরের একটি বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে হুলুস্থুল। আয়েসা খাতুন নামে মেয়েটি পুজোর আগে তার বাপকে গিয়ে বলল— 'গাঁয়ের সবাই নতুন কাপড় পরছে। আমাকে শাড়ি কিনে দাও। বেচারি বাপ ছাতা সারাই-এর সামান্য মিস্তিরি। পেটে জোটে

না, কোথায় পাবে টাকা। মেয়ের বায়না এড়াবার সুযোগও ছিল। বলল— 'ও তো হিন্দুদের পুজো। আমাদের কী?' আয়েসা অতসত বোঝে না। সে তার দিদির সঙ্গে পুকুরে স্নান করতে গেল। জল থেকে উঠে এসে হঠাৎ বলল— 'আমিই তোমাদের দুর্গা। আমাকে পুজো করো।' ব্যারাকপুরের কোন্ এক পুরোহিতের নামও করল সে। একমাত্র তিনিই ওকে পুজো করার অধিকারী ব্রাহ্মণ। হাতে সময় নেই। গ্রামের মানুষেরা বিহ্বল। অবশেষে ষষ্ঠী থেকে নবমী, চারদিন ধরে মহাসমারোহে হৈচৈ-এর মধ্যে স্থানীয় পুরোহিত দিয়ে তার পুজো হ.লা। খবরটা ছড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনার্থীর এত ভিড়, চাপ সামলাতে পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে পর্যন্ত নাকি ছুটতে হয়েছিল। দশমীতে বিশাল মিছিল। নিরঞ্জনের পর জল থেকে উঠে এসে আয়েসা আবার আয়েসা খাতুন, গরিব বাপের মেয়ে…'

কেমন বিদ্ঘুটে লাগছে সকলেরই। আঁৎকে ওঠার কাঁপুনিতে পূর্বা— 'কী বলছেন পরমেশবাবু! সত্যি?'

'আপনাদের সাহেবি-পত্রিকার স্পেশাল করেস্পণ্ডেন্ট যদি মিথ্যে না বলেন, সত্যি।'

'সত্যি অদ্ভুত! আজও হয় এসব?' নন্দিতা তার কাঁধে সিল্কের আঁচল সামলায়— 'কোন্ বছরের কথা যেন বললেন পরমদা? কবে?'

'সেভেনটি ফোর।'

'এই তো সেদিন। মাত্র ছ-বছর আগে…'

ম্লান জ্যোৎস্নায় নিজেদের ছায়াগুলো টেনে টেনে এগোচ্ছে সবাই। আঁশপাড়ার ঢাককাঁসর হুড়মুড় করে একেবারে কানের পর্দায়। অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে শৈলেন মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বভাব গাম্ভীর্যে— 'এসব তো আপনার ছবিতে থাকছে না পরমেশবাবু।'

'না। কিন্তু ছবির ভাবনায় থাকছে।'

'কোথায় পিন-পয়েন্ট করতে চাইছেন আপনি। এটা কিভাবে রিলেট করছেন জিন্নতের সঙ্গে?'

'এতে অত তত্ত্বকথার কচকচানি নেই শৈলেনবাবু। ওসব আমি মানি না। ডিরেকট অ্যাণ্ড সিম্পল কথা—দেশভাগের দাঙ্গাই বলুন কিংবা অস্পৃশ্যতার বর্বরতা—কোনোটাই এদেশের তলানিতে ছিল না। সবটাই ওপরের তলায় আমাদের বজ্জাতি…'

কথা বলা অসম্ভব এর পর। সর্বজনীন পূজামণ্ডপের আঙিনায় পৌঁছোল সবাই।
মহাসপ্তমীর সন্ধিপূজার শেষে হয়তো আরতির পালা। টিউবলাইটে ঝলমল ঝলমল
আলোর উৎসবে মেঘাচ্ছন্ন প্রসন্ন প্রতিমা। মানুষের ভিড়। পালকের-শুঁড়-
লাগানো ঢাক-কাঁধে নাচছে ঢাকী, নাচছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী।
এড়িয়ে যেতেও পারতেন। কিন্তু পরমেশ সদলে এগোলেন।
আর্টিস্টদের নিয়ে ডিরেক্টরবাবু স্বয়ং! রীতিমতো নাড়াচাড়া পড়ল ভক্ত-
সমাবেশে।
'আসুন, আসুন, বসুন…' এগিয়ে এলেন পুজো কমিটির কর্তারা।
ধবধবে ধুতিপাঞ্জাবিতে বয়স্ক একজন। ঢাকের-বাজনার ঊর্ধ্বে নিজের গলা
চড়াতে চিৎকারই কিছুটা— 'পায়ের ধুলো দিলেন। বসুন এট্টু। শুনে যান।
অনেক খচ্চাপত্তর করে এনেচি একে। জব্বর বাজায়। বীরভূমে বাস…'
ঈষৎ কপাল কুঁচকে কৌতুকে, পরমেশ তাকালেন সঙ্গীদের দিকে। বীরভূমের
ঢাকী খব বিখ্যাত নাকি! জানেন না তো!

ক্যাম্পে তখন প্রতীক্ষা ছিল। ক্যামেরা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে সবাই ফিরে
আসার পরও পরমেশ ফিরছেন না। স্কুলবাড়ির গেটে উৎকণ্ঠ সুকুমার বসাক।
দীপক ফিরে এসেছে সন্ধ্যার ট্রেনে। পরমেশ মিত্রের স্বাক্ষরসহ যতগুলো চিঠি
তার সঙ্গে ছিল, যোগাযোগ করেছে সর্বত্র। গ্রুপ-থিয়েটার ছাড়াও কমার্শিয়াল
আর্টিস্টদের মধ্যে ওই বয়সের দুচারজনের সঙ্গে যা কথা হয়েছে, এখন, এই
পুজোর মাসে এভাবে তাড়াহুড়োয় ডেট দিতে পারছেন না কেউ।
এদিকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাপসুদ্ধু একটা ছেলেকে পাকড়ে এনেছে হরেন
আওন। বারো তের বছরের রিকেট বালক। যথার্থই দুর্ভিক্ষের প্রতিনিধি।
মাথা ন্যাড়া করতে রাজি। যদি গোটা পঁচিশ-ত্রিশ টাকা পাওয়া যায়।
গেট থেকে ভেতরের দিকে এগোতে এগোতে সুকুমার বললেন— 'লোকটাকে
আপনি চেনেন।'
'আমি চিনি? কে?'
'পরান পোড়েল। সেই যে হাত-কাটা লোকটা। যার বৌকে আমরা মেয়েদের
ঘরে থাকার কাজ দিতে চেয়েছিলাম।'
'সে কি? ও নিজে এসেছে? সিনেমা-কোম্পানির ওপর এত রাগ!'

রান্নাবান্নার জটলার কাছে একটা বেঞ্চিতে বসিয়ে রাখা হয়েছিল ওদের। পরমেশ তার দলবল নিয়ে কাছাকাছি পৌঁছোতেই পরান উঠে দাঁড়াল। ওর ডানহাতের নমস্কারটা অনেকটা কুর্নিশ বা স্যালুটের মতো।

লিকলিকে চেহারার ছেলেটার দিকে তাকিয়ে পরমেশ বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন —'এ তোমার ছেলে? কী নাম?'

'অনন্ত গ বাবু...'

'তোমার তো আরো একটা ছেলে আছে?'

'আঁ বাবু, সি কোলের বাচ্ছা। জম্মো থিক্যে ব্যামো উয়ার। বাঁচবেনি...'

এ-ও কি বাঁচবে বেশিদিন? প্রশ্নটা চাগিয়ে উঠেই চকিতে নিভে যায়। অবসাদের শরীরে কিছুটা বিশ্রামের ভঙ্গিতে পরমেশ সিগারেট ধরালেন— 'ওকে কি করতে হবে শুনেছ তো সব। হরেন বলেনি?'

সংলাপের দিকে ওঁৎ পেতে ছিল হরেন। জাল ফেলে দশাসই রুই তোলার পর বাজারে না বিকোলে তার নিজের ক্ষতি। সে ঝলকে উঠল— 'বলেচি গ, সব বলেকয়েই ত এইনেচি উকে...'

'ওর মাথাটা ন্যাড়া করতে হবে। বাপ মা মরলে ছেলেকে যেমন করে কাপড় পরতে হয়, সেভাবেই পুকুরঘাটে গিয়ে একটা মাটির মালসা রেখে আসবে। মিনিট কয়েকের কাজ। আমরা ফটো তুলে নেব!'

পরান পোড়েল ঘাড় নাড়ে— 'পাব্বেনি কেনে? ই ছেল্যা মোট বঁয় ইষ্টিশানে...'

এ ছেলে মোট বয়? আরো একবার তাকালেন পরমেশ। নড়েচড়ে উঠলেন— 'এসবে কোনো আপত্তি নেই তো তোমার? বাপ হয়ে ছেলেকে ন্যাড়া দেখবে...'

'ঊ ত সিনিমা গ বাবু। সত্যি ত লয়...'

পরমেশ হাসলেন। চা-বিস্কুট নিয়ে এসেছে মধু। নিজের কাপ তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন— 'নাও, চা খাও। এই, ওকে খেতে দিয়েছিস কিছু। বাচ্চা-টাকে?'

'লুচি ভাজা হচ্ছে। হলেই দেবে...' বললেন সুকুমার।

'তাহলে ওই কথা রইল। কালই ভোর বেলা নিয়ে আসবে ছেলেকে। আর বাকি যা কথা সুকুমারবাবুর সঙ্গে বলে নাও। তোমাদের দেশের মানুষ হরেনও আছে...'

দিনের শেষে ভাঙাচোরা শরীরটা অবসর চায়। পরমেশ উঠে এলেন নিজের ঘরে। এবার বিশ্রাম।

দুর্ভাবনার জট থেকে মুক্তি নেই মগজটার। দেহের ক্লান্তিতে চাপ বাড়ে। মুঠো মুঠো মাথা-ধরার টেবলেট তখন। ন্যাড়া-মাথার ছেলেকে নিয়ে সঙ্কট ছিল না তেমন। ভাবনা—মালতী। আরতির বিকল্পে একটি মেয়ে।

স্কুলবাড়িটা শান্ত। অশেষ এনার্জি ওদের। যে-যার-মতো ভাগে ভাগে দল বেঁধে গ্রামের দুর্গোৎসব দেখতে বেরিয়ে পড়েছে। ধ্রুবজ্যোতি বিতোষের সঙ্গে প্রতিমা নন্দিতা পূর্বাও। ক্যাম্পে ফিরে বিশ্রামও নেয় নি বেশিক্ষণ।

বরং এই নিঃসঙ্গ নিভৃতিই ভালো লাগল তাঁর। দোতলার ফাঁকা বারান্দায় দীপককে নিয়ে বসলেন। বিস্তারিত শুনলেন। প্রডিউসার প্রভুপদ সাহা বিরক্ত। কাজ চলাকালীন এভাবে একজন অভিনেত্রীকে তাড়িয়ে দেওয়ার যৌক্তিকতা তিনি বুঝতে অক্ষম। যদিও পরমেশ মিত্রের অভিজ্ঞতা এবং বিবেচনাবোধে তার শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস অটল, তথাপি বিশদ আলোচনার জন্য প্রভুপদবাবু স্বয়ং আসবেন আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই। কারণ, বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ।

দীপককে ছুটি দিলেন। নিজেও উঠলেন। বিচ্ছিরিভাবে জ্যাম ধরে আছে মাথাটায়। প্রডাকশন-কস্ট বেড়ে যাওয়ার ভাবনা কি শুধু একজন তেলকল ব্যবসায়ীর? তাঁর নিজের কিছু না! এরই মধ্যে মালতীর-বাপ অযোধ্যা নন্দীর ভূমিকায় অভিনয় করতে এসে নিকুঞ্জ বালিয়াল এক দুপুর ক্যাম্পে থেকে ফিরে গেছেন। মালতীর সঙ্গে সংশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্রী যারা ক্যাম্পেই আছেন, তাদের নিয়েও পরিকল্পনার ছক অনুযায়ী খোলামেলা কাজ করা যাচ্ছে না কিছুতেই। আধখ্যাচড়া হয়ে যাচ্ছে সব। উদ্যোগ-উদ্যমে ভাঁটা। চিত্রনাট্য যথাযথ রাখার সঙ্কট।

নিজের ঘরে পরমেশ মিত্র তখন নিজেই এক জটিল নায়ক। নিজের সঙ্গেই অসিযুদ্ধ। আলোর ঘর থেকে খোলা-জানালায় দাঁড়ালে ম্লান জ্যোৎস্নায় অন্ধকার বাইরের জগৎ, ঝিঁঝির উর্ধ্বে দূরে, খুব দূরে কোন্ পূজামণ্ডপ থেকে হিন্দি ফিল্‌মের-গান। শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলেন মাথার চুল। হয়তো নিজেরই ভুল! কিছুটা বাড়াবাড়ি। স্পর্ধিত মেয়েটাকে কিছুটা সহ্য করাই সমীচীন ছিল হয়তো। কিংবা

দ্বিতীয় ভাবনা—ভুরু তোলা একটি মেয়ে কি করে মালতী হবে? সায়ত্রিশ বছর আগেকার এক গ্রামীণ কন্যা! আসলে

সাইনাসের মতো দুর্ভাবনাটাও একপ্রকার মস্তিষ্ক ব্যাধি। ঝিম মেরে সইতে পারলেই কিছুটা মুক্তি।

গোটা শরীরে মোচড় দিয়ে সরে এলেন। এবার স্নান। পরিপূর্ণ স্নানের পর যদি স্বভাবিক মেজাজটা ফিরে পাওয়া যায় আবার। বিছানার ওপর ভাঁজ-করা পায়জামাপাঞ্জাবিগেঞ্জি আণ্ডারওয়ার সবই রেখে গেছে রাজু। তোয়ালেটা টেনে নিলেন। সাবানটা।

যা-হবার, এ ক্যাম্পেই হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমায়। সিদ্ধান্তটা ভেতরে-বাইরে অটল যেহেতু, নিজেরই-তৈরি খাঁচায় আচমকা আটকে গিয়ে যখন মনে হচ্ছে, উদ্ভুত পরিস্থিতিতে একা, ভীষণভাবে নির্বান্ধব, পুরো চ্যালেঞ্জটাই নিতে হবে অন্যভাবে। যখন, এছাড়া গত্যন্তর নেই।

তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে সাবানের কেসটা রাখলেন টেবিলে। কনিয়াকটা বের করলেন। গ্লাশটাও। নিয়মিত অভ্যাসের প্রজা না হলেও একটু আধটু প্রয়োজন কাজের সময়।

টেবিলে কনুই-এর ভর রেখে, মাথাটা দুহাতে চেপে বসে রইলেন চেয়ারে। আরো কিছু স্টিল প্রিণ্ট হয়ে এসেছে কলকাতা থেকে। বার তিনেক দেখার পর আরো একবার টেনে নিলেন। এখন পর্যন্ত কাজের অগ্রগতিতে বিচলিত হবাব মতো তেমন কিছু ঘটেনি যদিও, শুধু দু-চার জায়গায় সামান্য খুঁতখুত। দু-চারটে ফ্রেমে আরো একটু মনোযোগী হলে ভালো হতো। কম্পোজিশনে আরো একটু নিখুঁত। তবু রিটেক-এর মতো তেমন খামতি চোখে পড়ছে না যেহেতু, কিছুটা স্বস্তি।

এক গ্লাশের পর, আরো একবার কিঞ্চিৎ।

এবং শেষ চুমুকে সবটা টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন আক্রোশে অথবা যন্ত্রণায়। মুঠোয় চেপে সাবানটা তুলে নিলেন হ্যাঁচকায়, পায়জামাপাঞ্জাবি অন্তর্বাস ইত্যাদি। ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে, বারান্দা পেরিয়ে, সিঁড়ি ভেঙে নিচে এসে পৌছোতেই ফুলবাগানের পাশে আধো-অন্ধকারে শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কিরণময়।

পায়জামাপাঞ্জাবিতে ঘরোয়া সাহেব শৈলেন সিগারেট-হাতে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন—'ইউ আর সো টায়ার্ড, ওপরে গিয়ে আর ডিস্টার্ব করিনি…'

মৃদু হাসলেন পরমেশ—'হ্যাঁ, আজ আবার বিশেষ করে…'

'ইউ নিড নট সে মোর। দেখলাম তো সারাটা দিন। এর পর টিকে থাকেন কি করে আপনারা? ফিল্ম্ ডায়রেক্টর অ্যাট্ ওয়র্ক ইজ মোর দ্যান এ ওয়রটাইম

জেনারেল অর্ দ্য প্রাইম মিনিস্টার ফেসিং নো-কন্‌ফিডেন্স মোশন ইন পার্লিয়ামেন্ট…'
ঠোঁটের কোণে আলগা হাসিটা সজীব রাখতে হয়—'আপনি স্নানটান সেরে ফ্রেস হয়ে নিয়েছেন তো!'
'না না, ওঅরিড হবার কিছু নেই। আয়াম অলরাইট। বরং আপনি…'
'আমি আসছি, আসছি এক্ষুনি। জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।'
ষাট সত্তর জনের ব্যবহার্য কতগুলো কাঁচা পায়খানা, টিনের বেড়ায় অস্থায়ী স্নানের ঘর। ভি. আই. পি চিহ্নিত না-থাকলেও এরই মধ্যে একটি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। পরমেশ সেদিকে এগোলেন না। সোজাসুজি লোকজনভিড়হল্লা রান্নাবান্নার দিকে। কাছাকাছি ছিল গোবরা। পায়জামাপাঞ্জাবি সাবান তোয়ালে ওর হাতে তুলে দিয়ে ডাকলেন হরেনকে—'কাল না পরশু, কার কথা বলছিলে তুমি ?'
নিবেদিত-প্রাণ হরেন আওন অনুগত নম্রতায়—'কার কতা বলচেন গ ডেরক্টর-বাবু ?'
'এখানেই কোথায়, কোন্ গ্রামের মেয়ে যাত্রায় অভিনয় করে।'
'হ্যাদামহাটির পঞ্চা বাকুলির মেজ মেয়ে ঝন্না গ …' খুশিতে খুশিতে উদ্দীপিত হয়েই হরেন নেতিয়ে পড়ল—'সিদিন যে বললেন গ, হবে নি…'
পরমেশ ধাক্কাটা সামলালেন নিজের মধ্যে। অদূরেই তেরপল-ঘেরা রসুইখানায় ব্যস্ত যারা, তাদের দিকে কিছুক্ষণ স্থিরপলক তাকিয়ে থেকে হঠাৎ নড়ে উঠলেন। যেন হঠাৎ নিজেকে ফিরে পাওয়া—'না, হয় না। বুঝলে হরেন, ওভাবে হয় না এসব। তুমি এসব পাগলামো করবে না আর। বুঝলে…,
কিন্তু হরেন, আবার যখন কথাটা উঠেছে, মনে ধরেছে ডেরক্টরবাবুর—এরকমই একটা কিছু ভেবে নিয়ে সুযোগটা ছাড়তে নারাজ। এ তল্লাটের এত বড়ো একজন 'আর্টিস' মেয়েকে এমন একজন নামী লোকের বই-এ নামিয়ে দিতে পারলে খুব নাম হবে তার। যশ গাইবে দশজনে। সে ব্যাকুল হলো। চলেই যাচ্ছিলেন পরমেশ, লাফিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াল—'একবারটি দেখেন না গ কেনে ডেরক্টরবাবু! 'সীতাহরণের' সীতা গ 'সেরাজের স্বপ্নে' লোৎফা…'
'কেন বিরক্ত করছ ? বলছি তো, হয় না। দেখছ না দিদিমণিদের ? প্রতিমাদি নন্দিতাদি পূর্বাদি! কত লেখাপড়া শিখে, কত কিছু দেখে, জেনেশুনে শহরের জীবন থেকে নেমে এসে গ্রামের দুঃখী মেয়েদের কথা বলছেন।'
খটকা লাগে। ভিড়মি খেল হরেন। এবং যেন পরিণাম না-বুঝেই বোকার

মতো—'গরিব ঘরের মেছেল্যা গ বাবু। অভাবের ঘরে বে-থা হলনি ত ধিঙ্গি মেয়ে দশ গাঁয়ে নেচ্যেকুঁদে বেড়ায়। উ জানবে নি আকালের কতা? ই জন্তি বইপুথি পড়তি নাগে গ?'

পরমেশ আবার শিথিল। হরেনের কাঁধে হাত, চোখে চোখ রেখে, বন্ধু-ভাবেই দুবার চাপড় দিলেন মৃদু—'বইপুঁথি নয় হরেন, অভিনয়টা শিখতে হয়, অনেক কিছু জানতে হয় ওর জন্যে…,

'আম্রা ত পালাই গায় গ? অভিনয়…'

'এ তোমাদের পালা নয়। ফিল্‌ম্…'

পেল্লাই পেল্লাই তিনটে ড্রাম-ভর্তি জল। মগের পর মগ মাথায় বুকেপিঠে নিম্নাঙ্গে সর্বদেহে। সন্ধ্যা-বাতাসে পরিপূর্ণ স্নানের পরও মুক্তি নেই ছন্নছাড়া মগজটার। যদি একটা জুয়া-খেলাই খেলা যায় শেষপর্যন্ত! যদিও এভাবে হয় না। গোটা পদ্ধতিটাই ভুল!

কিংবা এটাই চ্যালেঞ্জ। পূর্বা মুখোপাধ্যায় যদি জিন্নতবেগম হতে পারেন, জিন্নত কেন জিন্নত থাকতে পারবে না তার নিজের অবস্থানে?

এবং সেদিন অনেক রাতে কিরণময়ের সঙ্গে বসলেন নিভৃতে। পাশে শৈলেন মুখুজ্জে।

'জানি, অবাস্তব অসম্ভব ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে একটা। ভেরি আন্‌রিয়েল। কিন্তু…'

'রিয়েলিটিকে যখন হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইছ, তখন সেটাই আনরিয়েল।'

'নিজেকে ঠকিয়ে লাভ নেই কিরণদা। সেটা আপনিও জানেন, বেশ ভালো করেই জানেন, আপনার নাটকে অভিনয়ের জন্যে আপনিও আর্টিস্ট খোঁজেন। যে-কোনো ছেলেমেয়ে, পুরুষ বা মহিলা নয়। বরং…বরং আমিই একটু উল্টোদিক দিয়ে হাঁটতে চাইছি…'

'প্রথমত তোমার কথাটা ভুল। আমার দল একেবারে নন-আর্টিস্টদের নিয়ে। ছাপোষা কেরানি মাস্টারমশাই আর রকের ফুটপাতের ছোকরা। আমি যদি মনে করি, থিয়েটার ইজ মাই রিলিজিয়ান, আমার প্যাস্‌টাইম প্লেজার নয়, ওর মধ্যেই আমি, আমার বেঁচে-থাকা—নাথিং ক্যান প্রিভেন্ট মি ফ্রম ডুয়িং থিংগস আই ওয়ন্ট টু ডু… সে তো তোমরা পারবে না হে। তোমাদের তো আবার ফিল্‌ম্। আর্ট-ফিল্‌ম্ হোক, মাথামুণ্ডু যাই হোক, লাখ লাখ টাকার কারবার। ব্যবসা…'

'এগ্‌জাক্‌ট্‌লি, এটা…এ কথাটাই আমি বলতে চাইছি। বাংলায় শিল্প শব্দটার দুটো ইংরেজি—আর্ট আর ইন্‌ডাস্ট্রি। ফিল্‌ম্‌ তো একসঙ্গে দুটোই। সেখানে হিশেবটা অনেক বেশি। কোনো ফাজলামো চলে না…' নিজের হাতে টেবিলে তিনটে গ্লাশ সাজিয়েছিলেন পরমেশ। এগিয়ে এলেন— 'মেয়েটার গালে সাপাং করে একটা চড় কষানোর কথা ছিল আমার। মারিনি। অ্যাণ্ড ফর দ্যাট রিজন সি স্যুড এভার রিমেন গ্রেটফুল টু মি…'

'তাই বুঝি এখন ন্যাদামহাটির পঞ্চা বাকুলির মেজমেয়ে ঝর্ণা ?'

'যখন আর কোনো উপায় নেই, আই অ্যাম আনডান্‌…'

'বোঝো কাণ্ডটা! বুঝুন…' নাক থুত্‌নি ঝাঁকিয়ে শৈলেন মুখুজ্জের দিকে গলাটা বাড়ালেন কিরণময় — 'অভিনেত্রী বলে একজন এল, এলিমেণ্ট হিশেবে যে কিছু না। অপদার্থ। আর অন্যদিকে ঘাসের তলা থেকে যখন উঠে আসছে আরেকজন, হরেন আওনদের প্রভা সরযুবালা, ওকে কেউ দেখার আগেই এত কথা আমাদের। ভয়।'

এবম্বিধ নিশ্চর্য চৌকাঠ ডিঙোনোটা অনধিকার বিবেচনায় শৈলেন তাঁর নিজের সম্ভ্রমে নিঃসঙ্গ ধূমপানে চুপচাপই ছিলেন এতক্ষণ। হাসলেন।

'কেন, কেন এসব বলছেন, বলুন তো! নোয়িং ভেরি ওয়েল, ইউ আর টকিং নন্‌সেন্স…' দুটো গ্লাশ নিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে একরাশ বিরক্তিতে, অস্বস্তিতে ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে আসে। একটু কেশে নিলেন পরমেশ— 'আমি তো বলছি, আই কন্‌টিন্যু টু সে, আমি আমার ছবির জন্যে অভিনেত্রী চাই। অভিনেতা চাই। অদ্ভুত একটা সিচুয়েশনে যখন আর বেরোবার উপায় নেই, মেয়েটিকে আমি একটু দেখতে চাইছি। এটা যাস্ট একটা ভাবনা। ভেবে দেখা—এভাবে হতে পারে কিনা কিছু! পূবাকে দিয়ে যদি ওরকম একটা কাজ আদায় করে নেওয়া যায়…'

'ঝর্ণাকে দিয়েও হবে!'

'সে আমি জানি না…' দুহাতের গ্লাশদুটো দুজনকে এগিয়ে দিলেন পরমেশ। টেবিল থেকে নিজের গ্লাশটা নিয়ে ফিরলেন যখন

'একটু ইণ্টারফেয়ার করতে পারি ?' শৈলেন সহাস্যে হঠাৎ।

ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে পরমেশ তাকালেন।

'আমি অবশ্য কম্‌প্লিটলি ফরেন আপনাদের এসবে ; কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে আমার…'

'বলুন।'

'কী চাই আপনার? অল্পস্বল্প অভিনয় জানে, স্মার্ট ফ্রেশ ইয়ং গার্ল অব আর্লি টুয়েন্টিস্।'

'হ্যাঁ, অনেকটা তাই। কেন, চেনাজানা কেউ আছে আপনার?'

'আপনি সুজাতাকে দেখেছেন। মনে আছে?'

'কে সুজাতা?' পরমেশ উদ্গ্রীব এবার।

'ওই যে গুন্টুর গ্রাস-এর অ্যাডপটেড ড্রামাটা ওরা করল সেদিন। ওদের নায়িকা। ভালই তো করেছে। আমার ভালোই লেগেছে। কোয়ায়েট এনকারেজিং...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদের ডিরেক্টর...কি যেন নাম ছেলেটার! শুভজিৎ? সে তো আমাকে ধরেবেঁধে নিয়ে গিয়েছিল...' পরমেশ আনত মাথায় চোখ বুজলেন। স্মৃতিতে খুঁজলেন। ওদের নায়িকা! কোন্ মেয়ে! মনে পড়ছে না। মাথা তুললেন—'ওকে আপনি চেনেন?'

'ওর বাবা আমার বিশেষ বন্ধু। বিশাল মাল্‌টি-ন্যাশনাল ফার্ম-এর হাই এগ্-জিকিউটিভ। মেয়ের লাফালাফি ঝাঁপাঝাপিতে খুবই উৎসাহী। কিন্তু মুশকিলও তো আছে...'

'কী?'

'যে ফ্যামিলিতে যেভাবে ও জীবন কাটায়। ইংলিশ-মিডিয়ামের ছাত্রী, স্যামুয়েল বেকেট পেটার হ্বাইস গুন্টুর গ্রাস—এদের তলায় ছোটোখাটো ব্যাপারে তো মাথাই ঘামায় না ওরা। অথচ আপনাদের যা গল্প, যে-চরিত্রের জন্যে ওকে চাইছেন...'

'লিভ্ ইট টু মি...' পরমেশ প্রাণিত আগ্রহে—'অভিনয়ে যদি একটা প্যাশন থাকে, আম্‌বিশান থাকে, বাকিটা আমরা তৈরি করে নেব। আপনি দেখুন না একটু। যদি হয়।'

'দেখব। নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। ইট ইজ মাই ডিউটি ...'

'থ্যাঙ্কস...'

'কিন্তু প্রব্লেম তো একটাই...'

পরমেশ সংশয়ে তাকালেন।

'সুজাতা আবার আমার বোন তিতিরের খুব বন্ধু। দুজন একসঙ্গে পড়ে। এম. এ দেবে এবছর। নভেম্বর না ডিসেম্বরেই পরীক্ষা। দুমাস আড়াই মাস বাকি...'

দায়িত্ববোধেই পরমেশ নতুন করে আনত যখন, শৈলেন মুখোপাধ্যায় তাঁর রাশভারি উদাত্ত গলায়—'না না, সেটাও কোনো ট্রাবল নয়। ভাববেন না। আমি একটা ব্যবস্থা করব। দিন তিনেকের ব্যাপার তো আপনার…'

'না, তিন দিন লাগবে না। দুদিন দেড়-দিন হলেই চলবে…'

'রেস্ট অ্যাস্যুয়োর্ড। আই স্যাল ট্রাই মাই বেস্ট…'

'থ্যাঙ্কস।'

'বোঝো কাণ্ডটা…'

দুজনই চমকে তাকালেন।

'নাউ বিটুয়িন্ মাল্‌টি-ন্যাশন্যাল অ্যাণ্ড ন্যাদামহাটি…' নাকের ডগায় চশমা। ঘাড় উঁচোনো কিরণময়ের ভঙ্গিটাই অদ্ভুত—'আর মাঝখান থেকে ওই ছেমরি আউট। ভুরু কামিয়ে মালতী হওয়া হলো না। সুজাতা হতে চাইল। ওকে হাটিয়ে এখন সুজাতা নিজেই আসছেন। মরণ কি আর একটা আবাগীগুলোর।'

প্রস্তুত ছিলেন না সুকুমার।

দুর্ভিক্ষ-নিঃস্ব গ্রামের মানুষ মিছিল করে শহরে লঙরখানায় যাবে—দৃশ্যটা তোলা হবে খুব শিগগিরই একদিন এবং এ জন্য অন্যূন একশ দেড়শ সচল কঙ্কালদেহ অবিলম্বে সংগ্রহ প্রয়োজন। সব ক্ষেত্রেই যেমন, এখানেও কাজটাকে ঠিক সময় মতো গুছিয়ে রাখতে চান বলেই বিভিন্ন চাষি-পাড়ায় ঘুরে ঘুরে লোক সংগ্রহে বেরিয়ে পড়েছিলেন ভোরবেলা। তাঁর সহচর গ্রামের নব্যযুবকরা—ষষ্ঠী ভূদেব সমীর লক্ষ্মী শ্যামাপদ মোহন বাসু ক্ষ্যাপা। নিজেরাই ছোট্ট'টো একটা মিছিল।

সিদ্ধেশ্বরীতলার মোড়ে কপিল নন্দীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘাত—'অ্যাই অ্যাই যো দাদা। ভাল কারবার খুলে বসেচেন যা-হোক। গাঁয়ে ধম্মো বলে কিছুই ত নেই। ইদিকে আপনারা যে জ্যান্ত মানুষকে মারতে নেগেচেন।'

সকলেই থমকে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টা বুঝতে চায়।

'জ্যান্ত বাপের ছেরাদ্দ লাইগ্যে দেচেন নিকি আপনারা? পরান, ওই যো… বাগদীপাড়ার ওই হাত-কাটা নুলোটা নিকি নিজেই নিজের পিণ্ডি গেলাচ্চে ছেল্যাকে দিয়ে। তা ভাল তা ভাল। দিনে দিনে দেখব কত কলিকালে…'

সুকুমার কিঞ্চিৎ বিস্মিত। বটা নাপিতের সঙ্গে ওদের পাঠানো হয়েছে হাতুই-এ।

ওখানেই ছেলেটাকে মাথা ন্যাড়া করে দৃশ্যটা তোলা হবে। আজ সকালেই, হয়তো এখনই কাজটা চলছে। অথচ এরই মধ্যে খবরটা চারিয়ে গেছে গ্রামে। কিংবা এমন মজাদার আজব গপ্পো বাজারে রাষ্ট্র করার লোভ সামলাতে পারেনি বটা নাপিত নিজেই।

বদমেজাজী রাগী ছোঁড়া লক্ষ্মী তেড়েফুঁড়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, সুকুমার বাধা দিলেন। খুবই শান্তভাবে—'তা নন্দীমশাই, পরান তো নিজে থেকেই রাজি হলো। আমরা বলেছিলাম...'

'রাজি হল! বলি, উ এট্টা কতা হল ...' দাঁতেমুখে খিঁচুনি কপিল নন্দীর। এমন কি, গাঁয়ের এতগুলো ভেড়িয়া ছেলেকেও ভয়ডর নেই—'রাজি ত হবেই হারামজ্যাদারা। চাষার-ব্যাটা ফুটুনি দেখাতি শ'রে গেছল বাবু সাজতে। এখন সোমত্তা মাগের পয়সায় খায়। ও শালা ত পয়সার জন্যি গু-ও কাচবে বল্লে। তাই বলে ধম্মো বলে কিছু থাকবে নি দেশগাঁয়ে! বাপ-মা জ্যান্ত, মাথা কামাবে ছেল্যা?'

'অ্যাই, অ্যাই ঠিক বলেচেন। আসল কতাটা বেরিয়ে পড়েচে মুখ খসে...' হাসতে হাসতে নরম গলায় ফুঁসে উঠল দশরথ চক্রবর্তীর ছেলে সমীর—'পয়সা পেলে ওরা গু ও কাচে। কেন কাচে। কার গু?'

প্রতিপক্ষে নাতির বয়সী ছেলেরা, কপিল নন্দী উত্তেজনায় লাল চোখ—'অঁ, নেকাপড়া শিখ্যে খুব যে বড় বড় কতা শিখেচিস। সবতাতেই ভোটের বক্তিমে। আচ্ছা ঠিক আচে, ঠিক আচে, আমিও দেখব। দেখে নেবু...'

ক্রুদ্ধ দিশেহারা কপিল নন্দী হাত পা নাচিয়ে দ্রুত পাশ কাটিয়ে যাবার মুখে, কী মনে হলো, আবার পিছু ফিরলেন—'এট্টা কতা বলি মশাই, কী বায়োস্কোপের খেলা লাইগ্যে দিয়েচেন, মরুন গে ছাই। পয়সার নোভ ধইর‍্যে দিচ্ছেন ছোট জেতের মধ্যি। সিট্টে হল কতা। এমনিতেই চাষের খরচাপাতিতে পাছায় আমাশা ছুট্যে যাচ্ছে গাঁয়ের মানুষের, তার মধ্যি যদি নাঙলের দাম বাড়ে, ওরা বেশি রোজ চায় ত ইসব ফুলবাবুরা যাবেন কোথা? চাষের চালের ভাত জোগাবে কুথেকে এনাদের বাপেরা?'

কথাগুলো, বাক্যগুলো বাতাসে উড়ল। খুব একটা পাত্তা পেল না কোথাও। এগোতে এগোতে সুকুমার হঠাৎ লঘুস্বরে—'ব্যাপারটা খুব ভালো হচ্ছে না...'

'কেন! কী হয়েছে?'

'অ্যাদ্দিন তো তবু একটা সুধন্য কুণ্ডু ছিলেন। এখন গাঁয়ের মানুষ এমন ক্ষেপে যাচ্ছে একের পর এক...'

'দূঃ, ওই বুড়োগুলো কি করবে ? হারামিগুলোকে গাঁয়ের লোকে দেখতে পারে নাকি কেউ। আপনারাই ওদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন, সুধন্যশুকনি সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে।'

'আমরা ক্ষেপিয়ে দিয়েছি ?'

ষষ্ঠী হাসছে—'সেদিন হাতুই-এ ফগু ডুলের ঘরের সামনে যে সিন্‌টা হলো, চন্দ্রধরের ঘরের দোরে এসে তারুঠাকুর শেয়ালের মতো চুকচুক করছে—'তুর জমিটো লিখে দে না বটে র‍্যা চন্দর। উঃ মার্ভেলাস। গাঁয়ে ত ছেলেছোকরাদের ডায়লগ হয়ে গেছে। সুধন্য কুণ্ডু নিধি দেওয়ান কপিল নন্দী রাখাল ঘোষ—আমাদের গাঁয়ের তারুঠাকুর কেলো সামন্তি যারা, তাদের আওয়াজ দিতে শুরু করেছে···'

'কি সর্বনাশ···' সুকুমার চমকে উঠলেন—'এ যে আরো বিপদ বেড়ে যাচ্ছে···'

'ছাড়ুন ত। বাদ দিন। ও শালাদের পোছে কে ?'

'বাপজ্যাঠাদের কাছে ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি···' কিছুটা বয়স্ক যুবক বাসু—'বাজারে নিধি দেওয়ানের দোকানটা অনেক পুরনো। নিধি দেওয়ানের বাপ দেদার ধারে জিনিসপত্তর দিত সবাইকে। লেখাপড়া জানে না, হিশেব জানে না চাষিরা। ধারের ট্যাকা চড়চড়িয়ে গিয়ে উঠত পঞ্চাশের জায়গায় একশ, দেড়শ থেকে বেড়ে তিনশ-এ। যা খুশি-তাই। তারপর ট্যাকার শোধ দিতে না পারলেই, ব্যস, দে, লিখে দে, জমিটাই লিখে দে তা'লে। ঠিক আপনাদের বই-এ যেমন আছে···'

'তাই বলে ওঁদেরও তো সব দোষ নয়···' থামলেন সুকুমার। নতুন সিগারেট ধরাতে ধরাতে—'বাপ মা দাঁড়িয়ে থেকে ছেলেকে ও রকম ন্যাড়া মাথায় পিণ্ডি বয়ে যেতে দেখবে, এ-ও তো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আমি-আপনি না-হয় একরকমভাবে বুঝে নিলাম, কিন্তু ওরা সব গ্রামের পুরনো লোক···'

'সে কি! আপনিই বলছেন এসব কথা ?'

'বলছি। মানে সবদিকই তো ভেবে দেখা দরকার। শুধু-শুধু কতগুলো বুড়ো-মানুষকে···'

'তা'লে এটা করলেন কেন ?'

'সে আমাদের তো করতেই হবে। এটা আমাদের কাজ···'

'সে ত ওরা দুস্থ বলেই করাতে পারলেন সুকুমারদা। গরিবমানুষের সুযোগটা

তো আপনারাও নিলেন…' নিতান্তই অবুঝের মতো, গ্রামীণ সারল্যে কথাটা বলে ফেলেছে তাঁতিপাড়ার শ্যামাপদ।

সুকুমার হোঁচট খেলেন! নিজেকে সামলে নিয়ে—'না, না, ওভাবে বলবেন না। গরিব-বড়োলোকের কথা নয়। আমরা কাজ করতে এসেছি, কাজটা তো গুছিয়ে তুলতে হবে।'

সামনেই বাউরিপাড়া। লোকগুলো ছুটে এল। মেয়েরাও দূরে দূরে। সিনেমা-কোম্পানির বাবু নিজে এসেছেন ওদের ঘরে! সঙ্গে জোতজমির-মালিক বাবুদের ঘরের ছেলেরা!

এবং প্রস্তাব শুনে খলবলিয়ে উঠল অনেকেই—'সিনেমায় মুখ উইঠবে গ আমাদের। কিন্তুক বাবু, আমরা দেখতি পাব ত? কবে দেইখব?'

নিরুত্তর সুকুমার।

'আরে ধ্যাৎ…'ঝামটা মারল মঙ্গল চাটুজ্জের বড়ো নাতি ক্ষ্যাপা—'ফালতু বকবক ছাড় দিকিন সব। যাবে কিনা বল…'

ভুরু কুঁচকোল ওদের দু-চারজন—'যেতি ত বইলচেন গ বাবু। ট্যাকা দিবেন? খোরাকি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো বটেই। আমাদের কাজ করবেন। টাকা পাবেন না কেন? সবাইকে দিই…' সুকুমার তৎপর—'রোজ যা পান তার…'

'ছ ট্যাকা আর জলখাবারের গুড়মুড়ি বিড়ি ত পাই গ…'

'ছ ট্যাকা! হু, কাকে কী বোঝাচ্ছ গ…' ভূদেব বলল—'এই আশ্বিন মাসে কে তোমাকে নিত্যি কাজ দেয় গ খুড়? ছ ট্যাকা শোনাচ্ছ?'

সমর্থনতুষ্ট সুকুমার বসাক আড়ালে, ডানহাতের আঙুলে ইংরেজি 'ভি'-এর মুদ্রায় সঙ্কেত জানালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূদেব—'হ্যাঁ হ্যাঁ দু-টাকা পাবে মাথা পিছু। ঘণ্টাখানেকের ত কাজ বাবা। দল বেঁধে ইশকুলবাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে। ডিরেক্টরবাবু ফটো তুলে ছেড়ে দেবেন।'

বড়ো সহজেই মাথা নাড়ল ওদের অনেকেই। কোনো কোনো চোখে কিছুটা সংশয়।

সুকুমার বসাক খুশি যুবক বন্ধুদের সহযোগিতায়। ফিল্মকে ভালোবাসে এরা। সিনেমা রূপকথা। চড়া রোদ মাথায় বয়ে এক দুপুরে এত বড়ো গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো অসম্ভব। তবু যতটুকু পারা যায়, সেরে নিতে হবে আজই। বাউরিপাড়া থেকে বেরিয়ে প্রান্তরদীর্ঘ সবুজ মাঠ ডানদিকে রেখে, গাছপালা

বাঁশবনের ছায়ায়-রোদ্দুরে আরেক চাষিপাড়ায় এগোতে এগোতে যুবকরা আরো ঘন, আরো নিবিড়ভাবে লেপটে থাকে তাঁকে। তিনি গল্প শোনান, রূপকথারই কথা—এখানে যে শুটিং চলছে, তার তৈরি-ফিল্মগুলো মাদ্রাজে কি বোম্বেতে কালার্ড ফিল্ম লেবরেটরিতে পাঠানো হবে। আমাদের প্রথম সাত দিনের লটটা পাঠানো হয়ে গেছে মাদ্রাজ। সেখান থেকে রাশ প্রিণ্ট হয়ে এলে এডিটিং। মুভিওয়ালা মেশিনের বিশদ ব্যাখ্যা। এডিটিং-এর পর সাউণ্ড-ডাবিং। টুকরো টুকরো করে নির্বাক দৃশ্যগুলো প্রজেক্টেড হবে। নিজেদের অভিনয়ের দিকে তাকিয়ে আর্টিস্টরা রেডিওর কায়দায় আবার সংলাপ বলে যাবেন। ইন্‌সিডেণ্টাল সাউণ্ড জুড়ে দেওয়া হবে। আলাদাভাবে টেপ-করা মিউজিকও জুড়তে হয়। তারপর রিরেকর্ডিং—পাখির ডাক, ঝড়বৃষ্টির শব্দ…

'আপনি কে সুকুমারদা ?'

সুকুমার ঘাবড়ে গেলেন—'আমি! আমি কে মানে…'

'এই যে দেখি, দিনরাত এত খাটাখাটনি করছেন। সব ধকল ত আপনাকেই সইতে হয়। ওঁরা এসে পৌঁছোনোর আগে থেকে আপনি সব করে যাচ্ছেন। সিনেমায় আপনার নাম থাকে ?'

'থাকবে না কেন! কর্মসচিব।'

ছেলেরা বিস্মিত— 'কই, এমন কিছু ত লেখা দেখি না বই-এর গোড়ায়, যেখানে নাম থাকে…'

'থাকে, থাকে। সিঙ্গল-প্লেটে বড়ো করেই থাকে। আপনারা খেয়াল করেন না। কুলির-সর্দারকে কে আর চেনে বলুন।'

সুকুমার চমকে উঠলেন। হাতের সিগারেটটা ফেলতে যাচ্ছিলেন ডানদিকে, চোখে পড়ল। দূরে, বেশ দূরে, দুপুর-তাতানো রোদ্দুরে লাঠি-ঠুকঠুক তিন-পায়া এক বুড়ি। তাকালেন ছেলেদের দিকে—'ও কে বলুন তো! আপনাদের গ্রামের শেতলাবুড়ি না ?'

'হ্যাঁ, ওই বুড়িকেও দরকার নিকি আপনাদের ?'

'ওকে এখন কি করে ধরা যায় বলুন তো !'

'আজই দরকার ?'

'না, আজই না হোক। একটু দরকার ওকে। পরমদা চাইছিলেন। টাকা দেব, খেতে দেব…'

'তা'লে এখন ছেড়ে দিন। রোদ ভেঙে কে যাবে অদ্দুর। সে আমরা নিয়ে যাব কালপরশু...'

'না না, ওকে তো আবার পাওয়া যায় না সবসময়। এই নিয়ে তিনবার হলো, নাগালের মধ্যে পেয়েও...'

'আজ ওটা থাক সুকুমারদা। কাল আমরা ওকে পাকড়াও করে কাঁধে তুলে ঠিক নিয়ে যাব। এখন চলুন। ওই তো সাঁওতালপাড়া...'

আপশোস নিয়ে অপস্রিয়মান বুড়ির দিকে তাকিয়ে ছিলেন সুকুমার। যুবকদের অনিচ্ছায় জোর চলে না। সামনেই উঁচু উঁচু তিনটে নারকেল গাছের সারিতে সাঁওতাল পল্লির স্বাগত তোরণ।

ভরদুপুরে, বেলা একটায় ক্যাম্পে ফেরার পর আরেক কাণ্ড!

গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই শস্তা মার্কিন-কাপড়ের পাঞ্জাবি আর ক্ষারে কাচা ধুতির তলায় প্লাস্টিকের চটিতে, হাঁটু-কোমরে আনত মাঝবয়সী একজন লোক সামনে এসে দাঁড়ালেন—'নমস্কার গ দাদা। মান্যিজন আপনেরা। কী সুভাগ্যি আমাদের। সাক্ষাৎ পেলম...'

কাছাকাছি ছিল হরেন। উল্লসিত হলো—'আমাদের পদ্দাদা গ সুকুমাদ্দা, ন্যাদামহাটির সি যো ঝন্নার কতা বলেছেলম। উয়ার বাপ ..'—

পবমদার এই গোটা ব্যাপারটাই কেমন বিদঘুটে আর অবাস্তব মনে হচ্ছিল যদিও, এবার অস্বস্তি। ভ্রূ কুঁচকে বললেন—'উনিও এসেছেন? কোথায়?'

নিজের মানুষকে বেশ বড়োসড়ো একটা জায়গায় আনতে পেরে হবেন আগুন তৃপ্তিতে ভরপুর। বলল— 'কে গ সুকুমাদ্দা? ঝন্না? উয়াকে বইস্যে রেখেচি ওপরে, দোতলায় ..'

'না, না, বেলা হলো। দেড়টা বেজে গেছে। এঁদের খাওয়াদাওয়া ..'

'সি হবে খন। ডেরকটরবাবু আসুন। কতাবাত্রা হোক সব, ঝন্নাকে দেখুন ..'

'সবাই তো আর আপনার মতো বাউণ্ডুলে নয় ..' সুকুমার ব্যস্ত হলেন— 'কোথায় বনবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে কাজ চলছে। ওরা কখন ফিরবে ঠিক নেই। ওরা কেন বসে থাকবেন। যান, বাসুকে বলুন। রান্নাবান্না হয়ে গেছে। ওদের বসিয়ে দিক...'

নানান কথায় আরো ঘনিষ্ঠ হতে চাইলেন পদ্মা বাকুলি। হ্যাঁ-হুঁ গোছের ঘাড়-

-নাড়া ছাড়া সুকুমার খুব বেশি আমল দিলেন না। অনেক কাজ তার।

ক্যাম্পের ঝিমোনো দুপুরে লোকজন বিশেষ কেউ ছিল না। সকলেই শুটিং-স্পটে। ক্যাটারিং-এর দিকে কাজকর্ম শেষ। লক্ষ করলেন, পরস্পরের চোখে-চোখে আবছা চাপা-হাসি। কেউই বলছে না কিছু।

তারক পণ্ডিতের সঙ্গে দু-চারটে কাজের-কথা সেরে নিয়ে, কি মনে হলো, উঠে এলেন ওপরে। দোতলায়, যেখানে বিস্তীর্ণ করিডরের পাশে, রোদ থেকে গা বাঁচিয়ে বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে ছিল মেয়েটি। চোখে চোখ পড়তে জড়তা নেই। শাড়ির আঁচল গুছিয়ে নড়েচড়ে বসল মাত্র।

একই সঙ্গে ব্যথিত এবং বিরক্ত সুকুমার। পরমেশ মিত্রের মতো গুণী মানুষের দৈন্যদশায় সত্যি দুঃখ। বিরক্তির হেতু, গেঁয়ো মানুষ হরেনকে ক্ষ্যাপানোর যাবতীয় ঝক্কি এখন সামলাতে হবে তাঁকেই।

আটাশ-ত্রিশের কম তো নয়ই—এমন একটা বয়স। মুখেচোখে শরীরে ছিরিছাঁদ নেই, হালকা লিকলিকে, ভীষণভাবে রোগা। এক পলকে কিছুটা অসুস্থই মনে হয়। এলোমেলো স্নোপাউডারে কালো চেহারাটা আরো কুচ্ছিত। গ্রামের যাত্রায় এখানে ওখানে ভাড়া খাটে। কিন্তু পরমেশ মিত্রের চলচ্চিত্র! চিৎপুরের অধিকারী মশাইরাও কি কেউ কোনো সখীর ভিড়ে নেবেন ওকে?

সুকুমার জানেন না। ডান দিকে মেয়েটিকে রেখে বাঁদিকে ঘুরলেন। পরপর ঘরগুলো খোলা। আর্টিস্টরা সকলেই বেরিয়ে গেছেন। থাকতেও পারেন দু-চারজন, যাদের কাজ নেই। ঢুকে পড়লেন প্রথম ঘরে। তিনটে তক্তপোশেই বিছানাগুলো ফাঁকা। শুধু একদিকে তারুঠাকুরের অভিনেতা প্রৌঢ় হরদয়াল ঘোষ শাক বাছছেন তার নিজের বিছানায় খবরের-কাগজ ফেলে

সুকুমার এগিয়ে এলেন— 'কী করছেন আপান? এগুলো কী?'

'শুষনি শাক, কালোমেঘ পাতা, থানকুনি। কাঁটাওলা গোক্ষুরও পেয়ে গেলাম গোটাকতক। ভেরি রেয়ার জিনিস।'

'এ সব, এসব আপনি চেনেন?' সুকুমার বিস্মিত।

'চিনব না! আজ দশ বছর বেঁচে আছি এসবের ওপর।'

সুকুমার আরো এক উদ্ভট ক্ষ্যাপামির সামনে মৌন। আলতোভাবে সিগারেট ধরিয়ে পাশের তক্তপোশে বসলেন। শরীর ভেঙে ক্লান্তি।

'কলকাতার বাজারে এগুলো পয়সা দিয়ে কিনতে হয় সুকুমারবাবু। আর এখানে দেখুন জলেজঙ্গলে পড়ে আছে। কত চাই আপনার?'

'এত সব আপনি জানলেন কী করে? সবই কি পেটের গোলমালে?'
'কী বলছেন, পেট! এই যে দেখছেন…'উৎসাহে একটা ঘাসপাতা তুললেন হরদয়াল—'এ হলো শুষনি শাক। সেদিন বললাম পরমেশবাবুকে, এত টেনশানের মধ্যে থাকেন। কী গুচ্ছের ট্যাবলেট খান। শুষনি শাক সেদ্ধ করে রোজ এক বাটি খান সকালবেলা।' এর চেয়ে ভাল ট্র্যানকুইলাইজার আর পাবেন না দুনিয়ায়…'
ট্র্যানকুইলাইজার! টেনশনের উপশম! শব্দগুলোর শ্রবণে দেহের অবসাদে আরো শিথিলতা বাড়ে। কিন্তু হাসতেও পারছেন না খোলাখুলি। বললেন—
'এ কি আপনি রোজই কুড়োচ্ছেন নাকি?'
'হ্যাঁ, যখন কাজ থাকে না, ঘুরে ঘুরে জোগাড় করি। আজ একটু বেশিই নিয়ে এলাম। আজ বিকেলে একটু কাজ আছে। তারপর তো কাল সকালেই…'
'জানি, আপনি তো কালই চলে যাচ্ছেন…'
ঘাড় গুঁজে পারিপাটি শাক গোছাচ্ছিলেন হরদয়াল। ফিরে তাকালেন—'এর পর যদি মালতীকে খুঁজে পান তো আবার ডেট দেবেন। তখন আবার ছুটি নিতে হবে। মার্চেন্ট অফিস। সবসময় ছাড়তেও চায় না শালারা। কি সুখে যে থিয়েটার করি…'
সুকুমার উৎকর্ণ। গাড়ির শব্দ দূরে।
'কী হলো। ঠিক হলো কিছু?'
'কী?'
'একটি মেয়ে এসেছে দেখলাম। ও মালতী করবে?'
'জানি না। সেটা বলার মালিক তো আমি নই।' শরীর ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন সুকুমার। শুধু প্রসঙ্গ-এড়ানোর ছুতো নয়। সত্যি-সত্যি গাড়ির আওয়াজ। সকালের শিফ্‌ট সেরে সবাই ফিরছে ক্যাম্পে।

লোকজনে সোরগোলে ভরে উঠল স্কুলবাড়িটা। আর্টিস্ট টেকনিশিয়ান প্রডাকশনের কর্মী সকলেই যে-যার-মতো স্নানে-আহারে বা বিশ্রামে আড্ডায় মজে যাবার ফাঁকে সুকুমার বসাক সুযোগ খুঁজছিলেন, পক্ষা বাকুলি পৌঁছোবার আগেই একবার ধরবেন পরমেশকে। শুধু আনুগত্যে নয়, শ্রদ্ধায় আন্তরিকতায় দু-চার কথা শোনাবার অধিকার তো তাঁরই।

কিন্তু হেরে গেলেন। হরেন আওনের তর সইছিল না। দলবল নিয়ে ক্যাম্পে ফিরতেই ডিরেক্টরবাবুর ওপর হামলে পড়েছে।

প্রথম ঝটকায় ভ্রূ কুঁচকোলেন পরমেশ—'কে ওদের আসতে বলেছে? তুমি?'

হরেন কাঁচুমাচু—'না গ ডেরকটরবাবু, দশ কান হয়ে উয়রা শুনেচে কতাটা...'

'বেশি চালাকি করো না। বুঝলে হরেন, তুমি আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান নও...'

অথচ কাজের নেশায় মাতাল মানুষটা নিজের বাহান্ন বছরের শরীরটাকে খুব একটা আমল না দিয়ে লাফাতে লাফাতে উঠে এলেন দোতলায়, যেখানে ইতিমধ্যেই বেশ বড়োসড়ো ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সেই মেয়ে তখনও বেঞ্চিতে চুপচাপ। পায়ের দিকে তড়িঘড়ি আনত হাত বাড়াতেই পরমেশ বাধা দিলেন। প্রথম দেখাতেই দমে গেছেন—'কী নাম তোমার?'

কনে-দেখার ইন্টারভ্যু নয়, তবু কুন্ঠিত লজ্জায় ভেঙে পড়েছে মেয়ে—'শ্রীমতী ঝর্ণা বাকুলি।'

'কতদিন অভিনয় করছ?'

'সি ত এত্ টুকুন বয়েস থিক্যেই কত্তে হচ্চে গ দাদা। গরিবের মেয়ে...'বিনীত ভঙ্গিতে পঞ্চা বাকুলি।

হরেন ছাড়া ইউনিটের আর কেউ নেই আশেপাশে। সুকুমার উঠে এসেছেন। পরমেশ সিগারেট ধরালেন—'আপনি কী করেন?'

'কিছুই ত হচ্চে নি তেমন। ভাগে-পাওয়া জমি আচে অল্প কিছু। সি-ও চাষের খরচা জোটাতে পারিনে। আমাদের উখেনে হাটে এট্টা দোকান আচে ফটিক সাঁতরার। সিখেনে বসি। আর ই মে'টা যাত্রাপালা গেয়ে আনে দু-চার পয়সা। তাইতে চলে কোন রকম...'

মেয়েটির দিকে আরো একবার তাকালেন পরমেশ। সকাল থেকে বিরতিহীন কাজের পর দীর্ঘ অবসন্নতায় সময়ের বৃথা অপচয়। ঝাঁকুনি দিয়ে নড়েচড়ে উঠলেন—'শুনুন, আমাদের ছবিতে অভিনয়ের জন্যে একটি মেয়ে খুঁজছি আমরা। কিন্তু যে চরিত্রে অভিনয়, সেটা খুব সতীসাধ্বীর চরিত্র নয়...'

ড্যালাড্যালা চোখে বাপ মেয়ে দুজনই উন্মুখ। হাকিমের মুখে রায় শোনার উৎকণ্ঠা।

'আকালের গপ্পো। আকাল মনে আছে তো আপনার? পঞ্চাশের মন্বন্তর...'

'অঁ, শুনেচি। মনে নেই তেমন। সি ছুট্টবেলায়...'

'সেই আকাল। ঠিকেদাররা এসেছিল গ্রামে। মধ্যচাষির ঘরের একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে যায়। একেবারে সর্বনাশ করে দিয়ে...'

'সি ত হয় গ দাদা। এখনও হয়।'

'এখনও হয় মানে।' এবার পরমেশ নিজেই উৎসুক।

'নিত্যি ত নেখা হচ্চে কাগজেধ সোমত্তা মে'ছেল্যার শিল্লতাহানি, খুন...'

'হ্যাঁ, সেরকমই একটা কিছু। আমাদেব গল্পের মেয়ে, মালতী শেষপর্যন্ত বেশ্যা হয়ে গেল। এ ধরনের কোনো চরিত্রে অভিনয় করেছে এর আগে?'

'করবে নি কেনে। সি সিবারে মানিকচকের বাবুরা পালা দিলেন "সতীর ঘর"...'

'বাবা...' এই প্রথম, মুখে আঁচল চেপে সেই মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল প্রতিরোধের ঝাঁঝে।

'তাতে আর কী মা। বলতি হয়। এনাদের কাছে সব বলতি হয়। কী পুণ্যিতে আজ তোর এত্ত বড় ভাগ্যি...' পঞ্চা বাকুলি চোখ ফেরালেন আত্মজা থেকে ডিরেক্টরবাবুব দিকে—'মস্ত জমিদাবনাড়িতে ম'-লক্ষ্মী বিনোদিনীর সংসার। কিন্তু হলে হবে কী। তেনার ভাতার জমিদারবাবুর ছেল ভোগের নেশা। মদ জুয়া মে'মানুষ। সি শখের মে'মানুষ লযনতাবাব পাট দেল ঝন্নাবে। তা কপালের লেখন খণ্ডাবে কে গ ডেবকটববাবু। আমাদেব গাঁয়ের রাধু ঘোসের সেজ মেয়েটার শ্বশুরবাড়ি ছেল মানিকচক। সিখেন থিক্যে খপরটা গেল। ওখেনকার জোয়ান ছোঁড়া রতনবাবুর সনে ঢলাঢলির দেখ্যটা...'

স্থির পলকে শুনছিলেন পরমেশ। কিছু বলতে যাওয়ার আগেই

'পালাগান গাইতে গেলে ত আর অত বেচার চলবেনি। সব চরিত্তিরই বলতি হবে। দেবদাসে পাব্বতী হব, চন্দরমুখী হবনি—ই কেমন কতা?'

'ঠিকই বলেছেন, পালা গানে সব চরিত্রহীনও চরিত্র...' চমকে-ওঠার ছ্যাকাটা নিজের মধ্যে শুষে নিয়ে পরমেশ তার নিজের অধৈর্যে— 'শুনুন, ওকে তো আমরা দেখলাম। কথাবার্তাও হলো। এরপর যদি দরকার হয়, আপনাকে জানাব...'

অ্যাঁ। পলকে আঁৎকে উঠল ওরা। বাপবেটি এবং হরেনও।

'মেয়ে আমার পছন্দ হল নি গ?'

'পছন্দ-অপছন্দের কথা তো নয়...' পরমেশ ক্লান্ত, বিরক্ত—'অনেক কিছু তো ভাবতে হয় আমাদের। দেখি, যদি প্রয়োজন মনে করি, খবর পাবেন।'

দাঁড়ালেন না। ছিটকে পেরিয়ে গেলেন বারান্দাটা। সিঁড়ি গড়িয়ে নিচে।

এবং হতবাক পঞ্চা বাকুলি করুণভাবে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে, যেন অচল পয়সার শামিল কালো কুশ্রী মেয়ের দুর্ভাগ্যে আরো একটি সুপাত্তর হাত-ছাড়া, দুঃখে অনুতাপে এবার হরেনের ওপর হিংস্র আক্রমণ— 'হল ; বলি হল ত ! আমার কি সব্বোনাশটা তোরা কল্লি বল দিনি ! বামুনগাছির মন্মথ যে' বলল—যাও গ খুড়, মোয়নপুরের হরেনদা ডেরকটরবাবুকে সব বলে কয়ে রেখেচে ঝন্নার কতা। গেলেই হয়্যা যাবে। কী হল ! বলি, হলটা কী ! এখনে ইদিক গেল উদিক গেল। সাটিদার বাবুরা…'

পঞ্চা বাকুলি দিশেহারা। ওপাশে রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে মেয়েটা বোধ হয় সত্যি কাঁদছে। কেন না কাঁপছে শরীর। আঁচলে ঢাকা মুখ।

সাত ঝঞ্ঝাটে হরেনও বেকুব। বিশেষত তার সর্বনাশ—অদূরে দাঁড়িয়ে সুকুমারদা দেখলেন সব কিছু। বেত্তান্ত শুনলেন সব।

নিঃশব্দে লক্ষ করছিলেন সুকুমার। এমন কি, তীব্রতায় ছুটে যাবার মুহূর্তে পরমদা চোখে চোখ ফেলেও যখন বললেন না কিছু, তারপরও প্রতীক্ষার প্রয়োজন ছিল। এগিয়ে এলেন এবং যা শুনলেন, মর্মান্তিক—

গুপ্তিপাড়া থেকে যেতে-হয় সাটিদা নামে কোন্ এক গ্রামে দ্বাদশীতে অর্থাৎ কাল রাতে বাবুদের যাত্রাভিনয়— 'সোনার বাংলা'। ঝর্ণা সেখানে নায়িকা। যথারীতি রিহার্সাল দিয়ে এসেছে দিন পাঁচেক। আজ সকালে পৌঁছোনোর কথা। আজ সারাদিন রিহার্সালের পর কাল অভিনয়। অথচ সিনেমার ডাক পেয়ে কাল সন্ধে থেকে আকুল। রাহাখরচ আর বায়না বাবদ সাটিদার বাবুরা যা দিয়েছেন সবই খরচ হয়ে যাবার পর যদি বেইমানি হয় তো হোক। আগে সিনেমা…'

সুকুমার নিরুত্তাপ শান্তভাবে বললেন— 'সেখানে কখন পৌঁছোনোর কথা আপনাদের ?'

'আজ্ঞে, ছটা বত্তিরিশে গাড়ি। এই ধরুন গে, নটা সাড়ে নটা নাগদ চল্যে যেতম…'

'গাড়ি যায় সেখানে ? রাস্তা আছে ?'

পঞ্চা বাকুলি প্রশ্ন বোঝে না— 'সি ত যায়ই। নইলে বলচি কী ? গুপ্তিপাড়া ইষ্টিশান…'

'না, মোটরগাড়ি দিচ্ছি আপনাদের। চলে যান…' হাতঘড়ির দিকে তাকালেন সুকুমার— 'অবিশ্যি খুবই দেরি হয়ে গেল। সে আর কি করা যাবে।

বলবেন সত্যি কথা। যান, খেয়েদেয়ে নিন। আমি ব্যবস্থা করছি আপনাদের…'

বদান্যতায় মুগ্ধ পঞ্চা বাকুলি বোঝে না, মেয়েকে নাকচ করার অপরাধে এরা কতটা খারাপ! হরেন আগুন প্রাণ পেল। তবু যা-হোক ইজ্জৎ বাঁচল তার। একটা মোটর গাড়ি দিচ্ছেন সুকুমারদা। রাজু-ড্রাইভার চালাবে। সাত জন্মে কবে ভাবতে পেরেছে পঞ্চা বাকুলি—এমন সুখ!

বিষের মতো রাগ আর বিরক্তি ভেতরে ভেতরে। সিঁড়ির তলায় কিরণময়কে নিভৃতে পেলেন সুকুমার— 'এসব কি হচ্ছে বলুন তো! এভাবে কিছু হয়?'

'হয়। নিশ্চয়ই হতে পারে। কিন্তু এ মেয়েকে দিয়ে হয় না।'

'আপনি দেখলেন?'

'দেখলাম।'

'হরেনকে দিয়ে আর্টিস্ট খুঁজলে এরাই তো আসবে। পরমদাকে একটু বলুন আপনারা। বোঝান।'

হাসলেন কিরণময়—'কি বোঝাব! আরেক চাষি-বোকে তো আজ সিলেক্টই করে ফেলেছে।'

'সে কি! কাকে?'

'ওই যে, যার মাথা কামিয়ে আজ ছবি তুললে তোমরা। বাচ্চাটার মা…'

'দুর্গা!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ দুগ্‌গা…' কিরণময় বিড়ি বের করলেন— 'নিরক্ষর চাষি-বৌ হলে হবে কী! নাকমুখের কন্‌ট্যুর এত ভালো। গরিব হলেও ফিগারটিগার নিয়ে একটা চার্মিং সিম্‌প্লিসিটি—তোমার ডিরেক্টর তো মুগ্ধ…'

'আমি জানি না। আমি আপনাদের আর্টফার্টের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝি না কিরণদা…' সুকুমার রীতিমতো ক্ষিপ্ত—'শুধু বুঝছি, ঝালমশলা দিয়ে বেশ ভালো-রকম একটা ঝামেলা পাকানো হচ্ছে আবার। তাতে আমার কী! চাকরি করি। যা করতে বলবেন, করব…'

হাসলেন কিরণময়—'আজ সকালে যখন শটটা টেক হচ্ছে, কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে এল মেয়েটা। শেষপর্যন্ত বাধা দিচ্ছিল। আর হাত-কাটা লোকটার কী গোঁ। বৌকে লাথি মারতে চায়। সবাই বাধা দিল। মাটিতে পড়ে আছড়ানি কান্না বৌটার। প্রতিমা নন্দিতা ওরা কেউ সামলাতে পারে না। তোমাদের ডিরেক্টর আমাকে বললেন—ঠিক আকালের মালতী। সমাজের পায়ে পড়ে,

খড়মের গুঁতো খেয়ে ঠিক এভাবেই উথালপাথাল কেঁদেছিল মেয়েটা। ভেরি ভেরি রিয়েল…'

কিরণময় থামলেন। আরো নিবিড় হয়ে এলেন, যেখানে আঙুলের কাঁচিতে সিগারেটটা রেখে বুড়ো আঙুল কামড়ে ধরে আছে চিন্তাক্লিষ্ট সুকুমার। কুঞ্চিত ললাট।

'শটটা শেষ হয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। মনোযোগ দিয়ে একটাই টেক। কিন্তু তারপর সারাক্ষণ বৌটা চেঁচিয়েছে—গুখাকী মড়াখেকো আটকুড়্যা ব্যাটারা। মর মর তুরা, মর। লাথি, লাথি তুদের কপালে, ঝাঁটা মারি তুদের সিনিমায়। কুষ্ঠ হোক, খসে খসে পড়ুক গা। উলাওঠায় মরুক সব্বায়। ই কেমনধারা দেশ্খ গ! আমার এক ছেল্যা মবে ত আটকুড়্যা ব্যাটা শয়তানগুলা মরণসাজে সাজায়ল কেনে আমার আরেক ছেল্যাকে? মরণ ঢুকল আমার ঘরে…'

গলাটা খাটো করে কিরণময় কথাগুলো বললেন অবিকল দুর্গার ভাষায়, দুর্গার ভঙ্গিতে। অভিনয় নয়, জ্যান্ত।

যেন মধ্যযুগীয় কোনো সম্রাট যুদ্ধে এসেছেন রাজধানী থেকে দূরে, অনেক দূরের সীমান্তে। রণকৌশল ভীষণভাবে মার খাচ্ছে। পশ্চাদপসরণের মতো কোনো অবস্থা নয় যদিও, দুর্ভাবনার ভারে মগজটা কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে পোকা। ট্যাবলেটের পর ট্যাবলেট গিলে পরমেশ মিত্তির আরো বেশি কাতর।

পুরো শিবির জুড়েই সেই কাতরতা, বিভ্রান্তি। এমন কি, নন্দিতা প্রতিমা ধ্রুবজ্যোতি বিতোষের চলাচলে আড্ডায়ও আর প্রাণের উচ্ছল আবেগ নেই। একমাত্র প্রবীণ অভিনেতা কিরণময় অনেক বেশি সচল, আরো বেশি দায়িত্ব নিয়ে পরমেশ মিত্রের মনসবদার। কাজকর্ম এগোচ্ছে যদিও, চিত্রনাট্য ভেঙে ভেঙে, 'মালতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়' বাছাই দৃশ্যগুলো গৃহীত হতে হতে অতি দ্রুত এমন এক জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে ঘটনাটা, যখন, আরতির বিকল্প নির্দিষ্ট না-হলে চিত্রনাট্য অচিরেই খশখশে কাগজের পাতায় আটকে থাকার সম্ভাবনা।

অধিকতর সঙ্কট—ঠিকভাবে হোক অথবা ভুলভাবে, আশপাশের গ্রামের মানুষ জেনে গেছে সিনেমা-কোম্পানি অভিনেত্রী খুঁজছেন একজন। আঠার-কুড়ি বছরের যুবতী কন্যা। দেশপাড়াগাঁ থেকেই নেবেন ডিরেক্টরবাবু। পয়সা তো বটেই, সিনেমায় নেমে যাবার এত বড়ো সুযোগ!

রাত প্রায় আটটা। অ্যাসিস্ট্যান্টদের নিয়ে নিজের ঘরে কাজ-বুঝিয়ে-দেবার বা নিজের কাছেই বুঝে-নেবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন পরমেশ। স্কুলের সেক্রেটারি নির্মল ঘোষকে নিয়ে ঢুকলেন সুকুমার। সঙ্গে গ্রামের বন্ধু-যুবকরা।

'একটু ডিসটার্ব করতে এলাম…'

'না না, ডিসটার্ব কেন। আসুন আসুন…' চকিতে উঠে দাঁড়ালেন পরমেশ। সহাস্যে—'আপনাদের ভরসায় আছি। কাজকর্ম করছি আপনাদের এখানে…'

ঘরটা সহযোগীদের ছেড়ে দিয়ে বাইরের বারান্দায় বসার ব্যবস্থা হলো সকলের—চেয়ারে মোড়ায় বেঞ্চিতে।

'আমাদের আবার রেলগাড়িতেই দিনটা কেটে যায়। রাত্তিরে ফিরে আর খোঁজখবরও নিতে পারিনে তেমন…' চেয়ারে বসতে বসতে বললেন নির্মল ঘোষ—'তা আপনার কাজকম্মো সব চলছে তো ঠিকমতো…'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো। কোনো অসুবিধে নেই। দে আর অল আওয়ার নিউ ফ্রেণ্ডস…' যুবকদের দিকে তাকালেন পরমেশ—'এখানে এসে এত সহযোগিতা পাচ্ছি আপনাদের। এ তো প্রায় ভাবাই যায় না। কী ষষ্ঠী, অফিস যাওনি? না-কি ফাঁকি মাবলে আজ? ভালো, মাঝে মাঝে এরকম ডুব দেবে। স্বাস্থ্য ভালে থাকে…'

ষষ্ঠী নামে যুবক, কিঞ্চিৎ বিগলিত—'এখন তো পুজোর ছুটি। লক্ষ্মী পুজোর পরদিন আপিশ খুলবে।'

'পুজো। ও হ্যাঁ, পুজোটা যে কিরকম চুপিচুপি চলে গেল টেরই পেলাম না। শুধু দূর থেকে মাইকে হিন্দী-গান আর ঢাকের বাজনা শুনলাম বসে বসে…'

হাসিতামাশাকে জিইয়ে রেখে কিছুটা হালকা থাকতে চাইছিলেন পরমেশ। হঠাৎ নির্মল ঘোষ— 'এদিকে আবার একটা কাণ্ড হয়েছে…'

পরমেশ সন্দিগ্ধ এবার।

'আমাদের মান্‌কেদাকে তো চেনেন আপনি। মানিক চাটুজ্জে…'

নতুন কোনো ঝঞ্ঝাট-আশঙ্কায় পরমেশ ভ্রূকুঞ্চনে সুকুমারের দিকে তাকালেন। ওদিক থেকে সুকুমার— 'হ্যাঁ, বিকেল বেলা মানিকবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল রাস্তায়। কথাটা উনি আমাকেও বলেছেন। এরপর আর দেখা হয়নি আপনার সঙ্গে। বলাও হয়নি।'

'কি কথা?' এবার নির্মল ঘোষের দিকে মনোযোগ।

'আপনাদের সিনেমার জন্যে কি-নাকি একটা মেয়ে খুঁজছেন আপনারা?'

টান-টান সোজা হয়ে বসলেন পরমেশ। আবার সেই এক যন্ত্রণা! পকেট থেকে সিগারেট বের করে ঝুঁকে পড়লেন সামনে— 'আমাদের এ উপকারটা কে করছে বলুন তো! আমরা কি লোকাল আর্টিস্ট খুঁজে নেবার ভরসায় আপনাদের গ্রামে ছবি করতে এসেছি?'

'কিন্তু আপনারা তো গাঁয়ের মানুষ ডেকে ডেকে নিচ্চেন পরমদা…' যুবকদের মধ্যে হঠাৎ শ্যামাপদ— 'তামাশা দেখতে ভিড় হচ্চে, টেনে টেনে দাঁড় করিয়ে দিচ্চেন ক্যামেরার সামনে…'

'হ্যাঁ, সেগুলো হলো মব-সিন। ভিড় দেখাবার জন্যে ভিড়ের মানুষ। কিন্তু কথা হচ্ছে মালতীকে নিয়ে। সেটা একটা ইমপর্ট্যাণ্ট ক্যারেকটার। তার জন্যে তো স্পেসিফিক অভিনেত্রী চাই…'

'অতসব বোঝে নিকি গাঁয়ের মানুষ…' ভূদেব বলল— 'হাটেবাজারে প্ল্যাটফর্মে বেলতলার মোড়ে এখন তো ওই এক কত্তা…'

টগবগিয়ে উঠলেন নির্মল ঘোষ— 'সে যে কী হচ্ছে চাদ্দিকে, কি বলব আপনাকে। আমিও কি জানতাম নাকি! সেদিন শুনলাম রেলগাড়িতে, ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের মুখে…'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝলাম…' ডানহাতে সিগারেট। বাঁহাতের আঙুলে কপাল ঘসছেন বিরক্ত পরমেশ— 'এটা ঠিক, আমাদের একজন অভিনেত্রী তাঁর ব্যক্তিগত কারণে কলকাতা ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর পরিবর্তে অন্য একজন আর্টিস্টও তো ঠিক হয়ে গেছে। সুজাতা সান্যাল নামে একটি মেয়েকে কাল কিংবা পরশু যে-কোনো দিন এক্স্‌পেক্ট করছি…'

'ঠিক হয়ে গেছে?' সমবেতভাবে বিমর্ষ ওরা।

'কেন! কি হয়েছে বলুন তো! মানিকবাবু না কার কথা বললেন, উনি কী বলছেন?'

'ওর একটি মেয়ে আছে। আমাদের গাঁয়ের থিয়েটারেও নেমেছে অনেক-বার…'

ডানহাতের কনুইটা চেয়ারের হাতলে, মাথাটা হাতের তেলোয় স্থাপন করে পরমেশ নিজেই ক্রিজ। নিতান্তই নির্মলবাবু! চড়া গলায় ধমকাতেও পারছেন না তেমন করে, অন্তত ভেতরে-ভেতরে শরীরটা যে রকম তেতো হয়ে আছে।

'যা ভাবছেন তা নয়। মেয়েটি সত্যি ভালো…' বলে যাচ্ছেন নির্মল ঘোষ— 'শুক্লা, জন্মো থেকে দেখছি ত ওকে। ঠাণ্ডা, ব্যবহার ভালো, সুন্দরী। বাপকাকা-

জ্যাঠারা ও রকম হলে কি হবে, মানুকে চাটুজ্জের ছেলেমেয়েরা কিন্তু খুব ভাল। ছেলেটা ত কলকাতায় ডাক্তারি পড়ে। শুক্লা গানও জানে...'

'আপনি যান না পরমদা। যান একবারটি। শুক্লাকে আপনার পছন্দ হবে...' সমীর।

বিরক্তিতে মাথা তুললেন পরমেশ। হাসলেন নরমভাবে—'তোমাদেরও যে দেখছি, খুব উৎসাহ!'

'বাঃ, আমাদের গাঁয়ের মেয়ে ফিল্‌ম্ আর্টিস্ট হবে। আমাদের ভালো লাগবে না?'

'কিন্তু যেখানে আমার যাবার প্রয়োজন নেই; সেখানে কেন যাব বলো তো?'

নির্মল ঘোষ উতলা হলেন— 'না পরমবাবু, মানুকেদা যা লোক। একবার নিজে থেকে যখন বলেছেন, একবার যাওয়া ভাল। নইলে ফের যদি...'

'কেন! খুব খারাপ লোক নাকি?'

'ওরে বাপস!' ছেলেরা কোরাসে—'যা ফেরেববাজ...'

'তাহলে...' পরমেশ নিজেও কৌতূহলী—'ওরকম একজন মানুষ নিজে মেয়েকে ফিল্‌ম্-এ অভিনয় করতে পাঠাতে চাইছেন?'

'ওই, ওইটেই মজা...' নির্মল ঘোষ উৎসাহ পাচ্ছেন—'বেশ বড় সম্পন্ন পরিবার। অনেক জোতজমি। নিজেরাই চাষ করেন। পুকুর আছে, নিজেদের ধানকল। অঢেল পয়সা। তার মধ্যে মানিক চাটুজ্জে একটু আলাদা। ছেলেবেলা থেকেই থিয়েটারের খুব শখ। গাঁয়ে থিয়েটার হলে মানুকেদা থাকবেনই। উনিই তো এইটুকুন বয়েস থেকে শুক্লাকে নিয়ে এসেছেন গাঁয়ের থিয়েটারে।'

আবার চেয়ারের হাতলে ডান হাতের কনুই, সিগারেট সুদ্ধু হাতটা তুলে ধরে বুড়ো আঙুলে কামড়। ভাবতে হয়। ভাবনাটা এসে পড়েছে ঘাড়ে।

বিস্কুট-ভর্তি প্লেট, চা এল। তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন পরমেশ। দ্রুত নিজের ঘরে প্রবেশ। যেন এক দুর্নিরীক্ষ্য সংযোগ আছে কোথাও। কোনো ইঙ্গিত-ইশারা নেই। সুকুমার অনুগামী।

'কি বুঝছেন?'

সুকুমার নিশ্চুপ। ভাবনার দায় তাঁরও।

'শৈলেনবাবু সুজাতার কথা বলে গেছেন। এখন পর্যন্ত কোনো খবর এল না। অবশ্য সময়টা চলেও যায়নি। আর যাই হোক, সে আর ভেরি ডিসেন্ট অ্যাণ্ড রেসপনসিবল...'

'কিন্তু আপনি এখানে আর্টিস্ট খুঁজছেন। পাবেন ?'

'না না, আমি খুঁজছি না···' কিছুটা উত্তেজিত পরমেশ—'ওরকম একটা চিন্তা মাথায় এসেছিল একবার। সেসব তো এখন আর নেই···'

'কিন্তু মানিকবাবুর বাড়িতে তো যেতেই হবে আপনাকে। ভদ্রলোক আমার কাছেও এসেছিলেন। আমি পাত্তা দিইনি। কিন্তু এঁরা সবাই মিলে এসে বলছেন···'

পরমেশ চুপচাপ। কপালের বলিরেখায় দুভাবনা উঁচিয়ে থাকে—'ওদের কী বলব তাহলে ?'

'দেখুন ভেবে···'

গা-ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। অতিথিরা চা খাচ্ছেন, বিস্কুট চিবোচ্ছেন। পরমেশও বসলেন চেয়ারে—'অল্ রাইট, আপনারা যখন বলছেন, আমি যাব একবার। সুকুমারবাবু, আপনি একটা খবর দিয়ে রাখবেন। দেখি, যদি কালই সন্ধেবেলা, কাজকর্মের পর সময় হলে···'

হাঁটতে হাঁটতে,নীচে,একেবারে স্কুলবাড়ির দরজা পর্যন্ত অতিথিদের সঙ্গে এলেন। বললেন ছেলেদেব—'কাল সকালেই তো সেই শটটা। তোমরা আসছ তো ?'

'শট মানে ? দৃশ্য ?'

পরমেশ হাসলেন—'হ্যাঁ, মিছিল। মিছিল করে গ্রামের মানুষ যাচ্ছে শহরের দিকে। লঙরখানায়। শুনেছি, লোকজন জোগাড় করতে সুকুমারবাবুকে অনেক সাহায্য করেছ তোমরা। তোমরাও আসবে। শার্টপ্যাণ্ট নয় কিন্তু। ছেঁড়া-নোংরা লুঙি বা ধুতি। তখনকার দিনে গ্রামে শার্টপ্যাণ্ট কিছু কিছু থাকলেও এখনকার মতো নয়···'

'সেকি। আমরাও মিছিলে যাব ? আমরাও কাঙাল নাকি ?'

'ইয়েস, ছাটস এ পয়েণ্ট···' পরমেশ জমে গেলেন—'এ কথাটা বলার জন্যেই তো পুরো দৃশ্যটা। বিশাল ভারতবর্ষের একেবারে তলানিতে এক ধরনের দুর্ভিক্ষ তো চিরকালই বেঁচে ছিল। আজও আছে। গ্রামে থাক, দেখছ না চারপাশে। সরকারি ভাবে আমরা দুর্ভিক্ষ মানি তখনই, যখন, অন্তত মধ্যচাষির ছেলেমেয়েরা কিছুটা-ভালো-গোছের জামাকাপড়ে লঙরখানার লাইনে বা মিছিলে এসে দাঁড়ায়। ক্যামেরাটা তোমাদের ওপরই খেলবে বেশি···'

কিন্তু পরদিন সকালে, প্রাতঃক্রিয়া স্নান চায়ের পর ফিটফাট নেমে এসে পরমেশ ক্ষাত্রতেজে পরশুরাম।

পুরো ইউনিটটাই যথারীতি প্রস্তুত। যন্ত্রপাতি এবং প্রডাকশন-কর্মীরা সকলেই গাড়িতে উঠে গেছে। একটা মিছিল সাজাতে শ খানেক আবালবৃদ্ধবনিতা তো অবশ্যই প্রয়োজন। সাড়ে সাতটা বেজে গেল, কুড়ি জনের বেশি লোক আসেনি। এদের মধ্যে গ্রামের সুহৃদ যুবকরা জনা সাতেক। সুকুমার বসাকের নির্দেশে সাইকেলে চেপে ওরাও কোথায় চলে গেল।

প্রচণ্ড বেগে সুকুমার বসাকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন পরমেশ—'ইয়ার্কি! সব কিছুতেই তামাশা পেয়েছেন আপনারা…'

গনেগনে উনুনে পেল্লাই কড়াই। লুচি ভাজা চলছে তখনও। চারটে করে লুচি, আলুর দম আর দুটো করে দানাদারে শ দেড়েক প্যাকেট করতে হবে বেলা নটা সাড়ে নটার মধ্যে। তারক পণ্ডিত আর নকড়ি দত্তর সঙ্গে হিশেবের বোঝা-পড়াটা দ্রুত সেরে নিচ্ছিলেন সুকুমার। অতর্কিত আক্রমণে বিচলিত নন।

'সাত টাকা রোজ পায় ওরা। আমি খবর নিয়েছি। আর আপনি ওদের কাছে দুটাকার কথা বলে এসেছেন। ওরা কেন আসবে? কেন?' উত্তেজনায় বেসামাল পরমেশ—'গরিব মানুষ বলে কি চাকরবাকর পেয়েছেন সবাইকে? প্রডিউসারের টাকা বাঁচাচ্ছেন?'

'আটটায় টাইম তো, আপনার? আপনি যান। লোকেশনে গিয়ে দাঁড়ান। একশ নয়, দেড়শ জন যাচ্ছে…'

নিরুত্তাপ সুকুমার এত শীতল, এতই উদাসীন, যার মুখোমুখি, ক্রোধের উন্মাদনায় পরমেশ নিজেও দিশেহারা। একেবারে পরিকল্পনাবিহীন চলে না লোকটা। কিন্তু দেড়শ-র জায়গায় কুড়ি জনও কি বাঁধা-ছক!

এবং অবাক হলেন। কোত্থেকে সাইকেল জোগাড় করে রেখেছিলেন একটা। এই বয়সে সুকুমার সবাইকে তাক লাগিয়ে সাইকেল টেনে নিচ্ছেন। গেটের দিকে এগোতে এগোতে, কি ভেবে, সাইকেলটা আবার ঠেস দিয়ে রেখে পরমেশের কাছে এলেন—'প্রডিউসারের টাকা বাঁচাবার কোনো গরজ নেই আমার। সেদিন ওদের আমি দু টাকার কথা বলে এসেছি। জলখাবারের কথা আদৌ বলিনি। সব কবুল করে এলে দেড়শ নয়, হাজার দেড়েক লোক এসে এখানে হামলে পড়ত এখন। আপনার বাজেটে কুলোতো? পুলিশ দিয়ে ঠেকাতে পারতেন?'

পরমেশ তাঁর অস্বস্তিতে সিগারেট খুঁজলেন পকেটে। নিজেকে লুকোতে চান ধোঁয়ার আড়ালে।

'আগেই কথা ছিল। সেভাবেই ছেলেরা বেরিয়ে গেছে সাইকেলে। বিভিন্ন পাড়া থেকে কোটা অনুযায়ী দেড়শ জনকে ডেকে নিয়ে আসবে গোপনে। আপনার কথা মতো একেবারে বেছে বেছে—সবচেয়ে হাড়গিলে, সবচেয়ে বেশি কাঙাল-কাঙাল বাচ্চাবুড়ো নারীপুরুষ। গুনে গুনে ঠিক দেড়শ। একজন বেশি নয়, একজন কম নয়। ছবিতে ওরা লঙরখানায় যাবে বলে তো আমরাও লঙরখানা খুলে বসিনি এখানে। এটা দানসত্র নয়...'

সুকুমার চলে গেলেন। অশান্ত পরমেশ। মস্তিষ্কের কোষগুলো থেকে বালিখসার মতোই ঝরে-ঝরে পড়ছে কিছু। ইউনিটের গুণমুগ্ধদের মধ্যে প্রডাকশন-কন্ট্রোলার সুকুমার বসাক একমাত্র মানুষ, তাঁর সম্বৎসরের আপনজন। মানুষটাকে তিনি চেনেন। কোথাও কিছু অনিয়ম না-হলে খুব সহজে কোনো নিয়ম ভাঙে না লোকটা।

ওদিকে যাত্রা শুরু। যন্ত্রপাতি আর কিছু প্রয়োজনের লোক নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। আর্টিস্টরা বা বাড়তি কারো দরকার নেই।

পরমেশ এগোলেন পায়ে পায়ে। গাড়িতে নয়, হেঁটে হেঁটেই যাবেন সিদ্ধেশ্বরী তলা, যেখানে গাছগাছালির ছায়ায়-ছায়ায় মেঠো রাস্তায় শ-এ শ-এ নারীপুরুষ শিশুবৃদ্ধ হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্মণ শূদ্র একই মিছিলে গায়ে-গা ঘেঁষে শহরের দিকে এগোবে। কলকাতা কতদূর! কোথায় কলকাতা! কাছাকাছি জেলাগুলো থেকে লাখে লাখে মানুষ একই লক্ষ্যে—ইস্পাহানির বেহস্ত, হনুমান বক্সের বৈকুণ্ঠ।

সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর—উনিশ শ তেতাল্লিশ। মহাযুদ্ধের পৃথিবীতে, মাত্র চার মাসে মরে গেল লাখ পঁয়ত্রিশেক মানুষ। বোমায় নয়, ক্ষুধায় বছরখানেক আগে মেদিনীপুর আর দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার একাংশে প্রলয় বন্যা ছাড়া খরা বন্যামড়ক ছিল না কোথাও। শ্যামল প্রকৃতি আবহমান সবুজে গাঢ়, আকাশের নীলে ভাসমান মেঘ, মাঠেপ্রান্তরে দূর্বার ফলন—তবু, তবু গাছপালার গুহা থেকে বেরিয়ে লাখো লাখো মানুষ, গ্রামের মানুষ, মাঠের সম্রাটরা ধুঁকে ধুঁকে কৃমির মতো হাঁটে। রাজধানীর রাজপথে, লঙরখানায়, কঠিনপাষাণ প্রাসাদ পাদদেশে আকুল আবেদন— 'একটু ফ্যান দিবেন গ মা! একটু নুন! রাজরাণী হবেন...'

সিদ্ধেশ্বরী তলায় পৌঁছে আরেক আশ্বিনে সেই মাঠ দেখলেন পরমেশ। যতদূর

চোখ যায়, দিগন্তবৃত্তে ঘন সবুজে বিস্তীর্ণ গালিচা। সকালের রোদে চিকচিক চিকচিক বালিহাঁসের ঝাঁক উর্ধ্বে আকাশে, কচি ধানের ডগা ছুঁয়ে শাদা বক একটা কি ছুটো। কিছুদিন পরেই নাকি দেশ ছেয়ে, যোজন যোজন প্রান্তর জুড়ে এই সবুজ সোনা হবে। মাঠ মাটি স্বর্ণপ্রসবিনী।

আচ্ছন্নতা থেকে সচলতায় চঞ্চল হলেন। উদোম-গায়ে নেংটি-পরা মাঠের রাজারা আবার মিছিলে। অবাক কাণ্ড! সাইকেল ঠেঙিয়ে গ্রামের ছেলেরা ধরে বেঁধে নিয়ে এসেছে অনেক মানুষ। দেড়শর বেশি অথবা কম। হিশেব অনাবশ্যক। তিনি খুশি।

মস্ত একটা শিরিস গাছের ছায়ায় ক্যামেরা সেট করে ক্যামেরাম্যান নির্মল এবং তার সহযোগীরা নির্দেশের অপেক্ষায়। হাত-তিনেক চওড়া মেঠো রাস্তায় এলো-মেলো মানুষগুলোকে সাজানোর কাজ চলছে তখনও। দুজন দুজন করে দীর্ঘ লাইনে দাঁড় করাতে ব্যস্ত ইউনিটের লোকজনদের সঙ্গে গ্রামের যুবকরা।

মানুষগুলো হেঁটে যাবে। ক্যামেরা ধরবে তাদের। পুরো দৃশ্যটার চিত্রগ্রহণ কুড়ি মিনিট আধ ঘণ্টায় শেষ।

আরো একটি দৃশ্য তুলতে হবে। একই মিছিলের। চন্দ্রধর এবং অন্যান্য চাষিরা মাঠে লাঙল ঘোরাতে ঘোরাতে প্রথম দেখবে লণ্ডরখানার মিছিল। হালবলদসহ কিরণময়ের শটটা শেষ দিকে নেওয়া হবে এক সময়। মিছিলটা এখন।

সুতরাং মিছিল করেই মানুষগুলোকে নিয়ে যাওয়া হলো আসাম রোডের পাকা সড়কে। খুব দূরে, মাঠের আলে ক্যামেরা বসিয়ে লং-শট। মাঠ আর আকাশের বর্ণাঢ্য প্রেক্ষিতে, দূরে, নানা বয়সের নারীপুরুষশিশুবৃদ্ধের সারিবদ্ধ পদযাত্রা। প্রখর সূর্যদাহে কালো কালো মুখগুলো।

বেলা বাড়ে। রোদ চড়তে থাকে মাথার ওপর। সব কাজ সেরে এবার ফেরাতে হয় মিছিলের মুখ। মিছিলটা সত্যি-সত্যি কোনো মিছিল নয় বলেই গুছিয়ে রাখতে হয় মানুষগুলোকে। সুকুমার বসাকের নির্দেশ। নইলে অযথা লোক ঢুকে পড়বে। মাথা বাড়বে। বাজেট ছাপিয়ে যাবে।

কিন্তু গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশের পর রাস্তায় ভিড় বাড়তে থাকে। মিছিল নিজেই নিজেকে বাড়িয়ে চলল। ঘরদোর কাজকর্মো ফেলে গেরস্ত ঘরের বৌঝিরাও বেরিয়ে এসেছে তামাশা দেখতে। মিছিল তারা আগেও দেখেছে, হরবকৎ দেখে। কিন্তু আওয়াজ নেই ঝাণ্ডা নেই তর্জনগর্জন নেই—এমন মিছিল সত্যি অদ্ভুত!

মিছিলে হাঁটছে যারা, হাসছে তারাও। মিছিলে মিছিলে এর আগে তারা হেঁটেছে অনেক। হরেক পার্টি তাদের নিয়ে যায় কলকাতা। সেখানে মস্ত ময়দান, পিলপিল পিলপিল মানুষের মাথা,রুটি আর গুড়, নেতাবাবুদের বক্তিমে। কিন্তু আজ,। কলকাতা নেই, বক্তিমে নেই, বিনি পয়সার রেলগাড়ি নেই—এ মিছিল সত্যি আজব।

স্কুলবাড়ির দরজায় দলবল নিয়ে সুকুমার বসাক নিজে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গুনে গুনে, চোখে চোখ রেখে ভেতরে ঢোকাবেন। এটা কাঙাল-ভোজন বা দরিদ্র-নারায়ণ সেবা নয়। অযথা প্রেম-বিতরণ অযৌক্তিক।

এবং যখন ভাগ্যবান আর বঞ্চিতের ফারাক তুলে ফটকটা বন্ধ হয়ে গেল, ভেতরে বাইরে সোরগোল। বন্ধ-দরজার এপাশে ভাগ্যহতদের ভিড়ে সেই বুড়িকে খুঁজলেন পরমেশ। বুড়োবুড়ি আছে কয়েকজন। শেত্‌লাবুড়ি নেই। কেন যেন মনে হয়েছিল—থাকতে পারে।

বরং বিপদ! মানুষগুলো ঘিরে ফেলল তাঁকে। কি করে খবর পেয়েছে, মিছিলের লোকগুলোকে লুচি আর খাবার দিচ্ছেন বাবুরা। সুতরাং সমবেত চিৎকারে সকলেই দয়াপ্রার্থী তাঁর। সকলেরই দাবি— 'মিছিলে ছিলাম'। দুজন লেঠেল পুলিশ, হরেন আর সুভদ্র ছুটে এসে উদ্ধার করল। দলবদ্ধ গরিব মানুষ ভয়ঙ্কর। বেকায়দায় চামড়া ছিঁড়ে নেয়।

ক্যাম্পে তখন যথার্থই মহোৎসব। মিছিলটা ভাঙা হয়নি তখনও। লাইনে দাঁড় করিয়ে হাতে-হাতে টাকা ধরিয়ে দিচ্ছে নকড়ি দত্ত, পাশেই কাগজে-কাগজে নাম লিখে টিপসই-এর ছাপ তুলে নিচ্ছেন তারক পণ্ডিত। চেঁচিয়ে যাচ্ছে যুবকরা —'লাইন ভাঙবে না। খাবার নিয়ে বাইরে যাবে না। এখানেই খেতে হবে।'

প্রতিমা আর নন্দিতা খাবারের ঠোঙা তুলে দিচ্ছে সকলের হাতে। আর্টিস্ট টেকনিসিয়ান বা প্রডাকশনের লোকজন কেউ বসে নেই। খাবার পাচ্ছে নকল আকালের মানুষ। সবাই খুশি।

খোলামেলা একটা জায়গায় মোড়ায় বসে, সত্যি যেন অনেক, অনেকদিন পরে একটু জিরোবার অবকাশ পেলেন পরমেশ। ভালো লাগছে ক্যাম্প জুড়ে এত মানুষ, মানুষের উৎসব।

পুরো একটি পরিবার, হয়তো ক্ষেতমজুর, তাঁর পায়ের কাছে বসে ঠোঙায় হাত

ডুবিয়ে লুচি চাটছে। কৃপণের মতো রসিয়ে রসিয়ে দাঁতে চাটা। আলুর-দম তেজে তেজে নোংরা আঙুলের চিমটিতে তুলছে। ফুরিয়ে যাবার ভয়। দাঁত-নেই বুড়োর লালা-জড়ানো জিভে লুচি-চাটাটা দেখলেও-কেমন-গা-ঘুলোয় বলে যখন চোখ ফেরালেন অদূরে, একটা বাচ্চা মেয়ের হাত থেকে খসে পড়েছে একটা লুচি। ধুলো থেকে তুলে দিল তার মা।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পরমেশ ছুটে গেলেন—'এই, এই কী হচ্ছে! দাও ফেলে দাও…'

ব্যস্ত হয়ে ছুটে যাচ্ছিল প্রদীপ। ডাকলেন—'শোনো, বাড়তি দুটো লুচি দিয়ে দাও তো ওকে।'

'এট্টু পেস্যাদ পাব গ বাবু।'

পরমেশ চমকে তাকালেন। তাঁর পাঞ্জাবির কোণ ধরে কাতরভাবে টানছে কেউ। এবং অবাক হলেন, পরান পোড়েলের সেই ছেলে, তাঁরই অভিপ্রায়হেতু যার মুণ্ডিতমস্তক।

'কিরে, কোথায় ছিলি তুই! তুই পাসনি?' আদরে, বাচ্চাটাকে গায়ে লেপটে জড়িয়ে নিলেন ডানহাতে। তাঁর কোমর ছুঁয়ে ওর মাথা—'পেসাদ কে বলল রে তোকে? এটা কি ঠাকুরবাড়ি নাকি?'

'ভুল তো বলেনি কিছু…' কাছাকাছি ছিলেন কিরণময়—'মেট্রোপলিটান বৈকুণ্ঠের এলিট দেবতা। প্রসাদই তো চাইবে বেচারি। যদি ছিটেফোঁটা পায়…'

কিরণময়ের হাসির সঙ্গে পরমেশও অংশীদার—'সত্যি কিরণদা, ছবি করার সময় এমন অদ্ভুত, কুইয়ার সব ঘটনা ঘটে যায়! ভারি মজার…'

বাচ্চাটার জন্য একটা প্যাকেট! ভিড় আর হুল্লোড়ের মধ্যে পরমেশ কাউকে খুঁজছেন যখন, হরেন আওন ছুটে এল—'এস্যে গেচে গ ডেরক্টরবাবু, এস্যে গেচে…'

'কে?'

'উয়ার মা। পরানের বৌ-টা গ…'

দুর্লভ আহারে মত্ত যারা অথবা ইউনিটের লোকজন, কেউ-ই ঠিক ঠাহর পেল না। দেয়ালের ওপাশ থেকে লম্বা ঘোমটা টেনে ভীরু পায়ে এগিয়ে আসছে এক চাষি-বৌ! কাঁখের বাচ্চাটা কাঁদছে। ভিড় কিছুটা হালকা হয়ে এসেছে। অনেক চাষি-বৌই এতক্ষণ ছিল এখানে। এখনও আছে। কারও কাঁখের-বাচ্চা কাঁদতেই পারে।

বিব্রত পরমেশ। হরেনকে প্রশ্ন—'কী চায় ও ?'

'উয়র ছেল্যাটাকে ডাক্তারবাবু জবাব দে' দেচেন গ। উ বাঁচবে নি। আবাগী ছুটে এয়েচে। সুকুমাদ্দা ইখেনে উয়কে চাকরি দিবেন বল্যেছিলেন…'

পরমেশ ভ্রূ কুঁচকোলেন—'হুঁ ডাকো তো সুকুমারদাকে। আর শোনো, প্রতিমা-দিদিমণিকে বলো আমি ডাকছি…'

কাছাকাছিই ছিলেন ওঁরা। প্রতিমাকে বললেন—'ওকে নিয়ে দোতলায় আসুন তো। শোনা যাক, কি বলতে চায়। বাট ডোণ্ট লেট আদার পিপল নো অব ইট্…'

স্কুলবাড়ির অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এলেন। দুপুরের রোদে হতচ্ছাড়া বাগানের আধ মরা গাছগুলো আরো বেশি পুড়ছে। একটা দুরন্ত কাঠবেড়ালী তড়তড়িয়ে উঠে গেল আমগাছটার ডগায়। অন্য মনে, এলোমেলো ভাবনায় দোতলার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে স্নায়ুতে, শিরায় শিরায় টান। শেষপর্যন্ত বৌটা নিজেই এসে পড়ল। কোলের বাচ্চাটা বাঁচবে না। টাকা চাই। চাকরি! গ্রামে এখন চটপট কিছু রোজকার করে নেবার জায়গা বায়োস্কোপ কোম্পানি! আশ্চর্য! কিন্তু ওর গোঁয়ার স্বামীটা। কোথায় যেন লোকটাকে তিনি বড়ো বেশি ভালেবেসে ফেলেছেন।

অসংখ্য মানুষের কলরব হট্টগোল একতলায়। রেলিং ঘেঁষে দেহভার ভেঙে একটা চেয়ারে বসলেন। ঝিমঝিম করছে মাথাটা। সকালের দিকে আজ বেশি কাজ নেই বলে চিত্রনাট্যটা নিয়ে একটু বসবেন ভেবেছিলেন। তারপর নকড়ি দত্ত আর সুকুমারের সঙ্গে কিছু আলোচনা। হলো না কিছুই। নতুন সঙ্কট।

ওপর থেকেই দেখলেন, বাগদী-বৌ কাঁদছে। ওকে দুদিকে ধরে, অসুস্থ রোগীকে অথবা সদ্য-বিধবাকে ঘাট থেকে ঘরে তুলে আনার ঢঙে টেনে টেনে নিয়ে আসছে নন্দিতা আর প্রতিমা। পশ্চাদবর্তী জনতাকে ধমকাচ্ছে সবাই—'কেউ আসবেন না। কিছু হয়নি। আপনারা সরে যান…'

সুতরাং ওরা ওপরে উঠে আসার পর ক্যাচক্যাচ কান্নাকাটি দুঃখুফুখ্যুর প্রতি অকারণ দয়াফয়া নয়, ভারি গলায় প্রশ্ন—'কী হয়েছে তোমার ছেলের ?'

একটা চেষ্টা হলো ওকে বেঞ্চিতে বসাবার। বসানো গেল না। মেঝেতে লেপটে পড়েই হু-হু কান্না—'ছেল্যাটা মর্যে যাচ্চে গ বাবু। উ বাঁচবে নি…'

'সে তো শুনেছি। কিন্তু কী হয়েছে ওর ?'

'জম্মো থিক্যে ত কিছু খায় না গ বাবু। ব্যামোয় ব্যামোয় হাড়মাস একসা।

কাল থিক্যে কের বাহ্নি জলের মতন। হুড় হুড় পায়খ্যানায় রক্ত গ বাবু। ইটুকুন দুধের বাচ্ছা…'

এবং তখনও পরমেশের নিবদ্ধ দৃষ্টি বিঁধছে বৌটাকে। তখনও বিস্ময়—দুবেলা খেতে পায় না, হয়তো বুকেও দুধ নেই, বাচ্চা দুটো মরছে ম্যালনিউট্রিশনে, দেহস্বাস্থ্য বিবর্ণ হয়েও মুখশ্রীতে একটা-কিছু, একটা বিশেষ কিছু। সুন্দর-অসুন্দরের সাধারণ ব্যাকরণের বাইরে। যার সংজ্ঞা নেই।

বসলেন একটা চেয়ারে— 'শোনো, তোমাকে আমরা কাজ দেব বলেছিলাম। এখনও বলছি, দেব। বাচ্চাদের নিয়ে থাকবে, খেতে পাবে, টাকা পাবে …'

ভাসা ভাসা ডাগর চোখ তুলে দুর্গা দয়াময় ঈশ্বরের দিকে তাকাল— 'আমি পাব্ব গ বাবু। আমি সব কাজ জানি। বাসন মাজব, কাপড় কাচব, বৌদিদি-দিদিমণিদের সেবা কব্ব…'

'না, সেসব কাজ নয়। কিন্তু তোমার স্বামী কোথায়?'

'ছেল্যাটার মরণ দেখ্যে কি আর মাথার ঠিক আচে গ উয়র? পাগল হয়্যা শ'রে চল্যে গেল…'

'কেন? শহরে কী?

'ইখেনে গাঁয়ে ত কাজকাম নেই গ। ভগমান উয়র হাতটা নিলেন, এখনে ছেল্যাটাকে টানতে নেগেচেন। বলে শ'রে যে' দেখব একবারটি …'

ডানহাতের তেলোয় সজোরে থুত্‌নি চেপে পরমেশ নিঝুম তখন এবং তখনই, সুকুমারকে এগোতে হয়— 'কাজ তো আমরা দিতে পারি। কিন্তু তোমার স্বামী তো চায় না, তুমি আমাদের কাজ করো।'

'আমি ত কাজই কব্ব গ বাবু। যেমনধারা মাঠে করি, ধান কলে করি, বাবুদের থানে করি। ইখেনে কব্ব। লয়, দুটো নাথি মাব্বে মরদ'। ছেল্যাটা বাঁচবে।'

ভ্রূ-নাচানো চোখের ইশারায় ঝাঁ করে উঠে দাঁড়ালেন পরমেশ। ঢের হয়েছে। আর নয়। তাকালেন হরেনের দিকে—'একে নিয়ে যাও নিচে। খাবারদাবারের ব্যবস্থা করে দাও। আর শোনো, তারকবাবুকে বলো, একটু দুধটুধ ব্যবস্থা করে দিতে…'

সুকুমার বসাককে—'দেখবেন তো, একটা বেবি-ফুড এনে দেবেন ওকে। এ বাচ্চা বাঁচবে কি মরবে, সে তো জানি না। তবু একটা সান্ত্বনা …'

মৃদু ঘাড় নেড়ে সুকুমার বসাক ওদের নিয়ে নিচে নেমে গেলেন। মুখেচোখে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি বিরক্ত। খুবই ক্ষুব্ধ।

এবং ওরা চলে যাবার পর উপস্থিত-সহযোগীদের প্রতি নীরব ঔদাসীন্যে ভারাক্রান্ত পরমেশ যখন মৌন, এবং যখন, কোনো-কিছু না-বলার শিষ্টতায় সংযত সকলেই, আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে এগোলেন কিরণময়।

তাঁবুর দড়ির মতো টান-টান দুটো হাত রেলিং-এর ওপর রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকার পর পরমেশ ঘুরে দাঁড়ালেন, সরাসরি নন্দিতার ওপর চোখ —'কী হলো তোমাদের? এত চুপচাপ।'

যখন প্রশ্রয়ের শীতলতা, নন্দিতা হাসল—'একটা কথা জিজ্ঞেস করব পরমদা?

'বলো?'

'এই মেয়েটাকে আপনি সিলেক্ট করলেন?'

অস্পষ্ট হাসিটা মুখের ভাঁজে ভাসিয়ে রেখে পরমেশ আবার রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন—'ভাবছি।'

'মালতী?'

ভ্রূকুটিতে তীক্ষ্ণ হলেন—'তুমিও এসব বলছ?'

শুধু নন্দিতা নয়, সকলেই থতমত।

'তোমরা কি একসঙ্গে সবাই কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসে আছো। নাকি, অল অব ইউ হ্যাভ ডিসাইডেট টু ডিক্লেয়ার মি কম্‌প্লিটলি ম্যাড…' রেলিং ছেড়ে আবার ঋজুতায় শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন—'তোমরা কি ভাবো, ফিল্‌ম্ ইজ সো চিপ্! যে-কোনো ভাবে যা-খুশি একটা করলেই হলো। মালতীর মতো ওরকম একটা কম্‌প্লিকেটেড চরিত্র, সেখানে গ্রাম থেকে একটা চাষির বৌকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলব—নাও, অভিনয় করো। নিজেরা অভিনয় করো, জানো না। এভাবে কোনো অভিনেত্রী হয় না। অনলি এ স্টুপিড ক্যান প্রসিড লাইক ছ্যাট…'

সর্পভ্রমে রজ্জুকে আঘাত করার আহাম্মকিতে যখন বিব্রত সকলেই, পরমেশ নিজেই এগোলেন। কিছুটা সহজ হতে চাইলেন নিজের তাগিদেই—'আসলে কি জানো। স্ক্রিপ্‌ট একটা তৈরি করতে হয় কাজের সুবিধের জন্যে। একটা ছক ধরে এগোবার সুবিধে। কিন্তু চিত্রনাট্যটাই তো ছবি নয়। ক্যামেরা নিয়ে মাঠে নেমে যাবার পর অনেক নতুন নতুন বিষয় মাথায় এসে যায়। অনেক কিছু ইম্‌প্রভাইজ করতে ইচ্ছে করে। ওরও একটা মজা আছে। দারুণ মজা! মেয়েটাকে দেখার পর থেকেই মগজের মধ্যে খেলছিল ব্যাপারটা। চেষ্টাও তো করেছিলাম ওকে ধরতে। আজ একেবারে বেমক্কা নাগালের মধ্যে…'

গনগনে রোদের মাদুর ছড়ানো ছিল বারান্দায়। রেলিং ঘেঁষে তার কৌণিক

আয়তবর্ণ। পরমেশ একটা সিগারেট তুলে নিলেন। রোদের এলাকা থেকে চেয়ারটাকে পা দিয়ে ঠেললেন ছায়ার দিকে—'সে সময়ে জমিদারের কাছারিবাড়ি এক নতুন ভাগাড়। মেয়ে লুট করছে লম্পট জমিদার—বস্তাপচা হ্যাকনেড গল্প নয়। ও রকম কয়েক হাজার গপ্‌পো আছে ভারতবর্ষের উপন্যাসনাটকসিনেমায়। আমাদের ছবির কাছারিবাড়িতে ঠিকেদার আর কেলো সামন্ত। দুটোই নিউ সোসাল ফেনোমেনা। ঠিকেদার, এ নিউ টাইপ অব আর্বান মিডলম্যান, ইন্‌ফ্লেশনের উড়ো টাকায় যারা কালোবাজার বানাতে শিখল প্রথম, প্রডাক্ট অব গ্রেট ওয়র—যার দায় মেটাতে আজও ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন দেখছি আমরা। তার সাকরেদ কেলো সামন্ত—ব্লেসিং অব গ্রেট ফেমিন। ফিফ্‌টি ফোর-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটা তুলে দিলে, মাত্র এগার বছর আগে জলের দরে দুর্ভিক্ষের জমি কিনে তোমাদের ঘাড়ের ওপর জাঁকিয়ে বসল নতুন এক শ্রেণী—জোতদার। কাছারি-বাড়িতে গিয়ে ওদের খপ্পরে পড়েছে জিন্নতবেগম আর মালতী। তার তো একটা প্রিলুড দরকার...'

এক নাগাড়ে বলে থামলেন অতর্কিতে। স্বপ্নের সঙ্গী চাইছেন। বিশেষত নন্দিতা ও ধ্রুবজ্যোতির দিকে চোখ। চেয়ারটা ছুঁয়ে আছেন, বসছেন না—'আমাদের ছবিতে ঠিকেদাররা প্রথমএল চবণ দুলেব পরিত্যক্ত ঘবে জিন্নতবেগমের দৃশ্যে। কিন্তু আমবা তো আরও আগে ওদের ইনট্রডিউস করিয়ে দিতে পারি। এক জায়গায় আর সব মহাজনদের ছাড়িয়ে বাজিমাৎ কবে নিচ্ছে কেলো সামন্ত। অসহায় এক চাষি-বৌকে খাবারের লোভ দেখিয়ে কাছারিবাড়ির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে লোকটা। উপঢৌকন বাবুদের পায়ে। বাবুরাও খুশি। পুরো গল্পটাই একটা নতুন ডায়মেনশান পেয়ে যায় এতে। জিন্নত আর মালতী যাস্ট দুটো আয়সোলেটেড ঘটনা নয়। ইট ওয়াজ দ্য অর্ডার অব দ্য ডে...'

'শুধু ওই একটি দৃশ্যের জন্যেই এই বাগদী-বৌ?' ধ্রুবজ্যোতি উৎসাহী তখন।

সিগারেটটা অনেকক্ষণ পরে ধরালেন। দেশলাই-এর কাঠিটা ফেলে দিয়ে ব্যস্ততায় পশ্চাদবর্তী জানালায় মনোযোগ—'আরো গোটা কয়েক সায়লেন্ট শট তুলে রাখব কিংবা একটাই। মনে করুন, ভিজুয়েলাইজ করুন—জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়ে। পাথরের মতো শক্ত আর ঠাণ্ডা। ইনোসেন্ট আইজ উইথ্‌ বিটারমোস্ট লুক। বারবার নানা জায়গায় ব্যবহার করে কাছারি-বাড়ির সাজেশন। এর জন্যে কোনো অভিনয় লাগে না ধ্রুব। কান্না সংলাপ কিছুর দরকার নেই। মেয়েটার চোখদুটো দেখেছেন? বিটার্লি চার্মিং...'

দীর্ঘ প্রসারিত বারান্দায় রোদের মাতুর ক্রমশই খাটো হয়ে আসছে রেলিং-এর দিকে। কোনো মেল-এক্সপ্রেস ছুটে যাবার তুরন্ত ধাতব ধ্বনি দূরবর্তী রেললাইনে। শ্রোতৃপক্ষ নির্বাক যদিও, নিজেরই খাঁচায় ডানা-ঝাপটানো অস্থির পরমেশ তুপাশের চুলের গোছ চেপে ধরলেন শক্ত মুঠোয়। খানিকটা আপনমনেই—'সবই তো হলো। আমারটা আমি বুঝে নিলাম। এবার অনুমোদন প্রয়োজন সুকুমার-বাবুর। বৌটার ওই হাত-কাটা গোঁয়ার স্বামীটা তো আবার সইতে পারছে না বায়োস্কোপের লোকদের। ও ব্যাটা সত্যি-সত্যি শহরের ঠিকেদার ভেবে বসে আছে আমাদের…'

গ্রামের মেয়েরা বায়োস্কোপে নামল। হাসিঠাট্টায় সে এক আজব তামাশা। বলা বাহুল্য, সাংগঠনিক দক্ষতায় হরেন আওনই আজ হিরো।

ছবির প্রথমার্ধের একটি দৃশ্য। পুকুরঘাটে মেয়েদের কাছে স্বামীর জন্য সাফাই গাইতে এসেছে শশিবালা। তিন মাস চার মাসের মাসোয়ারা পাঠাচ্ছেন না মহামান্য রাজাবাহাদুর, চাষের মালিক মুরুব্বিমাতব্বররা নিত্যি এসে শাসাচ্ছেন দোরগোড়ায়। ওদিকে থানার দারোগাবাবু তুদিন-একদিন পর-পরই যুদ্ধ সাহেবের 'লুটিশ' জারি করে ডেরা পেটানোর হুকুম পাঠাচ্ছেন চৌকিদারকে। ডেরা পেটানোর দায়ে চৌকিদার স্বজাতির চোখে বিষ।

সুতরাং নানা বয়সের গুটিকয়েক মেয়ে বা বিবাহিতা মহিলার প্রয়োজন ছিল, যারা হাতুই-এর বড়োপুকুরে তালগুড়ি ঘাটে বাসন মাজবে, কাপড় কাচবে, নাইতেও নামবে। অনেক খেটেখুটে গোটা গ্রাম থেকে শেষপর্যন্ত পাঁচজনকে আনতে পেরেছিল হরেন। বন্ধু-যুবকরা একজন। এদের মধ্যে তুজন, এত সেজেগুজে এসেছিল, প্রথমই নাকচ। বাকি চারজনকে নিয়েই কাজ। হরেনের মেয়ে বেচারি অঞ্জলি! বাপের জন্যে ওকে ডুব-জলে নেমে কিছু ঘোলাজল গিলতে হলো এত এত মানুষের সামনে, এই বারবেলায়।

অভিনয়ে যা-বলার বা করার প্রতিমা দাশ একাই করলেন। ওদের তুজন-একজনকে দিয়ে তুটো কথা বলাতে প্রাণান্ত শ্রম। পরমেশ বড়ো বেশি ঠাণ্ডা রেখেছিলেন নিজেকে। বেশ হালকা চালে, পরিহাসরসিক।

তিনবার টেক হলো। শেষপর্যন্ত—'ও. কে. কাট্…'

ক্যাম্প থেকে খাবার এসেছিল ওদের জন্যে—লুচি, মাংস, মাখা-সন্দেশ, কমলালেবু, কলা।

দৃশ্যগ্রহণের দৃশ্যটাই সেখানে মজা।

বিকেলের শিফ্‌টে আরো বেশ কিছুটা কাজ এগোল। সুতরাং সূর্যাস্তে ক্যাম্পে ফেরার পর দেহে ক্লান্তি ছিল। ক্লান্তিটা সংশয়ের। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তেই যখন পূর্বা বা শৈলেন মুখুজ্জের চিঠি প্রত্যাশা করে যাচ্ছেন কিংবা ওদের সশরীর উপস্থিতি,ছেলেরা আরো একবার স্মরণ করিয়ে দিলো—'যান,যান না একবারটি। শুক্লা ভালো মেয়ে। ভালো অভিনয় করে। আপনাদের কলকাতার মতো এত ভালো পাবেন কি করে? দেশপাড়াগাঁয়ের মেয়ে। যেটুকু সুযোগ সুবিধে পেয়েছে। তাছাড়া মানিক চাটুজ্জে যখন হা করে বসে আছেন। লোকটা অবিশ্যি খুব খারাপ।'

তখনও, দ্বিধা নিজের মধ্যেও এবং সেই দ্বিধা থেকেই বেরোলেন সন্ধেবেলা। সঙ্গী হরেন আওন, তৎসহ তিন-ব্যাটারির একটি সুতীক্ষ্ম টর্চ।

বিস্মিত হলেন না। মোটামুটি এ রকমই অনুমান করেছিলেন একটা কিছু। মিলে গেল। মাঝারি একটা পুকুরের ধার ঘেঁষে দীর্ঘ ইটের পাঁচিল। সদর পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই ডানদিকে মেটেঘর একটা দুটো। তার পেছনে, অন্ধকারে বোঝা যায় না ঠিক,অনেক গাছপালা। আশ্বিন মাসের শেষেও পালুই-এ খড়ের পাহাড়। বিস্তীর্ণ উঠোনের বাঁদিকে বড়ো বড়ো তিনটে মরাই। সোজাসুজি, উঠোনের প্রান্তে লম্বা দোতলা বাড়ি। ঘরে বারান্দায় বিজলি বাতি।

করজোর অভ্যর্থনায় গলছেন চাটুজ্জে—'আসুন আসুন, কী থেকে যে কী হয়ে যায়। আপনার মতো একজন মানুষের পায়ের ধুলো পড়বে আমার ঘরে…'

পরমেশ সংযত স্বাভাবিক। ঘর উঠোন দোতলায় রেলিং-এর ফাঁকে-ফাঁকে মহিলাদের উঁকিঝুঁকি পরিহার করে পাকাদালানের একতলায় যে ঘরে উঠে এলেন, ডোরা-কাটা রঙিন সতরঞ্চি ঢাকা একটা তক্তপোশ সেখানে। দুটো চেয়ার। জমকালো নকশা-কাটা পলিথিন-আবৃত টেবিল। ফুলদানিতে গাদাফুল। দেয়ালে রামকৃষ্ণদেব সারদা-মা স্বামীজির বাঁধানো ফটোর পাশে কাশ্মীরের ডাল-লেক ছবিওলা ক্যালেণ্ডারে ফুরফুরে অক্টোবর মাস।

পাখাটা ঘুরছিল মাথার ওপর। পরমেশ বসলেন চেয়ারে। বাতাসটাকে ঠিক মাথায় রেখে। টেবিলে রঙিন অফসেটে মুদ্রিত বাংলা সিনেমা পাক্ষিক। হাতে তুলে নিলেন—'এ বুঝি আপনার মেয়ের? এসব খুব পড়ে?'

"হেঁ হেঁ হেঁ, সে আর বলবেন না। কত কি যে পড়ে দিনরাত্তির। আপনাদের সব খবর রাখে…'

তক্তপোশে বসেছেন চাটুজ্জে। হাত নেড়েচেড়ে গলাটা কিঞ্চিৎ নামিয়ে এনে—"নিজের মেয়ে বলে বলচিনে দাদা। গাঁয়ে ত আরো দু পাঁচটা ঘরে মেয়েরা কলেজের পাশ দিয়েচে। এ বাড়িতেও ত ওর বয়েসী মেয়েরা রয়েচে। বড়দার মেয়ে, ভাই-এর মেয়ে, জ্ঞাতিকুটুমদের ঘরের মেয়েরা সব। কেউ কিছু না। বুঝলেন, সব বোকাহাবা। আপনাদের মতো ভদ্দরলোকদের সঙ্গে যে দুটো কতা কইবে, এমন ক্ষ্যামতা নেই। গাঁয়ের আর দশজনকে জিজ্ঞেস করুন। এই ত হরেন রয়েচে, গাঁয়েরই ছেলে। বলুক না, বলুক। কি র‍্যা হরেন…'

বেচারি হরেন! ডেরক্টরবাবুর মাথায় ছাতা ধরে কি চামর বুলোতে বুলোতে বামুনবাড়ির অন্দরমহল পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে। চেয়ার বা তক্তপোশ অবদি এগোবার সাহস নেই। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সহসা সচল হলো—"অঁ, সি ত একশবার গ। শুক্কার মতন মে' হয় না। রূপেগুণে নক্ষী। সি কতাই ত বলছেলম কেস্পে সব্বায়কে। থ্যাটারে পাট বলে, গান গায়, আবার ইশ্‌কুলেরও পাশ দেয়…'

ঘরের ভেতর ভিড় বাড়ছে। ওদিকে দরজার পাশে হরেনের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে ছিল তিন জন বয়স্ক যুবক। অন্তঃপুর থেকে হাঁটু-ধুতি আর ধবধবে গেঞ্জি গায়ে মেদ-থলথল একজন অনতিবৃদ্ধ প্রৌঢ়ের প্রবেশ। পরিচয় করিয়ে দিলেন না কেউ। হরেনের পদধুলি কুড়োবার ধরণধারণেই বোঝা যায়, এ বাড়িরই কর্তা কেউ। হয়তো চাটুজ্জেরই বড়ো ভাই।

কুতকুতে আর অসম্ভব ধূর্ত চোখের বৃদ্ধ তাকিয়ে রইলেন। যেন, পৃথিবীর কোনো সন্দেহজনক আজব ব্যক্তি তার গৃহে।

'আমার আবার, বুঝলেন দাদা, সেই ছোট্টবেলা থেকেই খুব গানবাজনার থিয়ে-টারের শখ…' তক্তপোশের ওপর দুটো হাঁটু তুলে পদ্মাসনে বসেছেন মানিক চাটুজ্জে—'তা ঘরসংসার, দশরকমের কাজকম্মো করে ত কিছুই হলনি জেবনে। তাই ভাবচি, মেয়েটার জন্যি…এত্ত বড় এট্টা সুযোগও এসে গেল। আপনারা গাঁয়ে এয়েচেন, হিল্লিদিল্লি কোথাও যেতে হচ্চে নি যখন, দেখুক না দশটা গাঁয়ের লোক। মুখুজ্জেবাড়ির মেয়ে। তার জেল্লাই আলাদা…'

এবং কথাগুলো ফুরোবার আগেই সচকিত পরমেশ। রাগী চেহারার বুড়ো ভদ্রলোক কিছুই বললেন না যদিও, কটকটে চোখে একবার মানিক চাটুজ্জের

দিকে তাকিয়ে এবং ঘাড় ফিরিয়ে আগন্তুক অতিথিকে বিদ্ধ করতে করতে এপাশ থেকে ওপাশের দরজায় বেরিয়ে গেলেন।

পরমেশ সিগারেট ধরালেন। আশ্চর্য! একটা আসট্রে-গোছের কিছুই নেই এদিক ওদিক। নেভানো কাঠিটা সরাসরি মেঝেয় না ফেলে, হাতে রেখেই নিস্পৃহতায়—'একটা কথা মানিকবাবু ··'

'আজ্ঞে।'

'আপনি যে আমাকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছেন, অর্থাৎ যে-কারণে আমি আপনার বাড়িতে এসেছি, আপনাদের পরিবারের সবাই জানেন তো! আলোচনা করেছেন সকলের সঙ্গে ?'

'ওসবে গুলি মারুন দাদা। ওতে কান দেবেন না···' চাটুজ্জে ভ্রূক্ষেপহীন—'গাঁয়ে থেকে চাষাবাদ ছাড়া আর ত জানল না কিছু। সক্কাল থেকেই ত কত্তো কত্তা সংসারে। অশান্তি। আরে বাবা, বললেই ত হবে না। দিনকাল পাল্টাচ্চে। কত্তো মডান হচ্চে মেয়েরা···'

অস্বস্তি এবার। মনে মনে হিশেব করছেন পরমেশ—কী চায় লোকটা! নড়েচড়ে উঠলেন।

পাট-ভাঙা শাড়িতে সেজেগুজে ঘরে ঢুকল একটি মেয়ে। এক হাতে প্লেটে-সাজানো মাথা-সন্দেশ, অন্য হাতে কাচের-গ্লাশে জল। দরজার আড়াল থেকে কে যেন বাড়িয়ে দিলেন চায়ের-কাপ। শাঁখানোয়ার হাত। হরেনের জন্য লাল প্লাস্টিকের বাটি। হয়তো সন্দেশ। টেবিলের ওপর আতিথেয়তা সাজিয়ে রেখে মেয়েটি দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। আদৌ অপ্রতিভ গ্রাম্যতা নেই। বাঁ কাঁধের আঁচল ডানে টেনে স্মার্ট হবার ভঙ্গি।

'কী নাম তোমার ?'

'শুক্লা চাটার্জি।'

'চাটার্জি কেন ? চাটুজ্জে জানি। চাটার্জি বলে তো কোনো কুলোপাধি কস্মিনকালে ছিল না আমাদের।'

ভ্যাবাচাকা মেয়েটি করুণভাবে বাপের দিকে তাকাল। মানিক চাটুজ্জের কাছেও দুর্বোধ্য প্রসঙ্গ—'কেন দাদা, বাপঠাকুদ্দার আমল থেকে চলে আসছে সাবেকি নেয়ম···'

'ঠাকুদ্দা নয়, বাপের আমল থেকে। ওর ঠাকুদ্দার আমল···' উপায় নেই। সিগারেটের ছাইটা পরমেশ মাটিতেই ফেললেন—'ওটা ইংরেজরা বানিয়েছিল।

আমাদেরও সাহেব হবার সাধ। বর্ধমান বার্ডোয়ান হলো, বালেশ্বর ব্যালাশোর…'

বাপ আর মেয়ের চোখজোড়া গ্রীষ্মদাহে ভাসমান শিমুলতুলোর মে । মাটি চায়। অর্থ কী এসব কথার!

এবং তীক্ষ্ণ নিরীক্ষণে মেয়েটিকে দেখছিলেন পরমেশ। হয়তো কনে-দেখার:চেয়ে কিছুটা বেশি অশালীনতায়। চোখ ফেরালেন। বরং কৌতুকই শ্রেয়—'আমরা যে এতগুলো লোক তোমাদের গাঁয়ে এসে হৈচৈ বাধিয়ে তুলেছি, তুমি দেখেছ সেসব ?'

'হ্যাঁ, গেছি অনেকদিন…' মেয়েটি হঠাৎ উচ্ছল—'একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?'

'বলো।'

'আপনি উত্তমকুমারকে দেখেছেন ?'

পরমেশ নাড়া খেলেন। প্রশ্রয়ের ঔদার্যটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে একটু। অথচ আলগাভাবেই রাখলেন নিজেকে—'দেখেছি।'

'খুব কাছাকাছি ?'

'তুমি যতটুকু কাছে।'

'অমিতাভ বচ্চন! হেমা মালিনী ?'

'ওঁরা তো হিন্দী ছবিতে কাজ করেন। আমরা বাংলা ছবির লোক।'

'আপনার বই-এ বড় আর্টিস্টদের নেন না কেন আপনি ?'

'তুমিই তো আমার আর্টিস্ট…'

মেয়েটি খুশি। সর্বাঙ্গে ঢেউ খেলিয়ে হাসতে হাসতে তাকাল বাবার দিকে। খোদ ডিরেক্টরবাবুর মুখে শেষ-বাক্যি শুনে সাফল্যের ভবপুর আনন্দে হাঁটুতে হাত বুলোতে বুলোতে উঠে দাঁড়িয়েছেন মানিক চাটুজ্জে—'এ ত আর গাঁয়ের থিয়েটার নয় র‍্যা! এক রাত্তিরের জন্যি লাফঝাঁপ, ব্যস, ফুরিয়ে গেল। এ হল সিনিমা। এখানে পাট বলবি, দেশে দেশে ছড়িয়ে যাবে। দেখবে দশজনে। নিজেই বসে থেকে দেখবি নিজের মুখ—'

বিচলিতবোধে, পরমেশ এবার উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে—'আপনি বোধ হয় একটা ভুল করছেন মানিকবাবু…'

'কেন ?'

'আমার অবশ্য বলার কথা নয় এসব। কিন্তু আমাদেরও তো ভেবে দেখতে হয় সবদিক।'

বাপ-মেয়ে দুজনই থিতিয়ে এসেছে। ভরাট চোখে ব্যাকুলতা।

ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে যারা, হরেনের পার্শ্ববর্তী মানুষগুলোর দিকে তাকালেন পরমেশ—'এই যে একটু আগে এসেছিলেন, চলে গেলেন, কে হন আপনার?'

'দাদা...'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম...' পরমেশ গাঢ় গাম্ভীর্যে—'যে চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে আমরা একজন অভিনেত্রী খুঁজছি, সেখানে কি আপনিও আপনার মেয়েকে ছাড়বেন?'

'কেনে! এ আবার কী বলচেন?'

সরাসরি মেয়েটির দিকে তাকালেন পরমেশ—'ভীষণ একটা দুর্ভিক্ষ হয়েছিল আমাদের দেশে। পঞ্চাশের মন্বন্তর। নাম শুনেছ তো! তুমি তো দূরের কথা, তোমার দাদাদিদিরাও জন্মায়নি অনেকে। বাপজ্যাঠামশাইদের জিজ্ঞেস করো, হয়তো কিছু কিছু মনে আছে তাঁদের...'

'সে আর থাকবেনি! খুব মনে আছে...' ওদিক থেকে মানিক চাটুজ্জে—'সে কি এমনধারা গাঁ দাদা। শুধু জঙ্গল ম্যালেরা শেয়াল আর ঘুটঘুটি আঁধার। গাঁয়ে আর মানুষ ছেল নি। বাপকাকাদের কাছে শুনেচি—কারও পৌষমাস, কারও সব্বোনাশ...'

'এগ্‌জাকট্‌লি। ঠিক এ কথাটাই আমাদের ছবিতে বলতে চাইছি আমরা...' পরমেশ তাঁর রাশভারি ভঙ্গিতে—'কৃষিব্যবস্থায় যারা ধনী হয়, দুর্ভিক্ষের জমি লুটে যারা বিস্তর জমিজমার মালিক হয়েছে, তারা তো শুধু ভাতকাপড়েই গরিবকে মারে না মানিকবাবু, অভাবের সুযোগে ওদের ঘরের যুবতী বৌ কি মেয়ে কেউ বাদ যায় না। ওদের নিয়েও ধনী কৃষকের ফুর্তি...'

'কী! কী বলচেন আপনি? অ্যাঁ এসব কতা...'

'এসব কথা বলার জন্যেই আমাদের ছবি।'

বিস্ময়ের চোখজোড়ায় পলক ফেলতে পারছেন না চাটুজ্জে—'আর আমার মেয়েকে কোন্ পাট দেবেন?'

'দেব কিনা ঠিক করিনি। যে চরিত্রের জন্যে আমরা অভিনেত্রী খুঁজছি, সে ওই মেয়ে—মালতী। বাঁশ আর বাবলাকাঁটা সাপ্লাই করবে বলে কন্ট্রাকটাররা এসেছিল গ্রামে। ওরাই একদিন অসহায় মেয়েটাকে...'

'দাঁড়ান দাঁড়ান। থামুন...' মানিক চাটুজ্জে কিছুটা বিহ্বল এবং পরমুহূর্তেই তাকালেন মেয়ের দিকে— 'তুই যা, যা ভেতরে ..'

মুখে আঁচল-চাপা সেই মেয়ে ভীরু পায়ে পিছোল। যেতে-যেতে ফিরে-ফিরে পেছনে চোখ।

প্রথম ধাক্কায় দিশেহারা চাটুজ্জে কথা বলতেই পারছিলেন না তেমন, তারপরই আস্তে আস্তে— 'অ্যাঁ! কী সব বলচেন মশাই! সুধন্যদা, নিধি দেওয়ানরা ত মিছিমিছি বলচে নি—আজেবাজে যত্তো নোংরা আর মিথ্যে কতা মশাই আপনাদের। হয় না মশাই, দেশপাড়াগাঁয়ে ওসব হয় না। ওসব কেচ্ছা আপনাদের শ'রে—কার বাড়ির বৌকে কে বিষ খাইয়ে মারল, কোথায় কোন্ হোটেলে মেয়েমানুষ খুন…'

'শহরে তো হয়ই। হবে…' শিরদাঁড়ায় সোজা থেকে পরমেশও শান্ত, যেন নিজেকে বরফজলে ভিজিয়ে রাখার কঠিন প্রয়াসে— 'গ্রামকে-গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে হরিজন-হত্যা, ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে ক্ষেতমজুর খুন, মেয়েদের ওপর অত্যাচার। কাগজ পড়েন না? দেখেন না কাগজে…'

'থাক মশাই থাক। আপনাদের সঙ্গে তক্‌কোয় পারবে কোন্ শালা…' চাটুজ্জের চোখজোড়া ক্রমশই জটিলতর। শরীর ফুঁসছে— 'ওই ত, আপনার এক নম্বরী চামচা হরেনকে নিয়ে এয়েচেন। জিজ্ঞেস করুন না, করুন—এ তল্লাটে হয়েচে এসব। সাতজন্মে কেউ শুনেচে কোনো কালে?'

অতর্কিতে আক্রান্ত হরেন যখন হদিশই পাচ্ছে না—হঠাৎ কেন এমনটা হয়ে গেল! কেন ডেরকটরবাবুকে এমনধারা অপমান, ধীরপায়ে দরজার দিকে এগোলেন পরমেশ। বেঘোরে সন্ধেটা গেল এবং তাঁর এই মুহূর্তের ক্রোধটা যে কার ওপর, বুঝতে না পেরে থমকে দাঁড়ালেন একটু — 'এখানে হয় না মানিক-বাবু, কিন্তু অন্য কোথাও হয়। ভারতবর্ষে হয়। আকালই বলুন আর সবুজ বিপ্লবই বলুন, ব্যাপার তো একই। বাড়তি উৎপাদন হোক, সোনা ফলুক, সে তো সবাই চায়। কিন্তু তার জন্যে যদি গরিব মানুষদের মরতে হয়, নারীদের দাম দিতে হয়…'

'রাখুন, রাখুন তো মশাই, সবতাতেই লম্বা লম্বা বাৎ আপনাদের…' চাটুজ্জে এবার রীতিমতো বেসামাল— 'বেলাল্লাপনার বই করবেন। তার জন্যি গোটা গাঁয়ে হুজ্জুতি বাঁধিয়ে হুলুস্থুল কচ্চেন। এখনে ফের ঘরে ঘরে গিয়ে ভদ্দর গেরস্ত ঘরের মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্চেন বেশ্যা মাগীর পাট দেবেন বলে! কেনে, কী দোষ করেচে আমাদের মেয়েরা? ওদের বে-থা নেই? এজ্জৎ নেই ওদের?'

'কেন এসব বলচেন ? আমি তো নিজে থেকে আসি নি মানিকবাবু। আপনিই আসতে বলেছিলেন…'

'থাক থাক, ঢের হয়েচে। এবার আসুন ত মশাই…'

পরমেশ বেরিয়ে এলেন। দরজার বাইরে আবার সেই চাটুজ্জের দাদা। বদখত লোকটা। ঘর পেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই, ভয়ে বা কৌতূহলে আড়ি পেতে ছিলেন যারা, বৌ বা মেয়েরা, দূরে দূরে সরে সরে গেলেন।

এবং দীর্ঘ উঠোন ডিঙোবার নির্জনে আশাভঙ্গের বেদনায়, যেন কপাল চাপড়ানোর আপশোসে মলিন চাটুজ্জে— 'দুদিন ধরে ঘরের লোকদের সঙ্গে এক্ত লড়চি মশাই মেয়েটার জন্যি। সিনিমায় নামতে মত দেবে না কেউ। দেখুন দেখি, কী করলেন! এখনে মুখ দেখাই কোথা? বাপ হয়ে মেয়েটাকে এমনধারা বেশ্যা বানাতে গিছলুম…'

পরমেশ শান্ত, ভীষণভাবে নিরুত্তেজ। রাস্তায় নেমে, যেখানে বিজয়া-দশমীর পর ভরাট জ্যোৎস্নায় ছায়া-ছায়া ত্রয়োদশীর গ্রাম, দ্রুত কোজাগরীর দিকে এগোচ্ছে চাঁদ, সন্ধে-গড়ানো প্রথম প্রহরেই নিষ্পাপ-শিশুর-ঘুম সাড়াশব্দহীন নৈঃশব্দ্যে পুকুরের ঘোলা জলে আকাশ দেখলেন পরমেশ, যখন আর সাধ নেই জিরাফের মতো ঘাড় উঁচিয়ে সত্যিকারের চাঁদ দেখার।

পশ্চাদবর্তী হরেন নিতান্তই গৃহপোষ্য শশক।

নিষ্প্রয়োজনের টর্চটাও হাতের মুঠোয় অন্ধ। প্লাবিত জ্যোৎস্নায় দুপাশের গৃহস্থ বাড়ির মধ্যবর্তী কাঁচা রাস্তা ডিঙিয়ে, বাঁদিকের ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে কিছুটা ঢালুতে নামলেই নির্জন বাঁশঝাড়ে কাগজ কুঁচির মতো ছড়ানো চাঁদনি-আলো অন্ধকারের রঙে মোহময়। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোলেন পরমেশ। মস্তিষ্কের কোষে কোষে আকুপাংচারের সূঁচ। পথপ্রদর্শনের হরেনও বাতিল হয়ে গেল।

শুকনো বাঁশপাতার খশখশ খশখশ পায়ের তলায়। ইতস্তত জোনাকি! চাটুজ্জে বাড়ির অভিজ্ঞতার পর স্নায়ুতে স্নায়ুতে ভাবনাটা আরো ঘনীভূত হতে থাকে। আরতিকে নিয়ে কোনো দৃশ্যই তোলা হয় নি এখনও। সঙ্কটের মধ্যে মস্ত একটা ফাঁক রয়ে গেছে। সেটাই সুবিধে। নতুন ভাবে, একেবারে খোলনলচে পাল্টে ভাবতে পারছেন একটা কিছু। মালতীর বাপ অযোধ্যা নন্দীর ঘর হিশেবে নির্বাচিত মোহনপুরের দেওয়ানপাড়া এখনও কোনো ভাবে ক্যামেরায় ধৃত নয়।

পুরোপুরি অনুদ্ঘাটিত একটি এলাকা। যদি সেই ঘর মোহনপুর বা হাতুই-এ না হয়ে অন্য কোথাও হয়! অন্য কোনো গ্রামে! শহরগুলো আলাদা তাদের নিজস্ব চেহারায়। অসংখ্য রূপান্তরেও গ্রামের ছবি তো সর্বত্রই এক প্রকৃতির নিজস্ব বিধানে।

তাছাড়া, যেন একটা দুরূহ জটিল অঙ্কের সন্তোষজনক উত্তরে পৌছে যাবার সুখ। মগজটা খোলতাই হতে থাকে··· চিত্রনাট্য যেভাবে প্রস্তুত, মালতী মূল কাহিনীর কোনো ঘরে বা আঙ্গিনায় বা অন্য কোনো দৃশ্যপটে নেই। তার সবটাই পথে পথে। নতুন অভিনেত্রী খুঁজে এবং মালতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিনেত্রী-অভিনেতাদের নিয়ে যদি অল্প কদিনের সংক্ষিপ্ত একটা ক্যাম্প করা যায় কোথাও! অন্য কোনো গ্রামে!

একমাত্র কাছারিবাড়ির শটটা! কিন্তু কাছারিবাড়ির দৃশ্যেও মালতী নেই চিত্রনাট্যের কোথাও। শুধু সাবিত্রী যে রাতে নিজেকে বিকিয়ে এল, খিড়কির দুয়ারে তার প্রবেশ, বড়ো ফটকে প্রস্থান। মালতী সঙ্গে থাকবে। কিন্তু সেটাও অনায়াসে ব্যবস্থা করা যায়। অন্যভাবে।

বাঁশঝাড় ডিঙিয়ে এসে মাঝের-পাড়ার প্রাচীন মন্দিরটার গা ঘেঁষে পঞ্চায়েতের চওড়া সড়কে উঠে আসার পর, নিজের কুঞ্চন থেকে শামুক যেভাবে নিজেকে ছড়ায়, জনহীন ভরাট জ্যোৎস্নায় নিজেকে অদ্ভুত হালকা মনে হলো।

চাটুজ্জেবাড়ির ঘটনাটা বড়ো খিঁচিয়ে দিয়েছে মেজাজটা। একটা অর্থহীন অকারণ বোকামি।

উল্টোদিক থেকে দুজন মানুষ মুখোমুখি পাশ কেটে গেল। ডিরেক্টরকে রাস্তায় একা পেয়েও ফালতু প্রলাপে থমকে দাঁড়াল না—মধ্যবিত্ত কেউ নয় নির্ঘাৎ।

পরমেশ পেছন ফিরে তাকালেন—'তোমার তো বড়ো ঝামেলা হয়ে গেল হরেন···'

সাহস ছিল না পাশাপাশি হাঁটার। দুকদম পেছন থেকে হরেন প্রশ্রয়ে ছুটে এল—'কিছু বলচেন গ ডেরক্টরবাবু?'

'আমরা তো তোমাদের গ্রামে চিরকাল থাকব না। কাজ ফুরলেই চলে যাব। অথচ তারপরও তুমি থাকবে, তোমার গ্রাম থাকবে, তোমার ঘরসংসার তোমার মেয়েরা, তোমার বৌ। শুধু-শুধু কেন আর আমাদের জন্যে তোমার নিজের দুর্ভোগ বাড়াচ্ছ?'

হরেন বিহ্বল। কেন এসব কথা?

'কাল থেকে তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও...'

হরেন কেঁপে উঠল। সজল চোখজোড়ায় আর্ত আকুতি—'আমাকে, আমাকে তাইড়্যে দেচ্চেন গ ডেরক্টরবাবু?'

পরমেশ থমকে দাঁড়ালেন। হাত রাখলেন কাঁধে—'ছিঃ ছিঃ, তুমি আমাদের এত ভালো, এমন একজন সৎ বন্ধু। তুমি আসবে, আমরা যে কদিন আছি, রোজই আসবে। সকালে বিকেলে যখন তোমার কাজ থাকবে না হাতে।'

চাঁদনি আলোয় দুটো ছায়া পাশাপাশি মাটিতে হামা দেয়। খোঁচা খোঁচা দাড়ির গালে হাত বুলিয়ে হরেন আরো করুণ হয়ে ওঠে—'পালাগান আমার রক্তে গ ডেরক্টরবাবু। ইয়র জন্যি জেবনভর কত্ত দুঃখু সয়েচি। মুখ্যমানুষ। গাঁয়ের দশজনাকে ত বোঝাতি পারিনে সি কতা। পাগলা-হরা ডাকে, ঠাট্টামশকরা করে। আপুনেরা এলেন গাঁয়ে। ভাবলম, আমার তরে ভগমান পাইঠ্যে দেচেন আপনেকে। পালাগানের কদর ইবারে বুঝবে মুখ্যুগুলা...'

তেঁতুলতলায়, বনস্পতির বিস্তীর্ণ ছায়ায় দুজনের সংলগ্ন ছায়াও একাকার মিশে যায়। টর্চ জ্বলে ওঠে পরমেশের হাতে। নীরব শ্রবণে

'এট্টা কতা শুধোব গ ডেরক্টরবাবু?'

'বলো।'

'শিবতুল্যি মানুষ গ আপুনি। এত্ত আপনার জ্ঞান গ, এত্ত জানেন শোনেন। এমনধারা এট্টা পালা বেঁধেচেন সিনিমার জন্যি! আপুনি কেনে বোঝাতি পাচ্চেন নি গ গাঁয়ের মুখ্যুগুলাকে? ভোটের বাবুদের চাইতেও এমনধারা সোন্দর কতা বলেন। কিন্তুক শুনচেনি মানচেনি কেউ আপনেকে...'

আকাশমাটির উদাস শূন্যতায় থমকে দাঁড়িয়ে, যেন নেহাৎ-ই অকারণ, পরমেশ টর্চের আলো ফেললেন মাটিতে। নিজেরই ছায়ায়। এবং চকিতে নাড়া খেয়ে, হরেনের পিঠ চাপড়ে সহাস্যে—'চলো চলো, রাত হলো। আরো তো কাজ আছে আমার...'

'বামুনবাড়িতে আজ বড় অপমানটা হল গ আপুনার। আমার বুকটা ফেটে যাচ্চে গ ডেরক্টরবাবু। অমন বেআক্কেল মানুষগুলা...'

সুতরাং সেদিন অনেক রাত অবদি আলো জ্বলল ঘরে। ফার্স্ট-অ্যাসিস্টান্ট দীপককে নিয়ে বসলেন পরমেশ—'মনে করো, মালতী বলে কোনো চরিত্র

নেই আমাদের। অভিনেত্রী থাকা না-থাকার ঝামেলাও নেই আজ থেকে…'

'তাহলে!' সবিস্ময়ে তাকাল দীপক।

'ভাবনাটা আমার। কন্‌টিনিউটি সিট আর খাতাটা নিয়ে শট-ডিভিশনগুলো হিশেব করো। মালতীকে বাদ দিয়ে আর বাকি শটগুলো শেষ করে ফেলতে হবে কদিনের মধ্যে। উই মাস্ট প্যাক-আপ ফাইভ অর সিক্স ডেজ বিফোর দ্য সিডিউল ‥'

অথচ চিত্রনাট্যে যে মালতী তার অপরিহার্যতায় এখনও অম্লান, সে থাকছে। থাকবেই। পরিকল্পনার ছকটা আস্তে আস্তে, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে ব্যাখ্যা করলেন সহযোগীকে। দীপক বুঝল কিনা বোঝা গেল না যদিও, মেনে নিলো। অনন্যোপায় সে, কাগজপত্তর নিয়ে রাত জাগে ডিরেক্টরের ঘরে। কোজাগরীর সঙ্গী পরমদা স্বয়ং।

ওধারে ঘুম ছিল না কিরণময়ের চোখে। একই ঘরে দুজন লোক এভাবে আলো জ্বেলে কথা বললে ঘুমোনো যায় না। লুঙ্গির গিঁট বাঁধতে বাঁধতে বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন—'কিন্তু তোমার দুর্গা থাকছে তো? সেই বাগদী বৌটা!'

'অব কোর্স। সি উইল অ্যাড এ নিউ ডায়মেনশন টু দ্য স্টোরি…'

'আর তোমার ওই বাগদীবুড়ি! যাকে খুঁজছিলে।'

'সে তো পাওয়াই যাচ্ছে না…' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন পরমেশ— 'এ-ও কি একটা অদ্ভুত ব্যাপার বলুন তো! আমি তো মানেই খুঁজে পাচ্ছি না কোনো…'

'কেন?'

'এত এফিসিয়েন্ট প্রডাকশন কন্ট্রোলার! কাল যদি বলি, একটা অ্যাটমিক এক্‌স্‌প্লোশানের শট আছে সুকুমারবাবু, দেখবেন দিনকয়েকের মধ্যে তারও একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছেন ভদ্রলোক। অথচ একটা বুড়িকে ধরেবেঁধে নিয়ে আসতে পারছেন না ক্যাম্পে। মাঝে মাঝেই নাকি ওকে দেখা যায় এখানে ওখানে। কিন্তু পাখি তো নয়। থুথ্‌থুরে কুঁজো বুড়ি, লাঠি নিয়ে চলে। পালাবে কোথায়?'

'ভিখিরি তো…' হাসলেন কিরণময়— 'একে গরিব, তায় ভিক্ষে করে খায়।'

'তাতে কি হলো?'

'ও শালা ভিখিরি জাতটাই এমন। যেখানে মর্যাদার দান, সচরাচর বড়ো একটা পা বাড়ায় না সেদিকে। চিনতেই পারে না। মুখ্যু তো…'

ঘর ভরে অন্ধকারের তলায় টেবিল-লাইট জ্বলছিল। নিজের কাজে নিবিষ্ট দীপক। দুঃসহ স্নায়ুভারে পরমেশ বারান্দার দিকে এগোলেন। কদিন ধরেই একটানা টেনশনের চাপে অসহ্য রাত। সব কিছু সহজভাবে চললেও বিনিদ্র রাতের প্রহর। তখন ট্র্যাঙ্কুইলাইজার। -

বাইরে ভরাট জ্যোৎস্না। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হিমও কিঞ্চিৎ। মায়াময় নিসর্গের মগ্নতায় বরং নিজেকে যখন হালকা লাগছে একটু, উর্ধ্বে তাকালেন। পাতলা রুমালের আদলে একটা মেঘ আস্তে আস্তে ঢেকে দিচ্ছে ত্রয়োদশীর চাঁদ। অনেকটা বাউন্সবোর্ডের আবরণে সোলারের আলোর তীব্রতা থিতিয়ে দেবার মতো।

'কী! ঘুমোবে না? কাল ভোরেই তো আবার কাজ।'

পরমেশ নাড়া খেলেন—'ন্‌নাহ, আপনি যান। শুয়ে পড়ুন। আরো একটু কাজ আছে আমাদের…'

বিড়ি ধরিয়েছেন কিরণময়। ঘুম-ঘুম শরীরে চোয়াল ভেঙে মস্ত একটা হাই। মানিক চাটুজ্জের ঘরে সন্ধেবেলা যা ঘটেছে, সবই শুনেছেন হরেনের কাছে। মিতবাক সুকুমার বসাক নীরব ছিলেন যদিও, ভ্রূকুটিতে একরাশ বিরক্তি বড়ো বেশি স্পষ্ট ছিল।

'আচ্ছা কিরণদা, ভাবতে পারেন, ফ্যান্টাসি থেকে উঠে এসে অচেনা, কম্‌প্লিট্‌লি আন্‌নোন মানুষগুলো হঠাৎ আপনার ঘাড়ের ওপর! আর আপনি সেই ক্রুড রিয়েলিটির মুখোমুখি…'

'যদি বলো—আন্‌নোন্, আমি আমার গপ্‌পোটা নিয়ে আরেকবার ভাবতাম। নির্ঘাৎ গণ্ডগোল আছে কোথাও।'

'কেন?'

'যদি বলো তোমার ছবির কথা, বলব—মানিক চাটুজ্জে সুধন্য কুণ্ডুরা কখনওই তোমার তারুঠাকুর কেলো কোনার নয়। সাঁয়ত্রিশ বছর ধরে এক চেহারায় একই ভাবে থাকে না মানুষ। টিপোলজির দিক থেকেই ওরা ভিন্ন আদলে অন্য মানুষ…'

'অ্যাণ্ড দ্যাট আনইম্পেয়ার্ড কন্‌টিন্যুটি অব এক্‌সপ্লয়টেশন?' কিছুটা ক্ষিপ্রতায় রেলিং ছেড়ে সরে এলেন পরমেশ।

'তারও চেহারা বদলেছে। চরিত্তির আলাদা…' কার্নিশ ভেঙে কৌণিক জ্যোৎস্না

বারান্দায়। আবক্ষ অন্ধকারের অস্পষ্টতায়, দুজনেরই নিম্ন অর্ধাংশ চাঁদনি আলোয়। নিচের খাদে গলাকে খাটো করে এনে কিরণময় জ্যেষ্ঠের হৃদ্যতায়—
‘তোমার অর্জুনও কি আজ ওভাবে না-খেয়েনা-খেয়ে কাৎরে কাৎরে মরবে পরম ? দুর্ভিক্ষ হয় কোথাও ?’
‘হ্যাঁ, ওটা বাংলার মাস্টারমশাইরা স্কুলের বাচ্চাগুলোকে শেখায়। ভিক্ষার অভাব —দুর্ভিক্ষ। অব্যয়ীভাব সমাস। ভিক্ষেকে বাঁচিয়ে রাখো, দুর্ভিক্ষ থাকবে না। দেশের কোটি কোটি লোককে ভিখিরি বানিয়ে কিছু ধড়িবাজ টাকা লুটছে দুহাতে…’
‘ঠিক। কিন্তু তোমরাও তো গত চৌদ্দ পনের বছরে কোনো খাদ্য-আন্দোলন গড়তে পারছ না হে। ভুখামিছিল আর হয় না কলকাতায়…’
টেনশানের তীব্রতায় পকেটে হাত। চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন পরমেশ।
‘বারোমাসী ধানের ফলন। চাটুজ্জে-কুণ্ডুদের যেমন বাড়তি উৎপাদনের আয়, চাষিদেরও বছর ভরে মাঠের কাজ। দুবেলা দুমুঠো ভাত আর বছরে একটা-কি-দুটো মোটা কাপড় ছাড়া যাদের আর কোনো প্রার্থনা নেই জীবনে, বোঝাতে পেরেছ তাদের—তোমরা এখনও গরিব। মানুষের বেঁচে-থাকাটার আরো বড়ো অর্থ আছে। কে বোঝাবে ?’
‘কি বলতে চাইছেন আপনি ?’
‘বলছি, দেশগাঁয়ের অবস্থাটা এখন চারপাশ থেকে বড্ডো জটিল। আগের গ্রাম তো আর নেই। মানিক চাটুজ্জেকে দোষ দিয়ে লাভ নেই খামোকা…’
‘মানে! ওদের চেহারাগুলো আজ দেখেছেন আপনি ?’
‘দেখার দরকার নেই…’ শান্ত কিরণময়—‘গরিবরা গরিব, ধনীরা ধনী—এই লজিকে গোটা গাঁয়ের ওপর দাবড়ে বেড়িয়েছে বাপঠাকুদ্দা। ওটা একটা সিস্টেম। ওই সিস্টেমের মধ্যে বড়ো হয়েছে লোকটা। আশা বেচারি, গাঁয়ের আর সকলের কাছে মেয়েকে প্রতিভাময়ী করতে গিয়ে কী ফ্যাসাদেই না পড়েছে…’
কোথায় দুটো কাক ডাকল মধ্যরাতে। রাতের জ্যোৎস্নাকে প্রভাত বলে ভ্রম। একরাশ বিরক্তিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন পরমেশ। এসব তত্ত্বজ্ঞান অবসরের আড্ডা হতে পারে, কাজের সময় জঘন্য প্রলাপ।
অকারণ রাত-জাগার ক্লান্তিতে চোয়ালে আরো একটা ছোট হাই। অবসাদে আলস্যে কিরণময়— ‘বোঝো কাণ্ডটা! তুমি তো কৃষক-আন্দোলন করতে যাওনি হে, চটছ কেন? বাঘ মারতে গেলে লাঠিসোটা বন্দুক নিয়ে এগোনোটাই

কাহ্ন। চিড়িয়াখানায় পুরবে বলে জঙ্গলে ঢুকেছিলে। তারও তো একটা নিয়মবিধি কৌশল আছে পরম। বাঘকে বশ করার কায়দা জানতে হয়…'

ঝোড়ো বেগে ঘরে ঢুকলেন পরমেশ। দায় নেই পেছনে তাকাবার।

কিরণময়ও পিছু পিছু। লঘু শান্ত গলায়— 'সন্ধেবেলা এলোচুলে থাকলে মামাসির চেঁচামেচিতে যে-মেয়ের অন্নারম্ভের ভাত উঠে আসে এখনও, বেস্পতি-বার হাতের পায়ের নখ কাটলে বাপজ্যাঠার তাণ্ডবে মরণদশা হয়, তাকে তুমি মালতী হতে বলেছিলে ?'

দীপক তখনও নিবিষ্টচিত্ত। আত্মদহনে বিধ্বস্ত পরমেশ পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন— 'কই হলো। কদ্দুর এগোলে ?'

অন্য প্রান্তে তক্তপোশে গা এলিয়ে চাদরটা টেনে নিয়েছেন কিরণময়। রাত প্রায় একটা। শরীরটা জড়িয়ে আসছে ঘুমে। এবার ঘুম।

এক রাত্তিরের আঁধার পেরোতে-না-পেরোতেই বদলে গেল গ্রামটা। নিত্যি-বাজারের দোকানীরা ঝাঁপ তুলেছে সবে, রাস্তার ধুলোয় সব্জি-তরকারির পসার সাজিয়ে বসেছে যারা, তাদের বউনি হলো কি হলো না, সদলে হাঁকডাক তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুধন্য কুণ্ডু, মানিক চাটুজ্জে, মানিক চাটুজ্জের দাদা ঋষি চাটুজ্জে, নিধি দেওয়ান, কপিল নন্দী, কেষ্ট আশ, সদানন্দ ঘোষ।

মানইজ্জৎ ধম্মো বলে আর কিছু রইল না দেশে। কী এক বায়েস্কোপ-কোম্পানিকে এনে গাঁয়ে বসিয়েছে ইশ্‌কুলের বা পঞ্চায়েতের নতুন কর্তারা, তার ঠেলায় জ্বলে পুড়ে মরছে গাঁয়ের তামাম মানুষ। দিন নেই রাত নেই, সকালে এ পাড়ায় ত রাত্তিরে ও পাড়ায় কী এক ভটভটি যন্তর চালিয়ে পোকা ফেলে দিচ্ছে মাথায়। ঘরে-বাইরে তিষ্ঠোবার জো নেই। সে-ও না-হয় ছিল একরকম। দেখছ বাজারটার হাল! কাত্তিক মাসে পাড়াগাঁয়ে পুঁই পালং-এর দর আড়াই ট্যাকা তিন ট্যাকা মাছমাংসডিম তো পাওয়াই যাচ্ছে না। সবই আকালের দর। আকালের বাবুরা খায়।

কেনাকাটা করতে এসে যারা থমকে দাঁড়িয়েছিল, তাঁদের বিস্ময়—কথাগুলো তো নতুন কিছু নয়। অনেকদিন ধরেই বলাবলি চলছে এসবের। তবে আজ আবার হম্বিতম্বি মেরে এত বক্তিমে কেন ? তফাৎ শুধু—সুধন্য কুণ্ডু আজ দলে ভারি।

সত্যি বক্তিমে। হাত পা নাচিয়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সুধন্য কুণ্ডু তার গায়ের ঝাল মেটায় তো নিধি দেওয়ান আরো জোরে হাঁক পাড়ে— 'কত্তাটা ত সিখেনে নয় গ। শ'র থিক্যে ভদ্দরজনেরা এয়েচেন গাঁয়ে, মাস খানেকটাক থাকবেন, কাজকম্মো সেরে চলে যাবেন, তাতে আমাদেব কী? আমরা ত' ব্যাগড়া দিইনি কুথাও। সুবিধে হোক, অসুবিধে হোক, সইছেলম। কিন্তু ইসব কী? ই কেমনধারা ব্যাভার? উই যো গ, নম্বা নম্বা বাৎ ঝাড়েন তুমাদের ডেরকটরবাবু, এখনে আবাব উনি গাঁয়েব গেরস্তদের ঘরে ঘরে যেয়ে সোমত্তা মে'ছেল্যা খুঁজতে নেগেচেন। গেরস্ত ঘরের মে'দেরকে দে' বেশ্যা মাগীর পা'ট বলাবেন…'

বেশ্যা? জিভে আচমকা ঝালনোনতা স্বাদ। কলকলিয়ে উঠল বাজারের জনতা। দলবদ্ধ হাঁসের মতো প্যাকপ্যাক প্যাকপ্যাক।

'কী! বিশ্বেস হচ্চে নি? হবে কেমন করে! এমনধারা কাজ ত ইতিপুব্বে হয়নি গ গাঁয়ে। তা বিশ্বেস না হয়, শুধোও না কেনে মান্‌কেকে। কি গ, তুমি ক্যের কোন্ ভাসুর দেখ্যে মুখ ঘুইর‍্যে রইলে গ। বল না কেনে, বল…'

চোখের মুখের তিক্ততায় ঘেন্নায় তাকাল মানিক চাটুজ্জে— 'বলবটা কী! বলার আছেটা কী? আমার ত শালা, ইচ্ছে হচ্চে লাথ্‌থি মেরে ভেঙে দিয়ে আসি বাঞ্চোৎগুলার যন্তরপাতি সব…'

'শুন্না গ। মান্‌কের অমন নক্ষী মেয়েটা। ওকে সিনিমার পাট দিবেন বলেচে। বেশ্যার পাট। কেনে? আমাদের মেয়েরা ফ্যালনা নিকি? বেথার ভবিষ্যৎ নেই উদের? এজ্জৎ নেই?'

হাটবাজার কেনাকাটা উপলক্ষ মাত্র। রীতিমতো হ সভা। এতদিন ধরে সিনেমা-কোম্পানির উপস্থিতিই গাঁয়ে এক মস্ত ঘটনা। তাদের নিয়ে নিত্যি হাজার গপ্‌পো, হাজারো কথা। এখন যে সেটা বোকাহাবা হরা-তাঁতি আর গুলো পরান বাগদীকে ছাপিয়ে অ্যাদ্দুর গড়িয়েছে জানা ছিল না বলেই কৌতূহলী মানুষের ভিড়ে উত্তেজনাটা সংক্রামিত হতে থাকে। অথবা রগড়—বারো-টাকা-মণ চালের আকাল! সিনেমা কোম্পানির হরেক তামাশা।

জনতার ভিড়ে ওরাও ছিল—ভূদেব ষষ্ঠী লক্ষ্মী শ্যামাপদ। ভাগাড়ের মহোৎসবে সাহসই পেল না এগোবার। আশ্বস্ত হলো। ভিড়টা একতরফা নয়। অনেকটা শাদাসিধে বোকার মতোই কথাটা বলে ফেলল রাসতলার খগেন বাখুণ্ডি— 'বলচ কি গ। অমন সোন্দর সোন্দর মানুষগুলা। আমি গেছলুম গ। দেখে

এয়েচি, গরিবমান্‌ষের কতা নে' কেমন বাহারের পালা বেঁধেচে উয়রা। দশজনে দেখবে শুনবে…'

'শোনো কতা…' জনতার একাংশে হাউমাউকাউ বুড়ো বাখুণ্ডিকে ঘিরে—'তুমি আবার কোন্ সম্বন্ধার-পুত এলে গ। সি ত আমরা হরা পাগলাকেই জানতুম অ্যাদ্দিন…'

মানুষগুলো নতুন মজায় পাক খাচ্ছে। স্পষ্টতই দুটো ভাগ—যারা বিনা বিচারে এসব কথা মেনে নিতে রাজি নয়, তারা খগেন বাখুণ্ডির অবোধ প্রশ্নটাকেই বাড়িয়ে তুলল।

অন্যদিকে উত্তেজনার শীর্ষে বেসামাল সুধন্য কুণ্ডু চটের থলিটা দুহাতে ঊর্ধ্বে তুলে ফেটে পড়লেন উল্লাসে—'দেখ গ, তা'লে দেখে নাও। সইসাবুদ সাক্ষীপরমান ছাড়া মামলায় যায় না সুধুন্য কুণ্ডু। ই নাও, তুমরাই বুঝে নাও…'

থলে থেকে বেরোল চ্যাপ্টামতো দুটো কাচের বোতল। ওপরে রঙচঙে বাহারের ছাপ। জনতার সবিস্ময় প্রশ্ন—'কী। কী ওটা?'

'কী!' অনেক কালের পুরনো মস্ত মামলা জেতার খুশিতে ডগমগ সুধন্য কুণ্ডু শিশিদুটো ছুড়ে দিলেন ডানে বাঁয়ে, জনতার দুদিকে—'বিলিতি গ। সরেস মাল। দেশপাড়াগাঁয়ে সাত জম্মোয় পাবে না কোনো কালে…'

এবং জনমণ্ডলীতে যারা শিক্ষিত মানুষ, অন্তত বেশ কয়েকজন, শিশিদুটো হাতে-হাতে ঘুরল তাদের। বানান না করেই যারা পড়তে পারলেন অথবা ডি. আই. পি. এল. ও. এম. এ. টি—গুণে গুণে অক্ষরে বানান করার পরও শব্দের অর্থটা খোলসা হলো-কি-হলো-না শিশির পরিচয়টা ধোঁয়াটে থেকে গেল যাদের কাছে, পরবর্তী শব্দের পাঠে, নিজেদের অজ্ঞাতেই ছিপিটা খুলে ফেলে নাকে নাকে শুঁকল অনেকেই। শোঁকাশুঁকির কৌতূহলে হাত থেকে হাতে টানা-টানি—ডব্লু. এচ. আই. এস্. কে. ওয়াই। শব্দটা চেনা-চেনা।

জনগণ স্তব্ধ। কথাটা মিথ্যে নয়। প্রমাণ প্রত্যক্ষ।

'ওসব ত কতা নয় তেমন…' সব ছাপিয়ে বললেন শিবতলির ষড়ানন হালদার—'ইশকুল! ইশকুল হল বিদ্যালয়। পবিত্র স্থান। আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়ে সেখেনে। মাস্টারমশাইরা পড়ান। পুজোর মাসে সেখেনে নেশাভাঙের ফুর্তি চলচে, মজা লুটচে বিদেশী লোকেরা! এ কেমনধারা কতা!'

ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে বাক্যিটা ছুড়লেন হালদারমশাই। জনতা উদ্বেল হলো।

প্রায় সকলেই একমত—'অঁ, ই এট্টা কতার মতো কতা বটে। অনেয্য, বড়ই গর্হিত কম্মো…'

অথচ ভোর থেকেই ক্যাম্পের মানুষগুলো বড়ো উদ্দীপিত আজ। কেননা পরমেশ মিত্র স্বয়ং তাঁর ভারি চেহারার আবরণ ভেঙ্গে হাসিতে খুশিতে চাঙা রাখতে চাইছেন সবাইকে। প্রডাকশন কন্ট্রোলার সুকুমার বসাকের সঙ্গে বিশদ আলোচনার শেষে যেন নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন—মালতী-সংক্রান্ত কোনো সমস্যাই আর তাঁর নেই এবং ছবিটা শেষ করার ব্যাপারে পুরনো ভাবনা গুলো আপাতত সবই বাতিল। আর্ট-ডিরেক্টর গোপেন করকে খবর পাঠানোটা এই মুহূর্তে বড়োই জরুরি। প্রয়োজন হতে পারে।
যন্ত্রপাতি এবং কলাকুশলীদের নিয়ে ভ্যানটা বেরিয়ে গেছে লোকেশনে। শিল্পীদের নিয়ে এগোবার মুখে হঠাৎ বাধা।
পর পর দুটো ঘটনায় গোটা ক্যাম্পই সহসা চঞ্চল।
সকাল আটটাও বাজেনি তখন। মেরুন রঙের গাড়িটা স্কুলের গেটে এসে থমকে দাঁড়াল। প্রডিউসার প্রভুপদ সাহা স্বয়ং এসেছেন। কলকাতায় বিবিধ বাণিজ্য। 'আকাল'-এর জন্য ইতিমধ্যেই কয়েক লক্ষ টাকা লগ্নীর পর লোকমুখে বা বিভিন্ন সূত্রে যেসব সংবাদ পাচ্ছিলেন তাতে নিশ্চিন্ত থাকতে পারছিলেন না কিছুতেই। অথচ সময়াভাব। আজও, এক রকম জোর করেই ভোর রাতে বেড়িয়ে পড়েছেন।
সুকুমার বসাক এবং নকড়ি দত্ত যদিও তাঁর অভ্যর্থনা সর্বপ্রকারে উদ্যোগ নিয়েছেন, পরমেশকেও থামতে হলো—'আপনি তাহলে বিশ্রাম করুন। ইচ্ছে করলে একটু বাদে লোকেশনেও চলে আসতে পারেন। কথাবার্তাগুলো না-হয় ল্যাঞ্চের পর ··'
মানী ব্যক্তির সান্নিধ্যে বিত্তবান, অন্তত মুখোমুখি, চরণাশ্রিত বিনয়ী। গকগক হাসলেন বিশালদেহী প্রভুপদ—'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি আসুন। কাজ। কাজের জন্যেই না এত কাণ্ড। এত বড়ো ইন্‌ভেস্টমেণ্ট!'
কিন্তু এগোনো যায় না। নতুন বাধা।
হুড়মুড় করে ক্যাম্পে ঢুকলেন স্থানীয় সুহৃদজনেরা—স্কুলের সেক্রেটারি নির্মল ঘোষ, পঞ্চায়েত সদস্য হরিনাথ সাঁতরা এবং অন্যান্য যুবকবৃন্দ।

পরমেশ বিস্মিত হলেন। কেননা, তাঁর হিশেবমতো এঁদের অনেকেরই এখন, সেকেণ্ড ট্রেন চলে যাবার পর রেলগাড়িতে কলকাতা ছোটার কথা।

'কী ব্যাপার! আপনারা সবাই একসঙ্গে! এ সময়ে!'

'ব্যাপার বলে ব্যাপার! সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড মশাই…' বেঁটে খাটো নির্মল ঘোষ, এমনিতেই তড়বড়িয়ে কথা বলার স্বভাব, এক্ষেত্রে আরো অস্থির—'চলুন, কতা আছে।'

পুরোপুরি তৈরি হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন শিল্পীরা, হাতের মুদ্রায় পরমেশ তাদের প্রতীক্ষার নির্দেশ জানিয়ে গেট থেকে ফিরলেন। এঁরা যে কারণেই এসে থাকুন অথবা কথাবার্তা যা-ই হোক, তাঁর বাড়তি ভাবনা এবং অস্বস্তি—প্রভুপাদ সশরীরে ক্যাম্পে উপস্থিত।

অভ্যাগতদের ইচ্ছায়, ক্যাম্পের আয়োজনের মধ্যে কোথাও নয়, হেডমাস্টার-রুমের দরজা খোলা হলো সেক্রেটারির অভিলাষে। সেখানেই নিভৃত আলোচনা।

ভোরবেলা বাজারে কি ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে, সবিস্তারে বর্ণনা করলেন নির্মল ঘোষ। বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, গ্রাম্য-রাজনীতির বর্তমান অবস্থায় সিনেমা-কোম্পানিকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষ যদি জোরদার হট্টগোল বাঁধিয়ে তোলে বিপদ তাঁদেরই।

ডানহাতের তেলোয় থুত্‌নিটা চেপে ধরে ভাবনাভারে বিষণ্ণ ছিলেন পরমেশ। হঠাৎ ঝামটা দিয়ে উঠলেন—'মানিক চাটুজ্জের বাড়ি আমি যেতে চাইনি নির্মলবাবু। ওভাবে আর্টিস্ট খুঁজি না আমরা। আপনারাই যেতে বললেন…'

'সেজন্যে ত আপনাকে বলা হচ্চে না কিছু। সে ত আমরাই বলেছিলাম…' চিন্তাক্লিষ্ট নির্মল ঘোষ আপশোসে কুণ্ঠিত— 'আপনারা আসার পর থেকেই ত দশরকম কতা উঠচে চাদ্দিকে। ভাবলাম, কোনো রকমে মান্‌কেদাকে যদি আপনাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে পারি…'

'তার মানে আপনাদের গ্রাম্য-দলাদলির পুরো ঝামেলাটা আমার ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে…'

'না না, সে রকম কিছু নয়…'

নির্মল ঘোষ যখন কথা খুঁজছেন, যুবকদের মধ্যে একজন, ষষ্ঠী বলে উঠল— 'ওতে তো কিছু হতো না তেমন। শুক্লাকে আপনার পছন্দ হয়নি, নিলেন না। সেটা

সব্বায়কে বোঝানোও যেত। কিন্তু কাল রাত্তিরে আপনি নিকি কী সব বলে এয়েছেন…'

'কী?' পরমেশ ভ্রূ তুলে তাকালেন।

'কেনেল কেটে, ডিপ-টিউবওয়েল শ্যালো বসিয়ে বেশি বেশি ধান ফলানো হচ্চে আর সেই ট্যাকায় ডাঁহাবাজ লম্পট হচ্চে জমির মালিকরা।'

ভ্রূকুটিটা ললাটে বহাল ছিল। পরমেশ নড়েচড়ে বসলেন—'ভেরি ব্যাড স্টুডেন্ট। কি বলেছি, বুঝতে পারেনি।'

'বোঝাবুঝির ত কতা নয় দাদা…' ওপাশ থেকে পঞ্চায়েতের হরিনাথ সাঁতরা—'আপনারা কি বই তুলচেন, ওরাও ত দেখছে নিত্যি। সিদিন হাতুই-এ বই তোলার সময় কাকে নিকি বলেছিলেন আপনি—আকালের দিনে বাপঠাকুদ্দারা জলের দরে জোতজমি কিনে কিনে সম্পত্তি বানিয়ে গেচেন। তারই রসে এখনে সব বড়ো বড়ো জোতদার। ওই যো দেখচ মস্ত মস্ত সব পাকাবাড়ি, অঢেল ট্যাকা—শয়তান শয়তান সব্বায়। সব ভাল ভাল সঠিক কতাগুলোই ত ঝামেলা পাকিয়েচে দাদা…'

দুপাশের কথাবার্তায় শীতল থেকে শীতলতর হয়ে উঠছিলেন প্রভুপদ সাহা। দশ আঙুলে সাত-সাতটা সোনারুপোতামার আংটিতে হীরেপলাগোমেদ শান্তি দিচ্ছে না কিছুতেই। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বিহ্বলতায় তাকালেন—'এসব কী শুনচি পরমেশবাবু?'

'কিছু না। ভাববার কিছু নেই…'পরমেশ উঠে দাঁড়ালেন—'আমি এখানে কাউকে খুশি বা অখুশি করতে আসিনি হরিনাথবাবু। আমার কথা আমি বলতে চাই। বেশ জোরের সঙ্গেই বলব।'

'বলুন না। আমরাও ত তা-ই চাই। তাতে সমাজের মঙ্গল…'

হরিনাথ সাঁতরা আরো কিছু বলার আগেই হঠাৎ নির্মল ঘোষ—'কিন্তু দাদা, ওই…ওই বোতলদুটো? ওগুলো ত ওরা জনে জনে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্চে সব্বায়কে…'

পরমেশ ধাক্কা খেলেন। দুহাতের মুঠোয় চুলের গোছ আঁকড়ে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংহত রাখার দায়। তাকালেন সুকুমারের দিকে।

এক কোণে নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিলেন সুকুমার বসাক। এগিয়ে এলেন। ধীর শান্ত ভঙ্গি—'এতদিন ধরে আপনারাও তো দেখছেন আমাদের। দেখছেন তো, কিভাবে আমরা কাজকর্ম সব করি। পুরো একটা ফিল্ম্-ইউনিট,

বিরাট একটা সংসারের মতো। নানা ধরনের কাজের লোক নিয়ে পঞ্চাশ-ষাট জন মানুষ। সবাই যে-যার কাজে এসেছেন। এরই মধ্যে ছিটকে গিয়ে কেউ যদি আজেবাজে কিছু একটা করেই বসেন…আর যাই হোক, পরমদা তো এদের কারুর মরাল গার্জিয়ান নন…'

'সে ত হল সুকুমারবাবু। আমরা বুঝলাম। কিন্তু সে কতা গাঁয়ের মানুষগুলোকে বোঝায় কে?' একইভাবে শান্ত বিষাদগ্রস্ত নির্মল ঘোষ।

'গাঁয়ের ছেলেরা ত রয়েচে এখেনে। শুধোন ওদেরকে…' হরিনাথ সাঁতরা—'ইশ্‌কুলের মাস্টারমশাইদের রাস্তায় দেখলে এখনও, বুঝলেন দাদা, বাচ্ছা ছেলেরা ত বটেই, আমরা এক্স-স্টুডেন্টরাও সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াই। পুজোপাব্বনে বিজয়ায় নববর্ষে মাস্টারমশাইদের পেন্নাম করি। ইশ্‌কুল চলাকালে দুকুরবেলা পায়জামালুঙ্গি পরে ওই গেট পেরোনো নিষেধ আমাদের। আর সেখেনে যদি ইশ্‌কুলবাড়িতে বসে রোজ রোজ রাত্তিরবেলা…'

'ইন্‌ক্রেডিবল্‌…

সকলেই চমকে তাকাল।

'আপনি ওঁদের সঙ্গে কথা বলুন সুকুমারবাবু। আমি আসছি…' ঘর ছেড়ে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন পরমেশ। ভেজানো দরজায় পাল্লা ঠেলে দেবার বিকট আওয়াজটা তাঁর ক্রোধের বিস্ফোরণ।

তাঁর ঝোড়ো-প্রস্থান সত্ত্বেও ঘরের মানুষগুলো প্রত্যেকেই অনড় যে-যার নিজের অবস্থানে—খুব একটা বাজে কথা তাঁরাও বলছেন না।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নন্দিতা প্রতিমা এবং অন্যান্য সকলেই রাস্তা থেকে উঠে এসেছিল স্কুলবাড়ির বাগানে। সায়েন্স বিল্ডিং-এর ছায়ায় দল বেঁধে সকলেই একসঙ্গে—কথাবার্তায়, আড্ডায়।

ছুটে এসে, প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ার তীব্রতায় পরমেশ—'উদয়বাবু, শুনুন…'

'বলুন, পরমদা বলুন…' কৃতার্থ হাসির তৎপরতায় ঘুরে দাঁড়িয়ে উদয় চৌধুরী ঘাবড়ে গেল।

'আপনারা ড্রিঙ্ক করবেন, মজা করবেন, যা-খুশি করুন মশাই, করুন। কিন্তু সব কিছুরই একটা লিমিট আছে…'

'আমাকে বলছেন?'

'আপনাকে ডেকে বলব আর কাকে?' অতিরিক্ত ক্রোধের মাত্রায় পরমেশ আগ্নেয় ক্রোধে—'রোজ রাতে খালিবোতলগুলো আপনারা কোথায় ফেলেন?' এতগুলো লোকের সামনে, বিশেষত ধ্রুবজ্যোতি বিতোষ এবং অন্যদিকে প্রতিমা দাশ নন্দিতার উপস্থিতিতে দলনেতার এতাদৃশ আচরণ রীতিমত অপমান। তিরস্কৃত উদয় চৌধুরী ঘাড় সোজা করে শক্ত হয়ে দাঁড়াল—'ঘরেই তো থাকে। গুন্নু না কে আছে আপনাদের, এ গ্রামেরই লোকটা! ঘর ঝাড় দেবার সময় কুড়িয়ে নিয়ে যায়…'

শক্ত মুঠোয় চুলের মুঠি ধরে পাক খেলেন পরমেশ। এরপর কী বলবেন, কিভাবে এগোবেন, অস্থির দ্বিধায় যখন ভেতরে ভেতরে মর্মান্তিক দাহ, ঘুরে দাঁড়ালেন সোজাসুজি—'ঠিকই তো। একটা স্কুলে বা কলেজে কি হচ্ছে না-হচ্ছে আমরা খোঁজও রাখি না কলকাতায়। কিন্তু এখানে…গ্রামে! স্কুলটা ওদের কাছে দেবমন্দিরের মতো। সেখানে প্রতিদিনই মদ্যপান চলছে আমাদের! ওরা ক্ষেপে যা'ব। ক্ষেপে গেছে। নাউ দ্য হোল ইউনিট ইজ অ্যাট স্টেক্…'

'পানদোষটা কি আমার একারই পরমদা! শুধু আমাকেই কেন বলা হচ্ছে এভাবে?'

উদয়ের গলার স্বরে তীক্ষ্ণতা ছিল। পরমেশ নাড়া খেলেন। যেন নিজের স্বাভাবিকতায় ফিরে আসা। বড়ো বিচ্ছিরি জায়গায় গড়িয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। হয়তো-বা তাঁরই বাড়াবাড়ি। কিংবা দোষ হয়তো একা উদয়েরও নয়। অন্য কেউ, অন্য কোনো আর্টিস্ট বা টেক্‌নিশিয়ান! নিজেকে খাটো করে নিয়ে এলেন কিঞ্চিৎ। নিজের মনেই অন্তর্দাহে—'মদ্যপান করলেই যে চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় না—এসব জটিল ব্যাপারগুলো এখনও বোঝে না এঁরা। ·।দাসিধে গ্রামের মানুষ। ইন দ্যাট কেস, ইউ নিড বি ওয়াইজ এনাফ…'

ঝটিকাবেগ দেহে মেজাজে। দুদিকে হাত নেড়ে সবাইকে নির্দেশ—চলো বা চলুন। এবং দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় নিজেও গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। কাজ। এখন শুধু কাজ—সকালদুপুরসন্ধ্যারাত্রি। বাকি দৃশ্যগুলো তুলে নিতে হবে যত দ্রুত যত অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব।

রাজু প্রস্তুত ছিল। গাড়ি স্টার্ট নিল। ঘড়িতে সময়ের কাঁটা দেখলেন পরমেশ। প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের ওপর কোন্ এক অজ গ্রাম হাতুই-এ দীপক প্রদীপ একা আগলাচ্ছে দামি ক্যামেরাটা। তাঁর এই মুহূর্তের বড়ো ভাবনা সেখানেই।

সিন 79 শট 2 টেক 1 জি. টি ডে 22 10 80

ঝিমঝিম করছে মাথাটা। সে সঙ্গে অপ্রতিরোধ্য এক দুর্দম জেদ নিজেরই অন্তর্বর্তী অস্তিত্বে। দেহের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলোও দ্রুত বদলে যেতে থাকে তখন। স্নায়ুকেন্দ্র থেকে পদনখকণায়, রক্তের অণুতে অণুতে প্রদাহ। অলৌকিক ছায়াময়তা থেকে শিল্পের বাস্তব যদি তার ক্রূরতায় নিজেরই সম্মুখবর্তী সমবেত যুযুৎসবা।

চিত্রগ্রহণপর্বে বন্ধুশিল্পী অসীম রক্ষিতের দিকে ঘেন্নায় তাকালেন। ধ্রুবজ্যোতিকে নির্দেশ—'অর্জুনের চোখে এই ঘৃণা চাই...'

সাতসকালে এসেছেন কেদার কোনার—'তুর গাইবলদগুলান লিয়েচে তারুঠাকুর। তুর জমিটোও নিকি লিখে দিচ্চিস র‍্যা চন্দর...'

টাঙি নিয়ে তেড়ে এল অর্জুন—'আকাল এল ত গরিবমানুষের হাড় চিবুইতে লেগেচেন শুকুনির মতন। জমি-জমি কচ্চেন! জমি বিচব নাই। অঁ, হক কতা। জমি বিচব নাই। গতর বিচব।'

কাট্। একাধিক নয়। একটাই টেক। প্রাণের উষ্ণতায় হাত পা খেলিয়ে কিছুটা খোলামেলা নিঃশ্বাস। সিগারেট ধরবার আগে প্রসন্ন আবেগে হাত বাড়ালেন পরমেশ—'ব্রিলিয়ান্ট অসীমবাবু। ধ্রুব থ্যাঙ্কস।'

সেদিন বিকেলে আর ফিরতে পারলেন না প্রভুপদ সাহা। এমন অস্থানে মাননীয়ের রাত্রিযাপন-ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টায় গোটা দিন ধরেই হিমসিম খেলেন সুকুমার। কাজের অতিরিক্ত চাপ।

রেলস্টেশন মারফৎ টেলিফোন-বার্তা পাঠিয়েছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়—সুজাতাকে নিয়ে পূর্বা নিজেই আসছেন আগামী সোমবার, অর্থাৎ সাতাশে অক্টোবর, সকালে। নিজেরই গাড়িতে। স্বতন্ত্র কোনো ব্যবস্থা নিষ্প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য, অনেক দিন পরে ক্যাম্পে কিছুটা বসন্ত বাতাস।

সকালের দিকে নষ্ট হয়েছে বেশ কিছুটা সময়। তারপর বেলা দেড়টা পর্যন্ত একটানা, ঘণ্টাখানেক বিরতির পর আড়াইটা থেকে আবার কাজ। রোদে ঘামে তীব্র আলোর আলোয় আরো দীর্ঘ দীর্ঘতর কর্মপ্রবাহ। বিশ্রাম দিলেন না কাউকে, নিজেরও স্বস্তি নেই। করোনারি বা সেরিব্রায় আচমকা ধাক্কা, কোলাইটিস-গ্যাসট্রাইটিস্-এ দুঃসহ চিৎকার—ঘটে যেতে পারে যে-কোনো

কিছুই। পরমেশ মাতাল। সুজাতা সান্যাল নামে অপরীক্ষিত অভিনেত্রী এখনও সংশয়। কিন্তু মালতীকে বাদ দিয়ে বাকি ছবির কাজ তুলে ফেলতে হবে কদিনের মধ্যেই।

অনেক রাতে ক্যাম্পের বিশ্রামে অশান্ত আবার।

মোটামুটি স্থিরই করে ফেলেছেন প্রভুপদ, কাল সকালেই সুকুমার বসাককে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় থানায় যাবেন। প্রয়োজনে কলকাতায় টেলিফোন করবেন। স্বরাষ্ট্র বিভাগের কোন্ এক গগনচুম্বী বড়োকর্তা অতি ঘনিষ্ঠ তাঁর।

ভ্রূ কুঁচকোলেন পরমেশ—'কেন ?'

'কী বলছেন! গ্রামের লোকগুলো এমন ক্ষেপে গেছে।'

'কোথায় ক্ষেপেছে ? দশ বারো ঘণ্টা এক নাগাড়ে কাজ করে এলাম। কেউ তো কিছু বলেনি আমাদের।'

সুরভিত জর্দার ঘ্রাণ আপাতত স্থগিত। হুইস্কি এবং রাম—দুই-ই সঙ্গে এনেছেন এবং সিগারেট। প্রভুপদ ঘামছেন। ঘন ঘন রুমাল ঘসছেন কপালে—'না না মশাই, এসব গ্রামের লোকদের বিশ্বাস আছে!'

'সকালে যারা এসেছিলেন, যাদের সঙ্গে কথাবার্তা হলো, কাউকে শত্রু মনে হয়েছে আপনার ?'

ভয়ের হেতু বা ভয়ের বস্তু যখন দুর্জ্ঞেয় ধাঁধা, বিশাল দেহে প্রভুপদ শুধু আইঢাই হাপর তোলেন। বিত্তগৌরবের হুঙ্কারটাও ঠিকমতো চলে না এখানে। পরমেশ স্থিতির নামী এবং মানী ব্যক্তি।

'আসলে কি জানেন, এ তল্লাটে কস্মিনকালে কোনো ফিল্মের শু্যটিং হয়নি। এদের কাছে সবটাই নতুন। এতে বেশির ভাগ লোকের আগ্রহ যেমন বিশাল, আবার গোলমালও হয়ে যাচ্ছে কিছু কিছু। ওসব কিছু না…' নিজের গ্লাশটা নিঃশেষ করলেন পরমেশ। শেষটানের পর সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে—'তাছাড়া এ গ্রামে আমাদের বন্ধুও আছেন অনেক। এমন কিছু করা কি আমাদের উচিত হবে প্রভুবাবু, যাতে ওরা বিপদে পড়েন ?'

ঝোড়ো বাতাসের পাখা সত্ত্বেও সর্বাঙ্গ ঘামে প্রভুপদ যতই বিবশ, মুখেচোখে আতঙ্কিত বিমূঢ়তা, পরমেশ ঘনিষ্ঠ হলেন আরো। আকাল দুঃখের কথায়, দায়াবদ্ধ শিল্প রক্ষার তাগিদেই এতাদৃশ বৃহৎ বণিকের মনোতুষ্টি এই মুহূর্তে তাঁর বিশেষ প্রয়োজন।

কাগজকলম নিলেন। এ পর্যন্ত খরচের একটা আনুমানিক হিশেব। পূর্বনির্ধারিত

বাজেটকে তিনি ছাড়িয়ে যাচ্ছেন না। মোহনপুর হাতুই-এর কাজ প্রায় শেষ। আজকের মতো অবিরাম কাজ চললে, মালতীকে বাদ দিয়ে ছবির অবশিষ্ট অংশ দু-একদিনের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে পারবেন এবং মালতীসংক্রান্ত নতুন পরিকল্পনায় অঙ্কের হিসেবটা যদি সহস্রের বৃহত্তম বা অযুতের ক্ষুদ্রতম ঘরে বেড়েও যায় কোথাও, যেভাবেই হোক, তিনি পুষিয়ে দেবেন। অন্তত এ ছবি শেষ হবার ক্ষেত্রে কোনো আশঙ্কাই থাকছে না।

আরো গভীর রাতে সুকুমারকে ডাকলেন নিভৃতে—'কাছারিবাড়ির শটটা কী করলেন? হরেন কী বলছে?'

'আমি নিজেই গিয়েছিলাম।

'তারপর?'

'ধর্মদাস মাতো বাগদীও চাইছে আজকালের মধ্যেই হয়ে যাক। লোকটা যে কখন ছুট করে এসে হাজির হয়!'

'ওর ছেলেটা কেমন আছে?'

নাক কুঁচকে মৃদু মাথা নাড়লেন সুকুমার—'ও বাঁচবে না। অসম্ভব।'

'অলরাইট, কালই হবে। কাল সন্ধেবেলা।'

দুর্গা-পরাণ : অন্তরালবর্তী

কাঁধে আধমরা দুধের বাচ্চা, ডানদিকে ন্যাড়া-মাথার ছেলেটাকে গায়ে লেপটে সেদিন ভরদুপুরবেলায় যখন ঘাটের-মড়া গুখাকী সিনিমা-মিন্‌সেদের নামে শাপান্তি গাইতে গাইতে ঘরে ফিরেছিল দুর্গা, পড়শিরা ঘিরে ফেলেছিল তাকে। সমবেত ধিক্কার—'ছ্যা ছ্যা ছ্যা, এমনধারা বেআক্কেলে বাপও নিকি হয় গ কারুর! কটা ট্যাকা পেল গ? ইয়ার জন্যি নিজের মরণ দেখল হারামজ্যাদা।'

সামাজিক ঘৃণার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসেছিল পরাণ।

সেই একই পোড়ানিতে জ্বলতে জ্বলতে, দশজনকে সাক্ষী রেখে দুর্গার চিৎকার—দুধের বাচ্চাটা বাঁচবে না। তবে কেন এমনধারা তেজ মানুষটার। মুলো সোয়ামি আর টিঙটিঙে বাচ্চাগুলোর জন্য হাড়মাস পুড়িয়ে এত খাটে সে, তবু কেন দিনভর রাতভর দাঁত-ঝাড়ানি? টেরা চোখে শুধু সন্দ মেয়েমানুষকে! তাই যদি হয়, সে চলে যাবে। গাগতরে ক্ষ্যামতা থাকতে দণ্ডে মরবে না এমনধারা হাড়চিবুনি মরদের কাছে…

অনেক কালের পুরনো জং-ধরা একটা শাবল ছিল ঘরে। খুনে ডাকাতটাকে শল বেঁধে ঝাপটে ধরে পড়শিরা বাঁচাল দুর্গাকে।

অথচ জলবিচুটির জ্বালায় একটা কটকটে রাগ শরীরে থেকে যায়। অক্ষম ক্রোধের তেজে সেদিন দুপুরবেলা শাবলটা নিয়ে উঠোনে বসল পরাণ। মাটি কোপাতে শুরু করল। নেহাৎ-ই অকারণ। মাথা-খারাপ লোকটার কাণ্ড দেখে ঘিরে দাঁড়াল পড়শিরা। প্রশ্ন শুধোবার সাহস নেই। বিশ্বেস নেই ক্ষ্যাপা মানুষকে।

'কি র‍্যা! কচ্চিস কী এখেনে! উঠুনটা লষ্ট কচ্চিস কেনে?' এগিয়ে এল দুর্গার বাপ মাতো বাগদী, মোড়ল ধর্মদাস।

সাড়া নেই। বুনো শুয়োরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ যেমন, মাটিতে বসে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তীব্র আক্রোশে শাবল কোপায় লোকটা—বুঝুক, বুঝুক শালী মা-বসুন্ধরা।

কিন্তু একটা মাত্র হাত। জ্যান্ত ডানহাতের কোপে শাবলটা মাটিতে গেঁথে যাবার পর দুহাতওলা মানুষ যেমন দুটো হাতই বাড়িয়ে দেয় মাটিটা আঁচড়ে তোলার জন্যে,তার বাঁ-কাঁধের লাগোয়া বাড়তি মাংসপিণ্ডটা বুকের ইচ্ছেয় কাঁপে। এগোতে পারে না।

তামাশা দেখতে দেখতে পড়শিজনেরাও এক সময় অবাক বনে গেল। প্রায় হাত-আড়াই একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে লোকটা। সেটা যে কেন, কী উদ্দেশ্যে, বোঝা না গেলেও তাক লেগে গেছে চোখগুলোয়—ঘেমেনেয়ে, ধুলোয় ধুলোয় ডান হাতটার রং বদলে গর্তটার চারপাশে গোল করে মাটির ঢিপি বানিয়ে লোকটা শাবল ছাড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে গেল নিঃশব্দে। সিদ্ধান্ত সকলের—কাজকাম-নেই মরদব্যাটার। বর্ষাকালে তবু না-হয় ঘরের চালার লাউটা কুমড়োটা বেচে, মাঠের কাজে বৌ-এর রোজগারে চলেছে কোনোরকম। গেল র‍্যা, এখন পেটের টানে মাথাটাও গেল। ইবারে মরণ…

বাপের মরণ নিয়ে মরতে বসল দুধের-বাচ্চাটা। দুর্গা উন্মাদিনী।

সেদিন হেল্‌থ্‌ সেন্টারের ডাক্তারবাবু যখন সাফ-সাফ জবাব দিয়ে দিলেন—'কেন মিছিমিছি ওকে রোজ রোজ আনিস বল্‌ তো! ও বাঁচবে না…'

নিমেষে মিথ্যে হয়ে গেল মাথার ওপর মস্ত চাঁদোয়া। পলাশডাঙা বটতলার মাঠে দুর্গার প্রলয় চিৎকার। মায়ের বুক লেপটে টিঙটিঙে বাচ্চাটা যেন সত্যি মরে গেছে। ট্যাঁ-ফু নেই। এগিয়ে এল দুচারজন মানুষ—জন্মো মিত্যু নেয়তি-নেবন্ধ। কারও ত করার নেই কিছু।

'উটো মইরবে। মল্লে বাঁশবনের ধারে মাটিতে পুঁইতে দিস। পেট ভইরবে.
শ্যাল্ শুকনির...'
নিষ্ঠুর বাপ। পরাণ বাগদী কাঁদল না। ঘরেও ফিরল না। এক-কাপড়ে
আলগা-গায়ে যেমন ছিল, সেখান থেকেই চলে গেল ইস্টিশন। বিনিটিকিটেই
শহরে যাবে। কলকাতা॥
অথচ সেদিনই ঘরে-ফেরার পথে, বাউরিপাড়ার লোকেরা ফিরছিল দল বেঁধে,
বেলতলার মুখে শুনল দুর্গা—গরিব মানুষদের ডেকে নিয়ে ফোটো তুলছেন বাবুরা।
ফোটো তোলালে খাবার আর টাকা।
তার মরদের জন্মের জন্মের রাগ ওই সিনিমাবাবুদের ওপর। মানুষটা কোথায়
চলে গেল! বুকে সিঁধিয়ে মরছে ছেলেটা। সে ভাবল না।
ইশকুল বাড়ির ভেতরে-বাইরে কাঙালের ভিড়। যারা ভেতরে ছিল, তারা
ঢেকুর তুলতে তুলতে বেরিয়ে আসছে। যারা পরে এসেছে, ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে
না তাদের। কিন্তু তার মাথা-কামানো ছেলেটা আদর পেল বাবুদের।
মস্ত কাণ্ডকারখানায় দুর্গাও অবাক। সেখানে বড্ড খাতির তার। আলাদা
করে ডেকে নিয়ে দুঃখের কথা শুনলেন ওদের সব্বায়ের বড়ো ডেরকটরবাবু।
খাওয়ালেন দুপুরবেলা। ডালতরকারি মাছের অমন পরিপাটি খাওয়া মুখে রুচল
না। ন্যাতানো বাচ্চাটা মরণকালে সবই ফেলে দিল মুখ থেকে। মনে পড়ল
মরদটাকে। রেলগাড়ি চেপে কোথায় গেল মানুষটা! কদ্দুর! দানাপানি
পড়বে না গোটা দিন।
মাতো বাগদীকে সঙ্গে নিয়ে সেদিন রাতেই ঘরের দোরে এল ধর্মদাস মোড়ল—
'ই সমে পরানটা গেল কুথাকে র‍্যা! তাই এলম। এত্ত কর‍্যে বলচেন বাবুরা।
তুই যা না কেনে। যা। বাবুরা দুটো ফোটো তুলবেন তুর। ট্যাকা পাবি।
মা হয়্যা মাইরবি কেনে ছেল্যাটাকে। বেঁচে যাবে ই যাত্রা...'
পরদিনই হরেনের সঙ্গে এসে একটা আনকোরা নতুন ক্যারেক্স, বড়ো দু-কেজির-
টিন বেবি-ফুড রেখে গেলেন সুকুমার। সেবনবিধিও বুঝিয়ে দিলেন— 'রোগটা
যখন ম্যালনিউট্রিশন, অর্থাৎ অপুষ্টি। এ রোগের তো ওষুধ নেই। এগুলো
খাওয়াও তিন বেলা। ছেলে তোমার বেঁচে যাবে। বাঁচবেই।'
অভিভূত দুর্গা। গোটা বাগদীপাড়া ভেঙে পড়ল ফাটা-কপালের ভাগ্যি দেখতে।
এত বড় বড় মালিকমহাজন ত রয়েছে গাঁয়ের, বাগদীপাড়ার একটা খোকার
জন্যি এমন সোহাগ কে কবে দেখিয়েচে গ?

অন্তরালে লেনদেনের কথাবার্তাটা হলো ধর্মদাস মোড়লের সঙ্গে। টাকা গুনল দুর্গার বাপ মাতো বাগদী। সুকুমার বসাকের শর্ত একটাই—টাকাগুলো দুর্গার। খরচ হবে ওর ছেলের জন্য।
ধর্মদাস বলল— 'যা কবেন, দুচান্দিনের মধ্যি করুন গ বাবু। উ গোঁয়ারটা কবে এস্থে যাবে ফের…'

আয়োজন সম্পূর্ণ ছিল।
মোহনপুর স্টেশনের ওপারে পলাশডাঙা হেল্‌থ্‌ সেন্টার। বটতলার ছোট মাঠ। ঘাস নেই, ধুলোবালির জমি। ছেলেরা ফুটবল খেলে। তারই একদিকে মাত্র গোটাকয়েক বেডের হাসপাতাল, নার্স-কোয়ার্টার, অপর পারে ঘন গাছপালার প্রেক্ষিতে ·ডাক্তারবাবুর সরকারি বাসগৃহ। শাদামাটা একতলা বাড়ি। অপরিসর বারান্দা। গত দেড়-দুই দশকে আদৌ কখনও কলি-ফেরানো হয়েছে কিনা হিশেবটা জানা নেই বলেই অসংখ্য বর্ষার জলে এবং প্রতিদিনের রোদে তাপে বাড়িটার যা হাল, পরমেশ খুশি হয়েছিলেন—অকাল জরার এই প্রাচীনত্ব, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তিমপর্বে কাছারিবাড়ির বিশ্বস্ত প্রতিরূপ।
সদাশয় ডাক্তারবাবুরও আপত্তি ছিল না। কেন না, বয়োস্কোপ-কোম্পানি তাঁর সংসারে ঢুকছে না। বাইরে-বাইরেই নাকি ওদের কাজকম্মো। তাছাড়া ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপত্র ওদের দখলে। যত কম বেডই হোক, যে দুচারজন রোগী-রোগিনীরা আছে, জনে জনে সকলের কাছে গেছেন ওদের ম্যানেজারবাবু। কলা কমলালেবু আর সন্দেশ রেখে জো·হাতে উৎপাতের অনুমতি চেয়েছেন। শাদাসিধে গ্রামের মানুষ বোঝেনি—কিসের অনুমতি? কেন ভদ্দরলোকের জোড়হাত?
সেটাই স্পষ্ট হলো কাজের দিন সন্ধেবেলা। কোজাগরী রাত কেটে যাবার দুদিন পরে অস্থায়ী আঁধার ছিল। একটু বাদেই ফুটফুটে চাঁদ উঠবে আকাশে। যেন এই ভরসাতেই ছোট মাঠটুকুতে ভেঙে পড়েছে দশ গ্রামের মানুষ। প্রচণ্ড ভিড়। গুঁতোগুঁতি হুড়োহুড়ি তুমুল হল্লায় যেন সবাই ভুলে গেছে—এটা হাসপাতাল। প্রৌঢ় ডাক্তার এবার বিচলিত। ঘন ঘন অনুরোধ— 'যা করবেন, তাড়াতাড়ি করুন দাদা। আমার আবার সরকারি চাকরি…'
এবং যথাসময়ে পৌঁছে পরমেশও ক্ষেপে গেলেন। অনেক বেশি পুলিশ, দুজন

বাড়তি অফিসার। নেতৃত্বে থানার বড়োবাবু স্বয়ং। ভ্রূ তুলে বিরক্তিতে সুকুমারের দিকে তাকালেন। সুকুমার নিশ্চুপ। অন্য দিকে পুলিশ-কর্তার সঙ্গে সহাস্য কথোপকথনে ব্যস্ত প্রভুপদ সাহা। ইত্যাদি উটকো ঝঞ্ঝাটের দিকে দৃকপাতের সময় নয় যেহেতু, গা-ঝাড়া দিয়ে মুহূর্তে সচল করে তুললেন নিজেকে। কাজ। কাজটাই প্রথম।

দৃশ্য গ্রহণের ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারের মুখোমুখি। এত আলো, এমন জোরদার রোশনাই, ছাতা-পড়া শ্যাওলা-জমা একতলা অপরিচ্ছন্ন বাড়িটা যেন অন্ধকার রাতে ঝলমল পুজামণ্ডপ কোনো। বারান্দাটা ফাঁকা। দেবীমূর্তি নেই। ওটাই নাকি শয়তানের আখড়া হবে সিনেমার পর্দায়।

আলোর বিন্যাস সংক্রান্ত অ্যাসিস্ট্যান্টদের হাঁকাহাঁকিও অশ্রুত জনতার চিৎকারে। কিন্তু দৃশ্যটা গৃহীত হলো অনায়াসেই। একটি স্থবির গৃহের নির্বাক দৃশ্য।

এর পর দুর্গা। সেই বাগদী-বৌ। পরমেশ অধীর হলেন। মগজের মধ্যে দীর্ঘ লালনে-পালনে চিত্রনাট্য-বহির্ভূত যে দৃশ্যের চিত্রকল্প তাঁর অস্তিত্বের আচ্ছন্নতা, তারই মূর্তি নির্মাণে, ঠিক এই মুহূর্তে, ঘনীভূত প্রাণের আকুতি, সেরিব্রায় তীব্র চাপ।

অন্যত্র, ঠিক তখনই, হাসপাতালেরই একটি ঘরে দুর্গাকে নিয়ে আবশ্যিক ব্যস্ততা। চুপি চুপি তাকে নিয়ে এসেছে হরেন। সঙ্গে ধর্মদাস আর মান্তো বাগদী।

যেহেতু শিল্পের অসুন্দরকেও সুন্দর করে গড়ে তুলতে হয়, বাগদী-বৌকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত শিবনাথ বিশ্বাস। পচা ঘামের ভ্যাপসা আর সোঁদা গন্ধটা সেলুলয়েডে কোনো সমস্যা নয় যদিও, এঁটেল মাটির খশখশে গেঁয়ো চামড়াটাকে একটু ঘসে মেজে সংস্কার করতেই হয় ক্যামেরার জন্য। পুরো একটা সাবান নিঃশেষ করে স্নান করানো হলো। প্রতিমা দাশ এবং নন্দিতা তদারকের ভূমিকায়। সুবিশাল যজ্ঞভূমিতে হতচকিত দুর্গা বোঝে না, তাকে নিয়ে এ কী খেলা বাবুদের?

বাগদী-বৌ কাঁদছে। গোটা জীবন ধরে তাকে নিয়ে এমন উৎসব হয়নি কোনো কালে। বিয়ের রাতে কনে সাজাবার জন্যেও যার ভাঙা ঘরে কেউ আসে নি সোহাগ নিয়ে, বাবুদের ঘরে আজ তার সাজ! ছ্যা ছ্যা ছ্যা, ঘেন্না। হাড়ে-মজ্জায় সারা দেহে খিঁচুনি দিয়ে ঘেন্না উগড়ে ওঠে। সিনিমাবাবুদের প্রতি তার মরদের জন্মের জন্মের রাগ

"আকাল দুঃখীর কতা র‍্যা। তুর আমার সব্বায়ের দুঃখু। তুকে কাঁদতি হবে..."

ঘর থেকে টেনে আনার পথে বলেছিল হরেন তাঁতি— ‘উঁই দেখিস নি অমন ফুটফুটি বাবুদিদিমণিদেরকে। সুখের ঢল নামচে শরীলে। ডেরক্টরবাবু কাঁদতি বলবেন ত সি কী ফোঁপানি দে’ কান্না র‍্যা ওনাদের…’

বাহারের দিদিমণি-মাঠাকরুণের দিকে তাকায় দুর্গা। বিশ্বাসই হয় না। এমন দিদিমণিরা কাঁদবে কেনে? কিসের দুঃখু? সুতরাং তারই শরীর কাঁপে।

বুড়ো ধর্মদাস বলেছিল— ‘তুর বাপের হাতে একশটা ট্যাকা দেচেন বাবুরা। কাজ ফুরুলে আরো দিবেন বলেচেন। তুর ছেল্যাটা বেঁচ্যে যাবে র‍্যা! চাই কি, ছুট্ট মতন এট্টা কাজকারবারও খুলে বসতি পাব্বে মুল পরাণ। এত্ত ট্যাকা!’

ছেলেটা বাঁচবে! উদাস-উদাস ঝলসে ওঠে বুকটা। এমন এক চকচকে আশাকে বুকে বেঁধে, দাঁতে দাঁত চেপে, চোখ বুজে সে পুতুল হয়ে থাকে। বাবু-দিদিমণিদের হাতে খেলনা। পাঁজরার ভেতর মরদের ভয় নিয়ে স্বপ্নের মাঠে হাঁটা—মুলো নয়, খোঁড়া নয়। দুটো হাত দুটো পা নিয়ে তার সবল দেহের দুই ছেলে বগলে শেলেট বই চেপে পাঠশালায় যায়…

অনেক মেহনতে দৃশ্যপট তৈরি হলো। যেন কন্‌ডেমন্‌ড সেলের আসামীকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার শেষ-মুহূর্তের দিকে। দুদিকের বামদক্ষিণ ধরে আছেন প্রতিমা দাশ এবং নন্দিতা।

অথবা মনে হতেই পারত, নকশা-কাটা পিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে কোনো নতুন কনে। কিন্তু অসম্ভব। এমন শতছিন্ন মলিন বসনে, কাঙাল-কাঙাল হাহুতাশে বিয়ে হয় না কোনো মেয়ের। সত্যিকারের বিয়ের দিনেও লাল-টুকটুক একটা শাড়ি ছিল তার। বাহারের শায়া-বেলাউজ।

নইলে, একমাত্র বিয়ে ছাড়া হাজার মানুষের গিলে-খাওয়া চোখের সামনে, রাতকে-দিন-বানানো আলোর মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় কোন্ বেহায়া মেয়েমানুষ! বুকটা কাঁপছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে দুচার পা এগিয়েই, তেজী-তেজী আলো আর হরেক যন্তরপাতির বহর দেখে দুর্গা মাটিতে লেপটে বসে পড়ল। নন্দিতা প্রতিমা সামলাতে অক্ষম।

আলোর চত্বরে ওকে দেখার পরই ভিড়ে জনতায় তুলকালাম সোরগোল— ‘বরাত খুল্যে গেল বটে র‍্যা মুলো পরান ব্যাটার। উয়র কেল্‌টে বৌটা ফিলিম এস্টার গ, ফিলিম এস্টার! শাবনা আজমি হেমা মালিনী শর্মিলা জয়া গ আমাদের বাগদী-বৌ…’

শিস প্যাক হাসাহাসি মশকরা হরেক আওয়াজ দর্শকজনতায়।

মুখে মাথায় আঁচল টেনে দুর্গা লজ্জায় মরে। ভয়েও। মাটি আঁকড়ে বসে থাকে উবু হয়ে। ওঠে না। এবং ওকে তোলার জন্য চারদিক ঘিরে ইউনিটের লোকজন। পরমেশ নিজেও।

মাতো বাগদী ধর্মদাস মোড়ল এসে টেনে তুলল হ্যাঁচকা টানে। এক রকম জোর করেই— 'অমনধারা কচ্চিস কেনে র্যা! আমরা ত আছি ভয় কী তুর?'

যেন দিনদুপুরের সুয্যির চেয়েও কড়া আগুন তার গায়ের ওপর। তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যদিও, বাগদী-বৌ চোখ খুলে তাকাতে পারে না। বুক ঠেলে কান্না। হাড়পাঁজর কাঁপিয়ে শরীরটা, মৃগী রোগী যেমন, দাঁত-কপাটি শক্ত হয়ে ওঠে—কী শাস্তি কী শাস্তি গ ভগমান! উদোম মাঠে কাঁড়ি কাঁড়ি মানুষের সামনে মেয়েমানুষের আব্রু!

সিন 57A শট 1 টেক 1 সায়লেন্ট নাইট 25 10 80

তীব্র আলো এবং রিফ্লেকটর স্ট্যাণ্ডগুলো যথাবিহিত স্থানে স্থাপিত। ডাক্তার-বাবুর কোয়ার্টারের দিকে অনেকদূর পর্যন্ত ট্রলি গড়িয়ে যাবার রাস্তাও প্রস্তুত। হাঁকাহাঁকির শেষে সহযোগীরা এখন দৃশ্যের প্রতি মনোযোগী। ট্রলিতে বসে ক্যামেরাম্যান নির্মল নির্দেশের প্রতীক্ষায়।

শহরের বাবুদের থানে-নিবেদনের ভেট নিয়ে চলেছে কেলো সামন্ত। হাঁসমুর্গি-পাঁঠাখাসি নয়, নারীমাংস। আকালমড়কে এমনি হয়। হাঁসমুর্গির চড়া দর, মানুষের দামে ঘাটতি।

ট্রলি চলবে ধীরে ধীরে। বাগদী বৌ-এর হাত ধরে টেনে টেনে এগোবেন নিশীথ বাগচী।

'মাথা থেকে ঘোমটাটা সরিয়ে দাও তোমার। মুখটাই তো তুলব আমরা…' আন্তরিক পরমেশ স্নেহে ভালোবাসায় মমতায়।

বাগদী-বৌ অবশ হয়ে আসে। নিজের সরম ঢাকতে শেষ অবলম্বনটুকু, মাথার কাপড় টেনে আঁচলটা কামড়ে ধরেছিল দাঁতে। বাবুরা সেটুকুও কেড়ে নিতে চায় গ! ই কেমনধারা মরণ?

'কতাটা শোন্ না ক্যেনে! কর না কেনে যেমনধারা বলচেন বাবু…' মাতো বাগদী এসেই কাপড়টা টেনে খুলে দিল। কিছুটা রেগে।

বাপ হয়ে, হাজার চোখের সামনে এমনভাবে নিজের মেয়েকে উদোম করে দেবার পর দুর্গা কাঁদে না। দাঁতে দাঁত খিমচে চোখ বোজে। সুয্যিঠাকুরের তেজ, বাবুদের এত আলো সে দেখে না। তাকাতে পারে না। ঘোমটা খুলিয়ে খ্যামটা নাচ যখন নাচতেই হচ্ছে তাকে, সে শোনে, চারদিকের হুল্লোড়ে শেয়ালকুকুরের চিল্লানি—'ই বৌটাই ঘুঁটে বেচে গ আমাদের গাঁয়ে। এখনে কিলিম আক্টিস…'

ক্যামেরার সঙ্গে ওদের দূরত্ব ফিতেয় মেপে, মিটারে আলোর ওজন পরখ করে ফিরে এসেছে লোকনাথ।

'ফ্যান অফ্। ফুল লাইট…'

'ক্যামেরা…'

'স্টার্ট…অ্যাকশন…'

ট্রলি-ঠেলা শুরু হলো। ক্যামেরাম্যান নির্মলের পাশে পরমেশ। শান্ত মোলায়েম গলা— 'এগোন, এগোন নিশীথবাবু…ওর হাতটা হ্যাঁচকা টেনে নিন…'

মোটাসোটা কৃষ্ণবর্ণ নিশীথ বাগচী নকল গোঁফে কুটিল শকুনি সদৃশ, আরো ভয়ঙ্কর। জবথবু ভয়ে নিচু মুখে দাঁড়িয়ে ছিল দুর্গা। এবং তখনই, বাপের বয়সী লোকটা হাত ধরে টান দিতেই অঙ্গে অঙ্গে কাঁপুনি…কী লজ্জা কী লজ্জা গ… ঝুপ করে বসে পড়ল মাটিতে।

ট্রলি থেকে লাফ মারলেন পরমেশ। ছুটে এসেছে ধর্মদাস, মাতো বাগদী। ওদেরই ধমক—'কী হচ্ছে? হচ্ছে কী এসব?'

ওরা আড়ষ্ট। যেন অবাধ্য মেয়ের জন্যে বাপেরই দোষ—'আ᾽ হবেনি গ বাবু…' মেয়েকে টেনে তুলে, কানে কানে—'ট্যাকা দেচেন বাবুরা, আরো দিবেন। কী কচ্চিস তুই। বেইমানী করবিনি র‍্যা…'

চারদিকে দর্শক জনগণের চাপ সামলাচ্ছিল যারা, ঠাট্টাটিটকিরি তামাশার মজা রুখতে পারে না। বিরক্ত হতাশ পরমেশ ট্রলিতে ফিরে এলেন। সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ বা হেরে না-যাবার জেদ।

টেক 2

ক্যামেরা সচল হলো। ক্যামেরার নাকের ডগায় ক্ল্যাপস্টিক দিয়ে সুভদ্র সরে যাবার পর আবার শুরু থেকেই শুরু।

স্ট্রলি এগোয়। পরমেশ ওঁৎ পেতে থাকেন—'এগোন নিশীথবাবু, আরো লম্বা লম্বা পা ফেলুন···লাফাতে লাফাতে, আপনি ভীষণ খুশি···'

মেয়েটি ওর বাঁ-হাতটা টেনে নেবার অনুমোদন দিয়েছে যদিও, লজ্জা অথবা ভয় ···ডান হাতে আঁচল টেনে ঢেকে ফেলল মুখ।

দাঁতে দাঁত চাপলেন পরমেশ। বাধা দিলেন না। হোক, এভাবেই এগোক—'এগোন নিশীথবাবু, আরো, আরো টগবগ খুশিতে···'

হঠাৎ, মেয়েটি থমকে দাঁড়িয়েছে।

'কাট···' পরমেশ ক্ষিপ্ত এবার। ছুটে এলেন। ভেতরে ভেতরে ক্রোধের উত্তাপ, কিন্তু তবু, দেহমনে নিজেকে সংযত রেখে, বাক্যে আচরণে তখনও স্নেহ ভালোবাসা মমতা—'কাঁদছ কেন? তোমার ছেলেটা বাঁচবে না বলেছেন ডাক্তারবাবু? আমি বলছি—বাঁচবে। বেবিফুডের টিন তো দেওয়া হয়েছে তোমাকে? ওসব খেলেই শিশুরা বাঁচে···'

চারপাশের মানুষজন অদ্ভুত শান্ত, উদ্‌গ্রীব। কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে ইউনিটের লোকজন, ধর্মদাস আর মাতো বাগদী। দুহাতে আঁচল টেনে, নিচু-মাথায় মুখ লুকিয়ে বাগদী-বৌ কাঁপছে।

আরো নিবিড়, আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেন পরমেশ। স্নেহে আর্দ্রতায়—'তোমার ছেলে নয়, মনে করো তুমি···হ্যাঁ, তুমি সাতদিন দশদিন পনের দিন কিছু খাওনি। এ বাবু তোমাকে পেট পুরে খাবার দেবেন বলেছেন। তুমি যাচ্ছো তার সঙ্গে। খেতে পাবে···ভালো ভালো খাবার···'

'না, না গ বাবু, ন্‌না আ আ আ···'

অতর্কিতে, অণুতে অণুতে কেঁপে উঠল পারিপার্শ্বিক স্তব্ধতার মানুষ। বিপুল জনতাকে বধির করে বাগদী-বৌর বুক-চেরা চিৎকার—'এমনধারা কচ্চেন কেনে গ বাবু। পাব্বনি, আমি পাব্বনি···'

স্তম্ভিত বিস্ময়ে সমস্ত আয়োজন মিথ্যে হয়ে এলে, যদিও ক্ষণিক, দিশেহারা পরমেশ তাকালেন এপাশ ওপাশ। মাটিতে লেপটে বসে পড়েছে বাগদী-বৌ। মাতো বাগদী তার ঘাড়ের ওপর—'ই তুই কী কল্লি র‍্যা! এতটা হল, আর শেষটুকুন···কাঁড়ি কাঁড়ি ট্যাকা দিবেন র‍্যা বাবুরা···মা হয়্যা মাব্বি ছেল্যাটাকে?'

জনতার গুঞ্জন। উদ্বিগ্ন সুকুমার কদাক, প্রভুপদ সাহা, থানার বড়োবাবু। পরমেশ তাকালেন ওর অভিভাবকদের দিকে। ধর্মদাস চুপ। বয়স্ক মেয়ে-

মানুষের চোখের-জল মোছাবার যাদু সে জানে না। জোড়হাতে এগোল মাতো বাগদী— 'আর হবেনি গ বাবু। আর একবারটি মাপ করুন না কেনে…'
মেয়েকে তুলে দাঁড় করিয়েছে সে।
সর্বাঙ্গে ঘাম। পরমেশ তাঁর নিজের অস্থিরতায় ঘন ঘন ঘাড়গর্দান মুছছেন রুমালে। রুমাল ন্যাতান্যাতা। হঠাৎ কি মনে হলো, তাকালেন—'ঠিক আছে নিশীথবাবু, ওকে ওর মতো যেতে দিন। হাত ধরবেন না। আপনি একাই হেঁটে যাবেন উইথ এক্স্ট্রিম গ্রীড অ্যাণ্ড গ্রেট্লি টেম্পটেড আইজ। মাঝে মাঝে পিছু ফিরে তাকাবেন, দুহাত নেড়ে ডাকবেন—আয় আয়…আপনি, আপনি শুধু অভিনয় দিয়ে তৈরি করবেন সিচুয়েশনটা। এছাড়া উপায় নেই…'
একই কথা, আরো সহজ করে, সরল ভাষায় বোঝালেন দুর্গাকে। বললেন ধর্মদাস এবং মাতোকে।
সবাই আবার ফিরে গেল নিজেদের অবস্থানে। টলতে টলতে ফিরলেন পরমেশ। সিগারেট ধরালেন। সিগারেটও বিস্বাদ। বড়ো বিচ্ছিরিভাবে বাতিল হয়ে যাচ্ছে গাঢ় মমতায় গড়ে তোলা এতদিনের ভাবনাটা।

টেক 3

ক্যামেরা সচল হলো। ট্রলিও। প্রাণপণ খেটে একটা কিছু করতে চাইলেন নিশীথ বাগচী। মেয়েটি তাঁর পেছনে।
ডান হাতে থুত্নি চেপে নিষ্পলক স্থবিরতায় পরমেশ তাকিয়ে রইলেন যদিও, কোনো উৎসাহ নেই। নির্দিষ্ট সীমায় পৌছোবার আগেই যখন নির্দেশকের নিষ্প্রাণ কণ্ঠস্বর—'কাট্…'
সহযোগীরা অবাক। শুধু অচঞ্চল নির্দেশক স্বয়ং। বেশ কিছু দামি ফিল্ম্ নষ্ট হলো অনর্থক, পুরো সন্ধেটাই মাটি। পণ্ডশ্রম, পণ্ডশ্রম শুধু। যেন খুব একটা ভাবনার অবকাশ নেই। নিশ্চিত সিদ্ধান্ত—সবটাই বাদ যাবে এডিটিং-এ।
সহযোগীদের আরো বিস্ময়—প্রোগ্রামটাও বাতিল। বাগদী-বৌকে জানালায় দাঁড় করিয়ে আরো একটি নীরব স্থবিরচিত্র রচনার কথা ছিল। হবে না।
কিন্তু কোথায় পরমেশ মিত্তির? বাগদী-বৌকে নিয়ে উচ্চকিত জনতার কোলাহলে যখন বাগদী-বৌ নিজেও আপে।আঁধারীর ছায়ায় নিঃশব্দে বিলীন, যন্ত্রপাতি গুটিয়ে গাড়িতে তোলার এলোমেলো তোলপাড়ে নির্দেশককে খুঁজে পাওয়া গেল না কোথাও।

একপাশে নন্দিতা প্রতিমা ধ্রুবজ্যোতিদের কানে চুপিচুপি বললেন কিরণময়—'আকাল নয়, এ দৃশ্যটাই মনোরম হয়ে উঠত, যদি মহাভারত হতো তোমাদের বিষয়। কৌরবসভায় বিবস্ত্রা হচ্ছেন পাঞ্চালী। হতভাগী জানেই না, কী তার অপরাধ! এ পাপসভায় কেন তাকে টেনে আনা!'

ক্যাম্পে সেই বিষাদ এলো।

পায়ে পায়ে হেঁটে এসে পরমেশ বসে পড়েছিলেন তাঁর নিজের ঘরে। তাঁর আপন নিভৃতিতে। একটা অকারণ অবাস্তব মিথ্যেকে নিজের মধ্যে লালন করাব গ্লানিতে ভাঙাচোরা মানসিক অস্থৈর্যে যখন অন্তর্দাহ,নিজের বিবরে বন্দী, আশ্বাস কিছুটা—জরুরি বার্তায় আর্ট-ডিরেক্টর গোপেন কর চলে এসেছেন সন্ধ্যার ট্রেনে এবং যখন বন্ধু গোপেনের সঙ্গে প্রডাকশনের সঙ্কট নিয়ে আলোচনায় মগ্ন, গ্রামের মান্যজনদের নিয়ে ঢুকলেন সুকুমার এবং প্রভুপদ সাহা। রাত তখন আটটা।

আপিশ থেকে ফিরে আর বিশ্রামের সুযোগ পাননি সেক্রেটারি নির্মল ঘোষ। গ্রামে হৈচৈ বেঁধে গেছে। সুধন্য কুণ্ডু মানিক চাটুজ্জেরা আসর মাতাচ্ছে বাজারে। ভদ্দরঘরের মেয়েদের না পেয়ে বায়োস্কোপ-কোম্পানি এবার ছোটজাতের মেয়েছেলেদের ধরেছে। বাগদীপাড়ার সোমত্ত বৌটাকে পলাশডাঙায় টেনে নিয়ে গিয়ে বেশ্যাব পার্ট বলিয়েছে আজ। এমন ব্যভিচার যদি চলে, তাদের সিদ্ধান্ত—কাল সকালেই তারা দল বেঁধে আসবে ইশ্‌কুলবাড়িতে। এসব অনাসৃষ্টি কাণ্ড তারা ঘটতে দেবে না কিছুতেই।

বাঁহাতে আঙুলের সাঁড়াশিতে কপাল চেপে আপন মৌনে নিবিষ্ট ছিলেন পরমেশ। ডান হাতে সিগারেট পুড়ছে। চোখ তুললেন—'বেশ্যার পার্ট! কে বলল আপনাদের?'

'তাই ত শুনলাম।'

সুকুমার আর প্রভুপদর দিকে কটাক্ষে তাকালেন তীক্ষ্ণতায়—'সেটা বেশ্যার চরিত্র নয় নির্মলবাবু! সে যাক গে, এসব নিয়ে আর কথা বলতে ভালোও লাগছে না আমার। আই অ্যাম টায়ার্ড।'

গ্রামের পুরনো এল এম এফ ডাক্তার তথা স্কুলকমিটির প্রেসিডেন্ট রাধিকারঞ্জন গাঙ্গুলী এসেছেন সঙ্গে। পাখার বাতাসের সামনে বড়ো আদর করে বসতে দেওয়া

হয়েছে তাঁকে। দাঁত নেই অনেকগুলো, তোবড়ানো গালে জরা—'আমি ত গোড়াতেই বলেছেলুম ওদেরকে, কাজটা খুব ভাল হচ্চে নি গ। যা করবে, ভেবেচিন্তে কর। তা শুনল নিকি কেউ। বলে—বড় ডেরক্টর। আমাদের গাঁয়ের দেশ্য বই-এ উঠবে। জগৎ জুড়ে সুখ্যাত হবে, দেখবে দেশবিদেশের লোক। তা হোক সুখ্যাত্…

এগোলেন সুকুমার। গলার স্বর খুবই বিনত—'এটা এমন কিছু নতুন নয় রাধিকাবাবু। গ্রামের মানুষদের নিয়ে কাজ করি আমরা। সব জায়গায় সব ডিরেক্টরই করেন। কেন, এখানেও তো আপনাদের গ্রামের বেশ কয়েকজন মেয়েকে নিয়ে দুটো না তিনটে শট তোলা হয়ে গেছে আমাদের…'

"সে ত হল সুকুমারবাবু, আপনারা কি করচেন, না-করচেন, সে ত জানিনে আমরা…'দুর্ভাবনার তলানি থেকে শ্বাস-টানার ভঙ্গিতে সোজা হয়ে বসলেন হরিনাথ সাঁতরা—'লোকটা জানল না, শুনল না, ওর বৌকে নিয়ে এলেন?'

'ধর্মদাস কথা বলেছে আমাদের সঙ্গে। মাতো নিজে এসেছে। দুর্গার বাপ…'

'এটা কোনো কতা হল। পরানকে ত বশ করতে পারেননি। ভাগ্যিস গরিবমানুষ। কোর্টকাছারিব মুরদ নেই। নইলে আপনাদের ওসব ছেঁদো কতা টিকত কোথাও? দু-ছেলেব-মা, তার সোয়ামিকে না বলেকয়ে ঘর থেকে বের করে আনলেন এভাবে।'

ভ্রূ কুঞ্চনে তাকিয়ে ছিলেন পরমেশ। ওদিকে মুখে পান গুঁজে চিবোতে ভুলে গেছেন প্রভুপদ। দামি জর্দার গন্ধ। একমাত্র পাখাব শব্দটা ছাড়া ঘরে যখন ধ্বনি নেই, রাধিকারঞ্জন লাঠিতে ভর কবে উঠে দাঁড়ালেন—'নাও গ, কতা বল তোমরা। সাধের সিনিমা নিয়ে থাকো। আমায় টানবেনি এর মধ্যে…'

'একি! আপনি উঠছেন? উঠছেন কেন?' হবিনাথ সাঁতরাসহ সুকুমার এক সঙ্গে।

'এখন যে বায়োস্কোপ-কোম্পানির জন্যি ঘরে তিষ্ঠোনোও দায় হল গ। আরে ছ্যা ছ্যা, এসব কী! সেদিন শুনলুম ইশ্কুলবাড়িতে বসে নিত্যি মদ গিলচেন বাবুরা। এখন ঘরের মেয়েছেল্যাদের নিয়ে টানাটানি। তাই নিয়ে কেচ্ছা? এটা কেমনধারা ভদ্দরতা?'

পথ আগলে দাঁড়িয়েছেন সুকুমার। করুণ আকুতি—'না না, আপনি বসুন একটু। শুনুন আমাদের কথা। বোঝার চেষ্টা করুন…'

'কী বুঝব মশাই! বোঝাতে চান, যান না, বাজারে গিয়ে বোঝান না গাঁয়ের

মানুষদেরকে। আপনাদের আক্কেলটা কি বলুন দিকিন। দুদিনের জন্যি এয়েচেন। কাজ সেরে চলে যাবেন। তারপরও ত দেশগাঁয়ে থাকতে হবে আমাদের। না-কী।'

'অল রাইট, ঠিক আছে…' অতর্কিতে লাফিয়ে উঠলেন পরমেশ—'বেশি কথার দরকার তো নেই। আমরা আর বিরক্ত করব না আপনাদের। আমরা চলে যাচ্ছি…'

শৌখিন প্রভুপদকে নড়েচড়ে উঠতেও কিছুটা সময় নিতে হয়। অতর্কিত ধাক্কায় হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে—'কী করছেন? বলছেন কী পরমেশবাবু?'

'হবে। আপনার সঙ্গে পরে…' পরমেশ দ্রুত অভ্যাগতদের দিকে মনোযোগী —'ঠিক আছে নির্মলবাবু, নাউ ইট ইজ ডিসাইডেড আমরা দু-একদিনের মধ্যেই চলে যাব। দেখি যদি কাল বিকেলে অথবা পরশু…'

'আপনাদের চলে যেতে বলা হয়নি পরমেশবাবু। কতগুলো ঝামেলা বেঁধে গেছে গাঁয়ে, সে নিয়ে কতা বলতেই এসেছিলাম আমরা।'

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ আপনাদের। ইউ হ্যাভ ডান মাচ ফর আস…'উত্তেজনায় গলাটা ধরে আসে। পরমেশ তার ব্যক্তিত্বের অটল দৃঢ়তায়।

বেখাপ্পা রাধিকারঞ্জন ঠুকঠুক করে চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। খিঁচিয়ে উঠলেন —'যাবেন না ত কী করবেন মশাই? যেভাবে ক্ষেপিয়ে দিয়েচেন গাঁয়ের লোকদেরকে! টি-টি পড়ে গেচে ঘরে ঘরে। এখন আর কেউ সইবে আপনাদেরকে? শুনবে কোনো কতা?'

তর্ক বৃথা। নাগালের বাইরে চলে যাবার পর সত্তর-পঁচাত্তর বছরের এক অবুঝ বৃদ্ধকে আধুনিকতার ধারাপাত শেখানো যখন সত্যি কঠিন, অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে গ্রামবাসীরা বৃদ্ধকেই অনুসরণ করলেন। অসহায় সুকুমার, তখনও শেষ রক্ষায় তাদের অনুগামী। নিতান্তই ভদ্রতাবশত গেট পর্যন্ত এগোতে হবে তাঁকে।

বেশ খানিকটা পেছনে থেকে, নির্মল ঘোষ কানে কানে, অনুতপ্ত নৈরাশ্যের সুর —'কী বলব সুকুমারবাবু। এখানেই বড্ড মার খেয়ে গেলাম। বুড়ো মানুষ। সেকেলে লোক। কিন্তু গাঁয়ের মানুষ বড্ড মান্যি করে ওঁকে। এখন যদি বিগড়ে গিয়ে স্কুলকমিটি ছেড়ে দিয়ে বসেন, কমজোরী হয়ে পড়ব আমরা।'

'সে কি। ও রকম কোনো সম্ভাবনাও আছে নাকি?'

'তাই ত বলছেন কদিন ধরে। ভীষণ রেগে আছেন।'

শীর্ষ-সম্মেলনের বাইরে অথবা হাসপাতালের দরজায় যেমন উৎকণ্ঠ মানুষ, এক-

তলার সিঁড়ির কাছে জটলা। ইউনিটের প্রায় সবাই। কোনোদিকে তাকালেন না রাধিকারঞ্জন। লাঠি ঠুকে ঠুকে এগোলেন স্কুলবাড়ির গেটের দিকে।'
কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার ভেদ করে দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠেছে বাইরে। মলিন জ্যোৎস্না।

'হয় না, বুঝলে হে, এ হয় না...' ভিন্নতর এক বিষাদে আচম্বিতে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ কিরণময়—'আকাল খুঁজতে এসেছ? এ তো শুধু ভাতের হাঁড়ির আকাল নয় তোমাদের। গোটা দেশ জুড়ে বিত্তেবুদ্ধির আকাল, চেতনার আকাল, অনেষ্টির আকাল, ডিসেন্সির আকাল, টোটাল ফিলসফির আকাল... জানপ্রাণ দিয়ে খুব তো নাটক করছ। ফিল্ম্ বানাচ্ছ। সত্যি ভাল ফিল্ম্, সাংঘাতিক ভালো একটা স্ক্রিপ্‌ট্। কিন্তু হলে হবে কী! তোমরা তো হাইজ্যাক্‌ড এরোপ্লেনের সুদক্ষ পাইলট হে সবাই। দেশের মাটিতে নামতে পারছ না, এখন বিদেশের মাটিতে কোথাও পা রাখতে পারলে ইজ্জৎটা বাঁচে। অবিশ্যি ওতেই অনেক বেশি লাভ—সোনা রুপো ফরেন একস্‌চেঞ্জ...'
একসঙ্গে হেসে ফেলাটাই সঙ্গত ছিল হয়তো এবং নিঃশব্দে, গালে ভাঁজ তুলে হাসতেও হলো কুণ্ঠায়। কোনো কিছু বলার অবকাশ নেই। জটলার বাইরে সায়েন্স বিল্ডিং-এর চওড়া সিঁড়ির নিরিবিলিতে চুপচাপ বসে ছিল সকলেই। গ্লানিতে আনত অথবা দুর্ভাবনা—শেষপর্যন্ত ছবিটার কী হবে? উচ্চাকাঙ্ক্ষার আকাশটা ক্রমেই মেঘলা হয়ে উঠছে। এমন কি, নন্দিতাও বড়ো বেশি ম্রিয়মাণ এই মুহূর্তে।
'ওই বাগদী বৌটাকে নিয়েই যত্তো গণ্ডগোল। বুঝলেন কিরণদা..' অভিনেতা উদয় চৌধুরী তার খোলামেলা আতিশয্যে—'সিকোয়েন্সটা যে কেন ছাই ঢোকাতে গেলেন পরমদা। শেষ পর্যন্ত হলো তো ঘেঁচু...'
'না, সেটা বলবেন না...' নন্দিতা বেশ বড়োসড়ো ঝাঁকুনি দিয়ে, যথেষ্ট জোরের সঙ্গে—'নতুন একটা আইডিয়া মাথায় এসে গেছে। ছবির প্রয়োজনেই সেটা খুব জরুরি। এনিহাউ ইট হ্যাজ টু বি ডান্। হলো না—সে আর কী করা যাবে।'
'বেশ তো, যান না একবার গ্রামের ভেতর। গিয়ে দেখবেন কি হচ্ছে সেখানে...' উদয় চৌধুরী বৃত্তাকার চোখে, গলাটাকে ফ্যাসফেসে করে—'এই তো গিয়েছিলাম বাজারে। মাই গড। সে কি ব্যাপার! রীতিমতো পাবলিক

মিটিং। ফায়ার ফায়ার। বুঝলেন—আগুন জ্বলছে সেখানে। আমি তো পালিয়ে এলাম।'

'এভাবে বলবেন না উদয়বাবু। ঝামেলাটা আরো বাড়বে...' বসে ছিল বিতোষ। উঠে দাঁড়াল— 'গ্রামের ছেলেগুলো যায় নি এখনও। ওই দেখুন না, কথা বলছে সুকুমারবাবুর সঙ্গে। ওদিকে দেখে এলাম, এই এত রাতেও গেটের বাইরে ভিড়।'

ঘটনাও তাই। সবাই দেখছে। ওধারে হিউম্যানিটিজ-কমার্স বিল্ডিং-এর সামনে ইউনিটের লোকজন এবং গ্রামের ছেলেরা। স্কুলের বাগানে, গেট পর্যন্ত এপাশে ওপাশে ব্যস্ততা, অবিন্যস্ত লোকচলাচল। উদয় চৌধুরী একটা সিগারেট ধরিয়ে সেদিকেই চলে যাবার পর ধ্রুবজ্যোতি যেন তার বধির নিমগ্নতা থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলল— 'আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত নন্দিতা। ওভাবে বললে পরমদার প্রতি যথেষ্ট ইন্‌জাস্টিস করা হয়। লোকাল হ্যাজার্ডটা অন্য জিনিস। সেজন্যে তো বলা যাবে না—দুর্গাকে এনে পরমদা সাধ করে ঝামেলাটা পাকিয়েছেন...'

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন কিরণময়। ভিড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। কোনো কথা বলল না কেউ। এমন কি, বর্ষীয়সী প্রতিমাও উতলা নন। যেহেতু খোদ ডিরেক্টরের ঘরেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা এবং সেখানে এখন কর্তৃপক্ষের গোল-টেবিল, জানে না কেউ, বুড়ো কোথায় যাচ্ছেন। হয়তো খুঁজবেন হরেনকে। তার চেলা।

নন্দিতা প্রতিমা পাশাপাশি বন্ধ-কলাপসিবল্ গেটে ঠেস দিয়ে অবশভঙ্গিতে স্থির। অলস পায়চারি করতে করতে বিতোষ অন্যায়ভাবে পাতাবাহারের একটা পাতা ছিঁড়ল গাছ থেকে।

সিগারেট ধরাল ধ্রুবজ্যোতি— 'কিরণদার কথাই ঠিক...'

'কী?'

'রবীন্দ্রনাথই বলুন কিংবা আই পি. টি এ—শুধু হাওয়া থেকে তো হয়নি কিছু। গোটা দেশ জুড়ে টগবগ করছে মানুষ। ন্যাশনাল স্ট্রাগল তো বটেই, হরেক রকমের আন্দোলন। গ্রামগ্রামও বাদ যায় না তার উত্তাপ থেকে। একজন আর্টিস্ট অনায়াসে ভাবতে পারতেন—আই অ্যাম পার্ট অব দ্য মুভমেণ্ট। পিপলের মধ্যে সাঁতার কাটাতে পারতেন ওঁরা। আর এখন বুঝুন ঠ্যালা। ফিল্‌ম্ করতে এসে চোরের মতো সিঁধিয়ে গেছি ঘরের ভেতর। আমাদের

নাকি কিছু বন্ধুও আছেন এ গ্রামে। এখন তো শুনছি, আমরাই ওদের গলায় আটকে আছি। কোনো রকমে ওগড়াতে পারলে বেচারিরা বাঁচে।'

নড়েচড়ে উঠল সকলেই।

জটলা থেকে ছুটে আসছে হরেন আগুন। পেছনের আলোয় শিলুয়েট মানুষটাকে ভালো করেই চেনা যায়। আপনজন।

'ধুর্বদা বিভবদা নন্দিতাদিদি গ…' ছুটতে ছুটতে এসে সিঁড়ির নিচের ধাপে একেবারে মাটিতেই ধপাস করে বসে পড়ল লোকটা। প্রতিমা দাশের পায়ের কাছে— 'আপুনেরা নিকি কাল সকালেই চল্যে যাবেন গ দিদিমণি? ই কী শুনচি গ?'

সকলেই চমকে উঠল—'কাল সকালে? কী বলছেন? কে বলল আপনাকে?'

'এমনধারাই ত বলাকওয়া হচ্চে গ। ডেরকটরবাবু বলেচেন…' হরেন কাঁদছে। সত্যি সত্যি কান্না।

বিস্ময়ের চোখগুলো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে স্থির। ধ্রুবজ্যোতি বলল— 'উঠুন। উঠুন হরেনবাবু, চলুন। খবরটা শোনা যাক। ব্যাপারটা কী? হুট করে চলে যাওয়া মানে!'

ওদিকে ভিড়টা সজীব ছিল। সংবাদের সত্যতা একতলাতেই স্পষ্ট হলো যদিও, ওরা ওপরে উঠে এল।

কিন্তু তখনই নয়। রাত আরো গাঢ় হয়ে এলে, অনাবশ্যক মানুষের ভিড়ভাট্টা হালকা হবার পর পরমেশ নিজেই ঘোষণা করলেন—প্যাক আপ। কাল সকালেই ক্যাম্প ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত। ভাবনা নেই। এ ছবি হবে। উই মাস্ট গেট ইট কম্পলিট, ইনক্লুডিং হোল অব মালতী এপিসোড বাই নভেম্বর। নইলে ক্ষতি আপনাদের সকলেরই। ডিসেম্বরের মধ্যে সেন্সর সার্টিফিকেট না পেলে সামনের বছর দেশী-বিদেশী বিভিন্ন কম্পিটিশন…

বিহ্বল স্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে ছিল হরেন। দুর্বোধ্য বাক্যের শব্দগুলো তাকে বিদ্ধ করে। দেহে ইনজেকশনের সূঁচ সইবার মতোই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কান্নাকে দমিয়ে রাখার কঠিন প্রয়াসে, যন্ত্রণায়, নির্বোধ ইন্দ্রিয়গুলি যখন শাসন মানে না, মান্যিজনদের আওতা থেকে ছিটকে গিয়ে, দূরে, সিঁড়ির মুখে কংক্রিটের রেলিং-এ হুমড়ি খেল—বেইমান, বেইমান সব। গরিব মানুষের দুঃখু নিয়ে পালা বাঁধতে গিয়ে হেরে গেলেন বাবুরা। দুঃখী লোকের কতা কইবার জন নেই গ দেশে। আপনজন…'

লোকটার কাণ্ডই অদ্ভুত। সহানুভূতির আর্দ্রতায় অথবা যথার্থই বিরক্তিতে সমবেত সুধীজনেরা যখন বেদনায় শীতল, কিংবা নিরর্থক উৎপাত এড়াতে চাইছেন, পরমেশ এগিয়ে এলেন— 'কী হলো হরেন। চলো, নীচে চলো। তোমার সঙ্গে বসে খাব আজ রাতে…'

ছুঁতে পারলেন না। সিঁড়ি ভেঙে টলতে টলতে নেমে যাচ্ছে লোকটা। ধরে রাখা গেল না কিছুতেই। কিরণময় নিজেই এগোলেন না।

বাইরে তখন কত রাত। ঠাহর নেই। চাঁদনি আলো ছিল। হাতে দু-ব্যাটারির চকচকে নতুন টর্চ। নন্দিতা দিদিমণির এই ছোট্ট উপহারটুকু ছাড়া পাবার কিছু ছিল না এখানে। প্রায় তিনটে হপ্তা ধরে তার বৃথাই ছুটোছুটি, বৃথাই প্রত্যাশা।

এবং আরো গভীর রাতে নিজের ঘর থেকে যখন বেরোলেন প্রভুপদ সাহা, শিল্পীরা আশ্বস্ত সকলেই— হুইস্কি বিলাসে তৃপ্তি অগাধ। 'আকাল'-এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এতদ্‌সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা নিতান্তই অমূলক।

সুতরাং শেষ রজনীতে শিবিরে সুখনিদ্রা ছিল।

সাবেকি নিয়মে পরদিন যথারীতি সূর্যোদয়।

দলবল লোকলস্কর যন্ত্রপাতি নিয়ে ওঁরা চলে গেলেন। প্রডিউসার আর্ট-ডিরেক্টরের সঙ্গে ডিরেক্টরের যৌথ আলোচনায় নিশ্চিত বিশ্বাসে পৌঁছে গেছেন তাঁরা—'আকাল' দাঁড়িয়ে যাবে। কলকাতার স্টুডিওতে বা অন্যত্র কোনো গ্রামে সংক্ষিপ্ত ক্যাম্প করে যথাযুক্ত 'আকাল' নির্মাণে কলাকুশলগত কোনো বাধাই আর নেই।

মালতী-বিষয়ক ভাবনাও সমস্যা নয় কোনো। সুজাতা সান্যালকে নিয়ে পূর্বার পৌঁছোনোর কথা আগামীকাল সকালে। আজই বিকেলে কলকাতা পৌঁছে পরমেশ নিজেই টেলিফোনে জানিয়ে দেবেন—প্রয়োজন নেই। মোহন-পুর বা হাতুই-এর পর্ব শেষ।

কিন্তু তারপরও মোহনপুর থাকে। হাতুই-এ জীবন বয়ে যায়।

পরদিন সকালে আবার স্কুলবাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল হরেন

আগুন। হৃদয়ের মানুষ একবার যেমন আসবেই তার প্রিয়জনের শূন্যতায়।

দুপুরের খরখরে রোদ্দুরে জলছিল পুজোর-ছুটির বিশাল বাড়িটা। হাজার শিশুর কলরব নেই, ধোপদুরস্ত ঝলমল মান্যিজনদের হাঁকাহাঁকি ব্যস্ততা ফুরিয়েছে। গাছ-গাছালি-ভরা বাহারের বাগান আর হলুদ রঙের মস্ত মস্ত দুটো দোতলা দালান-কোঠা নিয়ে গোটা স্কুলবাড়িটাই তখন তার নিয়তিনির্বন্ধ জনার্দন হালদার, দয়াহীন নির্মম।

দূরের গাছতলায় অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল একা। হপ্তা তিনেকের কটা দিন কী ভীষণ, কী ভীষণ মিথ্যে।

মানুষ হওয়া হলো না জীবনে। জনার্দন মহাজনের খাতায় দেনা বাড়ছে তার। বাড়তেই থাকবে। বিয়ের যুগ্যি দুটো মেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে বড়ো হচ্ছে, বড়ো হতে থাকবে। নিত্যি দাঁত-ঝাড়ানি খিটকেল বৌটার—শাপান্তি তার অপদার্থতাকে। এবং সে, ভাঙা মেটে ঘরের আঁধারে পারগোলে পা রেখে জীবনভর দক্তি টেনে যাবে—মা-লক্ষ্মীদের অঙ্গের বাস তার শিল্পে, বুননে। পালাগান ভুলবে সে। ভুলতেই হবে। ওরা বড়ো, বড়ো বেশি কষ্ট দেয়। নইলে তাঁতের টনোপোড়েন কেন তার জীবনেও।

দুর্গার ছেলেটা মরে গেল।

বিশাল পৃথিবীর অবাধ গতিময়তায় টেরই পেল না কেউ -বাচ্চাটা জন্মেছিল একদিন।

কিন্তু শিশুটির একজন মা ছিল। মায়ের বুকে আকাশ ছিল। সেখানে বজ্রসহ অবিশ্রাম জলধারা। সাতজন্মের কী পুণ্যি নিয়ে এসেছিল তার খোকা—ওর জন্যে রঙচঙে টিনের কৌটোয় দুধের পথ্যি!

প্রায়-আস্ত পথ্যির কৌটোদুটো বুকে নিয়ে দুর্গা হাহুতাশে কাঁদে।

থুঃ থুঃ ওয়াক থুঃ…নিজেরই ওপর ঘেন্নায় ঘেন্নায় বুকের মধ্যে জ্বালা—'আমি ত পারলুম নি গ! পালাগানের বিবি সাজা হলো নি। বোকাহাবা মে'মানুষ। কিন্তুক আকালদুঃখীর কতা না কইতে এয়েছিলেন গ বাবুরা? কুথাকে পাইল্যে গেলেন? কেনে গেলেন? আপুনেরা না মরদ?'

পরান পোড়েল ফিরে এসেছিল।

জানোয়ারের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে সে শুনেছিল সবই। লাথি কষায়নি হাহুতাশী বৌ-এর ফাঁকা কলজেটায়, জিন্দা হাতের থাবলায় কাটারিটা থাবলে ধরে কোপাতে যায় নি তুলতুলে নরম গর্দানাটা। একশ-টাকা নোটের বাস্তবটাকে মেনে নিয়েছিল।

চণ্ডাল ক্রোধে লাথি মেরেছিল বাপঠাকুদ্দার ভিটেয়, আগুন দিয়ে খড়ের চালটা পুড়িয়ে দেবার সাধ—কাজকাম নেই, খেতেপত্‌তে দেবে না কেউ, তবে কোন্ সোহাগের ভিটে। কোন্ পিরিতের দেশ র‍্যা আমার ?

যে-ছেলেটা বেঁচে থাকে, তাকে আর বৌকে নিয়ে কলকাতা চলে এল পরাণ। কলকাতার ফুটপাথে আলগা সংসার।

নুলো হাত বাড়িয়ে করুণা চাইবে না বাবুদের কাছে। আরো একবার লড়বে। লড়ে দেখবে

অথচ লাখো লাখো পরদেশী বাবুদের জুলুজুলু চোখের সামনে তার বৌ আরো ন্যাংটো, আরো উদোম

চালচুলো নেই, ঘর নেই, যত্নআত্তি আদরসোহাগের বাসনাশূন্য গ্রামের পথে পথে, মাঠে মাঠে আজও ঘুরে বেড়ায় শেতলাবুড়ি। রঙ বদলায় না মাথার ওপর মস্ত চাঁদোয়ার—নীল। শতবর্ষের আবাদে আবাদে একই মাঠ প্রতি বছর রঙ বদলে কখনও সবুজ কখনও সোনা। বুড়ি দানা ঠোকরায়, দানা খোঁজে। অসংখ্য আকাল মড়ক খরা বন্যা পেরিয়ে দীর্ঘ, দীর্ঘকাল বেঁচে-থাকার পাপে বা ক্লান্তিতে লোলচর্মে শুষ্কতায়, কুঁজো হতে হতে কোমরটা যখন সমকোণে কৌণিক, কাঁপা-কাঁপা মাথাটা নত হয়ে আসে ভূমির দিকে এবং নত হতে হতে ললাটে ভূমিস্পর্শ বিলম্বিত যতদিন, কম্পিত হাতে গাছের-ডাল-ভাঙা লাঠিটা ঠুকে ঠুকে বাগদী বুড়ি দানা ঠোকরাবে, দানা খুঁজবে। মরণ বয়ে বাঁচবে আরো কটা দিন